মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

দীর্ঘায়ুনিরাপৎসু,—

প্রাণভরা স্নেহ আর অঞ্জলি ভরিয়া আশীর্ব্বাদ
তোমারি লাগিয়া বৎস, আনিয়াছি করিয়া সঞ্চয় ;
নয়ন-আনন্দ জ্যোতি, জীবনের পরিপূর্ণ সাধ !
হে কুমার, জন্মমাত্র এ হৃদয় করিয়াছ জয়।

দিক্‌পালের শুভইচ্ছা নিরাময় আনে বায়ুস্তরে',
ব্রাহ্মণের নান্দীপাঠে অকল্যাণ দূরে সরে যায়,
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা জন্মারম্ভে কুলাচার করে ;
দেবতার আশীর্ব্বাদ-পুষ্প-বৃষ্টি করিছে মাথায়।

পুণ্যবলে পিতামহ দীর্ঘ-আয়ু করেছে তোমায়,
আপন সুকৃতি তব দিনে দিনে বাড়াবে গৌরব ;
পিতৃকুল ধন্য হ'বে, মাতৃকুল কৃতার্থ প্রভায়,
কীর্ত্তির অম্লান ফুল দিকে দিকে ছড়াবে সৌরভ।

আশিস্ করিয়া তোমা নবাঙ্কুরশ্যাম দূর্ব্বাদলে
এ মহামানব-গাথা উৎসর্গিনু ও কর-কমলে !

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

সাবিত্রী-কাকা

দানের অক্ষয়বট—সুশীতল মধুর ছায়ায়
খর রৌদ্রতাপ হ'তে রক্ষিল যে স্নেহমমতায় ;
রাখিল সে যাদুস্পর্শে, দরিদ্রের ছিন্ন ঝুলি ভরি'
ভিক্ষার তণ্ডুলকণা স্বর্ণখণ্ডে রূপান্তর করি।
করুণা-উজ্জ্বল হাতে আলোকি' সে জীবযাত্রা-পথ
পরিশ্রান্ত পথিকের পুরাইল সর্ব্ব মনোরথ।
দুর্দ্দিনের সহচর, বিপদায়ে সদা বরণীয়,
দরিদ্রের চিরবন্ধু, পুণ্যশ্লোক, প্রাতঃস্মরণীয়।

নিবেদন

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে অতি বিস্ময়ের বহু উদাহরণ আছে, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের চরিত্রের মত তাঁহার চরিত্রের মধ্যে দুর্লভ উপাদানেরও অভাব নাই কিন্তু তিনি তাঁহার সহজবোধ্য জীবনের মধ্যে পূর্ব্বাপর এমনি একটি ভাবধারা অব্যাহত রাখিয়া গিয়াছেন যে, নাটকীয় সংঘাতেও তাহার কোনওরূপ রূপান্তর সম্ভব নহে। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের মধ্যে মানুষের সহিত মানুষের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্র ও বিবিধ কার্য্য-কারণের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের আসল রূপটি আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। লোকসম্পর্কে মণীন্দ্রচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব নিজের প্রাধান্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল,—অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, পালন ও পরিচালন ছিল তাঁহার প্রতিদিনের নিয়মিত কর্ম্মসূচি। কর্ম্ম-পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য অবশ্যই ছিল, নিত্য নূতন প্রেরণাও ছিল প্রচুর, অব্যাহত কর্ম্ম-স্রোতের ধারাবাহিকতারও অভাব ছিল না ;—সেগুলি মহৎ জীবনের দৈনন্দিন লিপির মত যেমন বিচিত্র তেমনি সুন্দর। তাই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের ঘটনাগুলি আমি দিনের পর দিন লিপিকারের মত সাজাইয়া দিয়াছি ; মহতের চরিত্র বুঝিবার পক্ষে দৈনন্দিন লিপি-পাঠই আমি প্রশস্ত বলিয়া মনে করি। রাইট্ অনারেবল্ এইচ্, এইচ্, আসকুইথ বলিয়াছেন—

"The Most illustrious men are created, not so much by the rounded and measured story of their lives, as by a single act or incident or sentence which stands out from the pages, whether of the best or of the most inadequate biography."

মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় মানুষের জীবন বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুন্দর দেখায়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনও তাই সুন্দর ! সে জীবনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লেখকের কোনও বিশিষ্ট মতামতের প্রকাশে পাছে ম্লান বা অতিরঞ্জিত হয় সেজন্য অধিকাংশ স্থলে তাঁহারই কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রকৃত

পরিচয় দিবার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহার বিচার করিবেন বাঙ্গালা দেশের পাঠকপাঠিকাগণ।

সুকবি শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে উপাদান সংগ্রহে আংশিক ভাবে সাহায্য করিয়া স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের প্রতি তাঁহার আশৈশব শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থসন্নিবিষ্ট ছবিগুলির অধিকাংশই কাশিমবাজার এষ্টেট্-ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ মল্লিক মহাশয় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' তাঁহাদের 'বিবরণী' পুস্তক ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই আমার ধন্যবাদের পাত্র।

আমার অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীভিনিলয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম-এ, এম-এল-সি, মহোদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও উৎসাহ, সর্ব্ববিষয়ে সহানুভূতি ও সাহায্য না পাইলে এ প্রকার বৃহৎ গ্রন্থপ্রকাশে আমি কখনই সমর্থ হইতাম না। স্বর্গগত কীর্ত্তিমান্ পিতার প্রতি ইহা যোগ্য পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা জানি, তবুও ইঁহার সঙ্কল্প ও প্রেরণায় আজ "মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র" প্রকাশিত হইল—তাঁহাকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

লোকনাথপুর
পোঃ দর্শনা (নদীয়া)
সন ১৩৩৯ সাল
মাঘ-সংক্রান্তি

বিনীত—
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

মারণ-যজ্ঞ, সরলতা, শঙ্কাকুল স্বামী, মণীন্দ্র-কীর্তি,

মণীন্দ্রচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনারায়ণ

চিত্র-সূচী

আপন মর্যাদা ত্যজি' জনে জনে হায়
অঞ্জলি ভরিয়া সুখে যে জন বিলায়,
তুচ্ছ করি' সিংহাসন ধূলায় নামিয়া
গোষ্ঠীসুখ অনুভবে সখিরে ডাকিয়া
সসম্মানে নিজ পাশে ; মানের আসন
কে তাহারে দিতে পারে হে মহারাজন্ ?

নিত্য উৎসারিত প্রাণ,—পুণ্য মহিমার
তুমি ত চাহনি পূজা প্রতিদানে তা'র।
আপনি পূজারী বেশে মন্দিরের ঘরে,
গৈরিকে আবরি' দেহ পাত্র অর্ঘ্য করে,
সকল পূজার আগে অর্পিয়া প্রাণ
নরে নারায়ণ ভাবি' করিয়াছ দান!

মানবে পূজিয়া তাই দেবতার হাতে
সিদ্ধির নির্মাল্য পে'লে মরণ-প্রভাতে।

———

সূচনা

একসপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে একদিন অপরাহ্ন বেলায়, উদ্বেগ ও আগ্রহের মধুর যন্ত্রণা, আশা ও প্রত্যাশার অধৈর্য্য আবেগ প্রশমিত করিয়া, আনন্দকোলাহলের মধ্যে, জন্মজন্মান্তরের অদৃশ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি নবজাত শিশু জ্যৈষ্ঠের মেঘমুক্ত অম্লান আলোকের দিকে প্রথম নয়ন মেলিয়া চাহিয়াছিল।—এ যেন যুগ যুগান্তের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আপনার মধ্যে আহরণ করিয়া একটি অস্ফুট কোরকের পরিপূর্ণ বিকাশ!—আলোকের মুখ চাহিয়া ধীরে ধীরে দলে দলে গন্ধ-সুষমার অপূর্ব্ব পরিণতি।

সে দিন সেই জন্মতিথির পবিত্র ক্ষণে—ললাটলিখন পূর্ণমাত্রায় রাজযোগের সূচনা করিল,—বাঙ্গলার অলিখিত ইতিহাসের বীরপ্রসিদ্ধি করায়ত্ত করিয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেদিন দেশ জাতি ও ধর্ম্মের কল্যাণে এই সদ্যপ্রসূত নব কুমারের জীবনে সাধনার যে বীজটি উপ্ত হইল, উত্তরকালে লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহাকেই পত্রপুষ্প ও ফলে সুশোভিত হইয়া এক অতি আশ্চর্য্য কল্পবৃক্ষরূপে বিরাজ করিতে দেখিলাম।

দশহরার পুণ্য পর্ব্বাহে এই পৃথিবীর আলো বাতাসের সঙ্গে যাঁহার প্রথম পরিচয়, তিনি যেন সেদিনের মুক্তি-স্নানে ভবিষ্যৎ জীবনের দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আসিলেন;—অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিয়া যিনি ধরিত্রী-মাতার ক্রোড়ে জন্মলাভ করিলেন, তিনি আজীবন অপূর্ব্ব সাধনার দ্বারা এই দরিদ্র দেশে ত্যাগ ও দানধর্ম্মের যে সুমহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন—তাহা শুধু আপনার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের নয়, সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে আদর্শরূপে বিরাজ করিবে।

কর্ম্মের বৈচিত্র্যে তাঁহার জীবন ছিল সুন্দর, উদারতার সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় ছিল মহনীয়;—আচারে ও আচরণে, বিচারে ও বিবেচনায়,

দাক্ষিণ্যে ও অমায়িকতায় মণীন্দ্রচন্দ্র ছিলেন বাঙ্গালী সমাজের মুকুটমণি। সংসার-সমরাঙ্গনে যুধ্যমান সৈনাধ্যক্ষের ন্যায় আঘাত ও আক্রমণ তাঁহাকে অক্লান্তভাবে সহ্য করিতে দেখিয়াছি, আজ তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার চারিদিকে যে বিপুল অবকাশের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে আজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব-বিগ্রহরূপে দেখিতে পাইতেছি। বিগত দিনের কর্ম্মে পরিপূর্ণ সফল দিনগুলির পার্শ্বে বিফল দিবসের নিরানন্দ স্মৃতি আজ হয়ত আমাদের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করিতেছে কিন্তু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের যে দুঃখ ও বেদনা নৈরাশ্য ও নিরানন্দ তাহা ত তাঁহার নিজের জন্য নহে—তাহাত তাঁহাকে কোনও দিন স্পর্শও করে নাই—করিতে পারেও না। তিনি যে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত বহুজনের ও বহু জীবনের ব্যথা ও ব্যর্থতার গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন;—এ যেন তাঁহার জীবন-প্রদীপে ব্যথার আরতি! এ বড় সুন্দর! বড় মনোহর! আজ সে আরতির দীপ নির্ব্বাপিত,—কিন্তু এই গভীর শোকের মধ্যেও দেখিতেছি—জীবন-দহনের ধূপতি হইতে সৌরভরাশি এখনও দিকে দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনে বিলাসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না,—ভোগ-সুখের লেশমাত্র স্পর্শ বা আড়ম্বরের কণামাত্র অবকাশও কখনও সে জীবনকে বিকৃত করিতে পারে নাই। প্রাচুর্য্যের মধ্যে, সুখের অফুরন্ত প্রলোভনের মধ্যে দেবদুর্লভ পবিত্র জীবন যাপন করিয়া তিনি সকলের নমস্য হইয়া গিয়াছেন। পরের যে দুঃখ-বেদনা, শরণাগতের যে বিপদ্-বিপর্য্যয়, অনুগতের যে নৈরাশ্য-নিরানন্দ তাহাতেই তাঁহার অন্তর ব্যথিত, হৃদয় বিচলিত হইত।—সময়ে সময়ে তাঁহার ললাটে যে দুশ্চিন্তার কৃষ্ণ-রেখা দেখা দিত, তাহা ত তাঁহার নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য নহে;—এ যেন আকাশের গায়ে দূরসঞ্চারী মেঘমালা—তৃষ্ণার্ত্ত জনপদের হাহাকারে ব্যথিত, আসন্ন দুর্য্যোগ-সম্ভাবনায় মলিন,—অথচ সে মালিন্য আকাশের নহে।

বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি আজীবন গচ্ছিত ধনের ন্যাসরক্ষক ও প্রজার প্রতিনিধি রূপে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন—

"তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন,
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য ল'য়ে র'বে রাজ্যহীন।"

—শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামীর মত কোন্ গুরু তাঁহার মস্তকে এমনি অমোঘ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা জানি না, কোন্ উৎস হইতে তিনি আত্মদমনের এই অপরাজেয় শক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহাও অবগত নহি, কিন্তু রাজা হইয়া এমন সন্ন্যাসধর্ম্ম পালনের উজ্জ্বল উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

পরের বিক্ষোভ ও অভাবের জ্বালা তিনি প্রসন্নচিত্তে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া গিয়াছেন ;—তাই পরদুঃখমোচনের গুরু দায়িত্ব যিনি তাঁহার মাথায় তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বহন করিবার শক্তিও দিয়াছিলেন তিনি। গৃহের সুখ, স্বস্তি ও শান্তি সে ত তাঁহার ছিল না,—সংসার-জীবনের অবসর ও বিশ্রাম সেও ত তাঁহার জীবনে ঘটে নাই.—নিজেকে ত্যাগ করিয়া পরের কল্যাণের জন্য তাঁহার যে কর্ম্মময় জীবন, তাহাতে একদিকে যেমন কৃতকর্ম্মের পূর্ণ পরিতৃপ্তি আছে, অন্যদিকে তেমনি সংঘাত-বিগ্রহের অবসাদ এবং নৈরাশ্যও আছে ;—সেই চিরচঞ্চল যুধ্যমান জীবনই ত তিনি হাস্যমুখে বিধাতার হাতে আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজয়ী বীর মণীন্দ্রচন্দ্র আজ চিরনিদ্রায় অভিভূত, কিন্তু মনুষ্যত্বের যে পরমাদর্শ তিনি বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনির্ব্বাণ আহিতাগ্নির ন্যায় আমাদের সংসার-আশ্রমে চিরদিন পরম শ্রদ্ধায় সংরক্ষিত হইবে।

কাশিমবাজার রেসিডেন্সি

(১২৬০ খৃষ্টাব্দ)
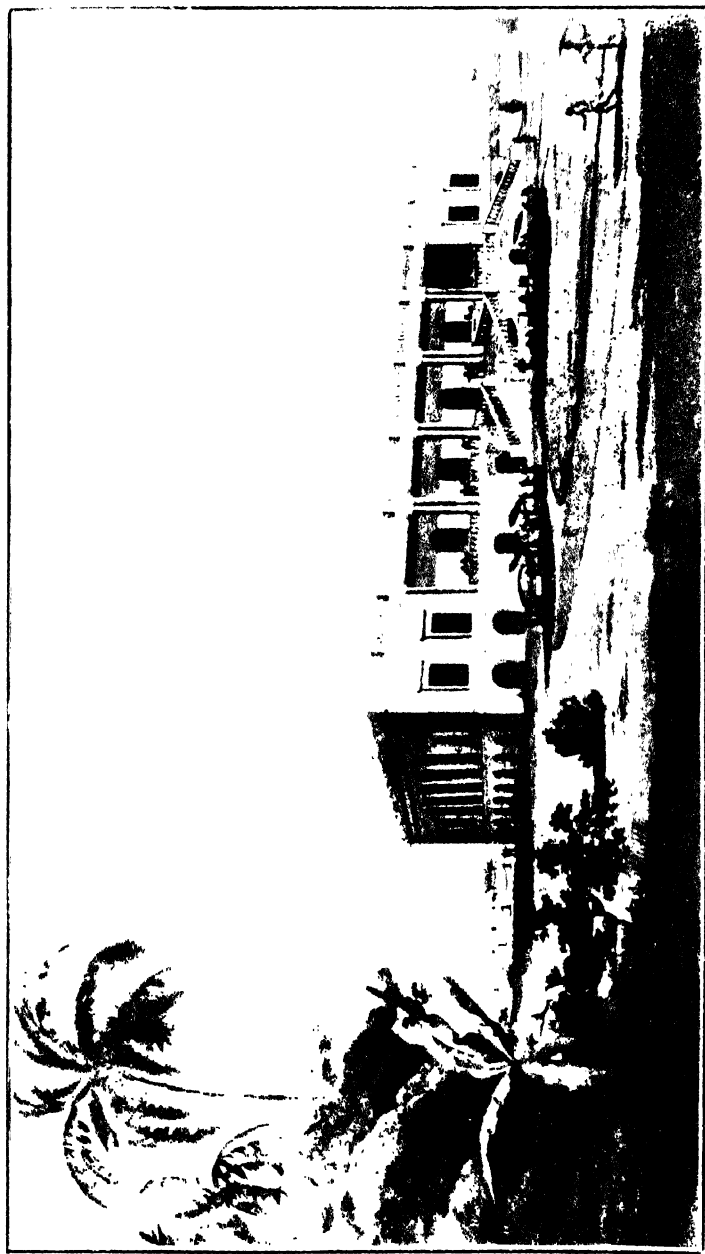
মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র
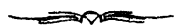
কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস

বাঙ্গলার মুসলমান-রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত কাশিমবাজারই কাশিমবাজার রাজবংশের রাজধানী। এই কাশিমবাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। রামপুর বোয়ালিয়া, মালদহ এবং নিকটস্থ অন্যান্য জেলায় রেশম-গুঁটি হইতে নাটাইয়ে সূতা জড়াইবার কারখানা (বানুক) গুলি সবই কাশিমবাজারের অধীন ছিল। গুঁটিপোকা পালনের জন্য বিখ্যাত স্থানসমূহে উক্ত কারখানাগুলি পরিচালিত হইত। সহস্র সহস্র লোক কাশিমবাজারে অবস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-প্রতিনিধির (Commercial Resident) নিকট হইতে কারখানাসমূহে গুঁটিপোকা সরবরাহ করিবার জন্য টাকা দাদন লইত। বহুসংখ্যক মহাজন রেশমী কাপড় চোপড় আনিয়া পরিবর্ত্তে বরাদ্দ টাকা পাইত। রেশমের কারখানা গুলির সহিত ব্যবসায় সম্পর্কে আসিয়া মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান বনিয়াদী বংশের অনেকেরই প্রভূত অর্থাগমের সূচনা হইয়াছিল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

কাশিমবাজার এষ্টেটের স্থাপয়িতা কান্তবাবুর সময় কাশিমবাজার সহরটি কয়েক মাইল অবধি বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া জানা যায়। মহাজন, গদীওয়ালা, সাহুকার বা ব্যাঙ্কার ও নানা ব্যবসায়ীর আবাসস্থল রূপে কাশিমবাজার প্রধানতঃ ব্যবসায়ের স্থান বলিয়াই পরিগণিত হইত। এখানকার অধিবাসিবৃন্দ অধিকাংশই হিন্দু ছিল এবং তাহাদের তৎকালীন সংখ্যা আনুমানিক এক লক্ষ ধরা যাইতে পারে। তাহারা প্রধানতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিল বলিয়া একদিকে যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের কলরব চলিত, তেমনি অন্যদিকে পথে পথে সংকীর্ত্তনের সঙ্গে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যে সমগ্র ব্যবসায়ের কেন্দ্রটি মুখরিত হইয়া উঠিত।

দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং প্রস্থে তিন মাইল এই সহরটি পরস্পর সংলগ্ন অট্টালিকায় এমন ভাবেই পরিপূর্ণ ছিল যে, সহজেই ছাদে ছাদে সারা সহরটি ঘুরিয়া আসা যাইত। প্রায় শতাধিক সাহুকার বা ব্যাঙ্কার এখানকার টাকা-পয়সার 'লেনদেন' করিত। কাশিমবাজারের পার্শ্ববর্ত্তী কালকাপুর ওলান্দাজগণের ও ফরাসডাঙ্গা ফরাসীগণের রেশম-কুঠির সদর আফিস ছিল। স্থানে স্থানে সমাধিক্ষেত্র, ভগ্ন প্রাচীর ও ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকা এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই প্রথমে এখানে ব্যবসায় করিতে আগমন করেন। তিন বৎসর পরেই কামান দ্বারা সংরক্ষিত দুর্গসদৃশ এক বিশাল কুঠি নির্ম্মিত হইল।—বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে তোপধ্বনি করিবার জন্য নদীতীরে চব্বিশটি কামান স্থাপিত হইল। ইংরাজ বণিকদের এই কুঠির এখন আর কোনও চিহ্নই নাই—রাজ-প্রাসাদের সন্নিকট, দক্ষিণে হেষ্টিংস-পত্নীর সমাধি, ১০০ বিঘা আন্দাজ জমি পড়িয়া আছে, ইহাকে এখন কোম্পানীর হাতা (Residency Hata) বা হাতার বাগান বলা হইয়া থাকে। স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সযত্নে উক্ত কুঠির স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস

ভাটপাড়া, বামুনগাছি, চুনাখালি প্রভৃতি স্থান কাশিমবাজারের সহরতলী বলিয়া পরিচিত ছিল। এখন পর্য্যন্ত চুনাখালি উৎকৃষ্ট আম্রের জন্য প্রসিদ্ধ এবং মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় চালানি আম 'চুনাখালির আম' বলিয়া সুপরিচিত। এই স্থানগুলি পূর্ব্বে ভাগীরথী নদীর বাঁকের উপর অবস্থিত ছিল—কিন্তু শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে সোজা ভাবে দুই বাঁকের মুখ মাঝামাঝি কাটিয়া দেওয়াতে নদীর গতিমুখ অন্য দিকে ফিরিয়া যায় এবং উক্ত স্থানগুলি অন্তর্ভূমিতে আসিয়া পড়ে। ইহার ফলে মহামারীর আকারে যে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, ভীষণতায় ও মৃত্যু-সংখ্যায় একমাত্র গৌড়-ধ্বংসকারী মহামারীর সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। বর্দ্ধমানেও এই জ্বরের প্রকোপ দেখা গিয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কাশিমবাজারের তিন ভাগ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শববাহীর একান্ত অভাব বশতঃ সেই মহামারীর সময় মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার উপায় ছিল না; মৃতদেহ গোযানে বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। এইরূপে ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, সমৃদ্ধিশালী কাশিমবাজার নগরের ধ্বংস হইয়া গেল।

আজিকার দিনে কাশিমবাজারের বিরল পল্লীবাসগুলি, ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাশ্রেণী ও রোগজীর্ণ কঙ্কালসার মুষ্টিমেয় অধিবাসিগণকে দেখিলে তখনকার দিনের সেই ধ্বংস-লীলার চিত্র মানসপটে ভাসিয়া উঠে।

কিন্তু কান্তবাবুর সময় কাশিমবাজার প্রবহমাণ ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য-প্রসিদ্ধিতে বাঙ্গলার অন্যতম প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত হইত।

১৭৮৫ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে কাশিমবাজারের বন্যার কথা বিবৃত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৮৭ সালে কাশিমবাজারে একবার ভীষণ ঝড় (Cyclone) হইয়াছিল,—কলিকাতার গেজেটে প্রকাশ যে, মেজর ও মিসেস্ ডান্

সেই ঝড় জলে "কাশিমবাজার নদীতে" ("Cassimbazar river") নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, কালী নন্দী কান্তবাবুর পূর্ব্বপুরুষ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্ত্রেশ্বরের অধীন রিপী গ্রাম বা সিজনা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল—কিন্তু তিনি কাশিমবাজারসংলগ্ন শ্রীপুরে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি রেশম, সুপারি এবং তূলার মিশ্রিত সূতায় প্রস্তুত কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। এক সময়ে এই প্রকার কাপড়ের ব্যবসায় বিশেষ উন্নত ছিল, এখন আর তাহা নাই। কালী নন্দীর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের পুত্র রাধাকৃষ্ণ নন্দী পূর্ব্বপুরুষের মত রেশমের ব্যবসায় করিতেন এবং তাঁহার একখানি সুপারি ও মুদিখানার দোকান ছিল। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে তিনি ঘুঁড়ি বিক্রয় করিতেন এবং নিজেও তিনি অতি সুন্দরভাবে ঘুঁড়ি উড়াইতে পারিতেন, এজন্য তাঁহাকে লোকে *"খলিফা" বলিত। এই রাধাকৃষ্ণ খলিফাই কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্ত-বাবুর পিতা। কান্তবাবুর আরও চারিটি ভাই ছিল।* কান্তবাবু পিতৃপুরুষের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন এবং বর্ত্তমান কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ মিঠাইয়ের দোকানটি যে জমিতে অবস্থিত সেখানেই নাকি তাঁহার মুদিখানার দোকান ছিল। মনে হয় এই জন্যই তাঁহাকে "কান্ত মুদি" বলা হইত।

অখ্যাত লোকের সন্তান হইয়াও তিনি নিজের কর্ম্মকুশলতা, অধ্যবসায় এবং মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। শুধু বুদ্ধিমত্তা নহে, কূটবুদ্ধি ও ব্যবসায়ের ক্ষমতাতেই তিনি সংসারক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎস কোথায় তাহা জানিতেন, তাহার ফলে সকলের উপর তাঁহার প্রভাবও হইয়াছিল আশাতীত।

অসীম দূরদর্শিতার ফলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একদিন—

কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস

"বণিকের মানদণ্ড—
দেখা দিবে রাজদণ্ড রূপে—"

—ভারতে ইংরাজ জাতির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী, অতএব সে জাতির সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইলে তাঁহার উন্নতিও অনিবার্য্য।

শাসক ও শাসিতের সহিত সমানভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া তিনি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধাইবার সুযোগ পাইতেন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে তাঁহার এই প্রকার চেষ্টা যে অনেক স্থলে ফলবতী হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

কান্তবাবু বাঙ্গলা লেখাপড়া মোটামুটি রকম জানিতেন, ফারসীও কিছু কিছু জানিতেন এবং ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা বলিবার ও বুঝাইবার ক্ষমতা থাকাতে কোম্পানীর কাছে তাঁহার বিশেষ সুবিধাও হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি নাকি দুই হাজার ইংরাজি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইউরোপীয়গণের নিকট বক্তব্য বিষয় বোধগম্য করিয়া দেওয়া দেশীয় লোকের পক্ষে একটা মস্ত বাহাদুরির কাজ ছিল। বড় বড় কুঠির বেনিয়ানদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি ও স্বরচিত অপূর্ব্ব ভাষায় সাহেবদের সহিত কথা কহিবার বিষয় লইয়া অনেক মজার মজার গল্প আছে। এই বেনিয়ানদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভূত অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন।

কাশিমবাজার-কারখানায় কান্তবাবু শিক্ষানবিশ হইয়া প্রবেশ করেন এবং রেশমব্যবসায়ের প্রাথমিক সূত্র অবগত হইতে না হইতেই তাঁহাকে মহরার পদে নিযুক্ত করা হয়। অবশেষে কেরাণীর (Writer) পদে উন্নীত হইয়া তিনি সেই সূত্রে তদানীন্তন কাশিমবাজারের বাণিজ্য-প্রতিনিধি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সংস্রবে সর্ব্বদা গতায়াত করিবার সুযোগ পান।

যদিও নবাব-সরকারের অনুমতিক্রমে কাশিমবাজারে রেশমকুঠি স্থাপিত হইয়াছিল, তত্রাচ সিরাজউদ্দৌলা তথাকার বিশেষ লাভজনক

ব্যবসায়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন,—পূর্ব্বে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁরও এ বিষয় কড়া নজর ছিল। সিরাজউদ্দৌলা বাণিজ্য-প্রতিনিধি ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিবার সংকল্প করিলেন। কুঠি ঘেরাও করিয়া হেষ্টিংসকে কয়েদীরূপে মুর্শিদাবাদে পাঠান হইল। কিন্তু হেষ্টিংস পলাতক হইলেন। ঠিক সেই সময়েই কলিকাতার তথাকথিত অন্ধকূপ-হত্যা সংঘটিত হইল। হেষ্টিংসকে পুনরায় ধরিবার জন্য নবাব তাঁহার অশ্বারোহিগণকে এবং বার জন খাসবর্দ্দারকে আদেশ দিলেন। হেষ্টিংসের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। মাথা বাঁচাইয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিবারও উপায় ছিল না। অতি নিকটেই কান্তবাবু থাকিতেন, কান্তবাবুর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিলে তিনি কোনও গদি, দোকান বা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন; কারণ তিনি জানিতেন, হেষ্টিংসের সন্ধান করিবার জন্য গুপ্তচরের অভাব নাই। কান্তবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার গৃহে হেষ্টিংসকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে পলাতক হেষ্টিংস ইংরাজ হইয়াও বাঙ্গালী কান্তবাবুর গৃহে সসম্মানে আশ্রয় পাইলেন।

কান্তবাবু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বহু কষ্টে নৌকাযোগে হেষ্টিংস সাহেবকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিয়া নিজে স্বস্তি বোধ করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-প্রতিনিধি ও তাঁহার কেরাণী পরস্পর পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কাশিমবাজারের ভবিষ্যত ইতিহাসের বীজ এইভাবে রোপিত হইল।

হেষ্টিংস যদি কলিকাতায় ফিরিয়া কোনও বড় চাকুরী পান, তবে আশ্রয় লাভের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, কান্তবাবুর ভবিষ্যত উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। পাছে কান্তবাবুকে ভুলিয়া যান, এই জন্য তিনি উপযুক্ত সময়ে দাখিল করিতে অনুরোধ

করিয়া একখানি লিখিত স্মারক-পত্রও তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের পলায়ন সম্পর্কে প্রায় একই রকমের আর একটি বিবরণ পাওয়া যায় ঃ—

"নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন সেই সময় হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদে ছিলেন। এই সময় কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক ও অন্যান্য ইংরেজগণ কলিকাতা হইতে পলাইয়া ফলতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে নবাব সরকারের যাবতীয় সংবাদ গোপনে গোপনে প্রেরণ করিতেন। ক্রমে এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হয়। হেষ্টিংস নবাবের ভয়ে পলাইয়া কান্তবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন কান্তবাবু "কান্তমুদী" ছিলেন। নবাব হইতে ঘোষণা হইয়াছিল, যে হেষ্টিংসকে আশ্রয় দিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কান্ত প্রাণদণ্ডের ভয় করিলেন না। * * * হেষ্টিংসকে কান্তের আশ্রয়ে পান্তা ভাত ও চিংড়ি মৎস্য খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। পরে হেষ্টিংস কান্তবাবুর সাহায্যে গোপনে পলাইয়াছিলেন। পলাইবার সময় হেষ্টিংস কান্তকে একখানি নিদর্শন-পত্র দিয়া বলিয়াছিলেন—"ঈশ্বর যদি কখন দিন দেন, তাহা হইলে আমি তোমার যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করিব।" *

এই বিষয় লইয়া "রসসাগর" কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী পরে কৃষ্ণনগরে "হেষ্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে" এই সমস্যার এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন ;—

"হেষ্টিংস সিরাজভয়ে হয়ে মহাভীত,
কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত।
কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়,
হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।

* মহারাণী স্বর্ণময়ী—বিহারিলাল সরকার

কান্তমুদি ছিল তাঁর পূর্ব্বে পরিচিত,
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপস্থিত।
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে,
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে।
সিরাজের লোক তাঁর করিল সন্ধান,
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান।
মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়,
হেষ্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?
ঘরে ছিল পান্তা ভাত, আর চিংড়ি মাছ,
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলাগাছ।
কাটিয়া আনিল শীঘ্র কান্ত কলাপাত,
বিরাজ করিল তাহে পচা পান্তা ভাত;
পেটের জ্বালায় হায় হেষ্টিংস তখন
চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন।

* * *

সূর্য্যোদয় হল আজ পশ্চিম গগনে,
হেষ্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে।"

একদিকে ক্লাইভ সসৈন্যে এই কাশিমবাজার অভিমুখেই যাত্রা করিতেছিলেন, অন্যদিকে সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রভূত সৈন্যবল লইয়া পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। মধ্য পথে মীরজাফর নবাবকে পরিত্যাগ করিবার কথা দিয়াও সসৈন্যে ক্লাইবের সহিত যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। ক্লাইব অবিলম্বে যুদ্ধসম্পর্কে মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিলেন—সে সভায় অধিকাংশের মতে, নিরপেক্ষ থাকিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বাহির হইতে সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নীতি গৃহীত হইল। কিন্তু ক্লাইব তাঁহাদের সকলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, বহুতর বিপদাপদ্ সত্ত্বেও যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ঊনচত্বারিংশ সৈন্যবাহিনী

কাশিমবাজার রাজবাটী—জোড়াসাঁকো

কাশিমবাজার রাজবাটী—জোড়াসাঁকো (অভ্যন্তর)

তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তাঁহার নেতৃত্বে নিজেদের শেষ রক্তকণা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধপরিকর হইল।

ইহার পর পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের যে অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় হইয়া গেল, ঐতিহাসিক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরের দরবারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রতিনিধি (Agent) নিযুক্ত হইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত করা হইল।

কোম্পানীর তদানীন্তন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বেনামীতে কার-কারবার চালাইবার প্রথা ছিল। এই প্রকার কারবার তাঁহারা একজন প্রতিনিধি বা এজেন্ট (Agent)এর মারফতে চালাইতেন। কান্তবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা নৃসিংহবাবু একযোগে হেষ্টিংসের ব্যবসায় চালাইতেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তথায় চারি বৎসর অবস্থান করেন। দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করিতেই হেষ্টিংস একপ্রকার কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় বিলাতে যান। বিলাত হইতে ১২০০০৲বার হাজার টাকা ঋণ-স্বরূপ চাহিয়া হেষ্টিংস কান্তবাবুকে পত্র লিখিলেন—কিন্তু অত টাকা ঋণ দিবার সঙ্গতি তখন কান্তবাবুর হয় নাই। ইহাতে হেষ্টিংস তাঁহাকে অবিশ্বাস করিলেন না বা তাঁহার প্রতি রাগান্বিত হইলেন না বরং তাঁহার এতাদৃশ অবস্থার জন্য দুঃখ বোধই করিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্যরূপে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গলার গভর্ণররূপে মিঃ কার্টিয়ারের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কান্তবাবুকে ডাকিয়া পাঠান। বহুলোক নিজেকে কান্তবাবু বলিয়া পরিচয় দিয়া হেষ্টিংসের সম্মুখীন হইল। হেষ্টিংস সকলের মুখাবয়ব পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা সকলেই কান্তবাবু সাজিয়া নিজেদের মিথ্যা পরিচয় দিতেছে। কান্তবাবু ও তাঁহাতে কি কথা হইয়াছিল

তাহা কেহই বলিতে পারিল না। অবশেষে আসল কান্তবাবু উপস্থিত হইয়া হেষ্টিংস-প্রদত্ত স্মারক-লিপি দাখিল করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব স্বীয় হস্তলিপি চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে সানন্দে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায় যে, জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যে দখল না থাকায় কান্তবাবুর একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। সুতরাং তিনি সমব্যবসায়ী বেনিয়ান হিসাবে কান্দি বংশের আদি পুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সাহায্য গ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ বাঙ্গলার নবাব নাজিমের অধীনে বুজরত বা সেট্‌লমেণ্টের (Settlement) কার্য্য করিতেন। এই সময় তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বীরভূমের সর্দ্দার আমিন হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। তিনি যখন কান্তবাবুর সহিত যোগদান করেন তখন তিনি সাধারণের নিকট দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ বলিয়া পরিচিত। তিনি ফারসী ভাষা ও জমিদারী সেরেস্তার হিসাব কার্য্যে বিচক্ষণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বন্ধু কান্তবাবুকে বিশেষ রূপেই সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। সর্ব্বদা কান্তবাবুর সান্নিধ্যে বাস করিবার উদ্দেশে তিনি নাকি সৈদাবাদ অঞ্চলে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন,—সে বাড়ী তখন লালা বাবুর বাড়ী বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহার মূলে বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক তথ্য আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ কান্তবাবুর সমসাময়িক হিসাবে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে বর্ত্তমান সৈদাবাদ রাজবাটী যে জমিতে অবস্থিত, সেখানে শিবদয়াল লালা নামে একজন প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যবসায়ী বাস করিতেন। সম্ভবতঃ এই শিবদয়াল লালার নামেই উহা লালাবাবুর বাড়ী বলিয়া পরিচিত ছিল।

দেওয়ান হইবার সময় হইতে কান্তবাবুর সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল—বিত্ত ও সম্মান করায়ত্ত হইতে লাগিল—তিনি কয়েকটি

সমৃদ্ধিশালী জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। লোকে তাঁহার উপদেশপ্রার্থী হইয়া উপকৃত হইত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ন্যায় শক্তিমান শাসনকর্ত্তার শুধু যে শাসন বিষয়েরই তিনি পরামর্শদাতা ছিলেন তাহা নহে—তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কার্য্যাবলীতেও দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। মহামতি এড্‌মাণ্ড বার্ক সত্যই বলিয়াছিলেন—

"Whoever has heard of Mr. Hastings' name with any knowledge of Indian connection has heard of his *Banian* Kanta Babu. Wherever the Governor went on important missions his faithful Counsellor and friend followed him."

অর্থাৎ ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে কেহ মিঃ হেষ্টিংসের নাম শুনিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বেনিয়ান কান্তবাবুর নামও শুনিয়াছেন। যেখানেই হেষ্টিংস কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যোপলক্ষে যাইতেন, তাঁহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ও বন্ধু কান্তবাবুও তথায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন।

হেষ্টিংসের কার্য্যকালে 'বাবুর' চাকুরীর সম্মান এবং কদর বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁ পদচ্যুত হইলে শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠনের জন্য হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখনকার দিনে সৈন্য বিভাগ ইংরাজ দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপার নায়েব সুবাদার—কার্য্যতঃ যিনি নবাব ছিলেন—তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইত। হেষ্টিংস্ এই দ্বৈতশাসনের উচ্ছেদপ্রয়াসী হইলেন। নবাব সুবাদারের উপর বিচারের এবং রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পিত ছিল। মহম্মদ রেজাখাঁর পদচ্যুতিতে হেষ্টিংস শাসনব্যাপারের এই নিয়মবহির্ভূত অবস্থা দূর করিবার সুযোগ পাইলেন। কান্তবাবু হেষ্টিংসের সহিত মুর্শিদাবাদ আসিলেন এবং পরিবর্ত্তন বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। দেশের মধ্যে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল। মোটামুটিভাবে জমির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া পাঁচ বৎসরের

ওয়াদায় ইজারা দেওয়া হইল। নায়েব সুবাদারের পদ এবং তাহার বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা বেতন, নবীন নবাবের অভিভাবিকা মীরজাফরের বিধবা পত্নী মণিবেগম, মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র নবনিযুক্ত দেওয়ান কুমার গুরুদাস, খালসার "রায়রায়াণ" (Rai-Rayan) রাজা রাজবল্লভ এই তিন জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী দপ্তর সমগ্র বিভাগ ও আফিস সহ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল।

ইংরাজ-শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তনে দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের পরামর্শের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয়। যে ইংরাজ-রাজ্যের আইন ও শাসন-ব্যবস্থার কথা সমগ্র সভ্য জগতে সুপরিচিত তাহার সূচনায় কাশিমবাজার এষ্টেটের স্থাপয়িতা কৃষ্ণকান্তের বুদ্ধি ও পরামর্শের আধিপত্য দেখিয়া বাঙ্গালী জাতির শ্লাঘা করিবার যথেষ্ট হেতু আছে ; কিন্তু ভাগ্যের কঠিন পরিহাস এই যে, আজ দেড়শত বৎসরের উপর দুর্ম্মূল্য অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াও অভিভাবকদের কাছে এ জাতির নাবালকত্ব ঘুচিল না।

রাজস্ব বিভাগের পুনর্ব্যবস্থা [১] করিবার সময় বড়লাট বাহাদুর পরিষদের (Council) সহিত একমত হইয়া স্থির করিলেন যে, কোনও পত্তনি বা ইজারার বন্দোবস্ত এক লক্ষ টাকার উপর হইবে

[১] "১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর উপাধি-সম্বল সম্রাটের নিকট হইতে ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের ভার) গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ফৌজদারী ও পুলিশ ইংরাজের ক্রীড়া-পুতুল নবাবের অধীনেই রহিল। রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত দেশীয় কর্ম্মচারীদের হাতেই ছিল ; কিন্তু ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী নিজেই সেই ভার গ্রহণ করিল এবং দেওয়ানীর সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারী ও পুলিশ ক্রমশঃ তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িল। কার্য্যতঃ কোম্পানীই বাংলা দেশ শাসন করিতে লাগিল। এই সময় হইতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ইংরাজ-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল এবং অন্যান্য রাজারা জ্ঞাতিকলহজনিত দুর্ব্বলতা হেতু ইংরাজ-রাজের সার্ব্বভৌমিক অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।"

না এবং কোনও বেনিয়ান বা পদস্থ কর্ম্মচারী জমি ইজারা দিতে পারিবে না বা কোনও পত্তনিদারের জামিনও হইতে পারিবে না। কিন্তু এই স্বপ্রণীত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া হেষ্টিংস সাহেব বাৎসরিক ১৩ লক্ষ টাকার ইজারা কান্তবাবুকে মঞ্জুর করিলেন। এই প্রকার বে-আইনী ও গর্হিত কার্য্যের জন্য তিনি "কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্" (Court of Directors) [২] কর্ত্তৃক বিশেষভাবে নিন্দিত হইলেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই এই কার্য্য পার্লামেণ্টের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া পড়িল। [৩] পার্লামেণ্টে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস অভিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে ১৫ দফার অভিযোগে উক্ত বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়ঃ—

---

[২] "রাণী এলিজাবেথের অনুমতি পত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিজেদের কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি "কোর্ট" স্থাপন করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। এই কোর্টের একজন সভাপতি এবং চব্বিশ জন নির্ব্বাচিত সভ্য নিযুক্ত হইত। প্রতি বৎসর নূতন নির্ব্বাচন হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই শাসন-যন্ত্র একটি "অংশীদার-সভা" (General Court of proprietors) ও ডিরেক্টর সভায় (Court of Directors) পরিণত হয়। প্রতি বৎসর অংশীদারগণ কর্ত্তৃক চব্বিশ জন ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইত। কিন্তু অংশীদারগণের সভা ইচ্ছা করিলে ডিরেক্টর সভা প্রবর্ত্তিত যে কোন নিয়ম বাতিল করিতে পারিত।"

[৩] "কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল অথচ তাহার কর্ম্মচারীরা প্রভূত ধন সম্পত্তি লইয়া দেশে ফিরিতে লাগিল। ক্লাইভের যুদ্ধজয়, ভারত প্রত্যাগত ধনমদমত্ত ইংরাজের ঔদ্ধত্য এবং কোম্পানীর আর্থিক অবনতি এই তিন কারণে প্রথমতঃ পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষা করার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক একটি কমিটি গঠিত হয়। তাহারই অনুসন্ধানের ফলে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে (লর্ড নর্থের মন্ত্রীত্বের সময়) কোম্পানীর কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য "রেগুলেটিং অ্যাক্ট" (Regulating Act of 1773) প্রবর্ত্তিত হয়।"

[১] [২] [৩] ভারতপরিচয়—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

"The said Governor General did permit and suffer his own *banyan* or principal black steward named Kanta Babu to hold farms in different *Parganas* or to be security for farms to the amount of thirteen lakhs of rupees per annum ; and that after enjoying the whole of those farms for two years, he was permitted by Warren Hastings to relinquish two of them which were unproductive."

—অর্থাৎ উক্ত গভর্ণর জেনারেলই তাঁহার নিজের প্রধান বেনিয়ান কান্তবাবুকে বিভিন্ন পরগণায় ইজারা দিয়াছিলেন,—যে কোনও ইজারাদারের জন্য বাৎসরিক ১৩ লক্ষ টাকার জামিন হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং লাভ নাই বলিয়া দুই বৎসর পরে দুইটি ইজারা ওয়ারেন হেষ্টিংসই ছাড়িয়া দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

যাহা হউক এই অভিযোগ সম্পর্কে হেষ্টিংস নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষিত হন * কিন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহই নাই যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কান্তবাবু অনেকগুলি বিশেষ আয়ের জমিদারীর ইজারাদার ছিলেন।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস যখন বিদ্রোহী রাজা চৈতসিংহকে শাস্তি দিবার জন্য কাশী যাত্রা করেন, কান্তবাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে কান্তবাবু একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বীরোচিত কার্য্য করেন।

---

* পূর্ব্বোক্ত রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) অনুসারে "গভর্ণর জেনারল নিজের মন্ত্রী-সভার অধিক সংখ্যক সভ্যের সম্মতি ভিন্ন কোন কাজ করিতে পারিতেন না। মন্ত্রী-সভা ও গভর্ণর জেনারল উভয়েই বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার অধীনে অথচ পার্লিয়ামেণ্টের নিকট ভারত শাসনের জন্য গভর্ণর জেনারল ও তাহার মন্ত্রী-সভাই দায়ী। এই অসম্ভব সম্বন্ধসূত্রে গঠিত শাসন প্রণালীর দোষ পদে পদে ধরা পড়িতে লাগিল। অন্যায় ও অত্যাচারের জন্য পার্লিয়ামেণ্ট যখন ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বরখাস্ত করিবার হুকুম দিলেন তখন ডিরেক্টর সভা এই আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া হেষ্টিংসকে গভর্ণর জেনারল পদে বাহাল রাখিলেন। এই প্রকার অনিয়ম দূর করিবার জন্য মিঃ পিট (Mr. Pitt) ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আর একটি আইন প্রস্তুত করেন।" ভারত পরিচয়—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হইলে সৈন্যগণ ও কর্ম্মচারিবৃন্দ রাণীদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। কান্তবাবু তাহাদের এই অসামরিক ও অমানুষিক আচরণের প্রতিবাদ করিয়া গমনপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ান। কিন্তু তাঁহার এই প্রতিবাদে বর্ব্বর সৈন্যগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তখন তিনি রাণীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া হেষ্টিংসকে বিশেষ অনুরোধ সহকারে জানাইলেন যে, ভারত-নারীগণের অন্তঃপুরের বাহিরে যাইবার নিয়ম নাই, তাহাদিগকে তিনি হেষ্টিংসের অধীন কাণ্ডজ্ঞানহীন সৈন্যগণের হাতে নিষ্ঠুরভাবে অমর্য্যাদা ও গ্লানিভোগ করিতে দিতে পারিবেন না।

কান্তবাবুর অনুরোধ ও যুক্তি প্রদর্শনে ফল হইল—হেষ্টিংস স্বয়ং সৈন্যগণকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন; রাণীরা নিষ্কৃতি পাইলেন এবং কান্তবাবু শিবিকার ব্যবস্থা করিয়া রাণীগণকে রাজপ্রাসাদ হইতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। এই শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাণীগণ তাঁহাদের অঙ্গ হইতে রত্নালঙ্কার উন্মোচন করিয়া কান্তবাবুকে উপহার দিলেন এবং তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে লক্ষ্মীমন্তের নিদর্শনস্বরূপ লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, রামচন্দ্রী মোহর, একমুখী রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ প্রভৃতি লাভ করিলেন। হিন্দুদিগের পরমারাধ্য এই মহার্ঘ্য সামগ্রীগুলি এখনও পর্য্যন্ত কাশিমবাজার রাজবাটীতে সুরক্ষিত আছে। তদ্ব্যতীত তিনি একটি সুবৃহৎ দালানের পাথর আনিয়া কাশিমবাজারের বাটীতে রক্ষা করেন। ইহাই অধুনা কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের "সঙ্গীন দালান" নামে প্রখ্যাত। পাথরের চমৎকার কারুকার্য্য দেখিলে মনে হয়, উহা যেন সম্প্রতি খোদিত হইয়াছে।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়া গাজীপুর ও আজিমগঞ্জে অবস্থিত ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা আয়ের জায়গীর কান্তবাবুকে প্রদান করিলেন এবং তদানীন্তন খেতাব-খয়রাতী নবাব নাজীমের নিকট হইতে

কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথের নিমিত্ত "মহারাজা বাহাদুর" এই উপাধি মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। কান্তবাবু নিজের জন্য প্রাপ্ত জায়গীরের অন্তর্গত একটি পরগণাকে "কান্তনগর" এই নামে অভিহিত করাইয়া নিজে "দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নামে আর একজন কৃতী পুরুষও মুর্শিদাবাদে ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। ইনি বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সেন বংশীয়দের আদি পুরুষ দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্তকে জায়গীর প্রদানকালে যে সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল তাহার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল—

The Victorious Emperor Shah Alam, the devoted Farzand Sadat Mand Amir-ul Mumalik Itimad-uddaula, Warren Hastings, Bahadur Jaladat Sinh Governor General for his Son Loknath.

To the present and future *Matsaddis* of the affairs of Government and *Zamindars* and *Chaudhris* and *Kanungos* and *mukadams* and tenants and cultivators of *Pargana Ghazipur* purchased by Government situated in Subah Allahabad ; be it known, that *Jagir Mauzas* to the amount of ten thousand rupees are at present settled upon Dewan Krishna Kanta Nandi by way of an *altamgha* donation to enable him to defray the expense of the worship of the *Thakur* from the commencement of the autumn season in Adiyal 1189 One Thousand One Hundred and Eighty nine *Fasli*, according to the *Zamin*, so that he may take possession thereof and hold control over the same and he and his descendants apply the produce thereof to defray the necessary expense of the worship of the *Thakur.* It behoveth that you consider the aforesaid original *mauzas* and increase thereof to be free and exempt from being liable to charge and alteration, as well as from all the *Diwani* contributions and Government demands and not deviate from his advice for the welfare of the tenants and inhabitants and the cultivation of

the land, nor require a new *sanad* every year. The conduct that the abovenamed is to observe is this, that he shall take and use the produce of the original lands and increase thereof, he and his descendants, without participation or partner, and pray for the wlefare of Government and continue the tenants and inhabitants pleasure and thankfully adopting salutary measures and exert himself strenuously for the increase of cultivation and augmentation of duties and exercise no oppression or injustice towards the inhabitants of that place by any means and take care of the public roads, that passengers may pass and repass in full confidence and suffer nobody to commit any prohibited act or drunkenness, and refrain from levying any of the branches of revenue that have been discontinued. Consider this to be express and act as written above. Date, the twenty-seventh of Safi, year 26th of the Reign, corresponding with the 10th January 1785, English year.

রংপুর—বাহারবন্দ, দিনাজপুর—যোগসাহী, রাজসাহী—আমরুল, নদীয়া—মেহেরপুর ও পলাশী, * পুরুলিয়া,—চোটা বালিয়াপুর, গাজীপুর,—বালিয়া ও জয়গোয়ার প্রভৃতি প্রধান প্রধান জমিদারী লইয়া কাশিমবাজার এষ্টেট সংগঠিত হইল। ইহা ছাড়া মালদহ, বগুড়া, পাবনা পর্য্যন্ত কান্তবাবুর জমিদারী বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

পরগনা বাহারবন্দের জমিদারীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও লাভজনক—সমগ্র রংপুর জেলা ব্যাপিয়া এই জমিদারী এবং ইহার বাৎসরিক আয় খরচখরচা বাদ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল।

তখন কাশিমবাজার এষ্টেটের সর্ব্বসাকল্যে আয় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা,—জমি হইতে আয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই জমিদারীর কতকাংশ কান্তবাবুর নিজের নামে ছিল এবং কতকাংশে তিনি তাঁহার পুত্রের নাম পত্তন করাইয়া লইয়াছিলেন।

* বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র কাশিমবাজার এষ্টেটের অন্তর্গত

হেষ্টিংস পুণ্যবতী রাণী ভবানীর বাহারবন্দ পরগনার জমিদারী একপ্রকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কান্তবাবুকে দিয়াছিলেন। কান্তবাবুর খাতিরে হেষ্টিংস যে আরও অনেক প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হেষ্টিংসের অনুগ্রহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও বাহারবন্দ হইতে অধিক হারে রাজস্ব দিতে হয় নাই। হেষ্টিংসের আদেশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রবর্ত্তিত বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাহাল রহিল। কাশিমবাজার এষ্টেট এখনও পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্প হারে রাজস্ব দিবার সুবিধা ভোগ করিতেছে।

ধনসম্পদ অর্জ্জনের প্রতি সুতীব্র মোহ, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দ্বিধা-হীন আচরণ, স্বার্থরক্ষাকল্পে কূট নীতির আশ্রয় গ্রহণ দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের জীবনে লক্ষিত হইলেও তিনি বহুগুণের আধার ছিলেন—দয়া মমতা, সহানুভূতি এবং পুরুষোচিত তেজও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। (১)

"কান্তবাবু অন্যায়রূপে "বাবত" না লইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার জমিদারীতে প্রজাগণ মহাসুখে বাস করিতে লাগিল। বাহিরবন্দ নামক নবপ্রাপ্ত জমিদারী কিন্তু অত সহজে কান্তবাবুর শাসন মানিয়া লইল না। সেখানে প্রজাগণ সকলেই ধনী, অনেকের বাড়ীতেই

---

(১) সেহিমত পুন্নিমন্ত কান্ত বাবু ছিল।
প্রধান পুত্রকে জেহি ইস্বরে সম্পিল॥
জগতের নাথ তাহে প্রছন্ন হইল।
পুন্ন ফলে কান্ত বাবু মহারাজা হৈল॥
কান্ত বাবুর পিতা ছিল অন্তবাবু নাম।
পুত্র পুন্নে হৈল তার বৈকণ্ঠেতে ধাম॥

*   *   *

রাজা হৈল কান্ত বাবু দোয়ানি পরগণা।
সহজে আদায় কৈল মুলুকের খাজানা॥
মুলুকে ফিরিল কান্তবাবুর দোহাই।
জাহার সমো পুন্নিমন্ত রাজা কেহ নাই॥

হাতী আছে, তাহারা সকলে বিদ্রোহী হইয়া বসিল। প্রজাশাসন করিতে কান্তবাবু সসৈন্যে সাজিয়া গেলেন এবং বিশ দিনে বাহারবন্দ অধিকার করিলেন। প্রজাগণ তথাপি বশ মানিল না দেখিয়া প্রাচীন প্রথামত তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিলেন। তখন প্রজাগণ বশ মানিল এবং তিন সনের বাকী খাজনা একেবারে আদায় হইয়া গেল।" (২)

কোম্পানীর আমলের শাসন পদ্ধতির কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এইবার এই সময়কার মুদ্রা-ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; তদ্দ্বারা দেশের তদানীন্তন আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধেও একটা সাধারণ ধারণা করা যাইবে।

ছটি রাই তেরকলম ছিল কপাল উপরে।
রাজা হৈল কান্তবাবু সন বাহার্ত্যরে॥
এগারো সত্ত বাহার্তরে হৈল জমিদার।
ইশ্বর প্রচ্ছন্ন হৈল কপালে তাহার॥
সর্ব্ব রাজার দুই আনা নির্ন্নয় না জানি।
ভূমের নাম হৈল কান্তবাবুর দোয়ানি॥
ভূম পায়া মোহরিরাজা করাএ পরোআনা।
আপন নামে কান্তনগর করিল পরগণা॥
কান্তনগর পরগণা কান্তবাবুর নাম।
মানিল পরজা সব করিয়া সের্ল্লাম॥

(২) এক মুলুক পাইল রাজা নামে বাহিরবন্দ।
কহিলে রাজ্যের বাক্য ষনিতে লাগে ধন্দ॥
বরো খল রাজ্য সেহি খল তার প্রজা।
খাজানা না দেএ কাখো নাহি মানে রাজা॥
এথোক রাইঅতের জমা দুই চারি হাজার।
কুঞ্জর আছেন বান্ধা ফিলখানার মাঝার॥

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্ব্ব প্রথম ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫ আইন অনুসারে মুদ্রাপ্রচলন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। এই আইন অনুসারে মুদ্রিত রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রাকে Sicca বলা হইত। এই আইনের ২নং উপধারায় মুদ্রার ওজন ও কি গুণ থাকিলে অবিমিশ্র বা খাঁটি বলা যাইতে পারে তাহার বর্ণনা দেওয়া হয়। এই সময় এই আইন অনুসারে মুদ্রিত সোনা রূপার টাকায় শতকরা ৯৮ ভাগ খাঁটি ধাতু থাকিত।

বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের মুদ্রার সহিত বিনিময়-হার ঠিক রাখিবার জন্য ওজন ও খাঁটি ধাতুর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ১৮১৮ সালে ১৪নং আর একটি আইন পাশ প্রবর্ত্তিত হইল। খাঁটি ধাতুর পরিমাণ শতকরা ৯৮ হইতে ৯২ নির্দ্দিষ্ট হইল—অন্য বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৩৫ আইনই বলবৎ রহিল।

কাহার পুস্কর্ন্নির জল কেহ নাহি খাএ।
কাহার জাঙ্গাল দিয়া কেহ নাহি জাএ॥
যুকি বিনে ছুখি নএ সে রাজ্যের প্রজা।
কেহত মানিতে নারে কান্তবাবুক রাজা॥
না মানে রাজাকে আর না দেএ খাজানা।
সকলে মিলিয়া করে ঘরে ঘরে মানা॥
হুজ্যতি হেকাতি বিনে নাহি জানে আর।
রাজাখে জবাব দেএ না মানি তোমার॥
এতেক যুনিঞা রাজা ক্রর্দ্ধে হুতাশন।
লস্কর সাজিয়া তখন করিল গমন॥

*   *   *

হস্তি ঘোরা লোক লস্কর সাজিয়া বিস্তর।
বাহিরবন্দে গেল রাজা করিতে সমর॥

*   *   *

লিখিলা দিলাসা (১) রাজা প্রজাদিগের তরে।
ছুরে থাকি জবাব লিখে না মানি তোমারে॥

(১) আশাপূর্ণ পত্র।

মুর্শিদাবাদী মুদ্রা গভর্ণমেন্ট ট্রেজারীতে উপস্থিত করা হইলে—শতকরা ৯৮ ভাগ খাঁটি রৌপ্য আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। আইন অনুসারে মুর্শিদাবাদী মুদ্রা ট্রেজারী গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল।

১৯০৫ সালে বর্দ্ধমানরাজ ৫ লক্ষ, কলিকাতা-নিবাসী মিঃ ডি, এন সিংহ ৫০০০, ১৯০৮ সালে ডুমরায়ন রাজ ৩৭০,০০০, নেপাল দরবার ১৯২০ সালে ২৩ লক্ষ মুর্শিদাবাদী মুদ্রা বিক্রয়ার্থ প্রদান করেন। *

জেমন কাজ্য তেমন সাস্তি করিল সভারে।
তেসনা খিরজ (২) আদাএ কৈল এখিবারে॥ (২) খাজানা।
* * *
দয়ার সরির রাজার দয়া হৈল মনে।
ইনসাফ (৩) করিস বাবত না দিঅ কখনে॥ (৩) বিচার।
এহিরূপে আসল করি লইল খাজানা।
আপোন নামে কান্তনগর করিল পরগণা॥
কান্তনগর পরগণা কান্তবাবুর নাম।
মানিল পরজা সব করিয়া সের্ব্বাম॥

[১—২]—কান্তনামা

* Mr. G. L. Hart, Bullion Registrar Calcutta, Mint. in his evidence in the Inter-provincial Counterfeit coins gang case, which is being tried before the special Magistrate at Allahabad said on the 21st april 1932 :—

"East India Company promulgated its first coinage under Regulation 35 of 1793. All coins, gold and silver, coined under this regulation were designated *sicca.* Section 2 of this Regulation prescribed the weight and purity of coins. Purity of the gold and silver coins under this Regulation was 98 per cent.

In 1818 the East India Company passed another Regulation (No. 14) by which all coins under the previous Regulation were altered in weight and purity in order to bring them into line whith those coined at Madras and Bombay. Purity was reduced from 98 per cent to 92 per cent. In all other respects Regulation 35 of 1793 remained in force.

In 1833, under Act 7 of the year, there was a further change in the weight of coin, purity remaining the same as fixed by Regulation 14 of

গভর্ণর নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই হেষ্টিংসের সদর আফিস হইল কলিকাতায়—কান্তবাবুও সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাহাতে বাস করিতে পারেন তজ্জন্য কলিকাতায় আসিলেন। এই সময় তিনি কলিকাতায় জোড়াসাঁকোতে বিশাল প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। এখনও এই বাড়ী আপার চিৎপুরের উপরে জীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই গৃহেরই হল কামরায় রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করেন—সেকথা প্রসঙ্গক্রমে আসিবে।

হেষ্টিংসের সময় কান্তবাবুর প্রতিপত্তি নানাদিক্ দিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "কোম্পানীর বিচারালয়সমূহে জাতিঘটিত কোন তর্ক উপস্থিত

1818. Throughout all these changes the East India Company fixed the value of coins of the 1793 Regulation in relation to the subsequent regulations, so that the 1793 coinage remained legal tender up to the last change in 1833. By Act 13 of 1836 coins coined under the Regulation of 1793, namely, *sicca* rupees were demonetized, but the East India Company declared that these coins should be received in the collection of land revenues at public treasuries by weight. This valuation remained in force till February 1913, when the Comptroller-General of the Government of India modified the rates at which the Government could accept these coins. This Regulation had now been embodied in the Resource Manual for the guidance of treasury officials.

There were only two officials to whom power had been granted by the Government of India to strike specimen coins of the East India Company, that is, coinages made under the Regulations of 1793, 1818, and 1833. Such specimens were to be given only to coin collectors. The two officials were the Masters of Calcutta and Bombay Mints and they were the only officers in possession of the original punches and dies handed over by the East India Company to the Crown.

The difference between the valuation fixed by the Act of 1830 and that of 1813 was that in the first case coins were received by weight and paid for at a rupee a tola, while by the 1913 Regulation coins were received at their bullion value calculated on the merket price of the silver obtainig at the time. If Murshidabadi coins were presented at a Government treasury, the valuation was based on the assumption that

হইলে কান্তবাবুর উপর তাহার বিচারভার অর্পিত হইত।" * ধনে ও মানে 'কান্ত মুদি' কালক্রমে 'দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত' নামে অভিহিত হইয়া আভিজাত্য-গৌরব লাভ করিতে লাগিলেন।

কান্ত বাবুর একাধিক বিবাহ কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশেষ স্ত্রী ক্ষুদ্রমণির কেবল একটিমাত্র সন্তান হইয়াছিল।

১৭৮৫ সালে হেষ্টিংস অবসর গ্রহণ করিলে কান্তবাবু তাঁহার আদরের স্থান কাশিমবাজারে ফিরিয়া আসিলেন। মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলেন এবং অল্প দিন পরেই তীর্থ পর্য্যটন মানসে পুরীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কান্তবাবু লোকজন সহ পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—এমন একজন ধনী লোকের আগমনে পাণ্ডারা পুলকিত হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল এই ধার্ম্মিক দানশীল বাবুর নিকট হইতে বহু অর্থলাভ করা যাইবে। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল তিনি জাতিতে 'তিলি' তখন তাহারা তাঁহাকে তৈল-ব্যবসায়ী সামান্য কলু মাত্র ভাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। পাণ্ডাদের বিশ্বাস হইল যে, জাতিব্যবসায়ের জন্য ব্রাহ্মণকে কোনও দান করিবার অধিকার তাঁহার নাই। সেই জন্য তিনি "আটকে" (১) বাঁধিবার জন্য প্রভূত অর্থ দান করিতে চাহিলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে জানাইল যে, তিনি নীচ শূদ্রজাতি, দান করিতে পারেন না, কেন না নীচ জাতি বলিয়া তাঁহার দান গ্রহণীয়

---

the coins contained 98 per cent of pure silver. Under the Resource Manual rule a treasury was bound to accept Murshidabadi coins for sale.

The Burdwan *raj* tendered five lakhas and Mr. D. N. Singh of calcutta 5,000 of these Murshidabadi coins for sale in 1905. The Dumraon *raj* tendered 370,000 in 1908 and in 1920, the Nepal Durbar offered twenty-five lakhs."

* মুর্শিদাবাদ-কাহিনী—শ্রীনিখিলনাথ রায়

(১) পুরীতে দরিদ্র সেবার জন্য অন্নদান।

নহে। কান্তবাবু এই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য নবদ্বীপ, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত-সমাজের নিকট যাহাতে তিনি পুরীতে দান করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা চাহিয়া পত্র লিখিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে কান্তবাবুর অনুকূলে যুক্তি দেখাইয়া মত প্রকাশ করিলেন যে—তুলাদণ্ডধারী তৌলিক অর্থাৎ তিলি সাধারণ কলু নহে, দ্রব্যাদি ওজন করিবার জন্য 'তৌল' তুলাদণ্ড ধারণ করে বলিয়া তাহারা ঐ আখ্যা পাইয়াছে—তিলি বাক্যটি তৌলিক হইতে আসিয়াছে।

তুলাদণ্ড ধরা এবং জিনিসপত্র ওজন করা সকল ব্যবসায়ী ও মহাজনের পেষা বলিয়া তিলি জাতি উচ্চ শ্রেণীর শূদ্র হিসাবে নবশাকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই দান করিবার অধিকার তাহাদের আছে।

বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজের মীমাংসা উড়িষ্যাবাসী পাণ্ডারা চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিল। কান্তবাবু 'আটকে' বন্ধন এবং ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার অধিকার পাইলেন। তখনকার দিনে কান্তবাবুর জীবনে এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁহার স্বজাতিগণ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করিতেন। যে কোনও ধনাঢ্য তিলিকে তাঁহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কান্তবাবুর স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। শুনা যায়, সে সময় একমাত্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে নথ (নাকের অলঙ্কার) ব্যবহৃত হইত কিন্তু কান্তবাবু তাঁহার স্বজাতীয় মহিলাদিগের মধ্যে এই নথের ব্যবহার প্রচলন করেন।

প্রতিবেশীদিগের প্রতি কান্তবাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। একজন কলু তাঁহার প্রতিবেশী ছিল—তাঁহার বন্ধুগণ তাহাকে বিতাড়িত করিবার পরামর্শ দিলে তিনি বলিয়াছিলেন—আমি তাহা পারিব না, কলুর মুখ আমি প্রত্যেকদিন সকালেই দেখিতে পাই,—তাহার সান্নিধ্যের জন্যই আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

কাশিমবাজার এষ্টেটের স্থাপনকর্ত্তা অদ্ভুত লোক ছিলেন। অল্প-শিক্ষিত হইয়াও আইন এবং শাসন-কার্য্যের মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয় বুঝিবার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহার ছিল। রাজনীতিবিশারদ না হইয়াও তিনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং শাসকবর্গকে উপদেশ দিবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী তাঁহার পুত্র 'মহারাজা' লোকনাথ নন্দীকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া ইংরাজি সন ১৭৮৮ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

মহারাজ লোকনাথ

মৃত্যুকালে কৃষ্ণকান্ত তাঁহার পুত্র মহারাজ লোকনাথের জন্য একটি বিশাল জমিদারী রাখিয়া যান। সেই জমিদারী গতানুগতিকভাবে অসংখ্য অংশে বিভক্ত না হইয়া সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীর হাতে আসিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এ পর্য্যন্ত উত্তরাধিকার সূত্রে কেবলমাত্র একজনের হাতেই সম্পত্তির অধিকার বর্ত্তাইয়াছে।

লোকনাথ বহু সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। সেরূপ শ্রাদ্ধ ইতিপূর্ব্বে কেহ করে নাই। ইহার পরে মাতৃশ্রাদ্ধে রাজা নবকৃষ্ণ বার লক্ষ এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের সময়ে রাণী হরসুন্দরীর দানসাগর শ্রাদ্ধও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কান্তবাবুর জীবনকালে তিনি পুত্রকে জমিদারী কার্য্যে বেশ সুশিক্ষিত করেন—সেই শিক্ষার ফলে লোকনাথের জমিদারীর আয় বৃদ্ধি হয়,—কিন্তু বেশী দিন তিনি রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। মহারাজ লোকনাথ ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র কাশিমবাজার এষ্টেটের মালিক ছিলেন,—শেষ ছয় বৎসর এক দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে তিনি কোনও বৃহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। সন ১২১১ সালে (ইং ১৮০৪) মহারাণী সুসারময়ীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া, এক বৎসরের শিশু-পুত্র কুমার হরিনাথকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। *

---

* পুণ্যিমন্ত লোকনাথ রাজা বিদিত ভুবনে।
তিন লক্ষ মহর দান কৈল গুরুর স্থানে॥
অর্ন্নদান বস্ত্রদান করেন বিস্তর।
রজত কাঞ্চন দিল ই দান অপর॥

—কান্তনামা

রাজা বাহাদুর হরিনাথ

হরিনাথের নাবালক অবস্থায় জমিদারীর কার্য্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস (Court of Wards) কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। (১)

সন ১২২৭ সালে (ইং ১৮১৮) হরিনাথ সাবালক হইয়াই সর্ব্ব প্রথম হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৫,০০০৲ টাকা দান করেন। এই দান এবং অন্যান্য সৎকার্য্যে অর্থব্যয়ের জন্য লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট

---

(১) নাবালক রাজা হৈল কিছু নাহি জানে।
দয়ামায়া কিছু নাহি বুঝে প্রজা স্থানে॥
* * *
রাজা নাহি পাটের পরে প্রজার নাহি ষুক।
ছল করি বাবত লএ প্রজাক দিয়া দুক॥
* * *
আমলা হাওলাত করি হৈল বাকিপারা (ক)।
রাইঅতের বদনাম করি লইল ইজারা॥
রাজার লোকসান করি প্রজার করে দোস।
ডৌলের (খ) বাক্য গনিল করি জমিদার খোস্ব॥
* * *
বন্দবস্তি ডৌল মিলানি নান্‌হান বাবত লএ।
ফওত ফেরহার (গ) কতো হৈল পরগণাএ॥

(ক) আমলাগণ সরকারে প্রদেয় খাজনা নিজেরা রাইয়তের নিকট হইতে হাওলাত স্বরূপ লইয়া সরকারের হিসাবে বাকী দেখাইতে লাগিল।

(খ) দাখিলা না দিয়া এবং মাথা পিছু না ধরিয়া আন্দাজে মোটের উপর কোন এলাকা হইতে খাজনা আদায় করার নাম ডৌল আদায় করা। গ্রামের মাতব্বরগণ জরুরী কাজের জন্য জমিদারকে ডৌল আদায় করিয়া দেয় এবং পরে কোন্ প্রজার কত দিতে হইবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

(গ) বিবাদ হাঙ্গামা এবং হস্ত পরিবর্ত্তন।

হইতে ইংরাজি ১৮২৫ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'রাজা বাহাদুর' এই খেতাব প্রাপ্ত হন।

হরিনাথ সাবালক হইয়া (২) প্রজাপালনে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন বলিয়া জানা যায়।

সাবালক হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার জ্ঞাতি শ্যামাচরণ নন্দী ও রামচরণ নন্দীর সহিত দীর্ঘকালব্যাপী প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ এক মোকর্দ্দমায় তিনি লিপ্ত হইয়া পড়েন। সমগ্র সম্পত্তির অর্দ্ধেকের উপর দাবী করিয়া এই মোকর্দ্দমা সুপ্রীম কোর্টে দায়ের হয়। এই প্রকার ক্লেশদায়ক মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা ও অশান্তির জন্য দেশের কাজ করিবার অবসর তাঁহার ঘটে নাই—সাধারণের হিতকর কার্য্যের কতকগুলি সংকল্প তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে এই মোকর্দ্দমা তাঁহারই অনুকূলে খারিজ হইয়া যায়।

রাজা হরিনাথ সঙ্গীতের বিশেষতঃ কবির গানের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। শুধু নিজের বাড়ীতে কবির গান শুনিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না—কাহারো বাড়ী কবির গান হইতেছে শুনিতে পাইলে তিনি তথায় উপস্থিত হইতেন।

কবির গান সাধারণতঃ ঘটনা বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়া ঢোল বাজনার সহিত দুই পক্ষের দ্বারা গীত হইয়া থাকে। দুই দল সেই সময়ের জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসাবে কখনও আক্রমণ কখনও বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া চলে। রাত্রি শেষে তাহারা

---

(২) সাবালক হৈয়া জখন পাটে হৈল রাজা।
পুর্ব্বমতে পালন কৈল জতেক পরজা॥
মহাধার্ম্মিক রাজা হৈল কি কহিব তার।
বাবত বলি কয়া করি না নিল প্রজার॥

[১—২]—কান্তনামা

সাধারণতঃ অশ্লীল গানের মধ্য দিয়া গালাগালি করিয়া থাকে—এই গানের নামই "খেউড়" কবি।

হারু ঠাকুর, নীলু পাটনী, যজ্ঞেশ্বরী (স্ত্রী কবি), পরান সিং, ভোলা ময়রা, রাম বসু, বলা বোষ্টম, চিন্তামণি (চিন্তে ময়রা), এণ্টনি সাহেব, * ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, গদাধর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সময়ে কবির দলের দলপতি ছিলেন। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে রাজা হরিনাথের নিকট হইতে ইহাঁদের নিয়মিত বায়না হইত।

---

* এণ্টনি সাহেবের পরিচয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাহেব হইয়াও এণ্টনি বাঙ্গলার কবি বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন এবং সে সময় নিজে কবি-দলের দলপতি হইয়া গান গাহিয়া বেড়াইতেন। এণ্টনি জাতিতে পর্ত্তুগীজ—তাঁহার পিতা চন্দননগর নিবাসী একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। এণ্টনি ও অন্যান্য কবিওয়ালাদের অল্পাধিক পরিচয় অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিত 'উপাসনা'য় প্রকাশিত 'সঙ্গীতে সাহিত্য' ও 'কোম্পানী রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

এণ্টনি অল্প বয়সে এক ব্রাহ্মণ যুবতীর প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহাকে কুলত্যাগিনী করায় ফরাসডাঙ্গায় আর তাঁহার বাস করা হইল না। ব্রাহ্মণ-পত্নীকে (বিবাহ করিয়াছিলেন কিনা সে খবর আমরা জানিনা তবে এণ্টনির পত্নী বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন) লইয়া তিনি ভদ্রেশ্বরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গোরুটীতে বাস করেন। অদ্যাপি এণ্টনির বাস-বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় ব্রাহ্মণবনিতা ম্লেচ্ছানুরাগিণী হইলেও হিন্দুর বারব্রত দোল দুর্গোৎসবাদিতে অনাসক্ত ছিলেন না। এণ্টনির বাড়ীতে দুর্গোৎসবে মূর্ত্তি-পূজা হইত; পূজা উপলক্ষে নাচগান হইত। এণ্টনি বাঙ্গালী পত্নীর সহবাসে বেশ বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন। পূজার সময় এণ্টনির বাড়ীতে কবির গান হইত। শুনিতে শুনিতে এণ্টনির কবির গানে অনুরাগ জন্মে, তিনি নিজেই কবির দল বাঁধিয়া স্থানে স্থানে কবি গাহিয়া বেড়াইতেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সঙ্গে দোয়ার বায়েন লইয়া এণ্টনি ধুতি চাদরে আসরে নামিতেন, তাহাতে তাঁহার দ্বৈধভাব ছিলনা। প্রথম কিছুদিন গোরক্ষনাথ নামে একজন বাঙ্গালী তাঁহার দলে গান বাঁধিয়া দিতেন, শেষে সাহেব নিজেই গান বাঁধিতেন, ছড়া কাটাইতেন, ওস্তাদকে যাহা করিতে হয়

দুর্ব্বল, রুগ্ন পিতার সন্তান হইয়াও হরিনাথ নিজে বলিষ্ঠ ছিলেন। বাঙ্গালী জাতিকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে তাঁহার যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি ছিল না। তিনি খেলাধূলা ভাল বাসিতেন। তাঁহার ব্যায়ামাগারে অবিরাম তরবারি ও মল্লক্রীড়া চলিত। তিনি বহু সংখ্যক বরকন্দাজ ও কুস্তিগীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত বলিয়া তাঁহাকে আবার নূতন লোক বাহাল করিতে হইত। এক সময়ে যুক্ত প্রদেশ হইতে কতকগুলি লোক রাজসরকারে চাকুরী গ্রহণ করিল। রাজার ইচ্ছা নূতন লোকের

সবই করিতেন। এণ্টনির একটি গানও এখন আর সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না—প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান যাঁহারা কিছু কিছু জানেন তাঁহারাও সকলে এণ্টনির পূরা গান জানেন না। দুই একটী নমুনা পাওয়া যায়—

আমি ভজন সাধন জানিনে মা
জেতে হই ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে' কৃপা কর
মা শিবে মাতঙ্গী॥

একবার রাম বসু এক আসরে এণ্টনীকে গালি দিয়া বলেন—

সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি,
ও তোর পাদরী সাহেব শুন্‌তে পেলে
তোর গালে দিবে চুণ কালী।

এণ্টনি তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিলেন—

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভেদ নাই রে ভাই—
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে
এও ত কোথাও শুনি নাই।
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে—
আমার মানব জন্ম সফল হ'বে
যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥

সহিত পুরাতন লোকের বল পরীক্ষা হয়। পুরাতন লোকগুলি বলিল —হুজুর, তিনমাস সময় দিন, তাহার পর উহাদের সহিত লড়াই করিব। অর্থাৎ তিনমাসে জ্বরে ভুগিয়া তাহারা তাহাদেরই মত রুগ্ন হইয়া পড়িলে তাহাদের সহিত বল পরীক্ষা করা কঠিন হইবে না এই উদ্দেশ্যই বোধ হয় এইরূপ আর্জ্জি পেশ হইয়াছিল।

শিক্ষা-বিস্তারে রাজা হরিনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সাহায্যকল্পে রাজা হরিনাথ ১৫ হাজার টাকা দান করিয়া ছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজা হরিনাথের সময়েই কাশিমবাজারে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয়। বহু চতুষ্পাঠীতে

যজ্ঞেশ্বরী—[স্ত্রী কবি] ইনি ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির সমকাল-বর্ত্তিনী—ইহাঁর নিজের কবির দল ছিল, আপনি আসরে গিয়া গান বাঁধিতেন, গায়কদিগকে গাওয়াইতেন; তাঁহার রচনার সামান্যমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়—

অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে
দেখতে পেলাম চোখেতে,
ভাই বল দেখি তোমার সখার সংবাদ
ভাল ত আছেন প্রাণেতে।
তার মনে ত নাই অধিনীরে
তার মনে ত নাই অধিনীরে—
নবীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি এখন
ভেসেছেন সুখসাগরে—
ভাল সুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে,
ব'লো ব'লো প্রাণনাথেরে
বিচ্ছেদকে তার ডেকে নে যেতে
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আসব তার
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে।

বিভিন্ন জেলা হইতে ছাত্রগণ সমাগত হইত। পণ্ডিতদিগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন—কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। কেবল ন্যায়শাস্ত্রে নয়, স্মৃতি শাস্ত্রেও ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের গভীর জ্ঞান ছিল। ইহাঁর ন্যায়শাস্ত্র-শিক্ষা হইয়াছিল নবদ্বীপ হইতে—তৎকালে ইনি প্রথম শ্রেণীর নৈয়ায়িক বলিয়া বিবেচিত হইতেন। নির্ভুল এবং সহজবোধ্য বলিয়া ইহাঁর ব্যবস্থা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

রাজা হরিনাথ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণের সাহচর্য্য ভাল বাসিতেন। ফার্সী লেখা পড়ায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল—জমাখরচের জ্ঞানও তাঁহার মন্দ ছিল না।

পুত্র কৃষ্ণনাথ, কন্যা গোবিন্দ সুন্দরী এবং পত্নী রাণী হরসুন্দরীকে রাখিয়া হরিনাথ সন ১২৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন। হরিনাথের মৃত্যুর পর হইতে ৭২০০৲ টাকা মাসহারায় রাণী হরসুন্দরী কলিকাতার বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন।

আমার হল উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে,
তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর ;
দেখি পাপ দেশের পাপ বিচার
দোহাই আর দিব কার
সদা প্রাণ দহে কোকিলের স্বরেতে।

রাজা বাহাদুর কৃষ্ণনাথ

রাজা হরিনাথের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র কৃষ্ণনাথ ষোল বৎসরের নাবালক মাত্র। বিষয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডস (তখনকার Board of Revenue) এর অধীনে আসিল। কৃষ্ণনাথের শিক্ষার ব্যবস্থার কোনও ক্রুটীই হইল না। প্রথমতঃ তাঁহাকে এক দেশীয় শিক্ষকের দ্বারা বাঙ্গলা, ইংরাজী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা দেওয়া চলিতেছিল পরে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য দিগম্বর মিত্রকে তাঁহার গৃহশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল। দিগম্বরবাবু তখন মিঃ রাশেলের অধীনে মুর্শিদাবাদে আমীনের কাজ করিতেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগরে দিগম্বরের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম শিবচরণ মিত্র। তিনি কলিকাতায় শ্যামপুকুরে থাকিতেন, সেখান হইতে দিগম্বর হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দিগম্বরের শিক্ষকতার কিছুদিন পরে বোর্ড অফ রেভিনিউ (Board of Revenue) এর নির্দ্দেশ অনুসারে ফার্সী ভাষা শিক্ষা বন্ধ করিয়া পদ ও বংশ মর্য্যাদার অনুরূপ ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য ল্যাম্‌ব্রিক (Lambrick) নামক এক ইংরাজকে নিযুক্ত করা হইল।

মুর্শিদাবাদের কালেক্টর মিঃ ষ্টিয়ারের (Mr. Steer) অধীনে কৃষ্ণনাথকে অতি কঠিন এবং অন্যায় শাসনের মধ্যে রাখা হইয়াছিল। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ হকিন্‌স্ (Mr. Hawkins) এই শাসন হইতে কৃষ্ণনাথকে মুক্ত করিয়া বিশেষ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনাথ শুধু যে সাধারণ ইংরাজি লেখাপড়া জানিতেন তাহা নহে, ইংরাজদিগের সহিত অবাধে মেলামেশা করার দরুণ তিনি খুব দ্রুত ইংরাজিতে কথাবার্ত্তাও বলিতে পারিতেন।

কৃষ্ণনাথ নাবালক অবস্থাতেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'Murshidabad News' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। স্বল্পকালস্থায়ী হইলেও মফঃস্বলে এই প্রকার ইংরাজি সংবাদপত্রপ্রকাশ সম্পূর্ণ অভিনব এবং দুঃসাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণনাথ ইংরাজ সমাজে মিশিতে ভাল বাসিতেন। ইংরাজ বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আতিথেয়তা ছিল।

সন ১২৪৭ সালে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে) কৃষ্ণনাথ সাবালক হইয়া—গৃহশিক্ষক দিগম্বরবাবুকে তাঁহার ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাকলণ্ডের শাসনকালে তিনি "রাজাবাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় বহু লক্ষ টাকা জমিয়া যায়—সাবালক হইয়া তিনি তাহা স্বাধীনভাবে খরচ করিতে আরম্ভ করেন। টাকার মমতা তাঁহার ছিল না—তিনি কোন দিনই মিতব্যয়ী ছিলেন না। সাবালক হইয়া চারি বৎসরের মধ্যে তিনি একচল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ভাল ঘোড়া ও কুকুর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি শিকার-প্রিয় ছিলেন, এ বাবদেও তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইত। মালদহ এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থানে তিনি শিকার করিতে যাইতেন—বহুসংখ্যক লোক লস্কর তাঁহার সঙ্গে থাকিত। এই সময় তাঁহার বস্ত্রাবাস রাজধানীর ন্যায় প্রতীয়মান হইত এবং তিনি যখন রাত্রে বন্ধুবান্ধব এবং সঙ্গিগণ সহ রাজকীয় ভাবে আহারে বসিতেন, তখন সে স্থান অপূর্ব্ব আলোকমালায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

বাঙ্গলা ১২৩৮ সালে স্বর্ণময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়—তখনও কৃষ্ণনাথ নাবালক। শুনিতে পাওয়া যায় অপরূপ সৌন্দর্য্যে স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন *।

---

* রূপের ছটাতে ঘর হইল উজ্জ্বল।
সোবর্ণ পুতলি তনু করে ঝলমল॥

"ভাস্করের" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—সাধারণতঃ যিনি গুড়গুড়ে (খর্ব্বাকৃতি) ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত—এক সময়ে খুব তীব্র ভাষায় কৃষ্ণনাথকে তাঁহার অসংযম ও অমিতাচারের কথা লইয়া আক্রমণ করেন। অবিলম্বে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে বলা হইল। মানহানি করার অপরাধে ভট্টাচার্য্য সুপ্রিম কোর্টে অভিযুক্ত হইয়া দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

বাড়ীতে বসিয়া লেখাপড়া শিক্ষার জন্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষায় মানুষের যে মানসিক ও নৈতিক সংযম শিক্ষা হয়— কৃষ্ণনাথ তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। সমপাঠীদের সহিত স্বাধীনভাবে মিশিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া—তাঁহার অধীন ব্যক্তিবর্গের ভাগ্যনিয়ন্তা যে একমাত্র তিনিই—এ ধারণা তাঁহার মনে আজীবন বদ্ধমূল ছিল। এই জন্য তাহাদের সম্পর্কে তিনি সব সময় নিজের মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু 'বদমেজাজী' রাজা কৃষ্ণনাথেরও খোস মেজাজের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

একদিন দোল যাত্রার রাত্রে কৃষ্ণনাথ নেশায় মশগুল হইয়া অন্দর মহলে ফিরিবার পথে উপর হইতে দেখিলেন যে, নাটমন্দিরে যাত্রা হইতেছে এবং সুদীর্ঘ শুভ্রকেশসমন্বিত শ্মশ্রুসুশোভিত নারদমুনি বীণাযন্ত্র বাজাইয়া গান করিতেছেন। নারদমুনির সাজসজ্জা দেখিয়া রাজার ভারি মজা লাগিল। তিনি সে কালের প্রচলিত হিন্দী ভাষায় সঙ্গের হরকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বদনে জলএ সসি প্রথক দুই ভূরু।
ললাট উপরে রবি বিরাজিত চারু॥
পুর্ন্নিমার চন্দ্র জিনি জেন মুখসাজ।
কমল বিকসিত জেন সরবরের মাজ॥

—কান্তনামা

"হরকরা—উয়ো কোন্ হ্যায় ?"

হরকরা। —"হুজুর—উয়ো নারদমুনি হ্যায়।"

রাজা। আচ্ছা হ্যায়। অউর মুনি হ্যায় ?

হরকরা। হাঁ, হুজুর, হ্যায়।

রাজা। বোলাও।

হরকরা তখন চাকর দিয়া সেখানেই চেয়ার আনাইয়া রাজার বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাত্রাওয়ালাদের সাজঘরে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইল এবং অধিকারী মহাশয়কে বলিল—

"রাজা সাহেবের নারদ মুনি দেখিতে বড় ভাল লাগিয়াছে কিন্তু তিনি আর একজন মুনি দেখিতে চান।" সে পালায় আর কোনও মুনির ভূমিকা না থাকিলেও রাজার মনস্তুষ্টির জন্য আর একজনকে মুনির চুল দাড়ী পরাইয়া আসরে বাহির করা হইল।

হরকরা দেখিল রাজার আনন্দের সীমা নাই ;—তাহাকে দেখিয়া রাজা আবার বলিলেন—

"অউর মুনি বোলাও"—হরকরা ইঙ্গিত করিল। এক মিনিটের মধ্যে আর এক মুনি আসরে হাজির হইল। রাজা আরক্তিম নেত্রে ঈষৎ চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"অউর বোলাও"—

অধিকারীর অবস্থা তখন কাহিল—আর ত তাহার ভাণ্ডারে পাকা দাড়ী গোঁফ ও চুল নাই। রাজা যেমন মুনি দেখিয়া খুসী হইয়াছেন, তেমনি 'অউর মুনি' না দেখাইতে পারিলে বিগ্‌ড়াইতেও তাঁহার বেশীক্ষণ লাগিবে না ; কথায় বলে—"রাজা না গোঁজা।" এইরূপ ভাবিয়া শেষে একেবারে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, সন্ন্যাসী ও ব্যাধ প্রভৃতির কটা কটা চুল, দাড়ি, গোঁফে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ফুল খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া সাদা ও গেরুয়া কাপড় পরাইয়া একেবারে আট দশ জন বিবিধ প্রকার মুনি সঙ্গে লইয়া অধিকারী মহাশয় স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের চুল দাড়ী পরিয়া আর

এক মুনি সাজিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে অন্তরে দুর্গা নাম জপিতে জপিতে রাজার প্রতি চাহিয়া তারস্বরে গান জুড়িয়া দিলেন—মুনিরা সব তাহার দোহারকি দিতে লাগিল। রাজা খুসী হইয়া নগদ এক শত টাকা পুরস্কারের হুকুম দিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন।

এই প্রকার রাজোচিত দিলদরিয়া ভাব তাঁহার ছিল। কোমলে কঠোরে সংমিশ্রিত অসংযত জীবনের মধ্যে এই প্রকার সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না।

সুসংযত মন না থাকিলেও জনসাধারণের উপকারার্থে নিজ হইতে উপায় উদ্ভাবন করা এবং তাহা কার্য্যকরী করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা তাঁহার ছিল। বিদ্যাশিক্ষা যে মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন এবং তাহার ফল যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাহা তিনি উপলব্ধি করিতেন এবং সেইজন্য শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের আনুকূল্যে তৎকালে শিক্ষার বিস্তার হইতে দেখা গিয়াছে—তাঁহাদের সহিত ব্যবহারেই তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যাইত।

ইংরাজি শিক্ষার অগ্রদূত ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হইলে তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়া, মৃতের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য মেডিকেল কলেজে একটি সাধারণ সভার আহ্বান করেন। সেই সভায় তিনি বিশেষ অগ্রণী ভাবে কার্য্য করেন এবং ডেভিড হেয়ারের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকার চাঁদা দেন।

কৃষ্ণনাথ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, মাতা ও স্ত্রীর জন্য যৎসামান্য মাসহারার বন্দোবস্ত রাখিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার নামে কাশিমবাজারের নিকটস্থ বাঞ্জেটিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উইল করিয়া গভর্ণমেণ্টের হাতে দিয়া যান।

কৃষ্ণনাথের রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থা এবং রাজার মত চাল-চলন তাঁহার

অমাত্য ও বিভিন্ন কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত দরবার ও রাজ-সেরেস্তার বর্ণনা হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। [১]

তাঁহার সভায় বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত খ্যাতনামা সভাপণ্ডিতগণের সমাবেশ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি নিজে বিদ্যানুরাগী ও শিক্ষিত ছিলেন। [২] তাঁহার সম্পত্তির আয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যে তাঁহার মৃত্যুকালীন উইলে উল্লিখিত ছিল, তাহা হইতেই বুঝা যায়—তিনি শিক্ষাবিস্তারের সদিচ্ছা আজীবন পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

---

[১] শ্রীরাধানাথ বাবু নাম করেন দিওান কাম
হএ সেহি পেস্কার দিওান॥
* * *
নাজির গঙ্গাধর ঘোষ জে নামে ইশ্বর খোস্ব
* * *
দুর্গাচরণ বাবু জেহি সিরিস্তার মাল্লিক সেহি
সেহি সে রাজার সিরিস্তাদার॥
সভা করি বৈসে রাজা পাটের উপরে
মস্তক উপরে ছত্র ধরে ত নফরে

[২] শ্রীরাম যুন্দর তর্ক্য পঞ্চানন্দ ভূসন পণ্ডিত প্রধান।
আসিয়া সভাতে বৈসে রাজা বিদ্যমান॥
শ্রীভোবানি সঙ্কর শ্রীগুরুদাস পণ্ডিত মহাসএ।
আসিয়া সভাতে বৈসে বোলে জএ জএ॥
আগম পুরান আদি গিতা ভাগবত।
চৈতর্ণ্য চরিতাম্রত জানে সভার তত্য॥
মহা ধার্ম্মিক পণ্ডিত সব থাকে দরবারে।
বেদ উচ্যারন করে রাজার গোচরে॥
* * *
রাজ ছত্র মাথে রাজা পাটে থাকে বসি।
তারাগণ মর্দ্দে জেন পুর্ম্নিমার সসি॥
—কান্তনামা

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

বলবান, শিক্ষানুরাগী, শিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী, প্রভুত্বপ্রিয় কৃষ্ণনাথের মধ্যে অভিজাতবংশোচিত অধিকাংশ গুণই দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণনাথ তাঁহার ভৃত্যবর্গের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—এই অনুরাগের মাত্রা এতই অধিক পরিমাণে ছিল যে, তিনি তাঁহার খানসামাকে উইলস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডের ট্রাষ্টি করিয়া যান এবং বর্দ্ধমান জেলার চেটিয়া বেলিয়াপুরের কয়লাখনির বিশাল সম্পত্তি নামমাত্র নজর লইয়া তাহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই ঘটনাতেই আদালতের ধারণা হয় যে, উইল প্রণয়ন কালে তাঁহার মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না। কিন্তু শুধু যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানকারী ভৃত্যবর্গই তাঁহার প্রিয় ছিল তাহা নহে, যে কর্ম্মচারী বা আমলা তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিয়া নির্ভুল পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিত, তিনি তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। গুণের মর্য্যাদা করিয়াই তিনি তাঁহার শিক্ষক ও ম্যানেজার দিগম্বর মিত্রকে এক লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনাথপ্রদত্ত দানের এক লক্ষ টাকা লইয়া দিগম্বর নীল ও রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথমবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পরে লাভের টাকাতে তিনি চব্বিশ পরগণা, যশোহর, বাখরগঞ্জ ও কটক জেলায় জমিদারী ক্রয় করিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে উহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সংক্রামক জ্বরের কারণ অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে যে কমিশন বসে তিনি তাহার সদস্য হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় দিগম্বর গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি একাদিক্রমে তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার 'সেরিফ' পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি সি, আই, ই, উপাধি পান।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। ঠিক এই সময়েই তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। জমিদারী ও রাষ্ট্রনীতিতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি উত্তর কালে হিন্দুসমাজের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথের উক্ত লক্ষ মুদ্রা দানই ঝামাপুকুরের মিত্র পরিবারের প্রভূত অর্থ-সম্পদের ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া মনে হয়।—যোগ্যের যথোচিত সম্মান স্বরূপ এই প্রকার প্রভূত অর্থ দানের মধ্যে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই গুণোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণ আন্দোলনে কৃষ্ণনাথ দুইবার বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তক ডেভিড্ হেয়ারের স্মৃতিরক্ষা কল্পে যে সভা আহূত হইয়াছিল—কৃষ্ণনাথ তাহার অন্যতম অগ্রণী হইয়া যে এককালীন দান করিয়াছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জমিদারী সত্ত্বের "লাখরাজ" (Resumption question) বা পুনর্গ্রহণ বিষয়ে রাজা কৃষ্ণনাথের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তৎকালীন জমিদার সভা, স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের 'লাখরাজ' স্বত্ব সম্বন্ধে অবিবেচনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন—রাজ সরকারে আবেদনও করা হইয়াছিল। এই আবেদন অগ্রাহ্য হইলে ইংলণ্ডস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইবার এবং লণ্ডনস্থিত লর্ড ব্রুহাম (Lord Brougham) প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সহিত সহযোগ স্থাপন করিবার জন্য টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় রাজা কৃষ্ণনাথ বক্তৃতা করিয়া একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বহু সদ্‌গুণ থাকিলেও তিনি অত্যন্ত 'বদ্‌মেজাজী' ছিলেন। অভিযোগে প্রকাশ পায় যে, রাজার একটি মূল্যবান্ হাতঘড়ী হারাইয়া যাওয়ায় তিনি তাঁহার জনৈক ভৃত্যের উপর সন্দেহ করিয়া তাহাকে ভীষণভাবে প্রহার করেন এবং অবশেষে

তাহাকে দোষ কবুল করাইবার জন্য নানাভাবে কঠোর যন্ত্রণা দেওয়া হয়, ইহার ফলে হতভাগ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শবব্যবচ্ছেদেও প্রমাণিত হইল যে, প্রহারের ফলেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বেল (Mr. Bell) গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিলে কৃষ্ণনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মাতা হরসুন্দরীর নিকট পলাইয়া যান। পুত্রের হাতে ভৃত্যের শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিয়া রাণী হরসুন্দরী পুত্রের মুখদর্শনও করিলেন না। তথাকথিত বন্ধুর দল আশ্বাস দিল যে, টাকায় সব চাপা পড়িয়া যাইবে। বন্ধুগণ এই প্রকারে আশা ও ভীতির ছবি হত্যাকারীর চোখের সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক আরও উত্তপ্ত করিয়া তুলিল—তাহাদের কথাবার্ত্তায় কৃষ্ণনাথের কল্পনাতে ভীতি ও অপমানের ছবি ক্রমশঃ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশ শুধু যে কঠোর তাহা নহে, সে সময় এপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা বিদ্বেষমূলক বলিয়া সাধারণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিল। বিচারের পূর্ব্বে সাধারণ কয়েদীর মত কলিকাতা সহর হইতে মুর্শিদাবাদের ফৌজদারী আদালতে আনীত হইবার লজ্জা ও গ্লানির কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে যাহাকে এড়াইতে তিনি চোরের ন্যায় পলাতক হইয়াছিলেন সেই পুলিশ তাঁহারই দ্বারদেশে আসিয়া হানা দিল।—এক মুহূর্ত্তে জীবন তাঁহার কাছে একান্ত দুর্ভর বলিয়া মনে হইল,—মনে হইল,—পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা আত্মহত্যা শতগুণে বাঞ্ছনীয়; হাতের কাছেই গুলিভরা পিস্তল ছিল—নিমেষের মধ্যে কৃষ্ণনাথ পিস্তলের গুলিতে সমস্ত গ্লানি ও অপমানের ভয় হইতে চিরজীবনের মত মুক্তিলাভ করিলেন।

ইংরাজি ১৮৪৪ সালের ৩১শে অক্টোবর তিনি আত্মহত্যা করেন—এই আত্মহত্যা সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদ পত্র 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী'তে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল—

'গোপাল দফাদার নামে রাজা কৃষ্ণনাথের অধীন কোন লোক মূল্যবান্ দ্রব্যপূর্ণ কয়েকটি বাক্স চুরী করার সন্দেহে তাঁহার ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক প্রহৃত হয়। গম্ভীর সিং নামে তাঁহার কোনও সিপাহি তজ্জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিল। সেই মোকর্দ্দমায় রাজা কৃষ্ণনাথও অভিযুক্ত হন। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ বেল সাহেব রাজাকে ধৃত করিবার জন্য নাজির ও আরও কতিপয় লোক পাঠান, কিন্তু তাহারা কাশিমবাজার রাজবাটী হইতে রাজাকে ধৃত করিতে সমর্থ না হওয়ায় বহরমপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রাজাকে ধরিবার জন্য কাশিম-বাজার রাজবাড়ী ঘেরাও করেন। রাজা ধরা দিলে, তাঁহাকে ৫০ হাজার টাকা জামিনে খালাস দেওয়া হয়। এই চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়, তিনি তাঁহার সহিত বিলাত গমন করিয়াছিলেন। বড় বংশের সহিত সম্পর্ক থাকায় তিনি কিছু দাম্ভিক প্রকৃতি হন, এই জন্য রাজা কৃষ্ণনাথকে যথোচিত সম্মান না করিয়া তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিতে উদ্যোগী হইয়া-ছিলেন। রাজা কাশিমবাজার হইয়া কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে গোপাল দফাদারের মৃত্যু হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে কলিকাতা হইতে থানা-বথানা চালান হইয়া বহরমপুরে আসিবার জন্য ওয়ারেণ্ট জারি করেন। রাজা সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া পিস্তলের দ্বারা আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বের পত্রে জানা যায় যে, তিনি গোপালের প্রতি অত্যাচার ব্যাপারে সংসৃষ্ট ছিলেন না। তাঁহার সেই পত্রপাঠ করিলে নেত্র অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

I Sree Rajah Chrisnonath Roy * write. I part with the desire of life solely from the fear of being disgraced as I was

* 'রায়' উপাধি তিনি কেন ব্যবহার করিয়াছেন বুঝিতে পারা গেল না।

—গ্রন্থকার

not concerned in the matter of Gopal's case, nor did I beat or maltreat him. This I solemnly avow. It is only on account of the Deputy Magistrate Chandro Mohan Chatterji, that such excessive measures have been adopted towards me. I therefore write this letter that no one else may incur blame on account of my parting with my own life.

Everything is written in my will and testament.'

পত্রের ভাবার্থ এই যে, গোপালের মকর্দ্দমার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। আমি তাহাকে মারি নাই, তাহার প্রতি কোনও দুর্ব্যবহারও করি নাই, অপমানের ভয়ে আমি আত্মহত্যা করিলাম। আমার আত্মহত্যার জন্য অন্য কেহ দায়ী নহে। সকল কথা আমার উইলে লেখা আছে।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার একদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনাথ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নিজের ভাষায় উইল প্রস্তুত করেন। এই উইলে মহারাণী (তৎকালে রাণী) স্বর্ণময়ীর ১৫০০৲ করিয়া মাসহারার ব্যবস্থা ছিল। পোষ্য গ্রহণের অনুমতি না দিয়া তিনি তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশই শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য উইল করিয়া যান। এখানি কৃষ্ণনাথের দ্বিতীয় উইল—ইহাতে রাণী স্বর্ণময়ীর দত্তক গ্রহণের নিষেধ ছিল।

এইরূপে একজন সম্ভ্রান্ত যুবকের জীবন শেষ হইয়া গেল। দোষ ও খামখেয়াল সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে অনেকগুলি গুণেরও সমাবেশ ছিল; এজন্য সকলে তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিত। তিনি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন—এই ভাবপ্রবণতা তাঁহাকে কখনও ভাল, কখনও বা মন্দের দিকে পরিচালিত করিত। তৎকালীন "Friend of India" নামক সংবাদ পত্রে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার উপর নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—

"Thus has the family of Kanta Babu, become extinct in the fourth generation and the residue of the property which he accumulated by means which the court of Directors and the

House of Commons condemned with such severity, has been devoted to an object which will preserve the name of the family in lasting remembrance."

অর্থাৎ এইরূপে কান্তবাবুর বংশ চতুর্থ পুরুষেই ধ্বংস হইয়া গেল। কান্তবাবু যে উপায়ে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন কোর্ট অব ডিরেক্টরস ও হাউস অফ কমানস্ তীব্র ভাবে তাহার নিন্দা করিয়াছেন। সেই সম্পত্তি অবশেষে যে এমনি একটি সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইল—ইহাতে এই বংশের নাম চিরস্মরণীয় হইবে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী

স্বামীর এই শোকাবহ আকস্মিক মৃত্যুতে প্রথমাবস্থায় স্বর্ণময়ী শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িলেন ; কিছুতেই তাঁহার মন প্রবোধ মানিতে চাহিল না। কিন্তু ক্রমশঃ জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া তাঁহার বিহ্বল ভাব কাটিয়া গেল।

সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা পর্ণকুটিরেই দয়া-মমতা ও ধার্ম্মিকতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুজাতির আর যে দুর্ব্বলতাই থাক না কেন—দয়াহীনতার কলঙ্ক তাহাকে কেহ দিতে পারিবে না বরং হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের এই দিকটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এদেশের অসংখ্য দীঘি, পুষ্করিণী, ধর্ম্মশালা, পান্থনিবাস, অনাথ ও আতুর আশ্রম প্রভৃতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তৎকালীন রাজা মহারাজ ও জমিদার প্রভৃতি তাঁহাদের সম্পত্তির কিয়দংশ বাঁধা নিয়মেই ঠাকুরবাড়ী ও পান্থশালা প্রতিষ্ঠা, দীঘি ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতিতে ব্যয় করিতেন। খ্যাতির লোভে এই প্রকার অর্থব্যয় উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও সার্থকতা নষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানের মধ্যে কোনও ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় নাই। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তাঁহার দান সকলকেই উপকৃত করিত। সঙ্গতিসম্পন্নের কাছে অসহায় দরিদ্রের সাহায্য লাভ করিবার যে ন্যায্য দাবী আছে—উদার দানশীলতার দ্বারা মহারাণী তাহাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বদান্যতার মধ্যে কোনও প্রকার গোঁড়ামি ছিল না—কি স্বজাতি কি খ্রীষ্টান মিশনারী কর্ত্তৃক পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সবগুলিই তাঁহার দান ও সহানুভূতি লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছে।

সন ১২৩৬ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে) মহারাণী স্বর্ণময়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাটাকুল গ্রামে, দরিদ্রের পর্ণকুটিরে জন্মগ্রহণ করেন। ভাটাকুলে তাঁহার নাম ছিল 'সারদাসুন্দরী'। সারদার মতই তিনি সুন্দরী ছিলেন। সারদাসুন্দরী একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে ছিলেন।

রাণী হরসুন্দরী নিজের চোখে কন্যা দেখিয়া পুত্র কৃষ্ণকান্তের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। ঘটকের দল চারিদিকে সুপাত্রীর অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল। অবশেষে দুইটি পাত্রীকে পিতৃসমভিব্যাহারে কাশিমবাজারে উপস্থিত করা হইল। সুলক্ষণা সারদসুন্দরীকে দেখিয়া রাণী পছন্দ করিলেন—অন্য পাত্রীর পিতাকে সুপাত্রে কন্যা সমর্পণের উপযুক্ত অর্থাদি দান করিয়া বিদায় করা হইল। সন ১২৪৭ সালে (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) রূপবতী কিশোরী সারদাসুন্দরীর সহিত রূপবান্ যুবক কৃষ্ণনাথের মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল।

স্বর্ণময়ী দুইটি সুশ্রী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম লক্ষ্মী ও সরস্বতী। মহারাণী কন্যাদ্বয়কে এতই ভালবাসিতেন যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে কলিকাতা হইতে কাগজ বাহির করিয়া তাহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করিতেন।

মাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বর্ণময়ী বিধবা হন। তাঁহার একটি কন্যার শৈশবেই কৃষ্ণনাথের জীবিতকালে মৃত্যু হয়—অপরটি অর্থাৎ দ্বিতীয়া কন্যা সরস্বতীর সহিত বহরমপুর বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র—ব্রজনাথ দের * বিবাহ হইয়াছিল। সরস্বতীর দুইটি কন্যা সন্তান হইয়াছিল। শৈশবেই তাহাদের মৃত্যু হয়।

রাজা কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" দুইখানি

* ইহাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রগণের মধ্যে গোপিকামোহন ও নগেশচন্দ্র এবং একটি কন্যা বর্ত্তমান, গোপিকা মোহন মণীন্দ্রচন্দ্রের ভাগিনেয় যোগেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজপরিবারের সহিত বিশিষ্টসম্বন্ধে সম্পর্কিত হইয়াছেন।

উইল উপস্থিত করিলেন। দুইখানির মর্ম্মই বিভিন্ন। প্রথম উইলে কৃষ্ণনাথ নিজ নামে বাঞ্জেটিয়া উদ্যানবাটিকায় একটী বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তাঁহার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। কন্যা সরস্বতী তখনও অবিবাহিতা—তাহার বিবাহের জন্য কিছু অর্থ এবং স্বর্ণময়ীর মাসহারা ১৫০০৲ টাকা করিয়া দিবার কথা তাহাতে ছিল। রাণী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন না—এ নিষেধ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর একখানি উইলে রাণী ছয়বার দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন এ অনুমতি দেওয়া ছিল এবং দত্তক গ্রহণ করিয়াও যদি বংশ রক্ষা না হয় তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি কলেজ স্থাপিত হইবে, তাহাতে এরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।

দুই উইলেরই এক্‌জিকিউটার নিযুক্ত হইল। রাজার এটর্নি ষ্ট্রেণ্টেল সাহেবও এক্‌জিকিউটার নিযুক্ত হইলেন।

দেওয়ান রাজীবলোচন—সুপ্রিম কোর্টে মোকর্দ্দমা করিবার জন্য মহারাণীকে পরামর্শ দিলেন। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত এটর্নি হরচন্দ্র লাহিড়ি রাণীর সহায় হইলেন।

সুপ্রিম কোর্টের ফুলবেঞ্চে উইলের বিচার হইল। ইংরাজি ১৮৪৭ সালের ১৫ই নভেম্বর বিচারের শেষ দিন। রাণীর তরফে থাকিলেন, প্রধান কৌঁসুলি টেলর ক্লার্ক ও নর্টন। আর এক্‌জিকিউটার ষ্ট্রেটেলের তরফে থাকিলেন কৌঁসুলি কক্রেণ ও ম্যাকফারসন্। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে থাকিলেন স্বয়ং এড্‌ভোকেট জেনারেল, কৌঁসুলি প্রিন্সেপ্ ও রীচি। কৌঁসুলি লীথ তখন অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল। উইলের মামলায় কৃষ্ণচন্দ্র সরকার নামে এক ব্যক্তিও সংসৃষ্ট ছিলেন। নবীন নামক এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছিল—"আমি বিদ্যাসাগরের সাহায্যে উইলের অনুবাদ করিয়াছি।" * কৃষ্ণচন্দ্রের

* বিদ্যাসাগর—বিহারিলাল সরকার।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—উপেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

কৈশোরে—মণীন্দ্রচন্দ্র

পক্ষ লইয়া ছিলেন কৌঁসুলি ডিকেন্স। বিচারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না, সেণ্ডেস্ সাহেব তাঁহার প্রতিনিধিরূপে হাজির ছিলেন।

বিচারে উইল অগ্রাহ্য হইল। সিদ্ধান্ত হইল—রাজা কৃষ্ণনাথ সজ্ঞান থাকিয়া নিজের ইচ্ছায় উইল করেন নাই। অতএব রাণী স্বর্ণময়ীরই জয় হইল। পতিধনে তিনিই অধিকারিণী হইলেন।

এই মোকর্দ্দমার সময় রাণী স্বর্ণময়ী সারকুলার রোডের (রাণী কুঠী) বাড়ীতে, রাণী হরসুন্দরী জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছিলেন। পুত্রের অন্তিম সময়ে মাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা স্বর্ণময়ী সবই শুনিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—পথে বসিলেও কখনও ওই নিষ্ঠুরা শ্বশ্রূমাতার নিকট যাইবেন না। ঠিক এই সময়ে শ্বাশুড়ী ও বধূর মধ্যে যে বেশ মনোমালিন্য ছিল, তাহার প্রমাণ অনতিবিলম্বেই পাওয়া গেল।

কোর্টের সদর আমীন হরচন্দ্র ঘোষের এজলাশে রাণী হরসুন্দরী এই বলিয়া নালিশ করিলেন যে—রাজা কৃষ্ণনাথ অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অপেয়-পানাদির জন্য জাতিচ্যুত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সে কারণ পৈতৃক বিষয় সম্পত্তিতে তাঁহার কোনও অধিকারই ছিল না। সুতরাং তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণময়ীরও পতিধনে কোনও অধিকার নাই।

অন্যদিকে ভারত গভর্ণমেণ্ট বাদী হইয়া একটি মামলা উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের অভিযোগের মর্ম্ম এই যে—রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, আত্মঘাতীর বিষয়-সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সিদ্ধান্ত করিলেন, আত্মঘাতীর বিষয় সম্পত্তি যে রাজার অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের হইবে এ আইন এদেশে কোনও কালে বলবৎ হয় নাই। এ মামলায় রাণী স্বর্ণময়ীকে অনেক কাণ্ড করিয়া জয় লাভ করিতে হইয়াছিল।

—হরচন্দ্র লাহিড়ী শাল দোশালা ও নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইলেন। কিছুদিনের জন্য দেওয়ানের কার্য্যভারও তাঁহার

উপর অর্পিত হইয়াছিল। ইহার পরই ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজীবলোচন দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। রাজীবলোচন না থাকিলে স্বর্ণময়ীকে নিঃসম্বল অবস্থায় পথে দাঁড়াইতে হইত। রাজীবলোচনের মত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী তখনকার দিনে ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার তুলনা ছিল না। সমস্ত জমিদারী ঋণভারে প্রপীড়িত, আদায় পত্র মন্দা, অসাব্যস্ত ব্যবস্থা-প্রণালী, রাজকোষ শূন্য। —একেত এই সব বিশৃঙ্খলা, তাহার উপর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস কর্ত্তৃক প্রদত্ত কান্তবাবুর জায়গীর ক্রোক করিবার আদেশ দিলেন ; গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের মঞ্জুরী না লইয়া যে দান করিয়াছেন তাহা আইনসঙ্গত হয় নাই, এই অজুহাত করিয়া উক্ত আদেশ প্রদত্ত হইল।

রাণী স্বর্ণময়ীর সর্ত্ত কায়েমী করিবার জন্য রাজীবলোচন দেওয়ানী আদালতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গাজীপুরের জজ্ তাঁহার অনুকূলে রায় (decree) দিলেন। এই রায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সদর দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমর্থিত হইল—কান্তবাবুর জায়গীরের অধিকার এইভাবে চিরস্থায়ী হইয়া গেল।

স্বর্ণময়ীর দানের প্রাচুর্য্য ও ঔদার্য্যের জন্য ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো তাঁহাকে "মহারাণী" খেতাব প্রদান করেন। একই সময়ে দেওয়ান রাজীবলোচনও "রায় বাহাদুর" খেতাব পান। অভিষেক-উৎসব গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ কমিশনারের উপস্থিতিতে কাশিমবাজারেই সম্পাদিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলায় দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয় —মহারাণী স্বর্ণময়ী তাহাতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান করেন। এই বদান্যতার জন্য পরবর্ত্তী বৎসরেই অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৭৫ সালে স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে গভর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিলেন যে, মহারাণীর উত্তরাধিকারী 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হইবেন।

ইংরাজী ১৮৯৬ সাল হইতে ভগিনীপুত্র শ্রীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেত্রনাথ পালকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের জন্য মহারাণী চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টায় সাহায্য পাইবার আশায় এক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীকে ২৫০০০৲ টাকা নামে মাত্র ঋণ দান করিয়া মহারাণী তাহার বিবেক বুদ্ধি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।—তবে চিফ্ সেক্রেটারী মহামান্য কটন সাহেব মণীন্দ্রচন্দ্রকে সাহায্য করেন—এবং তাঁহারই কথামত স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ লেভিংজও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং মণীন্দ্রচন্দ্রকে বহু প্রকারে সাহায্য করেন।

পোষ্যপুত্র গ্রহণের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে স্বর্ণময়ী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গোপীনাথজীউর নামে উইল করিবেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া গেল— একখানি উইল নাকি প্রস্তুতও হইয়াছিল।

১৮৪৭ সালের ২৫শে নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীদ্বারা প্রচারিত হয় যে, রাজা বাহাদুর কৃষ্ণনাথ কোন উইল না করিয়া এবং ঔরস পুত্র না রাখিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কুচক্রী কৌঁসুলি ইভেন্স ও উড্রফ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ "দত্তক গ্রহণ হইতে পারে" এই অভিমত সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই দিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় মহারাণী বোর্ডে এই বলিয়া দরখাস্ত করিলেন যে, আমার জমিদারী পরিচালন রীতি ও তৎসম্বন্ধে দক্ষতা বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে অবগত আছেন এবং অবগত হইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট আছেন। সম্প্রতি আমি একটি দত্তক গ্রহণ করিয়া উক্ত নাবালকের অভিভাবিকা থাকিতে ইচ্ছাকরি—এ বিষয় গভর্ণমেণ্টের মতামত সত্বর জানা দরকার। কিন্তু বহুদিনযাবৎ সে দরখাস্তের কোনও উত্তর পাওয়া যায় না।

এদিকে মণীন্দ্রচন্দ্রও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। শাস্ত্র ও আইন হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন।

দত্তক চন্দ্রিকার ১ম অধ্যায়ের ৩২ সূত্রে "নিষেধ না থাকিলে সম্ভব" এই কথা দত্তকদাতার সম্বন্ধে খাটে, দত্তকগ্রহীতার সম্বন্ধে

খাটে না। মোকর্দ্দমায়ও ইহার নজির আছে। * আত্মঘাতী পোষ্যপুত্র লওয়ার অনুমতি দিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না; আত্মঘাতীর শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ প্রভৃতি নাই কেবল গয়ায় পিণ্ড আছে। যাহার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদি নাই—সে ব্যক্তির অনুমতির কোনও মূল্য নাই—ইত্যাদি যুক্তি দেখাইয়া মহারাণীর প্রধান সভাপতি ৺রমাপতি তর্কভূষণ দত্তক গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে মত দেন। ইহা ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মহারাণীর যে মোকর্দ্দমা হইয়াছিল তাহাতে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি নাই তাহাই প্রমাণিত হইয়াছিল। একথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে আইনতঃ অনুমতি দেওয়াই যদি থাকিবে তবে উকিল, ব্যারিষ্টার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে অনুমতি লইবার এত চেষ্টাই বা হইয়াছিল কেন? রাজার মৃত্যুর কতকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার চিত্তভ্রান্তি জন্মিয়াছিল তাহার নিশ্চয়তা নাই; তবে বরাবরই তিনি খামখেয়ালী ছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম উইলে দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি ছিল কিন্তু প্রথম উইল তিনি স্বয়ং অন্যথা করিয়া দ্বিতীয় উইল করেন। এটর্ণি একথা সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছিল। এই শেষ উইলও আদালত কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয়। বিচারে সুপ্রিম কোর্টের জজেরা বলেন—বর্ত্তমান উইলের সহিত পূর্ব্ব উইলের মিল না থাকায় এবং পোষ্য পুত্র গ্রহণের কথা না থাকায় এ উইল প্রকৃত নহে। এই সব কারণে পোষ্যপুত্র গ্রহণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইংরাজী ১৮৭৮ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর মিঃ পিকক্ (Mr. Peacock) কাশিমবাজারে দরবার করিয়া মহারাণীর জনহিতকর সৎকার্য্য ও দানের সম্মান স্বরূপ তাঁহাকে Imperial order of the Crown এর নিদর্শন ও বিশেষ অধিকার ভোগের সনন্দ (Royal Letters Patent) দান করিতে আসেন। কাশিমবাজার

* Tarini Charan Chowdhury vs Sarada Sundari Devi—Law Report Voll. II. page 468,

রাজপ্রাসাদ সেদিন ইন্দ্রপুরীর মত দেখাইতেছিল—নানাবর্ণের দীপাবলী ফুলমালা ও তোরণ-সজ্জায় সেদিন এক পরম উৎসবের রাত্রি বলিয়া মনে হইতেছিল।

দরবার মঞ্চে দাঁড়াইয়া বাঙ্গলার লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর মহারাণী স্বর্ণময়ীকে নিম্নলিখিত সনন্দ দান করিলেন—

Considerable as the list is, aggregating above two lakhs, it is largely exceeded by the small donations to schools, libraries, dispensaries and to the relief of the poor and distressed during the same period, which amount to more than three lakhs of rupees. Thus during the years to which I have referred, you have contributed nearly 5¼ lakhs of rupees to works of charity and public utility which does not fall short of one-sixth of your entire income. Large, however, as this amount undoubtedly is, it is not so much as the manner in which it has been given that makes it conspicuous. In this country we are accustomed to see a good deal of what I may call spasmodic money-giving where large sums are frequently given to purposes no doubt very good and very useful but which are aided not so much because they are so as because the donors hope to bring their names before the public or obtain some future reward. This has not been your case. You have not been content to wait till you were asked to give but have taken steps to ensure worthy objects for assistance being brought to your notice and have then given liberally, hoping for nothing in return. In a word your charity has been such as springs from a simple unostentatious desire to do good, where the left hand knoweth not what the right hand doeth ; which is as admirable, as I fear, it is uncommon.

হিন্দু রমণীর অবরোধ প্রথা তখনকার দিনে আরও কঠোর ছিল। বিশেষতঃ বিধবা মহারাণী পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতিতে নিবিষ্ট হইয়া যে প্রকার ব্রতচারিণীর মত জীবন যাপন করিতেন তাহাতে কোনও অনাত্মীয় পুরুষের

দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না—তাই দরবার-মণ্ডপে মহারাণী পর্দ্দার অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সপার্ষদ ছোট লাট বাহাদুরের অভ্যর্থনা শেষ হইলে পর মহারাণী তাহার একটি সময়োপযোগী উত্তর প্রদান করিলেন। দেওয়ান রাজীবলোচন মহারাণী এবং লাট সাহেবের মধ্যে দ্বিভাষীর (ব্যাখ্যাকারক) কাজ করিলেন।

লাট সাহেব মহারাণীর দানশীলতার জন্য বহু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা প্রজা ("Best female subject of the Queen in the Bengal Presidency") হিসাবে C. I. অর্থাৎ Crown of India—ভারত-মুকুট এই আখ্যা দিয়া সম্মানিত করিলেন। মহারাণী প্রত্যুত্তরে অতি বিনীতভাবে বলিলেন তাঁহার কোনও গুণই নাই—যশোলিপ্সা নহে, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান হইতেই তিনি যৎসামান্য দান করিয়া থাকেন। এই উপাধি প্রদানকালে তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনারের উক্তিতে প্রকাশ যে, ঐ বৎসর পর্য্যন্ত মহারাণীর দানের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ টাকা। তাহার পরও তিনি প্রায় বিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন —এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি যে আনুমানিক ষাট লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন এ ধারণা অমূলক নহে।

রাজীবলোচনের সুব্যবস্থায় অল্পদিনের মধ্যেই কাশিমবাজার এষ্টেটে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানে যে এদেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে দেওয়ান রাজীবলোচনের শুভবুদ্ধির প্রেরণাও কম ছিল না।

মহারাণীর জীবনকালেই দীর্ঘ ৩৩ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত কাশিমবাজার এষ্টেট পরিচালনা করিয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান রাজীবলোচনের মৃত্যু হইল—বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের একটি স্তম্ভ খসিয়া পড়িল। সৈদাবাদ গঙ্গাতীরে একটি শিবমন্দির আজিও অপুত্রক রাজীবলোচনের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় শ্যামাদাস রায় (নস্থু বাবু), তারিণী প্রসাদ রায়, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ মিত্র, রাজকৃষ্ণ ঘোষ, বীরচন্দ্র সরকার এই ছয় জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পরামর্শ অনুসারে কাশিমবাজার এষ্টেটের কার্য্য এই কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইত। শ্যামাদাসই দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। তারিণী রায়ের মৃত্যু হইলে মহারাণীর ভগিনীপুত্র শ্রীনাথ পাল উক্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। এইভাবে আট বৎসর যাবৎ কার্য্যপরিচালন চলিতে থাকে, পরে ১২৯৯ সালে (ইংরাজি ১৮৮৯) বিজয়ার দরবারে মহারাণী শ্রীনাথ বাবুকে 'ম্যানেজার' ও রাজবাটীর ইন্‌জিনিয়ার মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে আসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত করেন।

সন ১২৯৯ সালের মাঝামাঝি বৈকুণ্ঠনাথের সহিত রাজবাড়ীর সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। শ্রীনাথ পালের সহিত মতানৈক্যে তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীনাথ মহারাণীর একমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবুর ভ্রাতা ত্রৈলোক্য বাবু কাশিমবাজার রাজসরকারে মহাফেজের কার্য্য করিতেন, তাঁহাকে সামান্য কারণে শ্রীনাথ সস্‌পেণ্ড করেন,—যোগ্য ব্যক্তির সমাদর হইতেছে না বরং পূর্ব্ব রোষে তাঁহাকে অপমান করা হইতেছে, এজন্য বৈকুণ্ঠনাথ বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অনতিবিলম্বেই রাজবাড়ীর সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রও ঠিক এই সময় বিশেষ বিপন্ন অবস্থায় মাতুলানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বার বার বিফলমনোরথ হইতেছিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায্য দাবীর প্রতি বৈকুণ্ঠনাথের চিরদিনই সহানুভূতি ছিল। এই সুযোগে মণীন্দ্রচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠনাথের মিলন সহজ হইয়া আসিল।

উক্ত কমিটির দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হইত বটে কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ী কোন দিন কলের পুতুলের মত নামসহি করিয়া তাঁহার বিপুল

দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন না। বিশেষতঃ দেওয়ান বাহাদুরের মৃত্যুর পর তিনি পরিচালন পরিষদে নিজের প্রভুত্ব সর্ব্বদা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন। জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁহার নখদর্পণে ছিল।

স্বর্ণময়ী অসাধারণ বুদ্ধিশালিনী ছিলেন—তাঁহার মনের বলও ছিল অসীম। স্বামীর অপমৃত্যুর পর বিশাল জমিদারীর পরিচালন-ভার হাতে করিয়া দেখিলেন—কৃষ্ণনাথের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অপব্যয় কম নহে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভিভাবকত্বে দেনার পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই আসিয়াছে।—কিন্তু তিনি ইহাতে দমিলেন না—খুব মনোযোগ সহকারে কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। বাঙ্গলা লেখাপড়া বিবাহের পর যাহা শিখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার মত বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষে জমিদারী-কার্য্য পরিচালনে যথেষ্ট সাহায্য করিল। তিনি নিজেই সকল দলিল দস্তাবেদে সহি করিতেন—প্রত্যেক বিষয়টি দেওয়ানকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হইত। তাঁহার সুব্যবস্থায় কালক্রমে ঋণ পরিশোধ হইয়া জমিদারীর আয়ও কিছু বাড়িয়াছিল।

নিজের কর্ম্মচারিগণের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ও অনুগ্রহের নানা গল্প বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে। কর্ম্মচারিগণের দৈনন্দিন দপ্তরের কাজ শেষ হইলে প্রায়ই তাহারা মহারাণীর নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত জলখাবারে পরিতৃপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিত।

মহারাণী নৌকাবাস করিতে ভাল বাসিতেন। অনেক সময় দীর্ঘকাল গঙ্গাবক্ষে থাকিয়া রাত্রি বার ঘটিকার সময় গৃহে ফিরিতেন। একথা আমরা মণীন্দ্রচন্দ্রের লিখিত একখানি পত্র হইতে জানিতে পারি।—

"A steam launch has been hired by my aunt and she makes daily trip in the river. She generally starts at 4 p.m. and returns at 12 p.m. I do not understand who has advised her to make such river trips ; the steamer is decorated with lights of different colours and two flags are hanging over the boat in

which my aunt sits. The sentinels are placed on the roof of the boat. They fire after each five minutes in the night."

পূজা-পার্ব্বণ দান-ধ্যানাদি ধর্ম্ম-ক্রিয়া ছাড়া তিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবায় ও পণ্ডিত-বিদায়ে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। প্রতিদিন প্রায় আঠার মন চাউল রাজপ্রাসাদে সমাগত ভিখারিদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইত। সেই সময় অন্তরাল হইতে মহারাণী এই ভিক্ষা-দান দেখিতেন।

দান-প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাবগত ছিল বলিয়াই মনে হয়। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ভিক্ষুক, গ্রন্থকার, কন্যাদায়পীড়িত, ঋণগ্রস্ত প্রার্থিগণ কেহই তাঁহার নিকট হইতে কখনও বিমুখ হইয়া ফিরিত না। ভাণ্ডারের ধনরাশির যে সদ্ব্যয় হইয়াছিল একথাও ঠিক। কিন্তু বারবার প্রার্থনা জানাইয়াও মণীন্দ্রচন্দ্রের মত বিফলমনোরথ বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে আর কেহই হয় নাই।

"কেহ কখনও হাত পাতিয়া—মহারাণী স্বর্ণময়ীই বা কি, আর রায় রাজীবলোচনই বা কি—কাহারও নিকট হইতে, রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। অনেক সময় অনেকে আশাতীত দান পাইয়া স্তম্ভিত হইত। একবার একজন পুলিসের কর্ম্মচারী বড় কষ্টে পড়িয়া মহারাণীর নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, বড়জোর ২০।২৫ টাকা মাত্র পাইবেন। কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন পাঁচ শত টাকা। একবার একজন চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ রাজীবলোচনের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমার চক্ষুরোগ আরাম হয়, এমন কিছু করিতে পারেন?" রাজীবলোচন বুঝিলেন, যে চক্ষুরোগ আরাম হইবার নহে; অথচ রোগ আরাম হইবে না, এমন কথা বলিলে, ব্রাহ্মণের কষ্ট হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "এখানে চক্ষুরোগ আরোগ্য করিবার ব্যবস্থার সম্ভাবনা নাই। আপনি মাসিক বৃত্তি লউন, সে বৃত্তিতে আপনার সংসার চলিবে; চিকিৎসাও হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি বৃত্তি চাহিনা। তখন রাজীবলোচন নিরুপায় হইয়া

বলিলেন, "আর উপায় কি?" তিনি একথালা চিনি আনিয়া বলিলেন—আপনাকে একথালা চিনি লইতে হইবে। প্রভো, অধমের এ অনুরোধ রক্ষা করুন।" ব্রাহ্মণ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, থালা লইলেন। বাড়ী ফিরিয়া গিয়া শুনিলেন যে, যে থালাতে চিনি ছিল, সেখানি খাঁটি রৌপ্য নির্ম্মিত, মূল্য পাঁচ শত টাকার কম নহে।" (১)

মহারাণী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী-নিবাস নির্ম্মাণের জন্য এক লক্ষ টাকা, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য দশ সহস্র টাকা দান করেন এবং এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বহরমপুরে জলের কল স্থাপন করেন। অবশ্য এ কার্য্য বহু অর্থ ব্যয়ে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র।

বঙ্গের ছোট লাট ক্যাম্বেল সাহেব বহরমপুর কলেজের বি-এ ক্লাস তুলিয়া উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত করিলে, মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার জমিদারীর উৎকৃষ্ট অংশ চেটিয়া বেলেপুরের আয়ের টাকা বহরমপুর কলেজের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য দান (endowment) করিতে ইচ্ছা করেন। *

এই কথা জানাইয়া বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট মুর্শিদাবাদের কলেক্টর একখানি চিঠি দেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর (Director of Public Instruction) স্যার অ্যাল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌টও এই দান গ্রহণ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। এটর্ণি স্যাণ্ডারসন এণ্ড কোং'র অফিসের মিঃ রেপটন সাহেবকে বোর্ড অফ রেভিনিউ (Board of

---

(১) স্বর্ণময়ী—বিহারিলাল সরকার।

* Her Highness the Maharani Swarnamoyee of Moorshidabad intends to undertake from the year, the sole charge of permanently maintaining the Berhampur College and she has made the College free for the poor students. The Maharanee proposes to make over some landed properties of nearly four lacs of rupees for the maintenance of the College, whose income will be Rs. 20,000 annually.

17th May 1892 (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) Editorial—Indian Mirror.

Revenue) মতামত জিজ্ঞাসা করিলে জবাব আসিল—কদাচ যেন এই দান গ্রহণ করা না হয় কারণ মহারাণী হিন্দু বিধবা, জীবদ্দশা * পর্য্যন্তই তিনি সম্পত্তির মালিক। এদিকে বোর্ডের মেম্বর ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ এ, স্মিথ্‌ গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন—মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতার সহিত মহারাণীর বিশেষ মনোমালিন্য ছিল—গোলমাল বাধিয়া উঠিতে পারে। এই সম্পর্কে ৬৭নং রসা রোডস্থিত রায় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরকে লিখিত মণীন্দ্রচন্দ্রের ইংরাজি ১৮৯১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পত্রখানি দ্রষ্টব্য :—

"I only know that through the policy of the late Dewan Rajiblochan, my mother was driven from the Rajbari, and through his instigation the Maharani fell out with my mother and always chastised her bitterly. But as my mother was a woman of extraordinarily independent spirit she could not bear her upbraidings, and she left the Rajbari and lived independently till her death."

অর্থাৎ আমি এই মাত্র জানি যে, দেওয়ান রাজীবলোচনের কৌশলেই আমার মাতাঠাকুরাণী রাজবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন,—দেওয়ানের প্ররোচনায় মহারাণী আমার মায়ের সহিত কলহ করিতেন ও তাঁহাকে কটু কথা বলিতেন। কিন্তু আমার মা ছিলেন অসম্ভব রকমের স্বাধীনচেতা, তিনি এ সব সহ্য করিতে না পারিয়া যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন পৃথক্‌ভাবে বাস করিয়া গিয়াছেন।

---

* হিন্দু বিধবা শুধু মাত্র জীবদ্দশা পর্য্যন্ত সম্পত্তির মালিক—তাহার পর বিধবার মৃত্যু হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মালিকে সমগ্র সম্পত্তি বর্ত্তাইবে,—প্রচলিত এই আইন বদ্‌লাইবার জন্য মহারাণীর হিতৈষী মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহারাণীর অর্থানুকুল্যে ক্লার্ক সাহেবকে বিলাত পাঠাইয়া Law of Perpetuity অর্থাৎ হিন্দু বিধবার চিরস্থায়ী ভোগদখলের আইন পাশ করাইতে চেষ্টা করেন। এই আইন পাশ হইলে বিধবা যাহাকে ইচ্ছা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া যাইতে পারিতেন।

যাহাহউক মহারাণী উক্ত কলেজের সমস্ত পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উহাকে পুনর্ব্বার প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। এই কলেজকে অতঃপর "মহারাণী স্বর্ণময়ী কলেজ" এই নামে অভিহিত করিবার যে কথা হয়—তাহা আমরা মণীন্দ্রচন্দ্রের লিখিত একখানি পত্র হইতে জানিতে পারি। এই ব্যাপারে তাঁহার বার্ষিক ষোল হইতে বিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত।

"গুণে রমা রূপে তিলোত্তমা। দরিদ্রের কন্যা বটে; কিন্তু করুণায় কমলা। এখন আমরা বলি মহারাণী স্বর্ণময়ীর মতন দয়া আর কাহারও নাই; তখন ভাটাকুলের অধিবাসীরা মনে করিত, এ জগতে সারদা সুন্দরীর মত দয়া আর কাহারো নাই। যে মহারাণী স্বর্ণময়ী মাসহারার ব্যবস্থা করিয়া বা এককালে অর্থ সাহায্য করিয়া বিধবার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই ক্ষুদ্র বালিকা সারদাসুন্দরী ক্ষুদ্র পল্লীতে করুণ কাতরতায় অশ্রুময় অঞ্চলে বিধবার অশ্রু মুছাইতেন। হাসপাতালে ডাক্তার ধাত্রী প্রভৃতির দ্বারা বিপন্ন দরিদ্র সহায়হীন রোগীদের সেবা শুশ্রুষা ও চিকিৎসা হইবে বলিয়া যে মহারাণী স্বর্ণময়ী অকাতরে অর্থদান করিতেন, সেই ক্ষুদ্র বালিকা সারদা সুন্দরী ক্ষুদ্র হস্তে ক্ষুদ্র আর্ত্ত পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। যে মহারাণী স্বর্ণময়ী নিরাশ্রয়া পুত্রশোকাতুরা হতভাগিনী জননীর অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়া শোকের কথঞ্চিৎ লাঘব করিতেন, সেই ক্ষুদ্র বালিকা সারদাসুন্দরী কন্যার প্রাণে কাতরকণ্ঠে সুধামাখা মা মা বলিয়া ডাকিয়া পুত্র শোকাতুরা জননীর প্রাণে শান্তির সুধা ঢালিয়া দিতেন। ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে করুণার অনন্ত ক্ষীরধারা! দারিদ্র্য দানের পাষাণ চাপা হইতে পারে। কিন্তু দয়ার মুক্তোচ্ছ্বাসে দারিদ্র্যের সে পাষাণ চাপ তুচ্ছ তৃণবৎ ভাসিয়া যায়।" *

---

* মহারাণী স্বর্ণময়ী—বিহারিলাল সরকার।

দরিদ্রের কুটীর হইতে যিনি ভূম্যধিকারিণীর উচ্চ প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইয়াও এমন গুণের অধিকারিণী ছিলেন সেই মহারাণী স্বর্ণময়ীর পবিত্র নাম অবশ্যই প্রাতঃস্মরণীয় কিন্তু মহারাণীরই ভাগিনেয় মণীন্দ্র-চন্দ্রের পত্রাবলি পাঠে জীবনী-লেখকের মনে একথা স্বতঃই উদিত হইয়াছে যে, এমন নারীর হৃদয় কেমন করিয়া ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এমন নির্ম্মম, এমন কঠিন, এমন সহানুভূতিহীন হইতে পারে ?—যে অনাত্মীয়াগণের মাসহারার কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন সেই মাসহারার জন্য আবেদন করিয়া আত্মীয় মণীন্দ্রচন্দ্র কতবার বিফলমনোরথ হইয়াছেন ; বাহিরের আর্ত্ত, পীড়িত, সহায়হীন রোগীর সহায়ক ছিলেন বলিয়া যাঁহার গুণগানে গ্রন্থকার মুখর, তাঁহারই আপন ঘরের রোগার্ত্ত ও পীড়িত ভাগিনেয়ী, (মণীন্দ্র চন্দ্রের ভগিনী) ভাগিনেয়ের পুত্র মহিমচন্দ্র ও কন্যা সরোজিনীর রোগ-যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভাগিনেয় মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহারই নিকট করুণ প্রার্থনা জানাইয়া নিরাশ হইয়াছেন ; কখনও বা তাঁহার তাচ্ছিল্যভরা নিরুত্তরে মণীন্দ্রচন্দ্র অপমানের বৃশ্চিকদংশন সহ্য করিয়াছেন—কখনও বা কৃপাদত্ত অবহেলার অকিঞ্চিৎকর সাহায্য অতি বিলম্বে আসিয়াছে—কখনও বা আসেও নাই।

অথচ অমাত্যজনের কুপরামর্শ, দুরভিসন্ধি-প্ররোচিত ভিত্তিহীন মিথ্যা সন্দেহ ছাড়া এই অকরুণ ব্যবহারের অন্য কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহার "হৃদয়ে করুণার অনন্ত ক্ষীরধারা" তিনি ব্যক্তিবিশেষের দুঃখে বিমুখ রহিলেন কি করিয়া ! ক্ষণিক বিমুখ নহে, এমন বিমুখ রহিলেন যে, তাঁহার "চরণ দর্শন" করিবার জন্য সুদীর্ঘ কাল দিনের পর দিন প্রার্থনা জানাইয়া, সুপারিশ ধরিয়াও কোনও ফল হইল না— ! মহারাণীর বদান্যতায় পরম পরিতৃপ্ত, অনাত্মীয়েরা যে সময় তাঁহার জয় গানে কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল ঠিক সেই সময় মাতুলানীর চরণ-দর্শন-প্রার্থী

পরমাত্মীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নিষ্ফলতায় অশ্রুমোচন করিতে করিতে সেই দ্বারদেশ হইতেই ফিরিয়া যাইতেছিলেন। কোন যুক্তি দিয়াই এ নির্দ্দয় ব্যবহার সমর্থন করিতে পারা যায় না।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত ইহাতে কম্পিত হইয়া উঠে—মহারাণী প্রথমটা বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহার অন্তঃপুরের দাসী কর্ত্তৃক তিনি একটি নিরাপদ স্থানে নীত হন। স্থানান্তরিত হইবার পরক্ষণেই মহারাণীর কক্ষ ভূমিসাৎ হইয়া গেল। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে অস্থায়ী ভাবে তাঁহার জন্য শিবির তৈয়ার করান হইল—ইতিমধ্যে তাঁহার কক্ষ সুসংস্কৃত হইয়া গেল। কিন্তু সেখানে আর তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। বয়স হইয়াছিল প্রায় সত্তর বৎসর—ভূমিকম্প-জনিত মানসিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া সহ্য করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। তিনি জ্বরাতিসারে শয্যাগত হইলেন—জরাক্রান্ত দেহ ও উদ্বিগ্ন মন লইয়া জীবন ধারণের শক্তি তাঁহার আর ছিল না। নয় সপ্তাহ মধ্যেই মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। অন্তিম সময় বুঝিয়া তাঁহাকে সৈদাবাদ রাজবাটীতে গঙ্গাতীরস্থ করা হইল। এই সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী কাশিমবাজার ও বহরমপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

অসুস্থতা গোপন, চিকিৎসাবিভ্রাট, মৃতদেহ অন্তঃপুরে কয়েকদিনের জন্য আবদ্ধ রাখিয়া ধনরত্ন স্থানান্তরে অপসারণ বা অপহরণ, শূন্য শিবিকা 'তক্ত তাউসে' সৈদাবাদ রাজবাড়ীতে অবতরণ ইত্যাদি বহু প্রকার কথা আমরা শুনিয়াছি। প্রমাণ থাক্ বা না থাক্ এই সব রটনার অন্তরালে যে ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হইয়া উঠে—তাহা এই যে, মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া অনেকে স্বার্থসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কেহ পূর্ণ কেহ বা আংশিক ভাবে সফলকামও হইয়াছিলেন।

কিন্তু সত্য-মিথ্যা জল্পনা-কল্পনা জনসাধারণের মধ্যেই থাকিয়া গেল—১৩০৪ সালের (১৮৯৭—২৫ আগষ্ট) ১০ই ভাদ্র আটষট্টি বৎসর বয়সে মহারাণী স্বর্ণময়ীর লোকান্তর হইল।

মণীন্দ্রচন্দ্রের হিতৈষী-বন্ধু বহরমপুরের সুবিখ্যাত সেনবংশীয় জমিদার বিষ্ণুচরণ সেন কর্ত্তৃক এ সংবাদ তারযোগে কলিকাতায় মণীন্দ্র-চন্দ্রের নিকট প্রেরিত হইল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

পূর্ব্বাভাষ

মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার রাজা হরিনাথের বিধবা স্ত্রী রাণী হরসুন্দরীতে বর্ত্তাইল বা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। কি প্রকারে তাঁহার দৌহিত্র গোবিন্দসুন্দরীর পুত্র মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই প্রত্যাবৃত্ত সম্পত্তির মালিক হইলেন সে বিষয় বিস্তারিতভাবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবন-পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে। কি ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা অবলম্বন করিয়া অর্থাভাবে সামান্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সুদিনের প্রতীক্ষায় কালযাপন করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে তাঁহার জীবনের ইতিহাস নব পর্য্যায়ে শেষ অবধি নানা বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিল, তাহার আলোচনা আমরা ক্রমশঃ করিতেছি।

কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনী লেখা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহৎ লোকের জীবনী লেখার মত সহজ নহে।—ইতিহাসে যাঁহারা বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ, কর্ম্মী বলিয়া প্রখ্যাত, ধার্ম্মিক বলিয়া পূজিত, উদার বলিয়া সম্মানিত, দয়ালু বলিয়া কীর্ত্তিত, চরিত্রবান্ বলিয়া অভিনন্দিত, তাঁহাদের এক এক জনের জীবনী লেখা সহজ বলিয়া মনে করি, কারণ জীবনের ধারা সেখানে একটি নির্দ্দিষ্ট, সুচিহ্নিত গতিতে প্রবাহিত—সাধারণ জীবন হইতে দূরে অবস্থান করিয়াও তাঁহারা আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া আছেন। কিন্তু যাঁহার জীবনে একাধারে এই সব বিভিন্ন গুণাবলী পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল,—কর্ম্মে বিচিত্র ও ধর্ম্মে সুমহান্ হইয়া যিনি মানব-ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন,—লোকোত্তর চরিত্রের মাধুর্য্যে যিনি উত্তর

কালের জন্য এক নবীন গীতা রচনা করিয়া গিয়াছেন—সংযত, জিতেন্দ্রিয়, দানশৌণ্ড মহামানব সেই মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনকথা যেমনি অলৌকিক তেমনি অসাধারণ ; আত্মনাম-ঘোষণার মোহ হইতে, খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রলোভন হইতে আপনার সাধক জীবনকে গোপন গুহার অন্তরালে রাখিয়া যিনি অতি সাধারণ ভদ্রলোকের মত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গেলেন তাঁহার জীবন-ইতিহাসের রহস্য যেমনি জটিল তেমনি বিস্ময়কর। মানুষের স্মৃতি ও লিপি-কুশলতায় তাহার কতটুকুই বা ধরা যায় !—নিজের চারিদিকে নিবিড় পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া আপনাকে যিনি দিবস রাত্রির চলাচল হইতে গোপন রাখিতে চাহিলেন, গভীর আত্মসাধনায় যিনি আপনার মধ্যে আপনি ক্রমশঃ মহান্ হইতে মহীয়ান্ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার উল্লেখেই বা তিনি আমাদের কাছে কতটুকু প্রকাশ পাইবেন ! স্বয়ং-প্রকাশ সূর্য্যের দীপ্তি দেখি, উষ্ণতা উপলব্ধি করি, তেজ ও দুর্দ্ধর্ষতার পরিচয় পাই, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কোটিকল্প ব্যাপী যে অপরিজ্ঞাত ইতিহাস রহস্যের পর রহস্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে—কেমন করিয়া তাহা লিপিকুশলতায় উদ্‌ঘাটন করিব ?

—সান্ত্বনা এই যে, যিনি আপনার কীর্ত্তিতে আপনার ইতিহাস, দেশ ও জাতির ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—আমার লিখিত জীবনীর অসম্পূর্ণ ও অনালোকিত স্থানগুলি সেই মৃত মহাত্মার গৌরব-দীপ্তিতে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।

বাল্য জীবন

পুণ্যশ্লোক মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, সন ১২৬৭ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৬০ সালের ২৯শে মে, মঙ্গলবার দশহরার দিনে, অপরাহ্ণ ৫টা ১৪ মিনিটের সময় কলিকাতা মহানগরীর উত্তরাঞ্চল শ্যামবাজারে ৩৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটের পৈতৃক বাটীতে ভূমিষ্ঠ হন। জন্মকালে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু ও কেতু কেন্দ্রী এবং বৃহস্পতি ও মঙ্গল তুঙ্গী থাকায় পূর্ণ মাত্রায় রাজযোগ ছিল।

কিন্তু যিনি আজীবন আর্ত্তজনের দুর্ভর দুঃখ বহন করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিলেন—জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার প্রতি বিধাতা কঠোর বিধান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না—মাত্র এক বৎসর দশমাস বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল। শিশু যে সময় মায়ের স্নেহ মমতা ও লালন-পালনের মধুর স্পর্শ ছাড়া ইহ সংসারে অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারে না, মা ছাড়া কাহাকেও জানে না, চিনে না, কণ্ঠের ভাষায় যখন পবিত্র মাতৃনাম অর্দ্ধ উচ্চারিত হইয়া মর্ত্তলোকে স্বর্গ সৃষ্টি করে—মায়ের স্পর্শ, মায়ের কণ্ঠ, মায়ের হাসিটুকুর মধ্য দিয়া শিশু যখন জগতের পরিচয় মাত্র লইতে আরম্ভ করে ঠিক তখনই, সেই অতি প্রয়োজনের সময় অদৃষ্টক্রমে মাতা গোবিন্দসুন্দরীকে এই শিশু পুত্রের সকল মায়া কাটাইয়া পরপারের ডাকে সাড়া দিতে হইল। অপ্রবুদ্ধ অনুভূতির মধ্যে সেদিন এই মাতৃহীন শিশুটি নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছিল কি না কে জানে?

কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের মধ্যমা ভগ্নী বিশ্বেশ্বরী দাসী তাঁহাকে মাতার স্নেহে বক্ষে স্থান দিলেন—জ্ঞানোদয় হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকেই তাঁহার জননী বলিয়া জানিতেন।—আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহারই তত্ত্বাবধানে মণীন্দ্রচন্দ্র লালিত পালিত হন।

বাল্য জীবন

পাঁচ বৎসর বয়সে মণীন্দ্রচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়;—শ্যামবাজার কম্বুলিয়া টোলার অ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া গুরু মহাশয় জগবন্ধু মোদকের কাছে মণীন্দ্রচন্দ্র নয় বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। এই বিদ্যালয়টি এখন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

দুই দিদির দুইটি কন্যা ছিল তাঁহার খেলার সাথী; তাহাদের সঙ্গেই তাঁহার শিশুসুলভ খেলা ও আমোদ আহ্লাদ চলিত— বাহিরের সাথী মণীন্দ্রচন্দ্রের বড় একটা কেহ ছিল না।

মৃত্যু, রোগযন্ত্রণা এবং সাংসারিক কলহবিবাদের বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি তাঁহাকে অতি বাল্যকাল হইতেই ব্যথা দিত। তাঁহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন একটি ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হয়—বাড়ীর সকলের কান্না ক্রমশঃ থামিয়া আসিল কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের চোখের জল আর থামে না। এই সময় তাঁহার ভগ্নী ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের মধ্যে কলহ হইতে লাগিল। মণীন্দ্রচন্দ্র সকল ব্যাপার সঠিক বুঝিতে পারিতেন না—তবু তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইতেন—অবুঝ ব্যথার অশ্রু-প্রবাহ রোধ করিতে না পারিয়া বালক মণীন্দ্রচন্দ্র গৃহপ্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করিতেন।

মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতা ছিলেন সর্ব্বগুণসম্পন্না গৃহলক্ষ্মী, পিতা নবীন-চন্দ্রের দিনগুলি গুণবতী ভার্য্যার গৃহপরিচর্য্যায় ও পুত্রকন্যাগণের হাস্য-কোলাহলে মুখরিত ছিল—অভাবও তেমন ছিল না। বাঙ্গালীর সংসারে আর চাই কি? কিন্তু সুখ কয়দিনের? স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে নবীনচন্দ্রের মনের শান্তি তিরোহিত হইল। মাতৃহীন পুত্রকন্যাদের লইয়া নিষ্ঠুর সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে নবীনচন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্রের লেখা পড়া চলিতে লাগিল, মণীন্দ্রচন্দ্র তখন নাবালক শিশু মাত্র। অল্প বয়সেই উপেন্দ্রের বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখা যায়। তিনি 'গ্রন্থকীট' ছিলেন, তাঁহার নানা বিষয়ের পুস্তকাবলীর মধ্যে কিছু কিছু এখনও কাশিমবাজারের রাজ-পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। পঠিত

পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁহার হাতের লেখা বিশদ নোট বা ব্যাখ্যা দেখিলেই তাঁহার পড়াশুনার প্রতি কি রকম আকর্ষণ ছিল বুঝিতে পারা যায়।

পিতা নবীনচন্দ্রের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্রের কোন কারণে মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহার বিবাহিতা ভগ্নীগণ আপন আপন শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন। জ্যেষ্ঠের আপত্তি সত্ত্বেও ঐ সময় মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার মেজদিদির সহিত পিতার জন্মভূমি বর্দ্ধমান জেলার মাথরুণ গ্রামে চলিয়া আসিলেন। ছয়মাস পরে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন দেখিলেন মাথরুণে থাকিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, তখন পুনরায় তাঁহাকে তাঁহাদের কলিকাতার বাসায় আনিলেন। উপেন্দ্রচন্দ্রের স্ত্রী গুণবতী সত্যই অশেষ গুণে ভূষিতা ছিলেন—তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। বাড়ীতে একজন শিক্ষকের নিকট মণীন্দ্রচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস করিলেন। পুনরায় কম্বুলিয়াটোলার অ্যাংলো-ভার্ণাকুলার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন—বাৎসরিক পরীক্ষায় মণীন্দ্রচন্দ্র প্রায়ই শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেন; কিন্তু শেষ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন—বেশী মাত্রায় কুইনাইন খাইয়া তাঁহার মাথার অসুখ হওয়াতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য্য হন, কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র ক্লাশের মধ্যে অন্যতম "ভাল ছেলে" ছিলেন—অঙ্ক, ভুগোল ও ইতিহাসের পরীক্ষায় তিনি প্রায় পূরা নম্বর—(Full marks) পাইতেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র হিন্দু স্কুলের ৯ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া বাহিরের পুস্তক পাঠ করিবার প্রবল আগ্রহ দেখা দিল।—পাড়ার ছোট একটি পাঠাগারে বালক মণীন্দ্রচন্দ্রকে নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে দেখিয়া অনেকে মৃদু হাস্য করিত কিন্তু তিনি যখন ৯ম শ্রেণী হইতে কয়েক শ্রেণী পর্য্যন্ত "ডবল প্রমোশন" পাইতে লাগিলেন—তখন অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইয়া

উঠিল কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের বিদ্যার স্থানে উপগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইল। —তিনি আবার মাথার অসুখে শয্যাশায়ী হইলেন। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইল না—কবিরাজী, এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এমন কি হকিমী ঔষধও ব্যবহার করান হইল। স্বনামখ্যাত ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার ও তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডাঃ চার্লস্ তাঁহাকে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে বলিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের লেখা পড়া করিবার উৎসাহ ছিল অপরিসীম—উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রবল ইচ্ছা যখন এই ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইল তখন মণীন্দ্রচন্দ্র ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে রোগযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিতান্তই তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইল।

সন ১২৭৮ সালে এগার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ এবং চার মাস পরে জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মণীন্দ্রচন্দ্রের তিন ভ্রাতা ও পাঁচ ভগ্নী। পিতৃবিয়োগের সময় ছোট দিদি গণেশজননী ও ন'দিদি গন্ধেশ্বরী মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট থাকায় তিনি এই গভীর শোকের মধ্যে অনেকটা সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন—কিন্তু বিপদ্ কখন একক আসে না—তাঁহার জীবনেও আসে নাই, সংঘবদ্ধ হইয়াই আসিয়াছিল। তাঁহার যখন বয়স আট বৎসর তখন অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার পিতা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কাশীধামে আসেন—সেখানে চার মাস পরে মণীন্দ্রচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্রের কলেরা রোগে মৃত্যু হয়, এগার মাস পরে ছোট দিদি গণেশজননী বিধবা হন, জ্যেষ্ঠের একটি পুত্র সন্তান হইয়া মারা যায়;—এই সব কারণে তাঁহার পিতা কাশী ত্যাগ করিয়া কলিকাতার বাড়ীতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাহার পর এক বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে চার মাসের মধ্যে পিতা ও জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে মণীন্দ্রচন্দ্র দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সম্পূর্ণ অভিভাবক-হীন হইয়া পড়েন। এই অসহায় অবস্থায় তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে তাঁহার কোনও নিকট আত্মীয় ছিলেন না। বালক মণীন্দ্রচন্দ্র যেন অকূল সমুদ্রে

হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন,—নিরুপায় হইয়া তিনি তাঁহার মাতামহী রাণী হরসুন্দরীর নিকট ৩৭৪নং অপার চিৎপুর রোডের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র সজল নয়নে মাতামহীর নিকট সকল কথা নিবেদন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিভাবিকা হইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন—"আমি গোবিন্দের * মৃত্যুর পর হইতে সংসার ত্যাগ করিয়াছি, সংসারের মায়া মমতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি—এ অবস্থায় তোমার তত্ত্বাবধান করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।"—সকল অনুরোধ নিষ্ফল হইল—মণীন্দ্রচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আবার চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বয়সই বা কত!—বার বছর বয়সে তাঁহার খেলা করিয়া বেড়াইবার কথা কিন্তু এমনি অদৃষ্টলিপি যে, সে সময় তাঁহাকে এই নিষ্ঠুর সংসারের বিড়ম্বনায় অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হইল। অসহায় মণীন্দ্রচন্দ্র ভাবিলেন—মাতামহী বিরূপা হইলেন, মাতুলানীর নিকট যাই; তাঁহার কোমল হৃদয়, দয়াময়ী তিনি, তিনি হয়ত আমাকে রক্ষা করিবেন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার পুরাতন দ্বারবান্ ভূনা সিং এবং গৃহশিক্ষক চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে কাশিমবাজার যাত্রা করিলেন।

তখনকার দিনে কাশিমবাজার যাইতে হইলে ই, আই, রেলওয়ের হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিয়া নলহাটিতে নামিতে হইত। তথায় সমস্ত দিন অপেক্ষার পর বৈকালে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইবার জন্য মন্থরগতি ছোট ট্রেণ পাওয়া যাইত। কাশিমবাজার যাওয়ার কথা পূর্ব্বাহ্নে মহারাণী স্বর্ণময়ীকে জানান হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আজিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনে নামিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র দেখিলেন—তাঁহার জন্য কাশিমবাজারের একজন হরকরা ষ্টেশনে উপস্থিত আছে। মাতুলানী প্রেরিত জুড়ি গাড়ী—পরপারে জিয়াগঞ্জে অপেক্ষা করিতেছে। পারঘাট পার হইয়া

* গোবিন্দসুন্দরী—মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতা।

বাল্য জীবন

জুড়িগাড়ীতে চড়িয়া মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে দুইবার 'ডাক বদল' (অর্থাৎ গাড়ীর ঘোড়া বদল) করিয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে কাশিমবাজার রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে ভাবী মহারাজ, বালক মণীন্দ্রচন্দ্র প্রার্থীভাবে উপস্থিত হইলেন! ভাগ্যদেবী মৃদুহাস্যে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন!

কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বস্থিত "জামাইবাবুর কামরা"র দ্বিতল কক্ষে মণীন্দ্রচন্দ্রকে স্থান দেওয়া হইল। মহারাণীর জামাতা ব্রজনাথ দে ঐ গৃহে বাস করিতেন বলিয়া উহার নাম ছিল "জামাই বাবুর কামরা।" দ্বিতল চত্বরে তিনটি ঘর ছিল—যেটিতে জামাই বাবু থাকিতেন তাহারই পাশের দিকে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মণীন্দ্রচন্দ্র উপরে উঠিয়াই জামাই বাবুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন। জামাই বাবুর ভদ্রতা ও অমায়িকতা মণীন্দ্র-চন্দ্রের বিক্ষুব্ধ মনে অনেকটা স্বস্তি আনিয়া দিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে দেওয়ান রাজীবলোচন মণীন্দ্রচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কাশিমবাজার আসিবার অভিপ্রায় তাঁহাকে জানান হইল। বৈকালে মাতুলানীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য মণীন্দ্রচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান হইল।

অন্দরে উপস্থিত হইয়া মাতুলানীকে প্রণাম করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সবিনয়ে নিজের অবস্থার কথা নিবেদন করিলেন—কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ী অতি নিষ্ঠুর ভাবে উত্তর করিলেন—"তোমার মা আমার সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই; আমার বাড়ী হইতে তিনি ঝগ্‌ড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা আমি ভুলিতে পারি না; তোমার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার লওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

ইনিই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দানশীলা, করুণাময়ী, কোমল-স্বভাবা, প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী? বয়স বিবেচনা করিলেন না, অবস্থা

মানিলেন না, সমবেদনা অনুভব করিলেন না—মাতৃহীন, দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালকের সকাতর প্রার্থনা তাহার মাতার কোন্ এক তুচ্ছ অপরাধে তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন! মণীন্দ্রচন্দ্রের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সেদিন আর কোনও কথা ফুটিল না; সুকুমার চিত্তের উপর কি অকরুণ আঘাত! সেদিন কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের কক্ষতলে অসহায় বালকের পঞ্জর ভেদ করিয়া গভীর নৈরাশ্যের যে দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছিল, তাহাতে স্বর্ণময়ীর স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সুনামের উপর কলঙ্কের ছায়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই।

কাশিমবাজারে এইভাবে তিন দিন কাটিল, চতুর্থ দিন রাজীবলোচন আবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"মাতামহী আমার অভিভাবিকা হইলেন না—মাতুলানী অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন—এখন আমি দাঁড়াই কোথায়? আমার অভিভাবক নিযুক্ত না হইলে কে আমার 'মাসহারা' বাহির করিয়া দিবে? আমাকে অনাহারে মরিতে হইবে।"

রাজীব বাবু বলিলেন—"রাজা দিগম্বর মিত্র তোমার মামার গৃহশিক্ষক ছিলেন—তিনি কলিকাতায় আছেন—তাঁহাকে তোমার প্রয়োজন জানাইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবেন।"

এই "মাসহারা" বাহির করিবার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্রের একজন অভিভাবকের প্রয়োজন হইয়াছিল কেন তৎসম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে মনে করি।

মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতামহ রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুর মৃত্যুকালীন উইলে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী, স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যার ভরণপোষণের জন্য এষ্টেট হইতে একটা মোটা টাকার কোম্পানীর কাগজ ইংরাজ সরকারে জমা রাখিয়া দেন। ঐ টাকার সুদ হইতে মাতার ৮০০৲, সহধর্ম্মিণীর ১৪০০৲ এবং কন্যার অর্থাৎ মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতা গোবিন্দসুন্দরীর ২৫০৲ টাকা মাসহারা পাইবার ব্যবস্থা থাকে।

স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ সেন

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুকালে মণীন্দ্রচন্দ্র নাবালক ছিলেন। হাইকোর্টের বিচার অনুসারে * একজন অভিভাবক নিযুক্ত না হইলে মাসহারা পাইবার কোনও উপায়ই ছিল না। সুতরাং রাজীব বাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী রাজা দিগম্বর মিত্রের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া মণীন্দ্রচন্দ্রের গত্যন্তর ছিল না।

কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, দিগম্বর মিত্র অভিভাবক হইতে রাজী হইলেন না; মণীন্দ্রচন্দ্রকে বলিলেন—"তোমার Next-door neighbour কেদার বসু, তিনিই কেন তোমার Guardian হোন্ না?" এইভাবে পদে পদে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিপুল নৈরাশ্য বুকে করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন বটে কিন্তু সরল, নিষ্পাপ বালক সেদিন ভগবানের নিকট যে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিল—তাহা পূর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

২৪ পরগণা জেলার মজিলপুরনিবাসী মুন্সী মথুরানাথ দত্ত রাণী হরসুন্দরীর পুরাতন কর্ম্মচারী। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে আসিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার অভিভাবক হইতে রাজী আছেন। মণীন্দ্রচন্দ্র আশান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ সম্মতি দিতে পারিলেন না।

"বড় বউ দিদি" মোক্ষদাসুন্দরীর বিনা অনুমতিতে তিনি কোনও কার্য্যই করিতেন না। যাহা হউক ভ্রাতৃবধূ রাজী হইলেন, নন্দী পরিবারের পরমহিতৈষী বন্ধু শ্রীনাথ ঘোষ, স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ছোট জামাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতির সহিতও পরামর্শ হইল। মথুরা বাবু ও মোক্ষদাসুন্দরী উভয়েই অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। সন ১২৮৮ সালে মোক্ষদাসুন্দরীর মৃত্যু হইল। মথুরা বাবু তখন একাই অভিভাবকের পদে নিযুক্ত থাকিলেন।

* Decree of the Supreme Court. 27th. June, 1843.

ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুর পর হইতে মণীন্দ্রচন্দ্রের মাথার অসুখ পুনরায় দেখা দিল। ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে মণীন্দ্রচন্দ্রের লেখাপড়ার সুবিধা হইল না। কিন্তু অধ্যয়নের প্রবল ইচ্ছা তাঁহাকে বড়ই অস্বস্তি- দিতে লাগিল। নিজে গোপনে ইংরাজি উপন্যাসের ছোট ছোট বই পড়িতে লাগিলেন, পরে একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে ও নিজের আগ্রহে মণীন্দ্রচন্দ্র ছোট ছোট অনেকগুলি ইংরাজি গল্পের বই শেষ করিলেন। টেনিসনের কবিতা, সেকস্‌পিয়রের অধিকাংশ নাটক অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। তাঁহার গৃহশিক্ষক কলিকাতার সবজজ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, লাহোর কোর্টের উকিল মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় মণীন্দ্রচন্দ্রের সাধারণ শিক্ষা তখনকার দিনের পক্ষে যথোপযোগীই হইয়াছিল।

ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মণীন্দ্রচন্দ্র নিজে নিজে Gibbon's History of the Roman Empire, History of the French Revolution, Russel's History of Europe, African Travellers, Burk's Impeachment of Warren Hastings, Parliamentary debates প্রভৃতি নানা বিষয়ের পুস্তক পাঠ শেষ করিয়া ফেলিলেন।

অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"অঙ্ক আর আইন, এতে পারদর্শী না হতে পারলে শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না।" তাই তিনি নিজে বাল্য বয়সে, সকলের নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। উত্তর কালে তাই তাঁহাকে অতি জটিল হিসাব-পত্র অনায়াসে আয়ত্ত করিতে দেখা যাইত ;— কঠিন যোগ বিয়োগ, আয় ব্যয়ের গোঁজামিল দেওয়া হিসাব মণীন্দ্রচন্দ্র দৃষ্টিমাত্র ধরিতে পারিতেন।

বাল্যজীবনে ঠাকুর দেখা, ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়ার ইচ্ছা মণীন্দ্র-চন্দ্রের অতিমাত্রায় প্রবল ছিল। কোনও পূজা-পার্ব্বণাদি উপলক্ষে

প্রতিবাসিগণ নিমন্ত্রণ করিয়া গেলে—বালক মণীন্দ্রচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে পিতার সঙ্গী হইতেন।

ভিখারী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—পাঠ-নিযুক্ত বা ক্রীড়া-রত মণীন্দ্রচন্দ্রের দৌড়াইয়া গিয়া ভিক্ষা দেওয়াই চাই—বরাদ্দ মাপের অতিরিক্ত ভিক্ষা দিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র দ্বারবান্ ও চাকর কর্ত্তৃক ভৎ´সিত হইতেন। প্রার্থিতের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার যে প্রবল আগ্রহ উত্তরকালে তাঁহার চরিত্রের প্রধানতম গুণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—তাহার সজীব অঙ্কুরটি বাল্যজীবনের সরস ক্ষেত্রে পল্লব মেলিবার ব্যাকুলতায় যেন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া জলখাওয়ার পরই বাড়ীর বৃদ্ধা পাচিকা মণীন্দ্র-চন্দ্রকে প্রতিদিন রামায়ণ কিংবা মহাভারত সুর করিয়া পড়িতে বলিত, মণীন্দ্রচন্দ্র আবিষ্ট হইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িয়া চলিতেন। তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মন কখনও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-বিগ্রহে উত্তেজিত, কখনও বা সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর জন্য ব্যথিত হইত, কখনও বা দাতাকর্ণের উপাখ্যান, দধীচির অস্থিদানের কথায় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত; সীতার পতিপ্রেম, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃবাক্য পালনের জন্য রামের বনবাসের কথা পড়িতে পড়িতে চক্ষে জল আসিত। মহাভারত রামায়ণের অন্য ঘটনা তাঁহাকে কিরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল জানি না; কিন্তু কর্ণের ত্যাগ, দধীচির আত্মোৎসর্গ যে তাঁহার চরিত্র-গঠনের প্রধানতম উপকরণরূপে সঞ্চিত হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত।

এই সময়ে পুনরায় স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য প্রথম এটোয়া ও কাশীধাম হইয়া, কিছুকালের মত অবস্থান করিবার জন্য লক্ষ্ণৌ আসেন। লক্ষ্ণৌ স্থানটি মণীন্দ্রচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল। হরিদ্বার হইতে ফিরিবার পথে—তাঁহার যৌবনের বন্ধুদের লইয়া তিনি কি আনন্দে যে লক্ষ্ণৌ সহরে দিন কাটাইতেন,তাহা বর্ণনা করিতে করিতে বৃদ্ধ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মুখে যৌবন-দিনের আলোক-সম্পাত দেখিতে পাইতাম—

অতি তুচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত ঘটনা, কিন্তু তাঁহার জীবনের মধ্যে সেগুলি গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল—তাই তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সেও বিহারীলাল বসু, নিকুঞ্জবিহারী বসু, আশুতোষ বসু, বঙ্কুবিহারী বসু, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কৈলাসচন্দ্র দে, অদ্বৈত সামন্ত প্রভৃতি লক্ষ্ণৌএর বন্ধুগণের কথা স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপের কথা বর্ণনা করিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়ের ভাবপ্রবণতার দিকটা সেদিন আমার চোখে ধরা পড়িয়াছিল।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যাহারা চিরপরিচিতের মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, হৃদয়-বৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই যাহারা প্রীতি লইয়া ও সমাদর করিয়া একান্ত আপনার জনের মত সাথী, সহচর ও বন্ধুরূপে হৃদয় দিয়া হৃদয় জয় করিয়া লয়, তাহারা আমাদের জীবনের একটি বিশেষস্থান অধিকার করিয়া থাকে, ইহা যখন আমরা অনুভব করি, তখন কর্ম্মবাহুল্যে বিস্মৃতপ্রায় সুখ ও আনন্দে মুখরিত অতীত জীবনের দিনগুলি ব্যাকুল ব্যগ্রতায় আমাদিগকে আকর্ষণ করে,—একদিনের উপলব্ধ আনন্দ ও সুখ যেন সেদিন তেমনি করিয়া দেহ মনকে উৎসাহিত করিয়া তুলে—অবসন্ন জরার মধ্যেও সেদিন যৌবনের সুখ-স্পন্দন অনুভূত হয়।

যৌবনে মণীন্দ্রবাবু

জীবন-সংগ্রাম

কাশিমবাজার হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে মণীন্দ্রচন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইতে লাগিল। মাতামহী রাণী হরসুন্দরী ও মাতুলানী রাণী স্বর্ণময়ীকে এ সংবাদ জানান হইল।

বর্দ্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামের নিকটবর্ত্তী যবগ্রামে রামগোপাল নন্দী মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কাশীশ্বরী দাসীর সহিত সন ১২৮২ সালের ১২ই ফাল্গুন, ১৭ বৎসর বয়সে মণীন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাপক্ষকে পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে। এ প্রস্তাবে তাঁহারা রাজী হইলে—একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাঁহাদের স্থান দিয়া সেখান হইতে শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হইল।

বিবাহের পর বধূকে আর পিত্রালয়ে যাইতে দেওয়া হয় নাই,—মহারাণী কাশীশ্বরী বিবাহ দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত কাশিমবাজার রাজভবনে অবস্থান করিতেছেন।

নব-পরিণীতা বধূর শিক্ষার ভার মণীন্দ্রচন্দ্র নিজেই গ্রহণ করিলেন—তাঁহার ন'দিদি ও ছোট দিদি সূচ ও উলের কাজ শিখাইয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। সংসারে ব্যয়বৃদ্ধির অনুপাতে দুশ্চিন্তা ক্রমশঃ যুবক মণীন্দ্রচন্দ্রকে পীড়া দিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট মাসহারা ছিল মাত্র ২৫০৲ টাকা—অতি প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুলান করিতেই তাহা ফুরাইয়া যাইত—নিরুপায় হইয়া সাময়িক সাহায্যের জন্য তাঁহাকে মাতামহীর শরণাপন্ন হইতে হইত। মাতামহী ১০০৲ টাকা ও মাতুলানী ৫০০৲ টাকা বাৎসরিক সাহায্য করিতেন। দুইটি ভাগিনেয় রাজেন্দ্র নন্দী ও শরৎচন্দ্র দের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার মণীন্দ্রচন্দ্র বহন

করিতেন—বন্ধু বান্ধব আত্মীয়ের অনুরোধ, তাঁহাদের সবিনয় প্রার্থনা মণীন্দ্রচন্দ্র উপেক্ষা করিতে পারিতেন না—কাহারো শিক্ষার ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করিয়া দিতে পারিলে তিনি যেন বাঁচিয়া যাইতেন। এইভাবে তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে এমন বালকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিবাহের ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে শ্যামবাজারের বাড়ীতে প্রথম পুত্র মহিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার পর হইতে মণীন্দ্রচন্দ্র বিশেষভাবে অর্থাভাব অনুভব করিতে থাকেন। নবকুমারের জন্ম-উপলক্ষ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইল তাহা অতি সামান্য। সংসার কোন প্রকারে চলিতেছে—এমত অবস্থায় মণীন্দ্রচন্দ্র আবার মাতুলানীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কয়েকবার এই উদ্দেশ্য লইয়া কাশিমবাজার যাতয়াত করিয়াও বিশেষ কিছু ফল হইল না। কলিকাতায় বাসা খরচ বেশী—পিতার জন্মভূমি মাথরুণ যাইয়া বাস করিলে হয় ত ব্যয়সঙ্কোচ হইবে এবং সেখানে কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া কিছু অর্থাগমও হইতে পারে, এই ভাবিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সপরিবারে বর্দ্ধমান জেলার মাথরুণ গ্রামে আসিলেন।

মাথরুণ বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে প্রায় ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। এই গ্রামে তাঁহার পৈতৃক দেবসেবা, কিছু যোতের জমি ও লাখরাজ পুষ্করিণী ছিল, নিজের বসত বাটী বলিতে কিছু ছিল না। খুল্লতাত শ্রীনাথ নন্দীর বাড়ীতে উঠিয়া তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে মণীন্দ্রচন্দ্র চাষের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনে একদিকে যেমন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, অন্যদিকে তেমনি নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার কর্ম্মমুখী মন কোনও একটী সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কদাচ আবদ্ধ থাকিতে পারিত না, নিত্য নূতন কর্ম্ম-প্রচেষ্টা, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ, বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রতি প্রবল

আকর্ষণ তাঁহাকে কর্ম্মবহুল জীবন যাপনে প্রবুদ্ধ রাখিয়াছিল। ইহারই প্রথম অভিব্যক্তি দেখি—মাথরুণে আসিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিবার ঐকান্তিক চেষ্টার মধ্যে। অর্থাগমে মাসিক আয় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যটি সঙ্কল্পের প্রারম্ভে দেখিতে পাইলেও,—কৃষি কার্য্যের উন্নতি কল্পে তিনি সামান্য একটী পল্লীতে দীর্ঘকাল বাস করিয়া ব্যক্তিগতভাবে যে প্রকার প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে কর্ম্ম-প্রেরণারই যথেষ্ট প্রাধান্য দেখিতে পাই।

তিনি মাথরুণে আসিয়া খুল্লতাত ও নিজের যৎসামান্য জমি লইয়া চাষবাস আরম্ভ করিলেন। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য গোময় সার ও পাঁক প্রভৃতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সামান্য কিছু ফল পাওয়া গেল। প্রথম দুই বৎসর দেশীয় প্রথায় আঁখের চাষ করা হইল। সারের পরিবর্ত্তন করিয়া কিরূপ ফল হয় তাহারও পরীক্ষা চলিতে লাগিল। মণীন্দ্রচন্দ্র কৃষিসম্বন্ধীয় ইংরাজি মাসিক পত্র ও পুস্তিকা হইতে জানিতে পারিলেন যে, সরিষা অপেক্ষা রেড়ীর খইল ব্যবহার করিলে ফসল দ্বিগুণ উৎপন্ন হইবে; সে বৎসর তাহাই করিলেন—বিঘায় তিন চার মণ গুড় উৎপন্ন হইল—দেশী মাড়াই কলের পরিবর্ত্তে বিলাতী মাড়াই কল আসিল—মাটির জালার পরিবর্ত্তে লৌহ কটাহে আঁখ জ্বাল হইতে লাগিল, গুড়ের রঙ পরিষ্কার করিবার জন্য নিত্য নূতন পরীক্ষা চলিতে লাগিল। আলুর চাষের তেমন প্রচলন সেখানে ছিল না। মণীন্দ্রচন্দ্র সেই দিকটাও ধরিলেন—সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া আলুর ফসল বৃদ্ধি পাইল দ্বিগুণ—লাভের দিকে সাধারণ কৃষকের মন ফিরিল, ব্যাপক ভাবে আলুর চাষ হইতে লাগিল। ধানের জমিতে সার দিয়া জল সেচনের সুব্যবস্থা করিয়া দশ মণের স্থানে বিঘা প্রতি বিশ মণ ধান উৎপন্ন হইতে লাগিল। মণীন্দ্রচন্দ্রের আহার নিদ্রা এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়—পরিশ্রমের ফলে অর্থাগমও কিছু কিছু হইতে লাগিল। সাংসারিক অভাবের নৈরাশ্য নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের ব্যস্ততা ও সাফল্যে দূর

হইতে লাগিল—মাসহারা, মাতুলানীর সাহায্য এবং কৃষিজাত ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থে—সাংসারিক অস্বচ্ছলতা অনেকটা কমিয়া আসিল। কৃষকেরা তাঁহার মতানুসারে আপন আপন কৃষিকর্ম্মের পদ্ধতির অদল বদল করিল—ফলও কিছু পাইল—মণীন্দ্রচন্দ্র ইহাতে বিশেষ আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফসল ফলিল—কৃতকার্য্যের আনন্দে মণীন্দ্রচন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

মাথরুণে যাইবার কিছুকাল পরে মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার পত্নীর জ্বরবিকার লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পল্লীগ্রামে ডাক্তার বৈদ্য অমিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; মণীন্দ্রচন্দ্র ভাবিলেন—এখানকার হাতুড়ে ডাক্তার এই সঙ্কট পীড়ায় কিছুই করিতে পারিবে না। কাটোয়া হইতে এজন্য অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেনকে আনা হইল। তাঁহার উপদেশ মত তাঁহাকে সঙ্গে রাখিয়া কাটোয়ায় রোগিণীকে লইয়া গিয়া একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে রাখা হইল। কাটোয়ায় তখনকার দিনে যে কয়জন ডাক্তার ছিলেন—সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করা হইল। বহরমপুর হইতে সিভিল সার্জ্জনকে পাঠাইবার জন্য মাতুলানীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান হইল—কিন্তু তিনি পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিলেন না। সেই সময় মণীন্দ্রচন্দ্রের পরম বন্ধু বহরমপুরের স্বনামখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সেন সেখানে উপস্থিত। তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দেখিয়া বলিলেন—"সিভিল সার্জ্জন কিংবা ভাল ডাক্তার যখন পাওয়াই গেল না, তখন আমিই আরোগ্য করিবার ভার গ্রহণ করিলাম।"—ব্রজেন্দ্রবাবুর আপ্রাণ চেষ্টায় ও ভগবানের কৃপায় ভাবী মহারাণী ৪৫ দিন পরে রোগমুক্ত হইলেন। ৫২ দিনের দিন রোগিণীকে অন্নপথ্য দেওয়া হইল।

কিছুদিন পরে মণীন্দ্রচন্দ্র সপরিবারে আবার মাথরুণ ফিরিয়া আসিলেন। নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র প্রায় দীর্ঘ দশ বৎসরকাল মাথরুণে থাকিয়া গেলেন।
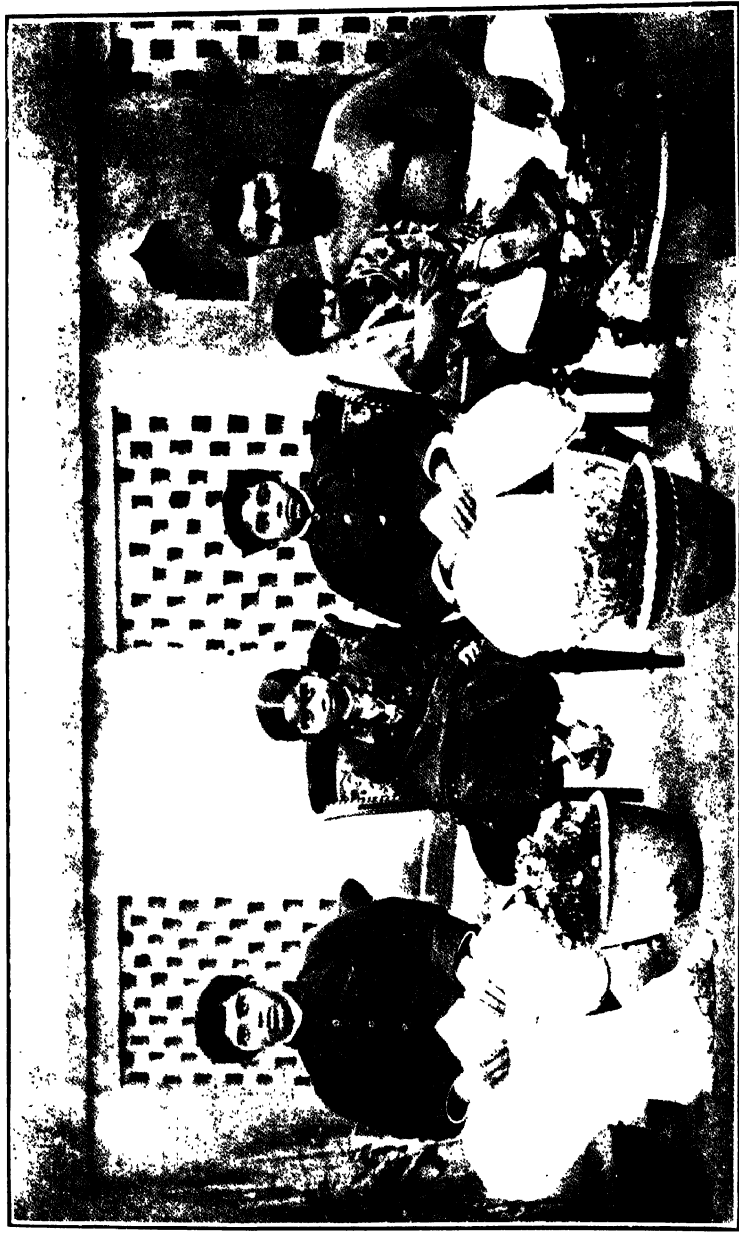
পুত্রকন্যাসহ মণীন্দ্রবাবু

যৌবনে মণীন্দ্রবাবু

একদিন মণীন্দ্রচন্দ্র বলিতেছিলেন—"কলিকাতার হৃদ্যতা ও ভদ্রতার মধ্যে প্রাণ নাই—সবই যেন কেমন মৌখিক। আমার যৌবনকালে যখন আমি মাথরুণে বাস করিতেছিলাম, তখন পল্লী ও সহরের সমাজ সম্বন্ধে তুলনা করিবার আমার বিশেষ সুযোগ ঘটে। আমার প্রতি আপামর সাধারণের সহানুভূতি সকল বিষয়েই প্রকাশ পাইত। সমবয়সীদের সহিত হৃদ্যতাও ছিল অকৃত্রিম।—কলিকাতায় বাস করিয়াছি বহুদিন, কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সকলের ব্যবহারই আমার নিকট অভিনয়ের মত বোধ হইত। ভব্যতার মাত্রা সহরে অধিক বটে—লৌকিকতাও সেখানে ক্রটিহীন কিন্তু প্রাণের সাড়া পাইয়াছিলাম মাথরুণে দশবৎসর কাল বাস করিয়া।"

মাথরুণে অবস্থানকালে মণীন্দ্রচন্দ্রের মাসিক সাংসারিক খরচ এক প্রকার চলিত। নিজের মাসহারা, মাতুলানী ও মাতামহীর সাহায্য এবং চাষবাস হইতে কিছু আয়, এই সকল একত্র করিয়া অভাব একপ্রকার মিটিত বটে কিন্তু পূর্ব্বের দেনা পরিশোধ করিবার কোনও উপায়ই হইত না।

গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল,—মণীন্দ্রচন্দ্রের চেষ্টায় বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরাজি শ্রেণীতে উন্নীত হইল। মণীন্দ্রচন্দ্র কখনও বিদ্যালয় পরিদর্শন, কখনও বা কোনও শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিক্ষকতা করিয়া বিদ্যালয়ের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

মাথরুণ হইতে বৎসরে একবার করিয়া তিনি কলিকাতায় ও কাশিমবাজারে যাইতেন। মধ্যে মধ্যে নিজের দুঃখ ও অভাবের কথা তিনি পত্রযোগে মাতুলানী স্বর্ণময়ীকে জানাইতেন, কিন্তু তাহাতে কুফল ফলিত।—মাতুলানীর সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা না বাড়িয়া ক্রমশঃ যেন সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতে লাগিল—কিন্তু নীরবে সহ্য করা ছাড়া মণীচন্দ্রচন্দ্রের তখন অন্য উপায় ছিল না।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

একবার কাশিমবাজার যাইতেছি বলিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র মাতুলানীকে খবর দিলেন। যথাসময়ে গুশ্‌করা রেল ষ্টেশন হইতে ট্রেণে চড়িয়া নলহাটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে কাশিমবাজার রাজবাড়ীর জমাদার প্রভাকর সিং একখানি চিঠি মণীন্দ্রচন্দ্রের হাতে দিল—চিঠিখানি বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহাশয়ের লেখা ;—চিঠিখানিতে তুই একটি সাধারণ কথা লিখিবার পর তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রকে নলহাটি হইতে মাথরুণ ফিরিয়া যাইতে লিখিয়াছেন ;—পত্রে প্রকাশ, কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে মাতুলানী নিষেধ করিয়াছেন ; নিষেধ না মানিয়া গেলে দেখা'ত হইবেই না, বরং শোচনীয় ফলভোগের জন্য যেন মণীন্দ্রচন্দ্র প্রস্তুত থাকেন।

চিঠি পড়িবামাত্র মণীন্দ্রচন্দ্রের সমস্ত দেহ যেন অবসন্ন হইয়া আসিল, মর্ম্মযাতনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, স্বীয় জীবনের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা ও বীতরাগে তিনি আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

হঠাৎ মণীন্দ্রচন্দ্রের মনে হইল এই বিড়ম্বিত জীবন শেষ করিয়া দিবার পূর্ব্বে একবার ললাটেশ্বরী দর্শন করিয়া যাই। একথা মনে হইবামাত্র মণীন্দ্রচন্দ্র পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। একটি পর্ব্বতের উপর ললাটেশ্বরীর পীঠস্থান। কখন যে মণীন্দ্রচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে পর্ব্বতের উচ্চতম স্থানে উঠিয়া পড়িয়াছেন, তিনি নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই ; চিত্তবিভ্রমের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সেই উচ্চস্থান হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে পশ্চাৎ হইতে কে একজন তাঁহাকে তুই হাতে ধরিয়া ফেলিলেন ; সুগভীর হৃদয়াবেগ ও তীব্র উত্তেজনা হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে মণীন্দ্রচন্দ্র পর্ব্বতগাত্রে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র নিজে বলিয়াছেন—"চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলাম একটি অপরিচিত ভদ্রলোক এবং আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার মুখে ও মাথায় জল দিতেছেন।—ভগবানের চিন্তা আমার মনে

প্রবল হইয়া উঠিল ; বাহ্যজ্ঞান যেন হারাইয়া ফেলিলাম। সেই বিমূঢ় অবস্থায় আমি স্পষ্ট দেখিলাম স্বয়ং যেন মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ অতি মধুর স্বরে আমাকে বলিতেছেন,—'এত অল্প বয়সেই সামান্য কারণে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে কেন ? জীবনে যে তোমাকে অনেক লীলাখেলা করিতে হইবে। চৈতন্য লাভ কর।' তাহার পরই আমার পূর্ণ চৈতন্য লাভ হইল। দেখি, চারুবাবুর কোলে আমার মাথা ; সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটি চাদর নিঙড়াইয়া আমার মুখে চোখে জল দিতেছেন।"

এই অপরিচিত ভদ্রলোকটি নলহাটির ষ্টেশন-মাষ্টার অদ্বৈতবাবু ; উপাধি কি জানি না, তিনি জীবিত কি মৃত তাহাও জানিনা, মণীন্দ্রচন্দ্রকেও তিনি চিনিতেন না। তাঁহার মানসিক অবস্থার কথা, স্বীয় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পের কথা এই অপরিচিত ভদ্রলোকের পক্ষে জানিবারও কোনও সুযোগ ছিল না —তাই পরম বিস্ময়ের কথা এই যে, কি করিয়া তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রের মনোগতভাব জানিলেন—কাহার প্রেরণা বা আদেশে তিনি অলক্ষ্যে অনুসরণ করিয়া একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া মৃত্যুর নিষ্ঠুর কবল হইতে মণীন্দ্রচন্দ্রকে রক্ষা করিলেন ! এই অলৌকিক ঘটনার সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের উল্লিখিত ব্যক্তিগত উক্তির তুলনা করিলে বেশ সামঞ্জস্য-সাধন করা যায়। ভগবানের যে অদৃশ্য মহাশক্তি মানুষের প্রতি করুণা ও সমবেদনার মধ্য দিয়া লীলারূপে প্রতিনিয়ত প্রকট হইতেছে—অসহায় অজ্ঞান মানুষের পথ চলিবার সকল বাধা বিপত্তি দূরীভূত করিয়া ভগবৎ-করুণার যে অপূর্ব্ব ধারাটি পরম সান্ত্বনা ও অনন্ত ভরসা রূপে সংসার-জীবনকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে—এ সমস্ত তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। অদ্বৈতবাবু ও মণীন্দ্রচন্দ্র ভগবৎ-লীলা প্রকটনের উপলক্ষ মাত্র।

যাহা হউক, এইরূপে ভবিষ্যৎ দিনের গৌরব-রবি মৃত্যু-রাহুর অকাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল—ভবিষ্যতে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়ের

জন্য আত্মহত্যার আপাত মহাপাপ হইতে মণীন্দ্রচন্দ্র নিষ্কৃতি পাইলেন।

অদ্বৈতবাবু ও চারুবাবুর সহিত মণীন্দ্রচন্দ্র ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন, ক্রমশঃ অভিভূত অবস্থাটা কাটিয়া আসিতে লাগিল। অদ্বৈতবাবুর বহু অনুরোধ সত্ত্বেও কিছু আহার করা মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে তখন সম্ভব হইল না। ষ্টেশনের একটি ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা হইল—অনতি-বিলম্বেই তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রান্তে অদ্বৈতবাবু বাসায় লইয়া গিয়া পরিতোষ সহকারে তাঁহাকে আহার করাইলেন। শেষ রাত্রির ট্রেণে গুশ্‌করা যাওয়া স্থির হইল।

পাল্কী রাখিবার জন্য গুশ্‌করার বাবুদের নিকট তার করা হইল—তাঁহারা সম্মতি জানাইয়া তারে প্রত্যুত্তর দিলেন। সে রাত্রে আর ঘুম হইল না, পর্ব্বতপ্রমাণ চিন্তায় অস্থির হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। ভোরের ট্রেণে গুশ্‌করা পৌঁছিলেন। গৃহস্বামী আসিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রকে স্নানাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন; শরীরটাও ক্লান্ত ছিল, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া পাল্কীতে করিয়া নূতনহাট হইয়া অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় ভগ্নমনে মণীন্দ্রচন্দ্র মাথরুণ ফিরিয়া আসিলেন।

কয়েক বৎসর ধরিয়া মাতুলানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহু পত্র লেখা হইল কিন্তু তাঁহার হৃদয় টলিল না। পত্রের জবাব প্রায়ই পাওয়া যাইত না, কখনও বা কর্ম্মচারীর জবানীতে এক আধখানি পত্র আসিত। মাতুলানীর এই প্রকার মনোভাবের কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার অশেষ গুণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তবুও তিনি স্ত্রীলোক; পার্শ্বস্থিত প্রভাবশালী উচ্চ কর্ম্মচারীর মন্ত্রণা, উপদেশ ও অস্পষ্ট ইঙ্গিতে যে তিনি একেবারেই

চালিত হইতেন না একথা মনে করিবার কোনও হেতু নাই। ইহাই সর্ব্বজনবিদিত যে, ধনীর গৃহে, রাজার প্রাসাদে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বা অমাত্যের ব্যক্তিত্ব প্রবলতর হইলে তাহার প্রভাব সকল সময় অতিক্রম করিয়া চলা কঠিন হইয়া পড়ে;—এই কারণেই প্রভু বা প্রভুপত্নীর অপেক্ষা একান্ত নিকটের কর্ম্মচারীর মন রক্ষা করার প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়। যাহা হউক, মণীন্দ্রচন্দ্রের আত্মা সংসার-ভারমুক্ত হইবার পর, সে সব অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করা একান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়।

মণীন্দ্রচন্দ্র মনে করিলেন—এত চেষ্টাতেও যখন মাতুলানীর স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না, তখন তাঁহার নিকটে অর্থাৎ বহরমপুরে যাইয়া সপরিবারে বাস করিলে হয়ত নৈকট্যের আকর্ষণে আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন হইবেন। এই ধারণা করিয়া তিনি সন ১২৯৮ সালের ৬ই চৈত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে বহরমপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত শ্রীনাথবাবুর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। তখনও বৈকুণ্ঠবাবু মহারাণীর উকিল আছেন। একটা মিটমাট করিবার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র একপ্রকার জোর করিয়াই কাশিমবাজারে গোবিন্দসুন্দরীর বাটীতে উঠিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করিতেছেন। রাজবাড়ীর "সিধাভোগী" হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র মনের দুঃখে ঐ বাড়ীতে একুশ দিন কাটাইলেন। ম্যানেজার শ্রীনাথ পাল মহাশয় তখন মফঃস্বলে সফরে বাহির হইয়াছেন। এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মৃত্যুঞ্জয় বাবু প্রতিদিন মণীন্দ্রচন্দ্রের তত্ত্ব লইতেন। তাঁহার মধ্যস্থতায়ও মহারাণীর সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না।

ঠিক এই সময় বিভাগীয় কমিশনার মিঃ বিম্‌স বহরমপুরে আসিলেন, রাজবাড়ীর হরকরার মারফতে চিঠি পাঠাইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র

কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের দিন ও সময় ঠিক করিয়া লইলেন। সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বে মণীন্দ্রচন্দ্র বৈকুণ্ঠবাবুকে বলিলেন—"আপনাদের দ্বারা ত আমার মাতুলানীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না—অতএব এজন্য আমাকে কমিশনারকেই অনুরোধ করিতে হইবে।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কমিশনারের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা, মাতুলানীর সহিত অসদ্ভাব, তিনি বাচনিক ও দরখাস্তে জানাইলেন। কমিশনার সাহেব মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সাধ্যমত মণীন্দ্রচন্দ্রের অভাবমোচনের চেষ্টা করিবেন এবং মহারাণীকে এ বিষয় অনুরোধ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

দুই একদিন মধ্যেই কমিশনার সাহেবের সহিত পর্দ্দার আড়াল হইতে মহারাণীর এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইল ঃ—

"আপনার ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারীর সহিত আপনি সাক্ষাৎ করেন না কেন—জানিতে পারি কি ?"

"গোপনীয় কারণ আছে।"

"গোপনীয় কারণ আমার জানা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।"

"আমার প্রতিনিধি বৈকুণ্ঠনাথ সেনের দ্বারা আপনাকে জানাইব।"

"আচ্ছা,—আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিতে পারেন, কিন্তু আপনার মানসম্ভ্রমোপযোগী সাহায্য তাঁহাকে করেন না কেন ?"

"সে বিষয় আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

"আমি কমিশনার হিসাবে আপনাকে বলিতেছি না, মধ্যস্থরূপে বলিতেছি,—আপনাদের ভিতরে যে অসদ্ভাব আছে, তাহা যেন না থাকে এবং আপনার উত্তরাধিকারীর অভাব পূরণ এবং তাঁহার ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ সংবাদটি আমি বহরমপুরে থাকিতে থাকিতে যেন জানিতে পারি। নতুবা আমি চলিয়া গেলে আর আপনার

মনে থাকিবে না। আমিও কার্য্যান্তরে লিপ্ত হইয়া পড়িব—তাহা হইলে যুবকটি মারা পড়িবে।"

"এ সংবাদ আপনি সত্বরই জানিতে পারিবেন।"

দুই চারিদিন পরে বৈকুণ্ঠবাবু এবং কমিশনারের সহিত নিম্নলিখিত কথোপকথন হইল ঃ—

"মণীন্দ্রচন্দ্রকে মহারাণী মাসিক কিছু সাহায্য করিতে আইনতঃ বাধ্য নহেন। তবে তিনি যদি তাঁহার মাতুলানীর সহিত ভাল ব্যবহার করেন তবে কিছু কিছু সাহায্য পাইতে পারেন।"

"মহারাণীকে বলিবেন, তিনি যেন মাসিক দুই সহস্র টাকা করিয়া সাহায্য করেন।"

"না, তিনি তাহা করিবেন না।"

"মহারাণীর আয় চার পাঁচ লাখ টাকা, তাঁহার উত্তরাধিকারীর মাসহারা দুই হাজার টাকা কেন হইবে না?—আচ্ছা, দেড় হাজার ত হইবে?"

বৈকুণ্ঠবাবু তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না, কোনও প্রকার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার নির্দ্দেশও ছিল না। অবশেষে "বাৎসরিক দশ হাজার টাকা দিতেই হইবে" এই বলিয়া কমিশনার সাহেব কথা শেষ করিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী সাক্ষাৎকারে কমিশনার সাহেব মণীন্দ্রচন্দ্রকে স্পষ্টই জানাইলেন,—

"মহারাণী যদি স্বেচ্ছায় না দেন, তবে আমি কোনও জোর ত করিতে পারিব না। তবে আপনি ঐ টাকা পাইবেন, এই কথা মনে রাখিবেন,—যদি না পান, পুনরায় আমাকে পত্র লিখিবেন।" এই কথা বলিয়া কমিশনার সাহেব মণীন্দ্রচন্দ্রকে বিদায় দিলেন।

তখন বৈকুণ্ঠনাথের সহিত শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জানিতে পারা গেল, বৈকুণ্ঠ

বাবু এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণীন্দ্রচন্দ্রকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন।

বৈকুণ্ঠ বাবু মণীন্দ্রচন্দ্রকে জানাইলেন—"মহারাণী সহজে টাকা দিবেন না। তবে কমিশনারের সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, তিনি আপনার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন, একটা আন্তরিক টান আছে বলিয়াই মনে হইল। ইংরাজের প্রকৃতি এই যে, যাহাকে সে ভালবাসে, তাহার উপকার না করা পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।"

বৈকুণ্ঠবাবু মণীন্দ্রচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন—"কমিশনারের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে থাকুন, আর আপনি বহরমপুর আসিয়া বাস করুন—"চক্ষুঃশূল" হইয়া থাকিলে মহারাণী বাধ্য হইয়া আপনার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

মণীন্দ্রচন্দ্র বলিলেন—"এখানকার জলবায়ু সহ্য হইবে কি?"

উত্তরে বৈকুণ্ঠনাথ মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন—"আমরাও ত স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতেছি।"

অতঃপর মণীন্দ্রচন্দ্র বহরমপুর থাকাই স্থির করিলেন একথা কিন্তু গোপন রহিল।—ফিরিবার সময় তিনি এক হাজার টাকা, এক জোড়া শাল এবং দুই জোড়া 'আট পৌরে' কাপড় পাইলেন, কিন্তু রাহা খরচ সেবার আর ভাগ্যে জুটিল না। কোনও না কোনও প্রকারে, মণীন্দ্রচন্দ্রের উপর মাতুলানী এই রূপে তাঁহার অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করিতে ছাড়িতেন না।

যাহা হউক, মাথরুণ ফিরিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সপরিবারে বহরমপুর বাস করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। একখানি বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য কর্ম্মচারী চারু বাবুকে অগ্রেই পাঠান হইল।

চারু বাবু বহরমপুর উপস্থিত হইলে, তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া যাহাতে কেহ মণীন্দ্রচন্দ্রের বাসের জন্য বাড়ীভাড়া না দেয়, তাহার বিশেষ চক্রান্ত চলিতে লাগিল। কাশিমবাজার রাজকর্ম্মচারিগণের তখন বিশেষ
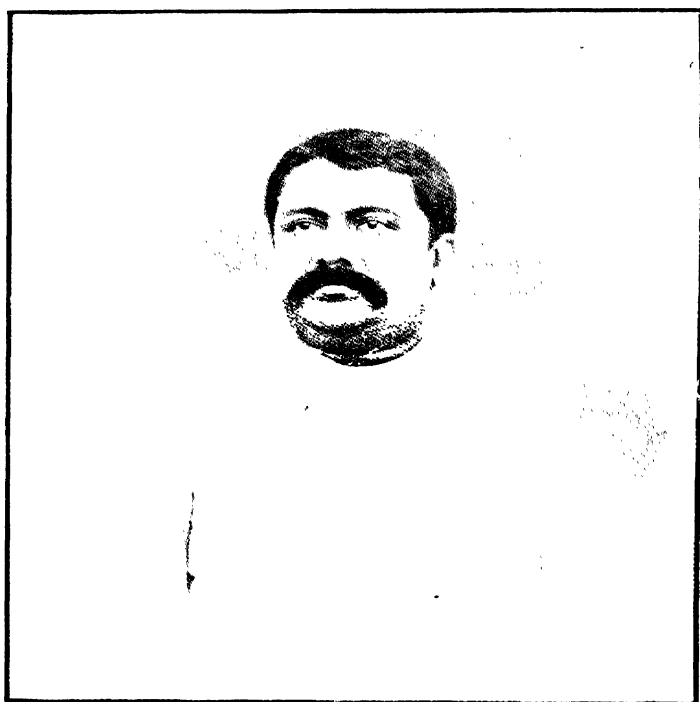
যৌবনে 'মণীন্দ্রবাবু'

প্রভাব প্রতিপত্তি। চারুবাবু বিফলমনোরথ হইয়া মাথরুণে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময় বহরমপুরের বিখ্যাত সেনবংশের গৌরব ডাঃ রামদাস সেনের পুত্রগণ তাঁহাদের একটি বাড়ী মণীন্দ্রচন্দ্রকে ভাড়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সন ১২৯৯ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ নৌকাযোগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠাইয়া বহরমপুর অভিমুখে যাত্রা করা হইল। এ সংবাদ পূর্ব্বেই মাতুলানীকে জানান হইয়াছিল।

মাথরুণ হইতে বহরমপুর আসিবার প্রস্তাবে গ্রামবাসী সকলেই মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হইল কিন্তু মুখে বলিল—কার্য্য উদ্ধারের জন্য যাইতেছেন, সফল হইলে আমরা খুসীই হইব।

মাথরুণ পরিত্যাগ করিবার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে বিদায়-ভোজ আরম্ভ হইল। মণীন্দ্রচন্দ্র এতই পল্লীবাসীর প্রিয় ছিলেন যে, যাত্রা করিবার দিন তাহাকে একাদিক্রমে ছয়টি বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

কাটোয়া পর্য্যন্ত তখন গরুর গাড়ী ও পাল্কীতে যাইতে হইত। একদিনের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। সেখানে আহারাদি সারিয়া তৃতীয় দিনে তিনখানি নৌকাযোগে মণীন্দ্রচন্দ্র সপরিবারে বহরমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাটোয়া হইতে বহরমপুরের পথে মণীন্দ্রচন্দ্রের নৌকা, বিদুপাড়ায় তাঁহার খুল্লতাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্র নন্দী ধরিয়া ফেলিলেন—উপায় নাই, এসব ব্যাপারে মণীন্দ্রচন্দ্রের ব্যবহার ছিল অতুলনীয়। দাদার অনুরোধ রক্ষা করিতে না করিতে বড় ভগ্নীর কন্যা গোপালসুন্দরীর নিকট হইতে নিমন্ত্রণ আসিল। সেখানে আর পাতা পাড়িয়া খাওয়া হইল না, সেখান হইতে রাত্রের আহার্য্য রূপে জাঁতাপেষা ময়দার লুচী, তরকারী ও কাঁটাল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

নৌকা ২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১২৯৯) তারিখে বহরমপুরের রাধার ঘাটে আসিয়া লাগিল। মণীন্দ্রচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজের পৌঁছান সংবাদ মাতুলানী মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট পাঠাইলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিতেছে,—নানা রূপ দুশ্চিন্তা তখন মণীন্দ্রচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। নৌকা ঘাটে ভিড়িল—সকলের অজ্ঞাতে মণীন্দ্রচন্দ্রের পঞ্জর ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।—মণীন্দ্রচন্দ্রের সম্মুখের জীবন বুঝি এমনি নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! কি অনির্দ্দিষ্ট ভরসায় আজ তিনি স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এই অজ্ঞাত কূলে আসিয়া লাগিলেন? যে ফল লাভের আশায় তিনি সপরিবারে স্বীয় অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য দাঁড়াইলেন—তাহারই অভাবিত আশঙ্কায় তিনি আজ নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা কাতর স্বরে বলিলেন—"বাবা বাড়ী চল"—মণীন্দ্রচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। সদ্য জ্ঞানপ্রাপ্ত মূর্চ্ছাগতের ন্যায় মণীন্দ্রচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পৌঁছান সংবাদের কোনও উত্তরই রাজবাড়ী হইতে আসে নাই।

মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী চারুবাবু আলো লইয়া ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রকে বলিলেন—"আপনার আশা বৃথা—রাজবাড়ী হইতে গাড়ী বা আহারাদির কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। আমি আমার সাধ্যানুসারে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।"

দূরে নগর-সৌধের গবাক্ষনিঃসৃত ক্ষীণালোক মণীন্দ্রচন্দ্রের দৃষ্টিপথে পতিত হইল—একটি দুইটি তিনটি, উত্তরে দক্ষিণে সম্মুখে, গৃহ-প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি যেন তাঁহাকে একান্ত মমতায় আহ্বান করিতেছে।

রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণমনে মণীন্দ্রচন্দ্র নিজের লজ্জা রাত্রির অন্ধকারে গোপন করিয়া রামদাস সেনের গঙ্গার ধারের নির্দ্দিষ্ট ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসিয়া সপরিবারে উঠিলেন। শয়নের

ব্যবস্থা ছিল, রাত্রির আহার্য্যও সঙ্গে ছিল, কাজেই কোনও অসুবিধাই হইল না। কিন্তু এই পথ-শ্রান্তির পরও সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইবার মত একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। গভীর রাত্রে মণীন্দ্রচন্দ্র শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় একটি লোক গঙ্গার ধারের দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া অমানুষিক চীৎকার করিতে করিতে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল—চীৎকারের মধ্যে স্পষ্টাভাষ কিছু ধরিতে না পারিলেও মণীন্দ্রচন্দ্রের মনে ভীতির সঞ্চার করিবার জন্যই যে এই প্রকার ঘটনার সৃষ্টি করা হইয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত।

মণীন্দ্রচন্দ্র মাতুলানীর দুর্ব্যবহারে এবং এইসব পূর্ব্বসংকল্পিত ভীতি-প্রদর্শন চেষ্টায় কিন্তু কিছুমাত্র দমিলেন না। তিনি পরদিন প্রত্যুষেই যাচিয়া মাতুলানীকে নিজের কুশল-জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার কুশল সংবাদ প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র দিলেন,—তাহার কোনও উত্তর আসিল না।

বহরমপুরে উপস্থিত হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র একথা জানিতে ও বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পক্ষে কাশিমবাজার রাজবাড়ীর দেউড়ী বন্ধ— প্রবেশ নিষেধ।

বহরমপুর আসিবার পর দিনই প্রাতঃকালে জমিদার রাধিকাচরণ সেন সপার্ষদ মণীন্দ্রচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, মণীন্দ্রচন্দ্র ইহাতে অনেকটা বল পাইলেন,—সারা দিনমান বহরমপুরবাসিগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া উৎসাহ ও আনন্দে কাটিয়া গেল। নিতান্ত অপরিচিত স্থানে আসিয়া তিনি যে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন—তাহা ক্রমশঃ কাটিয়া যাইতে লাগিল।

ডাঃ রামদাস সেনের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের পূর্ব্বের পরিচয় ছিল;—তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন—কালকাতার বাড়ীতে তাঁহার সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। ক্রমশঃ স্থানীয় জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। বহরমপুর ও নিকটবর্ত্তী স্থানের ধনী ও

ভদ্র সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে মাতুলানীর দিক হইতেও সহানুভূতির লক্ষণ কিছু প্রকাশ পাইল,—সান্ধ্য বায়ু সেবনের জন্য একখানি গাড়ী মঞ্জুর হইল ;—মণীন্দ্রচন্দ্র প্রতিদিন বায়ু সেবনে বাহির হইয়া বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা শুনা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাধিকাচরণ সেন মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা বিষ্ণুচরণ সেনের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ হয়। বিষ্ণুবাবুকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য মহারাণী বিনা সুদে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই তারিখে ২২০০০৲ বাইশ হাজার টাকা ধার দেন। বিষ্ণুবাবু কিন্তু একদিনের জন্যও মণীন্দ্রচন্দ্রের কোনরূপ বিপক্ষতা করেন নাই। বিষ্ণুবাবুর সাহায্যের কথা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই ; প্রত্যুপকারের অবকাশে নানাভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া তিনি উপকারী বন্ধুর সে সাহায্যের মর্য্যাদা রাখিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণু বাবুর বাগান-বাড়ীতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিরাট তাসের আড্ডা বসিত। মণীন্দ্রচন্দ্র সেখানে নিয়মিত যাইতেন—তাসখেলা মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিল।

ইতিমধ্যে একদিন সৈদাবাদ হইতে বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় আসিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের সহিত ভাল করিয়া আলাপ পরিচয় করিয়া গেলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের বহরমপুর আসার কারণ জানিয়া বৈকুণ্ঠ বাবু বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বেশ সাবধানে থাকিতে বলিলেন। ক্রমশঃ বহরমপুরের প্রধান প্রধান উকিলগণের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় হইল, তিনি তাঁহাদের নিকট আপনার অবস্থা বিবৃত করিলেন এবং সময়োচিত উপদেশ চাহিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিলেন।

এই সময় নৃত্যগোপাল সরকারের * সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে, তাঁহার দ্বারা ভাগিনেয়গণকে স্থানীয় হিন্দু স্কুল ও কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তী করিয়া দেওয়া হইল।

---

* পরে ইনি মহারাজের Personal Secretary বা খাসদপ্তরের সম্পাদক হন।

যৌবনে মণীন্দ্রবাবু

বিশিষ্ট ভদ্রতা, অমায়িকতা ও বন্ধুপ্রীতির জন্য মণীন্দ্রচন্দ্রের খ্যাতি বহরমপুর সহরে ক্রমশঃ যখন বৃদ্ধি পাইল, তখন নিমন্ত্রণের আদান প্রদানও বেশ চলিতে লাগিল।

বিষ্ণুবাবুর বৈঠকখানা বা বাগানবাড়ীতে বহুলোকের সমাগম হইত; এক একদিন ধর্ম্ম, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চলিত। এইখানেই ডাঃ রামদাস সেনের জামাতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় ও বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের গণিতাধ্যাপক মোহিনীমোহন রায়ের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় হয়। এই দুইজনকে লইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র আপনার বাড়ীতে প্রায়ই দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই প্রকার সাংসারিক অবস্থার মধ্যেও শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার কল্পে কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার চিন্তা ও আলোচনা তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল।

সন ১৩০১ সালের প্রথম ভাগে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাণী স্বর্ণময়ীর অধিকতর বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন। সাময়িক সাহায্য বন্ধ হইল—তাঁহার ভগ্নীর চিকিৎসা সিভিল সার্জ্জন করিতেছিলেন, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। বৈকালে বেড়াইবার গাড়ী আর আসে না, সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম দেখিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র আরও নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অপরাধ, তিনি বৈকুণ্ঠ বাবুর পক্ষাবলম্বী কয়েকটি বন্ধু এবং বৈকুণ্ঠ বাবুর ভ্রাতা হেমবাবুর সহিত কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর 'ভাউলে' করিয়া মহরম দেখিতে মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবু তখন মহারাণীর শত্রুমধ্যে গণ্য, শ্রীনাথ বাবুর সহিত বৈকুণ্ঠ বাবুর গোপন মনোমালিন্য চলিতেছে,—সেই বৈকুণ্ঠ বাবুর দলের সহিত প্রকাশ্যভাবে মেলামেশা করা মহারাণী সন্দেহের চক্ষে দেখিলেন। অথচ বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত রাজবাড়ীর প্রকাশ্যভাবে কোনও

বিবাদ দেখা যাইত না। রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ অথবা ওকালতনামার বাঁধা বেতন (Retainer) বন্ধ হয় নাই। এ অবস্থায় বন্ধুভাবে বৈকুণ্ঠ বাবুর সহিত মিশিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র এমন কি অপরাধ করিলেন তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক মণীন্দ্রচন্দ্র একথা জানিতে পারিয়া মহারাণীর মনস্তুষ্টির জন্য চেষ্টার কোনও ক্রটি করিলেন না। তিনি মাতুলানীকে লিখিলেন—

"লোকপরম্পরায় শ্রুত হইলাম যে, গত মহরমের সময় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠবাবুর ভ্রাতা হেমবাবুর সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদে মহরমাদি দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া আমার প্রতি আপনার যে শেষ দয়া ও অনুগ্রহ ছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

আমি শুনিলাম বৈকুণ্ঠবাবু আপনার চিরহিতৈষী এবং পরম শুভানুধ্যায়ী। তিনি আপনাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং তাহার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাই আপনার সংসারে আপনার বর্ত্তমান প্রধান কর্ম্মচারী-দ্বারা যথেচ্ছ অর্থলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহার সহিত মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। তাঁহার সহিত আপনার ব্যবহার দেখিতে পাই যে, সামাজিক নিমন্ত্রণ চলিতেছে, ওকালতনামা রক্ষণ জন্য ফি দিতেছেন। বৈকুণ্ঠবাবু আমার মহানিষ্টসাধনে আপনার পরামর্শদাতা হইলেও বাল্যকালাবধি তাঁহার সহিত এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত আমার আলাপাদি আছে। আমি আমার হিতাহিতকারী প্রত্যেক লোকের সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাকি। * * এই কারণে বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত আমার ব্যবহার সেইরূপ বর্ত্তমান আছে * * * * আমি আপনার মনোভাব না জানিয়া এইরূপ আলাপাদি করিয়াছি ও করিতেছি। * * ইহাতে আমার যাহা অপরাধ তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। স্বার্থপর লোকেরা আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট নানা কথা লাগাইতে লাগিল। * * আমাকে একবার চক্ষে দেখিলেন না, আমার দুঃখের কথা ভাবিলেন না, আমি কি কষ্টে দিন যাপন করি তাহাও শুনিলেন না, কেবল আমি আপনার বিরুদ্ধাচারী তাহাই শুনিলেন। একবারও ভাবিলেন না যে, আমি আপনার বিরুদ্ধাচারী কখনই হইতে পারি না। দয়াময়ি! কালচক্রে সকলই পরিবর্ত্তিত হয়, আমি এক্ষণে আপনার পর হইয়াছি, আপনার চির-অহিতাকাঙ্ক্ষীরা আপনার পরম সুহৃদ্ হইয়াছে। * * * আমি কখনই আপনার অপকার বা অসম্মান করিতে পারি না, এ চিন্তাও আমার

মনে স্থান পাইতে পারে না। অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কখন কোন অপরাধ করি তাহাও বলিয়া দিবেন এবং ক্ষমা করিবেন।"

কিন্তু অপরাধের ক্ষমা হইল না। এই বৎসরেই অর্থাৎ সন ১৩০১ সালে রাজবাড়ীর ঝুলনযাত্রায় ভাগিনেয় মণীন্দ্রচন্দ্রের "অন্তরঙ্গ" নিমন্ত্রণ হইল না; সাধারণ নিমন্ত্রণ হইল। আত্মীয় কুটুম্বগণের যে নিমন্ত্রণ তাহাকেই "অন্তরঙ্গ" নিমন্ত্রণ বলা হইত;—নিমন্ত্রিতের জন্য রাজবাড়ী হইতে গাড়ীর ব্যবস্থা হইত। অপমান করিয়া সমঝাইয়া দিবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শিত হইল। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া তিনি রাজবাড়ী উপস্থিত হইলেন। সাধারণ নিমন্ত্রণ হইলেও তাহা রক্ষা করা সামাজিক কর্ত্তব্য—তাহা পালন করা মণীন্দ্রচন্দ্র অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—চোখে জল আসিল—মণীন্দ্রচন্দ্র সকলের অজ্ঞাতে বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন সময় তদানীন্তন এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল; কিন্তু তিনি তাঁহার অনুরোধ কোনও প্রকারে এড়াইয়া ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুরোধ না রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছেন এই অনুশোচনায় মণীন্দ্রচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না—পর দিনই (৩১শে শ্রাবণ ১৩৩১) মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে ত্রুটি স্বীকার করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন—

"গতরাত্রে রাজবাড়ী হইতে প্রত্যাগমনকালীন আপনি আমাকে জলযোগের জন্য বলেন, কিন্তু তৎকালে আমার মানসিক ক্লেশ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় মজলিসে অধিকক্ষণ থাকিতে পারি নাই এবং খাইতেও ইচ্ছা হয় নাই। যে মামার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইলে একমাত্র ভাগিনেয় সন্তানহীনা মাতুলানীর স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করিয়া নানা প্রকার উৎসব ও আমোদ করিয়া আত্মহারা হইয়া থাকিবে, আজ সেই মামার বাড়ীতে, মাতুলানীর স্নেহে ও ভালবাসাতে বঞ্চিত হইয়া দীন সাধারণের ন্যায় নিমন্ত্রিত হইয়া, মাতুলানীর প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গের সদ্‌গুণের

এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদরে আদৃত ও অভ্যর্থিত হইলে কি মনে সুখ হয়? আপনি বুদ্ধিমান, আপনাকে অধিক আর কি লিখিব। জলযোগ না করার জন্য আপনি কোনওরূপ কিছু মনে করিবেন না এবং পূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতুলানী ঠাকুরাণী মহাশয়া তজ্জন্য যাহাতে কোনও অপরাধ না লয়েন তাহার উপায় করিবেন। * * * যদি কখনও গুরুজন এবং আত্মীয়ের স্নেহ ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, তবে আমার হৃদয়ের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। অনুমানে ঠিক বুঝা যায় না।"

গতরাত্রির অসম্মান ও অবহেলার জন্য যিনি মূলতঃ দায়ী—সেই মাতুলানীর কাছে পরদিনই নিজের লৌকিক ব্যবহারের সামান্য মাত্র ত্রুটির জন্য যিনি এই প্রকার বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারেন তাঁহার চরিত্র অসাধারণ ধাতু দ্বারা গঠিত।

কিন্তু সততই মনে হয়, ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে জল আসে, এক অভাবিত বেদনায় সারা প্রাণ আকুল হইয়া উঠে,—মনে এই প্রশ্নই কেবল জাগে—হায়! রমণীসুলভ সে কোমলতা কোথায়? শাস্ত্রে, পুরাণে, ইতিহাসে, নাটকে, উপন্যাসে ও কাব্যে দেখি, নারী চরিত্রের প্রধানতম গুণ কোমলতা, কারুণ্য—পরদুঃখকাতরতা;—মণীন্দ্রচন্দ্রের দুর্ভাগ্যে কি তাহা নারী-হৃদয় হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল? যে অপরাধে তৃণকোমল, করুণাকাতর নারীর হৃদয় কুলিশকঠিন রূঢ়তায় পর্য্যবসিত হয়, সে অপরাধ করা যে অন্ততঃ মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাহা তাঁহার পত্রাবলী ও উত্তর জীবনের বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন কর্ম্মধারা হইতে অতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

মহারাণীকে করুণাগুণে বিভূষিত ভাবিতে গেলে তাঁহার অমাত্যবর্গকে অতি ভীষণভাবে চিত্রিত করিতে হয়—এই ভাবিয়া যে, তিনি নিজে এত কঠোর ছিলেন না—অন্তঃপুরে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, হয়ত বা মণীন্দ্রচন্দ্রের কোনও পত্রাদি—কোনও প্রার্থনাই তাঁহার নিকট একেবারেই পৌঁছায় নাই। মাঝে মাঝে যেটুকু ভাল ব্যবহার মণীন্দ্রচন্দ্র
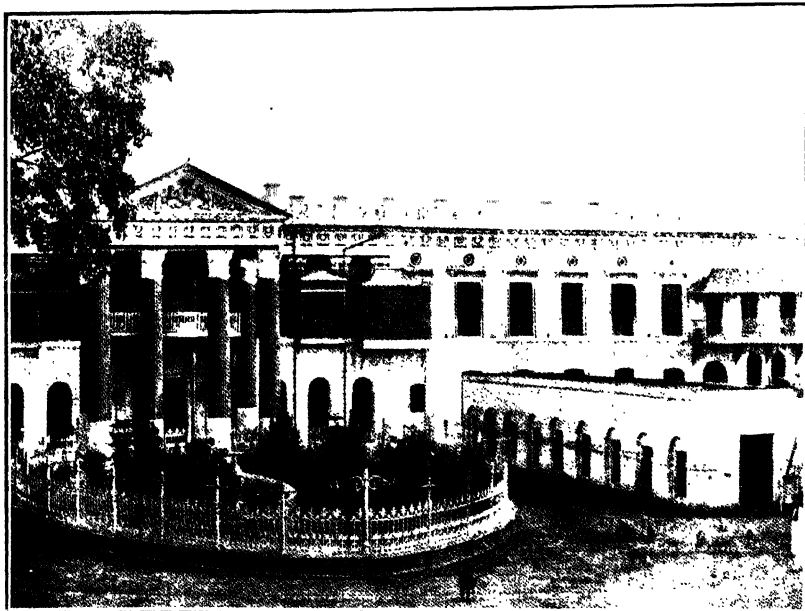
কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদ
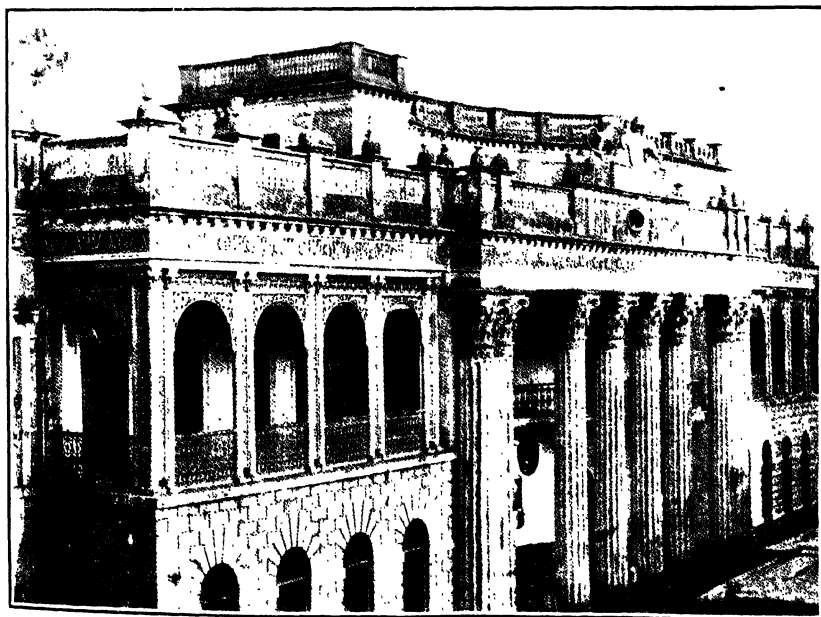
সৈদাবাদ রাজবাটী

রাজবাড়ী হইতে পাইয়াছিলেন তাহা কখনও ভয়ে, কখনও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, কখনও বা করুণামিশ্রিত উপকার-বৃত্তির চর্চ্চা করিয়া, কখনও বা মণীন্দ্রচন্দ্রের ভদ্র, সজ্জন ও অমায়িক ব্যবহারে বাধ্য হইয়া, আপন আপন ইচ্ছা অনুসারে অমাত্যরাই যে করিয়াছিলেন এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নহে।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর ব্যবহার ও কার্য্য-কারণের সহিত তাঁহার জনশ্রুত চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে সহজেই মনে হয় যে, একাধিক ব্যক্তিবিশেষের ইন্ধন-সংযোগে মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অন্তরের বিরাগ-বহ্নি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত ছিল। প্রাণপণ চেষ্টা, সকাতর প্রার্থনা, বিনীত নিবেদন, সকলই ব্যর্থ হইল, মাতুলানীর বিরূপ মনকে মণীন্দ্রচন্দ্র কিছুতেই ফিরাইতে পারিলেন না। এই দুঃখই ছিল—মণীন্দ্রচন্দ্রের সেই বহরমপুর-জীবনের চরম দুঃখ।

সন ১৩০২ সাল, শ্রাবণ মাসের কথা। ধর্ম্মদাস দের (মণীন্দ্রচন্দ্রের বড় জামাতা) বয়স তখন খুবই অল্প; তাঁহার পরিবারবর্গের সকলের অনুমতি লইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া উপযুক্ত সময়ে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনীর সহিত বিবাহ দিবার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মদাসের মাতামহ গিরিশচন্দ্র তখন মহারাণী স্বর্ণময়ীর সজীবাগানের নায়েব। হঠাৎ কোনও এক নিগূঢ় কারণে দৌহিত্র-দর্শন বাসনা তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি পুনঃ পুনঃ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইতে লাগিলেন। ৩রা শ্রাবণ শুক্রবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় একখানি ভাড়া-গাড়ী করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র ও তাঁহার ভাগিনেয় রাজেন্দ্রচন্দ্র ধর্ম্মদাসকে সঙ্গে লইয়া কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে রওনা হইলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া জামাইবাবুর বাড়ীতে গেলেন, রাজেন্দ্রচন্দ্র ধর্ম্মদাসকে লইয়া সজীবাগানে গিরিশ বাবুর নিকট

উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর "ধর্ম্মদাস আমার নিকটই থাকুক"—এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু রাজেন্দ্রচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলেন যে, গিরিশবাবু ধর্ম্মদাসকে তাঁহার নিকট আর না পাঠাইবারই মতলব করিয়াছেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যকরী না হয়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলিতে লাগিল। মহারাণী স্বর্ণময়ী গিরিশবাবুকে সতর্ক করিয়া কহিলেন—"তোমার দৌহিত্রের সহিত মণির কন্যার বিবাহ হইলে তোমার রাজবাড়ীতে চাকুরী থাকিবে না এই কথাটি মনে রাখিও।" শুনিতে পাওয়া যায় গিরিশবাবু প্রথমটা নাকি এ প্রস্তাবে রাজী হন নাই —কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, বিশেষ অনুনয় বিনয়েও তিনি ধর্ম্মদাসকে ছাড়িলেন না। বলিলেন, ধর্ম্মদাসের বাড়ী ইটেতে পত্র লিখিয়াছেন। এদিকে—ধর্ম্মদাসের পিতামহ অক্ষয়চন্দ্র দে মহাশয় মণীন্দ্রচন্দ্রের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে গিরিশবাবু বলিলেন—"ধর্ম্মদাস অন্দরে আছে, আমি দেখিতেছি।" অন্দর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"সে আমার দৌহিত্র, আমার কাছেই থাকিবে।"

ধর্ম্মদাস রাজবাড়ীতে থাকিয়া গেলেন। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র যখন প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন তখন ধর্ম্মদাসের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে এই কথা বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন। 'আগামী বুধবারে ধর্ম্মদাসকে পাঠাইয়া দিব',—গিরিশবাবু মণীন্দ্রচন্দ্রকে এই স্তোকবাক্য দিলেন। বুধবারে মণীন্দ্রচন্দ্র লোক পাঠাইয়াও যখন ধর্ম্মদাসকে আনিতে পারিলেন না, তখন সমস্ত ব্যাপারটি আনুপূর্ব্বিক রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পালকে জানাইয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন—"এসব পারিবারিক ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।" এই ভাবে মণীন্দ্রচন্দ্র নানা বিপদ ও বিড়ম্বনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মিঃ ই, ডিঃ, ওয়েষ্টমেকট সাহেব তখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার। তিনি বহরমপুরে 'টুরে' আসিলে মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অবস্থার কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। ওয়েষ্টমেকট সাহেব বিশেষ সহানুভূতি দেখাইলেন এবং মহারাণীর নিকট সব কথা বলিয়া ইহার একটা সুব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মহারাণীর সহিত কথাবার্ত্তা হইবার পর কমিশনার সাহেব মণীন্দ্রচন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিলেন—"মহারাণীর ধারণা—আপনি তাঁহার দেখা পাইলেই তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবেন। এই কারণে তিনি আপনার সহিত দেখা করিবেন না এবং আপনি এ স্থান পরিত্যাগ না করিলে তিনি আপনার উপর প্রসন্ন হইবেন না।"

"অবিলম্বে বহরমপুর ত্যাগ করিতে হইবে, মহারাণীর ইচ্ছা না হইলে এবং সম্মতি না থাকিলে আপনি কাশিমবাজার বা বহরমপুরে ফিরিতে পারিবেন না। বৈকুণ্ঠ বাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ এবং মহারাণীর বিপক্ষদলের সহিত বন্ধুত্ব রাখা বা মিলামিশা করিতে পারিবেন না। এই দুই সর্ত্তে রাজী হইয়া, কলিকাতায় বাস করিলে আপনি ৫০০৲ টাকা মাসহারা পাইবেন। অতএব আমার উপদেশ, আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।"

ঋণের জ্বালা এবং সাংসারিক অনটনে তখন মণীন্দ্রচন্দ্র বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ঋণ হইতে মুক্তি পাইবার বন্দোবস্ত হইলে তিনি বহরমপুর ত্যাগ করিতে পারেন—শুধু মাসহারার আশায় তিনি বহরমপুর ত্যাগ করিয়া গেলে উত্তমর্ণগণ মনে করিবেন, তিনি বোধ হয় ঋণভার এড়াইবার জন্যই পলাতক হইলেন ;—এরূপ অসাধু ব্যবহার তিনি করিতে পারিবেন না, এই কথা তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন। চেম্বার অফ্ কমার্সের সভ্য মিঃ ক্লার্কের তখন বঙ্গদেশে

বিশেষ প্রতিপত্তি এবং তাঁহার সহিত কাশিমবাজার এষ্টেটেরও বিশেষ জানাশুনা ছিল। তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিবার জন্য মহারাণী পত্রযোগে জানাইলেন যে মণীন্দ্রচন্দ্র বহরমপুর ত্যাগ করিয়া গেলে তিনি ঋণ-পরিশোধেরও ব্যবস্থা করিবেন। একথা মণীন্দ্রচন্দ্রকে জানান হইলে—মণীন্দ্রচন্দ্র নিম্নলিখিত হিসাবটি প্রস্তুত করিয়া সন ১৩০২ সালের কার্ত্তিক মাসে ক্লার্ক সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্রের ঋণ নিম্নলিখিত ভাবে বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে—

১২৯১	...	৩০০৲
১২৯২	...	৫৫০৲
১২৯৩	...	১৬০॥০
১২৯৪	...	৩৫০৲
১২৯৫	...	৩০০৲
১২৯৬	...	২০০৲
১২৯৭	...	২০০৲
১২৯৮	...	৪০০০৲
১২৯৯	...	১৫৫০৲
১৩০০	...	২০০০৲
১৩০১	...	১৮০০৲
১৩০২	...	১০০০৲
আশ্বিন পর্য্যন্ত বাজার দেনা—		১০০০৲
		১৩,৪১০॥০

মণীন্দ্রচন্দ্রের পরিবারে অবশ্য-প্রতিপাল্যের সংখ্যা তখন ৩০ জনের কম নহে। তাহার উপর অতিথি অভ্যাগত আছে, ভাগিনেয় ও পুত্রগণের শিক্ষাদানের ব্যয় আছে;—কিছুতেই সঙ্কুলান হয় না—সে কারণ, মাসের পর মাস শুধু ঋণভার বৃদ্ধি পাইতেছিল।

ক্লার্ক সাহেবের নিকট হইতে উত্তর পাইতে দেরী হইতে লাগিল। এই সময় একদিন বহরমপুর রেস্ কোর্সে (ষ্টেশনের নিকট ঘোড়-

দৌড়ের মাঠ) শ্রীনাথের সঙ্গে মণীন্দ্রচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। মাতুলানী তাঁহার ঋণমুক্তির কি ব্যবস্থা করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে—শ্রীনাথ রুক্ষভাবেই উত্তর দিলেন—"মহারাণী আপনাকে ত কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই—বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এই মাত্র বলিয়াছেন।"

কয়েকদিন পরেই শ্রীনাথ মণীন্দ্রচন্দ্রকে পত্রযোগে জানাইলেন—"ক্লার্ক সাহেবের পত্রে মহারাণী অবগত হইয়াছেন যে, আপনি বহরমপুর ত্যাগ করিবার সর্ত্তে মাসহারা লইতে স্বীকৃত আছেন। আপনি যে দিন হইতে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিবার ব্যবস্থা করিবেন, সেইদিন হইতেই আপনি আপনার মাসহারা পাইবেন—মহারাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে একথা আপনাকে জানান হইল।"

—কোন পথ অবলম্বন করিবেন তাহা ঠিক করা মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে কঠিন বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া একখানি চেয়ারে চিন্তাকুল হৃদয়ে বসিয়া থাকার পর মণীন্দ্রচন্দ্রের চোখের সম্মুখে তাঁহার সেই চিরপরিচিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেয়ালের গায়ে ভাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকার পরে কে যেন তাঁহাকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"এ প্রস্তাবে তুমি রাজী হও।"

দুই একদিনের মধ্যে বহরমপুর ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। মাতুলানীর নিকট এই দুইটী দিনের সময় প্রার্থনা করাতে তিনিও তাহাতে রাজী হইলেন। যথাসময়ে পুনরায় সপরিবারে মণীন্দ্রচন্দ্র কলিকাতার ২০নং রামচন্দ্র বসু ষ্ট্রীটস্থ পৈতৃক বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। মাতুলানীর চক্ষুঃশূল বিদায় হইল।

দুর্ভাগ্যের মধ্যে সান্ত্বনার কথা এই ছিল যে, মণীন্দ্রচন্দ্রের এই নিষ্ঠুর পরীক্ষার দিনে স্বার্থলেশহীন বহু বন্ধু তাঁহাকে ঘিরিয়া ছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বরাত্রে বন্ধুগণ তাঁহাকে যে বিদায়-ভোজ দিয়াছিলেন—তাহাতে এমন কোনও ব্যক্তি ছিল না যে মণীন্দ্রচন্দ্রের বিরহ-চিন্তায় শোকাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে নাই

কিছু দিন পূর্ব্বে আর একটী প্রস্তাবও অসিয়াছিল যে, মণীন্দ্রচন্দ্র যদি চিরদিনের মত বহরমপুর ত্যাগ করিয়া যান তাহা হইলে, বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা আয়ের একটা সম্পত্তি মহারাণী তাঁহার নামে লেখাপড়া করিয়া দিবেন; আরও চারি লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি মাতুলানীর মৃত্যুর পর মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রাপ্য হইবে। এই ব্যবস্থাতে মণীন্দ্রচন্দ্র রাজী হইলে সমগ্র সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইত এবং এই অংশ তিনি ভগ্নীপুত্র শ্রীনাথবাবুকে দিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র বিষম চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন—এই অভাবের মধ্যে দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তির প্রলোভন কম নহে,—আর একটা আশার কথা এই যে, মাতুলানীর পূর্ব্বে তাঁহার জীবন শেষ হইলে এই দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হইবে তাঁহারই পুত্রগণ। কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতের বৃহত্তর আশা চিরতরে নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা! কিন্তু অন্যদিক ভাবিতে গেলেও মাথা ঘুরিয়া যায়—এই প্রস্তাবে মত না দিলে মহারাণী বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হইয়া অবিলম্বে দত্তক গ্রহণ করিবেন; একবার কোনও প্রকারে দত্তক গ্রহণ করিয়া ফেলিলে তাহা নাকচ করা কঠিন হইবে এবং নাচক করিবার জন্য যে প্রভূত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, তাহাই বা মণীন্দ্রচন্দ্র পাইবেন কোথায়?

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক রাজা কৃষ্ণনাথের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টার কথা মণীন্দ্রচন্দ্রের মনে পড়িল। কি অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও দুর্ভোগ সহ্য করিয়াই না মহারাণীকে সম্পত্তি ফিরাইয়া লইতে হইয়াছিল!—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবার বিনিময়ে মহারাণীর সমস্ত সম্পত্তির উপর প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ছয় আনা অংশের দাবীর কথাও ভুলিবার নয়। মহাপ্রাণ হরচন্দ্র লাহিড়ীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাহায্য না পাইলে, খুব সম্ভব উক্ত ঠাকুর

মহাশয়কে অন্ততঃ সম্পত্তির চারি আনা অংশও দিতে হইত। বর্ত্তমান প্রাপ্তির সম্ভাবনার অনুকূলে নানাপ্রকার যুক্তি থাকিলেও, বৃহত্তর ভবিষ্যতের আশায় মণীন্দ্রচন্দ্র এ প্রস্তাবে রাজী হন নাই।

এইভাবে বিভিন্ন সময়ে মণীন্দ্রচন্দ্রকে "সম্মুখছাড়া" করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। মণীন্দ্রচন্দ্র উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না বলিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের সহিত মাতুলানীর ব্যবহার তিক্ত হইতে তিক্ততর হইতে লাগিল। মণীন্দ্রচন্দ্র সহিষ্ণু—ভবিষ্যতের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনিই কাশিমবাজার রাজতক্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

যাহাহউক প্রথমোক্ত প্রস্তাবে রাজী হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আর্থিক অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হইবার আশা হইল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ওয়েষ্টমেকট ও মহারাণী স্বর্ণময়ীকে তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কথা জানান হইল। একথাও জানান হইল যে কলিকাতার খরচপত্র বেশী—বর্ত্তমান আয়ে মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ একান্ত অসম্ভব। ওয়েষ্টমেকট মণীন্দ্রচন্দ্রকে জানাইলেন যে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মাসহারা ছাড়া আরো ৫০০৲ টাকা তিনি পাইবেন ;—একখানি গাড়ী, একজোড়া ঘোড়া তাঁহাকে দেওয়া হইবে এবং এযাবৎকাল তাঁহার যত দেনা হইয়াছে তাহাও মহারাণী সব পরিশোধ করিয়া দিবেন। কিছু দিন পরে মাতুলানীর পত্রেও এই আদেশের কথা মণীন্দ্রচন্দ্র জানিতে পারিলেন। অনতিবিলম্বে একদিন প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকা ও পূর্ব্বপ্রদত্ত দেনার হিসাব অনুসারে বাজার-দেনা পরিশোধার্থ সমস্ত টাকা মহারাণীর নিকট হইতে মণীন্দ্রচন্দ্র পাইলেন। একখানি পাল্কী গাড়ী, একজোড়া ঘোড়া কেনা হইল। বাড়ীতেই আস্তাবল ছিল, গাড়ী রাখিবার কোন অসুবিধা হইল না।

বাজার-দেনা পরিশোধ করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র বিশেষ স্বস্তি অনুভব করিলেন। অর্থাভাবও অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল বটে কিন্তু মাঝে মাঝে— মণীন্দ্রচন্দ্র যে সর্ত্তবদ্ধ হইয়া এইরূপ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া বিমর্ষ হইয়া পড়িতেন। দেখা হইলেই মণীন্দ্রচন্দ্র মাতুলানীকে হত্যা করিবেন—মাতুলানীর এই ঘৃণিত আশঙ্কার কথা চিন্তা করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকিতেন। তবু মণীন্দ্রচন্দ্রের বহু প্রার্থনার মধ্যে ইহাই দয়াময়ী মাতুলানীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য বদান্যতা।
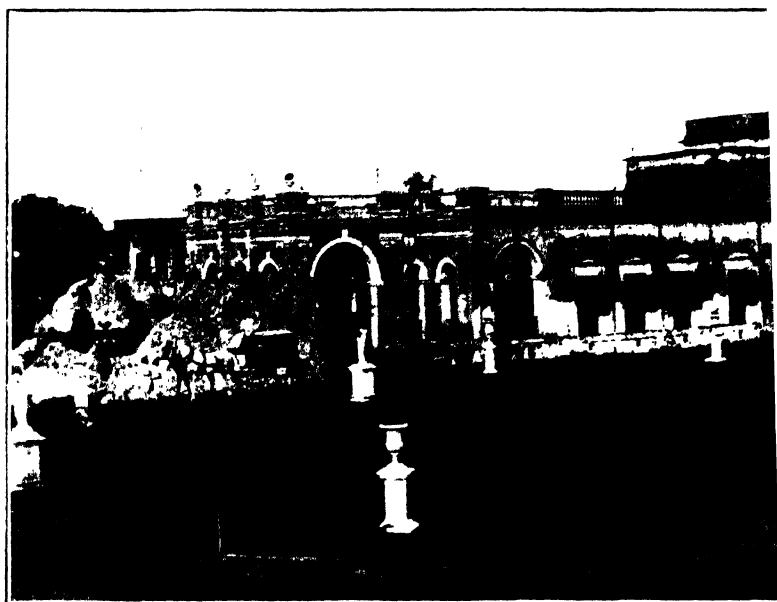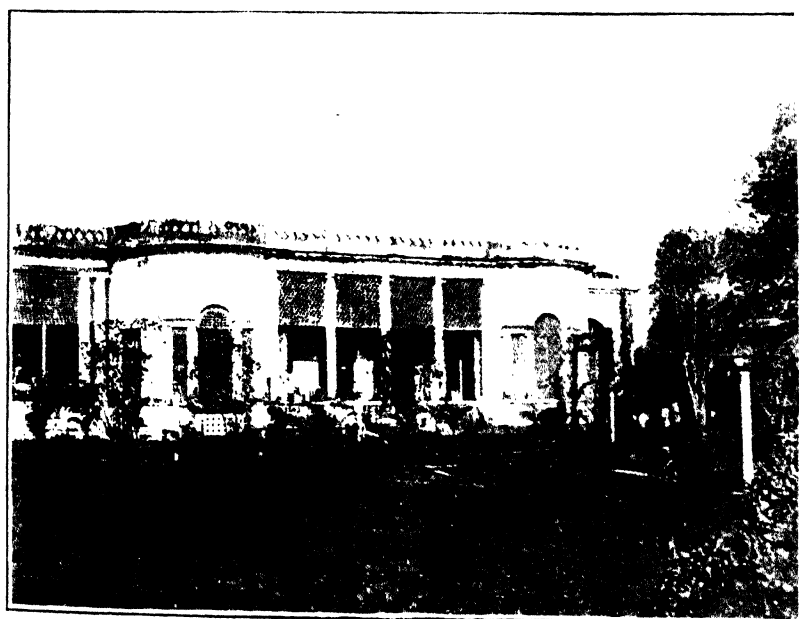
অদৃষ্টের আহ্বান

সন ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে মহারাণী স্বর্ণময়ী বিশেষ ভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন ;—এই খবরটি বিষ্ণুচরণ সেন, রামদাস মজুমদার এবং কাশিমবাজারের তদানীন্তন পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে কলিকাতার বাড়ীতে মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট পৌঁছিল। দুই এক দিনের মধ্যেই আবার খবর আসিল মহারাণীর জীবনের কোনও আশা নাই। এ সংবাদ কতদূর সত্য তাহা জানিবার জন্য চারুবাবুকে কাশিমবাজার পাঠান হইল—তিনি ফিরিবার পূর্ব্বেই বহরমপুর হইতে বিষ্ণু বাবুর টেলিগ্রাম আসিল—"১০ই ভাদ্র বুধবার বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় মহারাণীর মৃত্যু হইয়াছে।"

মহারাণীর মৃত্যুসংবাদে মণীন্দ্রচন্দ্র কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার 'চিরসুহৃদ্' (১) সারদাচরণ মিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। সারদাবাবু কমিশনার ওয়েষ্টমেকট সাহেবের সহিত দেখা করিয়া সব কথা জানাইবার জন্য বলিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র 'সোদরোপম বাল্যবন্ধু' (২) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু এবং ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ওয়েষ্টমেকট সাহেবকেই মুরুব্বি ধরিতে হইবে।

ওয়েষ্টমেকটের সহিত দেখা করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র বলিলেন—

"স্বর্গীয়া মহারাণীর শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী এখনও জীবিত, সুতরাং এখন সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাতেই বর্ত্তাইবে।"—

ওয়েষ্টমেকট ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তর করিলেন,—

"আমার ছেলে ব্যারিষ্টার, আপনি তাহার সহিত দেখা করিয়া আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।" পরক্ষণেই আবার নিজেই বলিলেন

(১) (২) মণীন্দ্রচন্দ্র পত্রাদিতে এই দুই জনকে এইভাবেই সম্বোধন করিয়াছেন।

"না, চলুন, আমি নিজেই আপনাকে আমার ছেলের কাছে লইয়া যাইতেছি।"

—মণীন্দ্রচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কমিশনার সাহেব তাঁহার পুত্রের অফিসে আসিয়া নিজেই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। তথায় ব্যারিষ্টার ওয়েষ্টমেকটের অংশীদার মিঃ শ্লিটনের সহিতও মণীন্দ্রচন্দ্রের কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহারা উভয়েই একবাক্যে বলিলেন—"Start for Berhampur immediately"—অবিলম্বে বহরমপুর যাত্রা কর।

মণীন্দ্রচন্দ্র ভাবিলেন হয়ত ইহাতে মাতামহীর আপত্তি হইবে। মণীন্দ্রচন্দ্র, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র দিবার জন্য ওয়েষ্টমেকট সাহেবকে অনুরোধ করিলেন;—তিনি সর্ব্ববিষয়ে মণীন্দ্রচন্দ্রকে সাহায্য করিবার জন্য জেলার ঐ দুই জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে পত্র দিলেন। কর্ম্মচারী চারুবাবু, একজন চাকর ও একজন দ্বারবান সঙ্গে লইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র বহরমপুর অভিমুখে সেই দিনই যাত্রা করিলেন এবং বিষ্ণুবাবুর বাড়ীতে যাইয়া অতিথি হইবেন এই মর্ম্মে তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর তিন দিন পরে আজিমগঞ্জ হইতে এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে মণীন্দ্রচন্দ্র বিষ্ণুবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পরম যত্নে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা হইল। মণীন্দ্রচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিয়া পূর্ব্বপরিচিত বহু ভদ্রলোক বিষ্ণুবাবুর বাড়ী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কমিশনারের পত্র লইয়া সর্ব্বপ্রথম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ লেভিংজের (Mr. Levinge) সহিত দেখা করা স্থির হইল। মিঃ লেভিংজের সহিত দেখা করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গেল। মণীন্দ্রচন্দ্র প্রথমেই কাশিমবাজার ও সৈদাবাদ রাজবাড়ী শিলমোহর করিয়া তালাবন্ধ (seal) করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে অনুরোধ করিলেন। মিঃ লেভিংজ

বলিলেন যে, মহারাণীর মৃত্যুর পর তিনি পুলিশ পাহারা বসাইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে আবার পুলিশ সাহেবকে একখানি পত্র দিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, ঐ সঙ্গে কমিশনার ওয়েষ্টমেকটের পত্রখানিও পাঠান হইল। মণীন্দ্রচন্দ্র অবিলম্বে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সঙ্গে লইয়া কাশিমবাজার রাজবাটীর দেউড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

প্রভাকর জমাদার এই প্রথম মণীন্দ্রচন্দ্রকে "সেলাম" করিল।

ভবিতব্যের কঠিন অনুশাসন !

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব প্রভাকর জমাদারকে বলিলেন—"ম্যানেজার সাবকো সেলাম দেও।" ম্যানেজার রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেনের সহিত সদর দেউড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র "Direct" উত্তরাধিকারী নহেন,—শ্রীনাথ পাল মহাশয় এই আপত্তি উত্থাপন করিলে মণীন্দ্রচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি উত্তরাধিকারী একথা আপনাকে বলি নাই। এই বিপুল সম্পত্তি ও ধনাদি রক্ষার জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি।" এই কথাটি বলাতে রায় বাহাদুর চুপ করিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পালকে উদ্দেশ করিয়া একটু রুক্ষ ভাবেই বলিলেন—

"You must vacate the Rajbari immediately. We shall lock up every door and seal it. I am determined to place police guards all over the Palace."

—অর্থাৎ আপনারা অবিলম্বে রাজবাড়ী পরিত্যাগ করুন। আমরা স্থির করিয়াছি প্রত্যেক দুয়ারটি তালা বন্ধ করিয়া সিল মোহর করিব—রাজপ্রাসাদের সর্ব্বত্র পুলিশপাহারা বসাইব।

সেই অনুসারে কাজও হইল। রাজবাড়ীতে যতগুলি কাঠের ও লোহার সিন্ধুক ছিল সবগুলিতে নূতন তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া সিল মোহর করা হইল।

মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত রাজ-কাছারী ও সেখানকার নগদ টাকা ক্রোকবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে তার করা হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্র বিষ্ণু বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন; আহারাদি সারিয়া তিনি পুনরায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে, মহারাণী স্বর্ণময়ীর সৈদাবাদের বাড়ীতে এবং স্বর্গীয় দেওয়ান রায় রাজীব লোচন বাহাদুরের বাড়ীতে স্বর্গীয়া মহারাণীর নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং ঐ সম্পত্তি মহারাণীর স্ত্রীধন বলিয়া ঐ বাড়ী দুইটি ক্রোকবদ্ধ করার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি হইবে এবং একথাও জানাইলেন যে, মহারাণীর স্ত্রীধনের যে শ্রীনাথই একমাত্র উত্তরাধিকারী তাহা সাব্যস্ত করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উকিল চন্দ্র বাবু ও বিজয় বাবুকে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইবে। তাঁহার এই স্বত্ব ও স্বামিত্ব প্রমাণের চেষ্টার কথা মণীন্দ্রচন্দ্র কাহার নিকট হইতে শুনিলেন তাহা ম্যাজিষ্ট্রেট্ জানিতে চাহিলে মণীন্দ্রচন্দ্র বলিলেন—বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট হইতে তিনি এ সংবাদ পাইয়াছেন,—সত্য কিনা তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তৎক্ষণাৎ রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পালকে জানাইলেন যে, পরদিন প্রাতে তিনি সৈদাবাদ রাজবাড়ী ক্রোক দিতে যাইবেন। মণীন্দ্রচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। পরে জানিতে পারা গেল চন্দ্র বাবু ও বিজয় বাবু রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পালের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া বহু বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি রায় বাহাদুরের পক্ষ সমর্থন করিয়া ওকালতি করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটএর নিকট উপস্থিত হইলেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সৈদাবাদ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনাথ পাল মহাশয় "সৈদাবাদ বাড়ী স্ত্রীধন—এ বাড়ীতে আপনাদের প্রবেশাধিকার নাই" ইত্যাদি বহু কথা বলিয়া বাদানুবাদ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

If you do not allow me to enter the house to lock up and seal whatever valuables the Maharani had in this house, I am afraid, you will be prosecuted. You are to vacate the Palace within twenty four hours under orders of the Government.

অর্থাৎ স্বর্গীয়া মহারাণীর মূল্যবান্ অলঙ্কারপত্র ক্রোকবদ্ধ করিয়া শিল-মোহর করিতে আসিয়াছি—আমাকে বাধা দিলে আপনি ফৌজদারী সোপরদ্দ হইবেন। গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে আপনাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। *

শ্রীনাথ আর কোনও বাধা দিলেন না—সৈদাবাদ রাজবাড়ী ক্রোকবদ্ধ ও শিলমোহর করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব রাজীবলোচনের

মহারাণীর মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ পরে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

* "রাণী হরসুন্দরীর দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্র নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন; স্বার্থপর কুলোকের জন্য তিনি স্নেহময়ী মাতুলানীর স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে কলিকাতায় বিতাড়িত হ'ন। আমরা শুনিলাম, মৃত্যুর দুই একদিন পূর্ব্বে মহারাণী মহোদয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরিত হয় নাই। তাঁহার বহরমপুরস্থ বন্ধুগণের তার-সংবাদে তিনি বুধবার রাত্রিতে বহরমপুরে উপস্থিত হন। মহারাণী মহোদয়ার মৃত্যুর পর প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী রাণী হরসুন্দরী উপস্থিত না থাকায় কাশিমবাজার ও সৈদাবাদ রাজবাটীতে চাবী বন্ধ হইয়াছে। সৈদাবাদ রাজবাটী স্ত্রীধন বলিয়া কোন পক্ষ হইতে আপত্তি হওয়ায় কালেক্টর বাহাদুর তাহা 'পরে বিবেচিত হইবে' বলিয়া উত্তর প্রদান করেন। যাঁহারা সে বাটীতে ছিলেন, তাঁহাদিগকে সে বাটী এক্ষণে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন।" ১৭ই ভাদ্র ১৩০৪—মুর্শিদাবাদ হিতৈষী।

বাড়ী ক্রোক দিতে আসিলেন। শ্রীনাথ পাল মহাশয় মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানপত্র দেখাইয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করা বন্ধ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সে বাড়ীতে শুধু পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

সমস্ত সহরময় একটা বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের চেষ্টা এইরূপে বিফল হইল দেখিয়া সহরবাসী অনেকেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বাঙ্গলা দেশের ভাবী দাতাকর্ণের হাতে বিপুল ধনসম্পত্তি আসিলে তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার হইবে এ ধারণা কেমন করিয়া যেন সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।—সকলেই ভাবিল দেশব্যাপী একটা বিরাট মঙ্গলের সূচনা হইতেছে। ভাবী দিনের আশ-ভরসায় সমুজ্জ্বল দিনগুলির চিত্র যেন সকলের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

ভাগ্যচক্রের গতি তখন অদৃশ্য হস্তে দিক্‌পরিবর্ত্তন করিতেছে।

পরিবর্ত্তনের পথে

মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতামহী রাণী হরসুন্দরী তখন কাশীবাস করিতেছেন। মণীন্দ্রচন্দ্র সমস্ত কথা টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন ও অনতিবিলম্বে তিনি যাহাতে কাশীমবাজার আসিয়া উপস্থিত হন তাহার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু সে টেলিগ্রামের কোনও উত্তর না আসাতে মণীন্দ্রচন্দ্র নিজেই কাশী রওনা হইবেন স্থির করিলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র কাশীর পথে কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পৈতৃক গ্রামনিবাসী বামাপদ দত্ত উকিল তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মণীন্দ্রচন্দ্র সারদা বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ললিত বাবুকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন—বামাপদ বাবুও সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়—তাঁহাকেও সঙ্গে লওয়া হইল।

সেদিন যাত্রা শুভ ছিল না—কিন্তু কালবিলম্ব করিবার উপায় ছিল না, তাই মঘা নক্ষত্রেই রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় মণীন্দ্রচন্দ্র সবান্ধবে কাশী যাত্রা করিলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র কাশীতে আসিয়া সরাসরি মাতামহীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। মাতামহীর কর্ম্মচারী মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ও কন্যাগণ সেখানে ছিলেন। হরসুন্দরী তখন ইহাঁদেরই যত্নে ও সেবায় দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহাদের প্রতি রাণীর এতই টান ছিল যে, তাঁহার সারা জীবনের নগদ অর্থ যাহা কিছু সকলই তাঁহাদিগকে দান করিয়া গিয়াছিলেন ; তাহার বিশদ বিবরণ আমরা পরে পাইব।—যাইবামাত্র মণীন্দ্রচন্দ্রের আগমনসংবাদ রাণী হরসুন্দরীকে জানান হইল। তিনি কুশল প্রশ্নের পর—হাতমুখ ধুইয়া স্নানাদি করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন।

স্নানান্তে মণীন্দ্রচন্দ্র মাতামহীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন,—প্রথম শোকের উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে তিনি অনেক কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—। মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে কাশিমবাজার যাইয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন—"এই বৃদ্ধ বয়সে কাশী ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না।" মণীন্দ্রচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন —"তাহা হইলে বিষয়সম্পত্তি রক্ষা হইবে কিরূপে?" তিনি উত্তর করিলেন—"কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসে (Court of Wards) দেওয়া হউক।" মণীন্দ্রচন্দ্র এই সুযোগে প্রস্তাব করিলেন—"আমরা আজীবন কষ্ট পাইতেছি, আপনার একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি, আমাকে বিষয় রক্ষার ভার দিলে—আমি সে ভার বহন করিতে পারিব।—আপনি কাশিমবাজার চলুন,—আপনার সাধের লক্ষ্মীনারায়ণকে দর্শন করুন, সেবা করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।" হরসুন্দরী বলিলেন "তুমি আহারাদি কর—পরে আমি যথাকর্ত্তব্য স্থির করিব। আমি কলেক্টর সাহেবের তার পাইয়াছি।"

মাধব বাবুর পুত্রগণের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের যে সব কথা হইল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, যে ব্যবস্থাই হউক, বিষয় সম্পত্তির লাভের বখরাটা যেন তাঁহাদেরই ভাগে বেশী পড়ে।

দ্বিপ্রহরে মাতামহীর সহিত আবার কথাবার্ত্তা হইল।—তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রকে বলিলেন,—'মণি', সম্পত্তি তুমিই ভোগ কর,—আমাকে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা করিয়া মাসহারা দাও—আর নগদ ৯,০০,০০০৲ নয় লক্ষ টাকা আমাকে দাও, আমি আমার ইচ্ছামত দান করি।"

মণীন্দ্রচন্দ্র উত্তরে জানাইলেন—"আপনার এটর্ণিকে আপনি খবর দিন,—আমি আমার উকিলকে আনাইয়া লই, উভয় পক্ষ উপস্থিত থাকিয়া লেখাপড়া কিরূপ হইবে স্থির হউক।"

রাণী হরসুন্দরী সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।—তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠবাবু,

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস (ব্যাং ব.) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু (নগ [illegible]) ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হরেন্দ্রবাবু, (১) ভবানীবাবু (২) এবং ব্রজেন্দ্র বসুকে কাশীতে আসিবার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র টেলিগ্রাম করিলেন।

টেলিগ্রাম পাইবামাত্র তাঁহারা সকলে কাশীতে উপস্থিত হইলেন। মাতামহীকে বলিয়া তাঁহাদের জন্য একটী ভাড়াটিয়া বাড়ী স্থির করা হইল। অপর পক্ষের উকিলবাবুও আসিলেন।—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মিটমাট ও সরল অন্তঃকরণে লেখাপড়া করার প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াইলেন—মাতামহীর ভিক্ষাপুত্র ও দেওয়ানের পুত্রগণ। তাঁহারা মাঝ হইতে বহু গোলমাল উপস্থিত করিলেন;—তাঁহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে ও তাঁহাদিগকে আপোষের পথে আনিতে মণীন্দ্রচন্দ্র ও তাঁহার স্বপক্ষীয়দের দিবারাত্রের আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল।—যেদিক হইতে দুর্য্যোগের কোনও আশঙ্কাই ছিল না, হঠাৎ সেইদিক হইতেই ঘনঘটা করিয়া আসিল;—ঝড় উঠিল, ধূলি উড়িল—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইল—দু'এক পশলা বৃষ্টিও যে না পড়িল তাহা নহে;—আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান মানসিক অবস্থায় অত্যন্ত উদ্বেগ ও অশান্তিতে কয়দিন কাটিল—দুই পক্ষের উকিলকেও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লেখাপড়া করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। যে বৈকুণ্ঠ নাথ সেন উত্তরকালে বাঙ্গলাদেশের ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবহারাজীব হিসাবে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতিভার লক্ষণ এই দলিল লেখাপড়ার ব্যাপারে সেই সময় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মণীন্দ্রচন্দ্রের স্বার্থ-সংরক্ষণ উদ্দেশে তিনি এমন ভাবে কূট

---

(১) শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি-এল, মহারাজের উকিলের পদ হইতে ক্রমশঃ বাহারবন্দ পরগণার নায়েব ও পরে কাশিমবাজার রাজ এষ্টেটের চিফ্ সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। বর্ত্তমানে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

(২) ইনি বাঙ্গলাদেশের প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীগিরিজাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর পিতা, বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন।

আইনের তর্ক-জাল বিস্তার করিলেন—যে, পরপক্ষের উকিল প্রায় নিরুত্তর হইয়া গেলেন, কিন্তু মাতামহীর স্নেহ তাঁহার ভিক্ষাপুত্রের উপর ছিল অত্যধিক—দেওয়ান-পুত্রগণের প্রতিও তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নিতান্ত কম ছিল না,কাজেই আইনের জয় হইলেও তাঁহার আপত্তি ও প্রার্থীদের পুনঃপুনঃ অনুযোগ, সকল যুক্তি ও আলোচনা ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল। একদিন রাত্রে এমনই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল যে, মণীন্দ্রচন্দ্রও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন।—তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনাদের সম্পত্তি আপনাদেরই থাকুক—আমি গরীব, আমি ভিক্ষা করিয়াই খাইব। এত বড় বাঙ্গলা দেশে আমার মাথা গুঁজিবার স্থান অবশ্যই মিলিবে।—কিন্তু আমি স্থির জানি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে এ সম্পত্তি আমারই অধিকারে আসিবে।" এই বলিয়া প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রে পরমসহিষ্ণু মণীন্দ্রচন্দ্র অনধিকারীর প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া একান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় কাশীর পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।—হিড়িম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাত ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।—বলিলেন, "দাদা, এত কাতর হইতেছেন কেন? উতলা হইবেন না, এ সম্পত্তি সত্যসত্যই আপনার। আপনিই উহা ভোগ করিবেন।" মণীন্দ্রচন্দ্র ততক্ষণে অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছেন।

আহারের ডাক পড়িল। মণীন্দ্রচন্দ্র মাতামহীর নিকট আহারে বসিলেন। ধীরে ধীরে মণীন্দ্রচন্দ্র নিবেদন করিলেন—"আপনার ভিক্ষা-পুত্রগণ আপনার কাশিমবাজারের সম্পত্তি আমার হাতে দিতে অনিচ্ছুক, আপনার সম্পত্তি আপনি গ্রহণ করুন।" রাণী সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তুই এত অধৈর্য্য হইতেছিস্ কেন? তুই অনেক টাকার মালিক হইবি,—অনেকদিন বাঁচিবি—এরা বামুনের ছেলে, এদের কিছু করিয়া টাকা দে।" মণীন্দ্রচন্দ্র উত্তর করিলেন—"আপনি ত জানেন, এষ্টেটের আয় আপনার আমলে আড়াই লক্ষ টাকার বেশী ছিল না—আপনাকে তাহার অর্দ্ধেক দিতে স্বীকৃত হইলাম—তাহার উপর রাজবাড়ীতে কিছু

নগদ টাকা পাইব কি না তাহার স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় আপনাকে যে নগদ টাকা দিতে হইবে তাহা আমাকে ধার করিয়াই দিতে হইবে। সে টাকার সুদ পরিমাণে কম হইবে না। এ অবস্থায় আপনার আদেশ আমি কিরূপে প্রতিপালন করিব, তাহা আপনিই বলিয়া দিন।" তিনি বলিলেন, "আমি আর কতদিন বাঁচিব? জমিদারী ত তোরই হাতে থাকিবে—আমাকে নয় লক্ষ টাকা দে—আমি সেই টাকা ভাগ করিয়া উহাদিগকে দিব, আর তুই যে টাকা মাসহারা দিবি তাহাই আমি নিজে ভোগ করিব। তুই অন্যমত করিস্ না; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তুই দীর্ঘজীবী হইবি, আমার মাথায় যত চুল তো'র তত পরমায়ু হইবে—সুখে থাকিবি, আমার কথা তুই ঠেলিস্ না।"

নিরুপায় হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এক মাসের মধ্যে ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাণী হরসুন্দরীকে দিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলে মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার এষ্টেটের যাবতীয় ধনসম্পত্তির দখলিকার হইবেন এইরূপ স্থির হইল।

রাণী হরসুন্দরী এই বলিয়া মুর্শিদাবাদের কলেক্টরের নিকট মণীন্দ্র-চন্দ্রের নামে ছাড়পত্র বা না-দাবী দলিল (Relinquishment deed) লিখিয়া দিলেন যে, "আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এ অবস্থায় আমি কাশী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি প্রাপ্ত স্বত্বের পরিচালনা ও ভোগাধিকার এবং বিষয়-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। তুমি আমার দৌহিত্র এবং আমার ও রাজা কৃষ্ণনাথের একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারী, আমার শ্বশুরকুলের পিণ্ডদাতা বিধায় এবং আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র বলিয়া উক্ত সম্পত্তিতে আমার যে কোনও স্বত্ব ও অধিকার হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে আছে, সে সমুদায় আমি তোমার অনুকূলে পরিত্যাগ করিয়া আমার জীবন-স্বত্বের দাবি হইতে মুক্ত করিলাম।" কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র বিষ্ণুবাবুকে সব কথা খুলিয়া লিখিলেন।

পত্রোত্তরে বিষ্ণুবাবু সানন্দে জানাইলেন যে, বহরমপুরের জনসাধারণ মণীন্দ্রচন্দ্রকে উপযুক্ত ভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। তিনি যেন ৮ই যাত্রা করিয়া ৯ই আশ্বিন (১৩০৪) তারিখে বহরমপুর বাঁধাঘাটে উপস্থিত হন।

সৌভাগ্য-সূচনায়

বিষ্ণুবাবুর পত্রানুযায়ী কাশিমবাজার যাত্রার ব্যবস্থা হইল। ললিত বাবু, বামাপদ বাবু এবং কর্ম্মচারী ও চাকর দ্বারবানের সঙ্গে মণীন্দ্রচন্দ্র ১৩০৪ সালের ৮ই আশ্বিন তারিখে হাওড়া ষ্টেশনে রাত্রির ট্রেণে উঠিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আজিমগঞ্জে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। বহরমপুর-অধিবাসীর হৃদয়ে মণীন্দ্রবাবু যে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন—তাহা এই অগণিত নরনারীর অভ্যর্থনা হইতে বেশ বুঝা যায়।

বিচিত্র ফুল ও লতাপাতায় ষ্টেশনটি সুসজ্জিত; প্লাটফর্ম্ম হইতে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত বনাত পাতিয়া, দুই ধারে কদলী বৃক্ষ ও দেওদার পাতার ছাউনী করিয়া একটি সুন্দর অবতরণিকা করা হইয়াছে; বহরমপুর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য সুন্দর একখানি ষ্টিমার সুসজ্জিত হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।—আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সৈদাবাদ, বহরমপুর ও গোরাবাজারের বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক মণীন্দ্রচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্য আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে সমাগত;—অভিবাদন, প্রত্যভিবাদন ও কুশল-প্রশ্ন বিনিময়াদির পর সসম্মানে মণীন্দ্রচন্দ্রকে ষ্টিমারে লইয়া যাওয়া হইল। ষ্টিমারখানি কূল ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু বোমা ফুটান হইতে লাগিল।

মণীন্দ্রচন্দ্র বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন—গঙ্গার উভয় তীরে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া আছে;—যেমন ষ্টিমারখানি নিকটে আসে অমনি স্ত্রীগণ হুলুধ্বনি দেয়, পুরুষগণ জয়ধ্বনি করে,—বালকবালিকাগণ উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে।

নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বহরমপুরের পথে কয়েক স্থানে ষ্টিমার দাঁড় করাইতে হইল—প্রত্যেক স্থানের ভদ্রলোকগণ আসিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন—

ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিলেন—পরিচিত, অপরিচিত বহু লোক প্রাণ খুলিয়া শুভ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

ক্রমশঃ মণীন্দ্রচন্দ্রের বিস্ময় বাড়িতে লাগিল—হৃদয় মন গভীরভাবে অভিভূত হইতে লাগিল—মণীন্দ্রচন্দ্র সাশ্রুনেত্রে ভাবিতে লাগিলেন—এই অগণিত নরনারী, ইহারা সত্যই কি আমার মত দরিদ্রকে চায়?—বাস্তবিকই কি ইহারা আমাকে ভালবাসে?—আজ তাঁহার বিগত দিনের নীরস মুহূর্ত্তগুলির কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। একদিন এই আজিমগঞ্জ ষ্টেশন হইতেই একান্ত প্রয়োজনীয় এক বিনীত প্রার্থনা জানাইতে আসিয়া ব্যর্থকাম প্রার্থীর মত, অবজ্ঞাত দরিদ্রের মত, অপমানিত আগন্তুকের মত ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।—যুবক মণীন্দ্রচন্দ্রের আত্মগ্লানি, অস্বচ্ছল অবস্থার দুঃখ বেদনা ও নৈরাশ্য তাঁহাকে সেদিন এমনি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তিনি আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

আর আজ? বিধাতার লীলা এমনি রহস্যময়! আজ এই অভাবনীয় দৃশ্যের পটভূমিকায় মণীন্দ্রচন্দ্রের চির-আরাধ্য ইষ্টদেবতা, সেই মোহনমুরলীধারী নবীন কিশোর শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তিটি চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র দেবতার চরণে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন,—একটী বিনম্র প্রণিপাতে যেন মণীন্দ্রচন্দ্রের ভবিষ্যৎ-জীবন ইষ্টদেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়া গেল!

ষ্টিমার দেড় ঘণ্টার মধ্যে বহরমপুর বাঁধাঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ঘাটের উপরই একটি পুষ্পমাল্য-পরিশোভিত মঞ্চ, সেই মঞ্চের উপর মণীন্দ্রচন্দ্রের সংবর্দ্ধনা-সভা আহূত হইয়াছে। পরিচিত ভদ্রলোকের মধ্যে রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর মণীন্দ্রচন্দ্রকে সংবর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। এই প্রকার আনন্দ বোধ করা একমাত্র মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। অতীতের

মর্ম্মান্তিক স্মৃতি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া এমন ভাবে ক্ষমা করা, অতি বড় শত্রুকেও পরমাত্মীয় জ্ঞানে এমন ভাবে বরণ করিয়া লওয়া দুর্জ্ঞেয়-চরিত্র মহামানব মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। আশীর্ব্বাদ, শুভ-ইচ্ছা-জ্ঞাপন, আনন্দ-প্রকাশ চলিতেছে; অন্যদিকে সমাগত নরনারীর মধ্য হইতে কখনও হুলুধ্বনি, কখনও মণীন্দ্রচন্দ্রের জয়, কখনও উচ্চকণ্ঠে হরিনাম শুনিতে পাওয়া যাইতেছে; মণীন্দ্রচন্দ্রের আগমনে যেন সহরময় একটি অব্যাহত অনাবিল আনন্দ-স্রোত বহিতেছে!—এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অভ্যর্থনায় মণীন্দ্রচন্দ্রের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না,—স্তম্ভিতের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে মণীন্দ্রচন্দ্রকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। এই আনন্দ ও উৎসাহ, এই উন্মাদনা ও ভাবাবেগ যেন তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিল। মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের এই চিরস্মরণীয় দিনটির কথা উল্লেখ করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র একদিন গ্রন্থকারকে বলিতেছিলেন—

"আমি জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত বহু গভর্ণর, ভাইসরয়, প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ প্রভৃতির অভ্যর্থনা দেখিয়া আসিতেছি কিন্তু এমন বিরাট, সার্ব্বজনীন, আন্তরিক অভ্যর্থনা আর কখনও দেখিতে পাইলাম না।"

বাঁধাঘাটের সেই বিরাট জনতার মধ্যে একটু শৃঙ্খলা আসিলে,—শোভাযাত্রা সহকারে একখানি সুন্দর ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া মণীন্দ্র-চন্দ্রকে বিষ্ণুবাবুর বাগানবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল।

বিশ্রামান্তে মণীন্দ্রচন্দ্র পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুগণের নিকট কাশীর ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। অপরাহ্নে বাবু রাধিকাচরণ সেনকে সঙ্গে লইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।—বৈকুণ্ঠ বাবুও সেখানে অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন। মাতামহীর লিখিত ছাড়পত্র (Relinquishment) ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লেভিংজকে দিবার পর স্থির হইল, পরদিন সকালে অর্থাৎ ১০ই আশ্বিন সম্পত্তি দখল করিবার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইবেন।

সৌভাগ্যের সিংহদ্বারে

সন ১৩০৪ সালের ১০ই আশ্বিন!—এই তারিখটি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ঐদিন বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে মণীন্দ্রবাবু কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদে রাজার গৌরবে, রাজার যোগ্য অভ্যর্থনায় সম্মানিত হইয়া, পৌরজনের আনন্দকোলাহল ও জয়ধ্বনির মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন,—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল!

মহারাণীর মৃত্যুর পর, মণীন্দ্রচন্দ্রের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লেভিংজ কাশিমবাজার রাজবাটী তালাবন্ধ ও শিলমোহর করিয়া রাখিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।—মহারাণীর উত্তরাধিকারিরূপে মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজারে উপস্থিত হইলেন; —উক্ত ১০ই আশ্বিন প্রাতঃকাল সাড়ে আট ঘটিকার সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লেভিংজ রাজবাটীর তালাচাবি খুলিয়া ও শিলমোহর ভাঙ্গিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রকে রাজবাটীর দখল দিলেন। ইহাতে বাঙ্গলা সরকারের মণীন্দ্রচন্দ্রকে আইনতঃ উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হইল।

কলিকাতা হইতে কাশিমবাজার আসিবার সময়—মণীন্দ্রচন্দ্রের ভাগিনেয় রাজেন্দ্রচন্দ্র, খুল্লতাত-ভ্রাতা গোষ্ঠবিহারী নন্দী তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার রাজভবনে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও রাধাগোবিন্দ জিউকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর তালা খুলিতে খুলিতে অন্দর মহলের পথে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাণী স্বর্ণময়ীর চত্বরে আসিয়া, যে সকল ঘর তালাবন্ধ ও শিলমোহর করা ছিল সেগুলি খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্নানাহারের সময়ের মধ্যে সব তালাগুলি খোলা হইয়া গেল। আহারান্তে আমলাগণের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের বৈষয়িক কথাবার্ত্তা হইল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

তদানীন্তন এষ্টেটের ম্যানেজার রায় শ্রীনাথপাল বাহাদুরের নিকট হইতে মণীন্দ্রচন্দ্র রাজসেরেস্তার অনেক কথা জানিতে পারিলেন—কাগজপত্র দেখাশুনা ও কাজকর্ম্মের হিসাবনিকাশ পরদিন কাছারীর সময় দেখাইবার কথা স্থির হইল।

বাল্যকাল হইতে দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র যে অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এইবার এই বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়া তাহা তাঁহার কাজে লাগিল। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের রাজোচিত কার্য্য-তৎপরতা হঠাৎ কোথা হইতে আসিল ইহা ভাবিবার কথা। বিশাল সম্পত্তির মালিক হইতে হইলে—যে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ক্ষিপ্র কর্ম্মপটুতা ও দৃঢ় অভিনিবেশের প্রয়োজন তাহা যেন মণীন্দ্রচন্দ্রের সংস্কারলব্ধ ছিল। পর পর সুশৃঙ্খলার সহিত তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া ও যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া চলিতে লাগিলেন। রাজবাড়ীর মালখানা খুলিয়া খাজাঞ্চী রামনারায়ণ রায়কে তহবিলে কত টাকা মজুত আছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল। অন্দরের প্রত্যেক ঘর ও সিন্ধুক বিশেষভাবে দেখিয়া—পর্য্যবেক্ষণের কাজ শেষ হইল।—দুই তিন দিন পরে সৈদাবাদের রাজবাড়ীর কাজ আরম্ভ হইল। মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভার, নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি কি ভাবে এবং কি পরিমাণ আছে তাহা দেখিতে গিয়া নিরাশ হইলেও—মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাণী স্বর্ণময়ীর শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে মনোযোগ দিতে ত্রুটি করিলেন না।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন, শ্রীনাথপাল, রাধিকাচরণ সেনের সহিত কিভাবে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল।—রায় বাহাদুর শ্রীনাথপালের উপর প্রধানতঃ শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কুটুম্ব প্রভৃতির নিমন্ত্রণ হইল। স্থানীয় ভদ্রলোকগণ নিমন্ত্রিত হইলেন। ২০,০০০ বিশ হাজার কাঙালী বিদায় হইবে ইহাই মণীন্দ্রচন্দ্র নিজে স্থির করিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী সত্যসত্যই কাঙ্গালীর মাতৃস্থানীয়া ছিলেন—তাঁহার যশঃ ও সম্মান

অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কাঙালী বিদায়ের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইল। প্রত্যেক কাঙালীকে একখানি নূতন কাপড়, পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে লুচি সন্দেশ এবং নগদ এক টাকা দান করিবার ব্যবস্থা হইল। এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রাদ্ধাদি বেশ সুনামের সহিত সমাধা হইয়া গেল।

এইবার সেই প্রতিশ্রুত নয় লক্ষ টাকার চিন্তা!—এষ্টেট ও মহারাণীর নিজ তহবিল হইতে অতি অল্প টাকার সঙ্কুলান হইল—কাজেই ঋণ করাই মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতায় যাইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র সারদা বাবুর সহিত পরামর্শ করিলেন। ঋণ গ্রহণের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ডিম্‌লের রাজার নিকট প্রয়োজনীয় টাকার কিয়দংশ পাওয়া যাইবে এ আশা মণীন্দ্রচন্দ্র পাইলেন। বাকী টাকা সংগ্রহের জন্য ভাগ্যকূলের কুণ্ডুবাবুদের নিকট যাওয়া হইল। রাজা জানকীনাথ রায়ের কাছে ঋণ লইবার প্রস্তাব করায় তিনি নানাপ্রকার ওজর আপত্তি তুলিলেন। হ্যাণ্ডনোটে কিরূপে টাকা ধার দেওয়া যায়, সুদের হার কত, ইত্যাদি বিষয় লইয়া বহু বাদানুবাদ হইবার পর, তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রকে টাকা দিবেন না বলিয়া স্থির করিলেন। যাহা হউক কোনও প্রকারে নয় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ভবানীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, ব্রজেন্দ্র বসু, ব্যারিষ্টার ওয়েষ্টমেকট, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রকে লইয়া কাশী যাত্রা স্থির করিয়া উকিল বাবু ও মহাজনদিগের থাকিবার মত একটি বাড়ী ঠিক করিতে মণীন্দ্রচন্দ্র মাতামহীর নিকট পত্র লিখিলেন—বাড়ী ঠিক করা হইয়াছে এ খবর মাতামহীর পত্রে কয়েকদিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। শুভদিনে যাত্রা করিয়া কাশীতে মণীন্দ্রচন্দ্র সদলবলে উপস্থিত হইলেন—নিজে মাতামহীর নিকট এবং আর সকলে ভাড়া বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হরসুন্দরী কিভাবে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি লেখাপড়া করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রকে দিবেন, তাহা লইয়া

মুষাবিদা চলিতে লাগিল। মাতামহীর পক্ষ হইতেও একজন এটর্ণি উপস্থিত ছিলেন। সাত আটদিন তর্কবিতর্কের পর কি লেখাপড়া হইবে তাহা স্থির হইল। দলিল লেখাপড়া ও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত হইল। মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুসারে একমাস উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই ৭ই কার্ত্তিক দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া মাতামহীর হাতে নগদ ৯,০০০০০৲ নয় লক্ষ টাকা দিলেন; যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাও এই সঙ্গে চুকাইয়া দেওয়া হইল। হরসুন্দরী মণীন্দ্রচন্দ্রকে বলিলেন, "ভাই, আমি ত তোমাকে আগেই বলিয়াছি—মাধবের ছেলেদের তোমার প্রদত্ত ঐ নয় লক্ষ টাকা দান করিব।" মণীন্দ্রচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন,—"ভালই ত, ইহা ত আপনার উচ্চ হৃদয়েরই পরিচয়। আমি শুনিয়াছি আপনি দ্বারিকা নাথ ঠাকুরকে ৮০,০০০৲ টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন, আপনি ত দয়ার আধার, তবে যদুনাথ ও তাহার ভ্রাতাকে কিছু দেওয়া উচিত ছিল।" তিনি বলিলেন—"তোমার নিকট হইতে প্রতি মাসে আমি ১০,০০০৲ টাকা করিয়া পাইব। ঐ টাকা হইতে তাহাদের কিছু দিব।"

রাণী হরসুন্দরী পরদিন বৈকুণ্ঠ বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মণি যে নয় লক্ষ টাকা আমাকে দিয়াছে তাহা আমার ভিক্ষাপুত্র মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রগণকে দান করিব। একটা দানপত্রও আমি লিখাইয়াছি। তুমি ভাল উকিল—এখানি বেশ করিয়া দেখিয়া দাও।" বৈকুণ্ঠবাবু নিজে দানপত্র দেখিয়া দিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রকে তাহার সাক্ষী হইতে বলিলেন—মণীন্দ্রচন্দ্র তাহাতে নাম সহি করিয়া দিলেন। এই নয় লক্ষ টাকা ছাড়া রাণী হরসুন্দরীকে যাবজ্জীবন বার্ষিক দশ হাজার টাকা দিবার অঙ্গীকারও মণীন্দ্রচন্দ্রকে করিতে হইল। সে অঙ্গীকার তিনি হরসুন্দরীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

কাশিমবাজার আসিবার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র হরসুন্দরীকে বিশেষ অনুরোধ উপরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না। তিনি

বলিলেন—"বিশ্বনাথের ধাম ছাড়িয়া আমি সেখানে গিয়া সুখী হইতে পারিব না। কৃষ্ণনাথের চিন্তা, গোবিন্দ সুন্দরীর (মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতা) স্মৃতি আমার ভগবৎ চিন্তা ভুলাইয়া দিবে। তোরা বাঁচিয়া থাক, এক একবার আমাকে দেখা দিতে আসিস্। আমি এইখানেই মরিব।" দলিলপত্র সহ মণীন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা হইয়া কাশিমবাজারে ফিরিয়া আসিলেন।

সৌভাগ্য-তোরণে

ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন—বহুদিনের প্রত্যাশা, নৈরাশ্য ও ক্ষোভের অবসান হইল, সত্যপথে সহিষ্ণু প্রতীক্ষার ফল ফলিল, কিন্তু প্রাপ্তির আনন্দ ও উৎসাহের মধ্যে মণীন্দ্রচন্দ্র উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। ভাবী কালের উৎফুল্ল আশার কুসুমদলে হতাশার হিম-বায়ু বহিয়া গেল। কাশিমবাজার রাজলক্ষ্মীর রত্নভাণ্ডারে যাহা দেখিবার আশা করিয়াছিলেন তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। বহুমূল্য রত্নালঙ্কার, স্বর্ণ-রৌপ্যের তৈজসপত্রাদি অজ্ঞাত হস্তে কখন কোন সুযোগে অপসৃত হইয়াছে ;--মহারাণী স্বর্ণময়ীর যে রাজান্তঃপুর এবং তোষাখানাগৃহ মণিমাণিক্যের বিচিত্র সম্ভারে অতুলনীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল—মণীন্দ্রচন্দ্র রাজবাড়ী দখল করিবার পর তাহা জনশ্রুতিতে পরিণত হইতে চলিল। কাশীধাম হইতে কাশিমবাজার ফিরিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র রাণী হরসুন্দরীর নিকট ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে পত্রখানি লিখেন তাহা হইতেই তাঁহার বিব্রত অবস্থার কথা জানিতে পারা যায়। তালা খুলিয়া অন্তঃপুরে পাইলেন—মাতুলানীর নিত্য ব্যবহার্য্য এক প্রস্থ রূপার বাসন, তোষাখানায় পাইলেন—কয়েকখানি রৌপ্যের থালা ও কলসী। মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর সুযোগে কুচক্রীগণের এই ঘৃণিত চৌর্য্যবৃত্তির ইঙ্গিত পূর্ব্বেও দেওয়া হইয়াছে।

এই নৈরাশ্যের উপর প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্য খাজানার অনাদায় এর ব্যাপারও মণীন্দ্রচন্দ্রকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সন ১৩০৪ সালের প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পে বাঙ্গলা দেশে যে প্রলয় হয়, তাহাতে কাশিমবাজার রাজবাড়ীর বহু অংশ ভূমিসাৎ হয় একথা 'মহারাণী স্বর্ণময়ী' অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই ভূমিকম্পে কাশিমবাজার এষ্টেটের বহু অট্টালিকা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়—বিশাল জমিদারীর নানাবিধ ক্ষতির জন্য

প্রজাগণের অবস্থা হঠাৎ মন্দ হওয়ায় প্রাপ্য খাজনা আদায়ের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ঘটে। উপযুক্ত সময়ে উক্ত খাজনা রাজবাটীতে 'ইরসাল' না হওয়ায় মহারাজা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রাণসঙ্কট বিপর্য্যয়ে যাঁহার জীবনযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে—মানুষের চক্রান্ত বা দেবতার অত্রযোগের মধ্যেও তিনি জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন—বীর যোদ্ধার পরীক্ষার মধ্যে উৎসাহের উপলক্ষ্য ও সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। তাই দেখিতে পাই এই অশান্তি ও উদ্বেগ প্রশমিত করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্রের জন্মলাভ।

সন ১৩০৪ সালের ১৫ই আশ্বিন তারিখে মণীন্দ্রচন্দ্রের পরিবারবর্গকে শ্যামবাজারের বাটী হইতে ৩০২নং অপার সারকুলার রোডের 'রাণী-কুঠী'তে আনা হইল। এই বাড়ীর পাথরের ঘরে ঠিক বার দিন পরে অর্থাৎ ২৭শে আশ্বিন তারিখে বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের জন্ম হইল। এক মাস অতীত হইতে না হইতেই পরিবারবর্গকে অবিলম্বে কাশিম-বাজার আনিবার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কোনও একটা কাজ করিবার মনস্থ করিলে যে কোনও উপায়ে তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। শুধু পারিবারিক জীবনে নহে—কর্ম্মজীবনেও তাঁহার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যস্ততার ভাব দেখা যাইত। ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে স্পেশাল ট্রেণে করিয়া—কামরায় দোলা ঝুলাইয়া এক মাসের শিশু শ্রীশচন্দ্রকে পরিবারবর্গ সহ কাশিমবাজার রাজবাটীতে আনিতে মণীন্দ্রচন্দ্রের ১৫০০৲ টাকা ব্যয় হইল।

এই বৎসরে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে;—তাহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি ভাগ্যবিধাতা অযোগ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন নাই। ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের মহারাজের বিবাহোপলক্ষে মণীন্দ্রচন্দ্রের নিমন্ত্রণ হইল।—রাজা হইবার জন্য যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কৃতী বলিয়া যাঁহার গৌরব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তিনি এই রাজার নিমন্ত্রণ রাজার ন্যায় রক্ষা করিয়া

কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজবাটীতে পাঁচ দিন অবস্থান করিয়া স্বহস্তে কাঙ্গালীবিদায় ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিমন্ত্রিতগণের আহারের ব্যবস্থা করিয়া সমাগত বহু রাজামহারাজকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—পূর্ব্বে উল্লিখিত মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানসাগর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয়। মাতুলানীর পূর্ব্ব ব্যবহারের কোনও কথাই তাঁহার মনে আসিল না—কর্ত্তব্যকর্ম্মে এমনি তাঁহার অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। সন ১৩০৪ সালের মাঘ মাসে অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তখনকার ছোটলাট কাশিমবাজার রাজ-বাটীতে আগমন করেন। এই উপলক্ষে মণীন্দ্রচন্দ্রের দশ হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং তিনি ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মধ্যম ভগ্নীর ঋণশোধের জন্য গোষ্ঠবিহারী নন্দীকে ডাকযোগে ১০০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। এই সালের ফাল্গুন মাসে মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষী মজিলপুরনিবাসী মথুরানাথ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ দত্তের নূতন চাকুরীর জন্য ১০০০৲ টাকা ডিপজিটের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ঐ সময় মথুরানাথের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে ১০০০৲ টাকা দান করিয়া শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।

এষ্টেট হাতে পাইয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের আর্থিক স্বচ্ছলতা যে আশানুরূপ হয় নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অবস্থার মধ্যেও প্রথম বৎসরেই এই কয়েকটি দান এবং অবশ্য করণীয় কার্য্যে ব্যয়ের মধ্যে আমরা দানশৌণ্ড মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের উদার চরিত্রের পূর্ব্বাভাস পাই বলিয়া সেগুলির উল্লেখ করা হইল।

রাজসিংহাসনে

ইংরাজি ১৮৯৮ সালের ৩০শে মে সোমবার তারিখে অর্থাৎ সন ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৭ই তারিখে, উত্তর ফাল্গুনি নক্ষত্রে মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারিরূপে গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে মণীন্দ্রচন্দ্র 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। বেলভেডিয়ার প্রাসাদে তদানীন্তন ছোটলাট একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় স্বর্গীয় মহারাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রকে সনন্দ ও খেলাত প্রদান করিলেন।

এক বৎসর পূর্ণ হইল—আবার বাঙ্গলা সন ১৩০৫ সালের ১০ই আশ্বিন আসিল। অর্থ-কষ্টে সারা বৎসর কাটিয়াছে। নানা উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্য দিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রাজধানীর পূজা-পার্ব্বণ, লৌকিকতাপ্রভৃতি চিরাচরিত ক্রিয়াকাণ্ডগুলি কিছু বাদ দিতে বা বদলাইতে পারিলেন না—সে ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। হৃদয়ের আশা ছিল বিপুল—সৎকর্ম্মের আকাঙ্ক্ষাও ছিল তাঁহার অসীম —শুধু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"—মনের বাসনা অর্থ ও সুযোগের অভাবে মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়াই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন ত তাহার চরিতার্থতা চাই। তাহার উপর কাশিমবাজারের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া—তখনকার দেশব্যাপী দুর্দ্দিনেও তিনি ব্যয়-সংকোচ করিতে পারিলেন না। অনাদায়ের বৎসর, তাহার উপর মাতামহীর বার্ষিকী দশ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট দিনে কাশীধামে প্রেরণ করা, ঠিক সময়ে গভর্ণমেণ্ট রেভিনিউ বা রাজস্ব প্রদান করা—এই সকল ঘটনাগুলির একত্র সমাবেশে তিনি চিন্তিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। নিরুপায় হইয়া ঠিক এই দিনে অর্থাৎ ১৩০৫ সালের ১০ই আশ্বিন তারিখে তিনি আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ধনী রায় বাহাদুর বুধ সিং

দুধোরিয়ার নিকট হইতে ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন। বিশাল জমিদারী লাভ করিবার পর ইহাই তাঁহার প্রথম ঋণ গ্রহণ! অথচ এমন অবস্থাতেও পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তব্য-কর্ম্মে তাঁহার ব্যয়-কুণ্ঠা দেখা গেল না।

. এই বৎসর কলিকাতায় একটি প্লেগ-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইল— মণীন্দ্রচন্দ্র তাহার সাহায্যকল্পে মাসিক ১০০৲ টাকা দান করিতে লাগিলেন।

পৌষমাসে মণীন্দ্রচন্দ্রের শ্বশুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধে তিনি শুধু কাঙ্গালী বিদায় করিয়াই ১৫০০৲ টাকা ব্যয় করিলেন। উহাতে ৭০০৲ টাকার পয়সা, ৮০০৲ টাকার সিকি বিতরিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে একটি করিয়া ঘড়া দান করা হইল। মোট ব্যয় হইল ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা।

জমিদারী-কার্য্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজার রাজবাটীর ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের একটা বিধিব্যবস্থা স্থির করার প্রয়োজন হইল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর আমলে তাঁহার সভাপণ্ডিত ৺রমাপতি তর্কভূষণ প্রদত্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে রাজধানীর সকল প্রকার ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, দুর্গোৎসব ও অন্নপূর্ণা পূজার পদ্ধতি তর্কভূষণ মহাশয়ের ব্যবস্থানুযায়ী রাখিয়া বাকী বৈষ্ণবধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানগুলি শ্রীপাদ গোস্বামীমহাশয়গণের প্রবর্ত্তিত “হরিভক্তিবিলাস” নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থের ব্যবস্থানুসারে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রমাপতি তর্কভূষণকে তিনি বিশেষ মান্য করিতেন; তাঁহার বাক্যও যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করিতেন, তথাপি তর্কভূষণ মহাশয়ের ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া মহারাজ যে ‘হরিভক্তি বিলাসে’র মতে রাজবাড়ীর বৈষ্ণবানুষ্ঠানগুলিতে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন, ইহাতে

তিনি যে কতখানি বৈষ্ণবপ্রাণ ছিলেন তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। কাশিমবাজার রাজপরিবারের আদিপুরুষগণও বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন —মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও রাজগদি লাভ করিবার পর নানাকাজের সুযোগে সেই বৈষ্ণব মতের প্রতিই আপনার অন্তরের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

সন ১৩০৬ ও ১৩০৭ সালের কথা—

মহারাজের কর্ম্মময় জীবন যথানিয়মে চলিতে লাগিল; ক্রমশঃ বিশাল জমিদারী পরিচালনের যে গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল, তাহার জন্য নানা অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কর্ম্মক্ষমতার বিকাশ হইতে লাগিল প্রতিদিনকার কর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়া।

মহারাণীর পূর্ব্বতন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাহারা মণীন্দ্রচন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল—এইবার মণীন্দ্রচন্দ্র তাহার প্রতিশোধ লইবেন; কিন্তু ক্ষমার আধার মণীন্দ্রচন্দ্র রাজতক্তে বসিয়া পূর্ব্ব আমলের কর্ম্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলকেই মুগ্ধ করিলেন। একটী কর্ম্মচারীও কর্ম্মচ্যুত হইল না। ক্ষমা-গুণে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানের এক লক্ষ টাকায় বহরমপুরে জলের কল (Water Works) প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হয়। সহরময় জলের পাইপ বসান এবং জলের কারখানা বা ইন্‌জিন ঘর নির্ম্মাণ শেষ হইতে না হইতেই স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র রাজ্যলাভের পর বৎসরই অর্থাৎ সন ১৩০৬ সালের (ইং ১৮৯৯) জ্যৈষ্ঠ মাসে জলের কল বা ওয়াটার ওয়ার্কসের সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন। মহারাজের সাদর আহ্বানে ছোটলাট স্যার জন্ উড্‌বার্ণ স্বয়ং উক্ত

ওয়াটার ওয়ার্কসের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্মৃতিরক্ষার্থ তাহার প্রাচীরগাত্রে একটি ইংরাজি কবিতা-খোদিত প্রস্তর ফলক বসাইয়া দেন। উক্ত কবিতাটি মহারাজের বাল্যবন্ধু এবং সেক্রেটারী প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর রচিত। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

How sweet the gen'ous use of wealth,
Flowing in streams that millions save !
Blessed the hands this gift that gave
To lengthen life and strengthen health !
The noble Swarnomoyee's name,
Linked with Manindra's shall be writ,
In living water—pure and sweet—
And blazoned by emblazing Fame !

ইহার ঠিক এক বৎসর পরে অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে উক্ত ছোট লাট স্যর জন্ উড্‌বার্ণ কাশিমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া মহারাজের স্বভাবসুলভ ঔদার্য্য ও রাজোচিত আতিথেয়তায় বিশেষ মুগ্ধ হইয়া কোনও মোকর্দ্দমায় যাহাতে মহারাজকে অতঃপর আদালতে উপস্থিত হইতে না হয় গভর্ণমেণ্টকর্তৃক তাহারই ব্যবস্থা-মূলক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া মহারাজকে সম্মানিত করিলেন।

মহারাজের মাথরুণ জীবনেই আমরা দেখিয়াছি যে, কৃষি-কার্য্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এষ্টেট্ হাতে লইয়াই মণীন্দ্র চন্দ্র সব্জী বাগানের দারোগাকে শাক সব্জী ও নানাবিধ ফসল লাগাইতে উপদেশ দিলেন। একজন ক্যাম্বেল-পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারকে বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। একজন জাপান-প্রত্যাগত ভদ্রলোকও কিছুদিন কৃষি-বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে রাজপরিবারবর্গ কলিকাতার সারকুলার রোডের

বাড়ীতে আসিলেন। মহারাজ কাশিমবাজারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। লোকহিতকর কার্য্যে মহারাজের বিন্দুমাত্র ব্যয়কুণ্ঠা ছিল না—কিন্তু নিজের বা পরিবারবর্গের একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বিন্দুমাত্র ব্যয়বাহুল্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। তাই দেখিতে পাই সারকুলার রোডের বাড়ীর কর্ম্মচারী যতীন্দ্রনাথ দত্ত যখন মহারাণী, মহারাজকুমার ও মহারাজকুমারীগণের জন্য কি কি প্রকারের পোষাক পরিচ্ছদ প্রয়োজন হইবে সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট উপদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন—তখন মহারাজের নিকট হইতে উত্তর আসিল—

"মহিমচন্দ্র ও কীর্ত্তিচন্দ্র সম্বন্ধে তাহাদের পছন্দমত বাড়ীর ব্যবহারের জন্য সূচের কাজ করা আলোয়ানই ক্রয় করিয়া দিবে। স্কুলের ব্যবহারের জন্য শাল খরিদের আবশ্যক নাই। মহিমচন্দ্র যদি শাল ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে তবে আমার ব্যবহারী শাল আছে তাহাই ব্যবহার করিতে বলিবে। * * * কোনও রূপ শাল ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। স্কুলে ব্যবহারের জন্য শালের রুমাল যাহা আমাদের ঘরে আছে তাহাই গায়ে দিতে বলিবে। মহিমের মাতার জন্য গাউনের দরকার নাই। সাটীনের কয়েকটি বডি পশুপতি বাবুকে সংবাদ দিয়া করাইয়া দিবে।"

মণীন্দ্রচন্দ্র যে রাজোচিত বহু গুণের অধিকারী ছিলেন, তাহা তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাৎসর্য্য তাঁহার কোন দিনই ছিল না; তাই এই অমায়িক ভদ্রলোকের পক্ষে রাজ-কায়দা সম্বন্ধে সতর্ক হইতে কিছু দিন সময় লাগিয়াছিল। উচ্চ সম্মানের পদে তিনি আরূঢ় হইলেন বটে কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে তাঁহাকে যে 'জবরদস্ত' হইয়া চলিতে হইবে, ইহা তিনি জানিতেন না—জানিবার কোনও প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন নাই, তাই তাঁহার অফিস ঘরের ফরাসে দিবারাত্র নানা শ্রেণীর লোকের ভীড় দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু যেটুকুর অভাবে রাজগৌরব নষ্ট

হইবার আশঙ্কা, তাহার প্রতি—মহারাণী স্বর্ণময়ীর আমলের পুরাতন খানসামা পরাণ মণ্ডল এবং পুরাতন চোপদার মুকুন্দ সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। পরাণ খানসামা ও মুকুন্দ চোপদারের অভিজ্ঞতা তিনি কোনও দিন অগ্রাহ্য করেন নাই; কারণ কাশিমবাজারের মান-সম্মানের প্রতি তাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তাহার সংরক্ষণেও তাঁহার শৈথিল্য ছিল না।

এষ্টেট্ হাতে আসিবার পর মহারাজের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হইল, তিনি বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের সেরেস্তার (Bengal Secretariate) আদর্শে নিজের সেরেস্তা সংগঠিত করিবেন। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র এষ্টেটের কার্য্য চার ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক জনকে এক এক বিভাগের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করিলেন:—

জমিদারী বিভাগের (Estate proper) সেক্রেটারী, ললিত মোহন বন্দোপাধ্যায় বি-এ; ইংরাজি বিভাগের (English Deptt. & Library) সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, মোতালক বা রাজপ্রাসাদের সেক্রেটারী, হেমেন্দ্রনাথ রায়; কলিয়ারী ও আইন বিভাগের (Colliary & Law) সেক্রেটারী, রামাপদ দত্ত বি-এল। পারসনাল ষ্টাফে (Personal staff) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার। ইহাছাড়া জমা-সেরেস্তায় প্রহ্লাদ চট্টোপাধ্যায়(১) ইংরাজি বিভাগে জগৎবাবু পরে হেমেন্দ্রচন্দ্র গুহ, নিকাস সেরেস্তায় ভৈরবচন্দ্র বরাট, মীর মুন্সীর পদে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়, (২) মহাফেজের পদে অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, খাজাঞ্চীর পদে রামনারায়ণ রায় (নন্দবাবুর শ্যালক) ভাণ্ডার দারোগার পদে মদনমোহন মুখোপাধ্যায় (ইনি স্বর্ণময়ীর আমলের বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন) নিযুক্ত

---

(১) কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুলের শিক্ষক ধর্ম্মদাস বাবুর খুল্লতাত।

(২) সুপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস রায়ের পিতা।

হইলেন। পরে মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের বাল্যের গৃহ-শিক্ষক জ্ঞানবাবুও মহারাজের পারসনাল ষ্টাফে (Personal staff) বাহাল হ'ন।

সন ১৩০৬ সালের ১১ই আশ্বিন অর্থাৎ প্রথম ঋণ গ্রহণের ঠিক এক বৎসর পরেই আবার মণীন্দ্রচন্দ্রকে আজিমগঞ্জের বুধ সিং দুধোরিয়ার নিকট হইতে হুণ্ডিতে ৭০,০০০৲ সত্তর হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইল।

একদিকে মহারাজের খয়রাতি খাতায় ছোট বড় অঙ্ক ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে লাগিল—অন্য দিকে রাণী হরসুন্দরীর বাৎসরিক ১০,০০০৲ টাকাও নির্দ্দিষ্ট দিনে কাশীধামে পৌঁছান চাই; ইহা ছাড়া আশ্রিতপ্রতিপালক, স্বজনরক্ষক রূপে তাঁহাকে প্রতি মাসে যে টাকা এখন হইতেই ব্যয় করিতে হইত, তাহাতে হাওলাতি খাতায় যে মাঝে মাঝে নূতন অঙ্ক পত্তন হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি যৌবন কাল হইতেই মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল।—পরিণত বয়সে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে একজন ভাল কোষ্ঠী-বিচারক ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের ফলাফল জানিয়াও তিনি অদৃষ্টবাদী ছিলেন না;—পুরুষকারে আস্থাবান্ এই কর্ম্মবীর ভবিতব্যতার প্রতি সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন ছিলেন।—জন্ম নক্ষত্রের প্রভাব যিনি বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতেন, তিনি যে কি করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইং ১৮৯৪ সালে দেখি রিপণ কলেজের অধ্যাপক হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের পত্রবিনিময় হইতেছে—"হিন্দু ফলিত জ্যোতিষে আপনার বিশেষ জ্ঞান আছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবে এক্ষণে ফলিত জ্যোতিষ সাধারণের বিলাস মাত্র হইয়াছে" ইত্যাদি। উক্ত ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের শিমলা ষ্ট্রীটস্থ জ্যোতিষ কার্য্যালয়ে মণীন্দ্রচন্দ্রের লিখিত বহু পত্রে 'বৃহজ্জাতক', 'সর্ব্বার্থ চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে মতবিনিময় হইতেছে দেখিতে পাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুশীলনের প্রসারকল্পে তিনি বিশেষ ভাবে সন ১৩০৭ সালে চেষ্টা করেন। পরবর্ত্তী কালে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশে তিনি যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই হয়ত অবগত আছেন।

এই প্রকার অর্থ ব্যয়ের মধ্যেও একটি সুখের বিষয় এই যে, সন ১৩০৭ সালের চৈত্র মাসে মহারাজ কলিকাতা এষ্টেটের দেনা ২১২৭৪৲ টাকা শোধ করিলেন এবং তোষাখানা ও অন্যান্য বিভাগের নানাবিধ সরঞ্জামের জন্য ৮৬৪১৲ টাকা ব্যয় করিলেন। বিভিন্ন সেরেস্তার পত্তনে জমিদারীর কাজ কর্ম্ম এইভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল।

সন ১৩০৮ সালের কথা—

অষ্টম কিস্তিতে পাঁচ ছয় লক্ষ টাকার একটি সম্পত্তি নিলামে উঠিল। মহারাজের ইচ্ছা এই সম্পত্তিটি ক্রয় করেন কিন্তু নিজের হাতে তখন সে পরিমাণ টাকা নাই। মুক্তহস্ত মণীন্দ্রচন্দ্রের হাতে টাকা কখনই জমিতে পাইত না। কাজেই কর্জ্জ করিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। স্বনামধন্য এটর্ণি স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত তাহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল—তাঁহার পরিচিত কোনও ধনীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণস্বরূপ পাওয়া যাইতে পারে কিনা এজন্য ভূপেন্দ্র বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লেখা হইল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে—তখন মহারাজের চেটিয়া বেলে পুরের জমিদারী কাছারির অন্তর্গত এথোরা কলিয়ারির 'রয়ালটি' (royalty) ছিল ২৩৩৬৬১৲ এবং এথোরা কাছারীর জমিদারীর 'হস্তবুদ' ছিল ৫৫০০০৲ অর্থাৎ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যখন সামান্য ছয় লক্ষ

টাকার অভাবে সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিতেছেন না—ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিতে হইতেছে তখন তাঁহার জমিদারি ও কলিয়ারি মিলাইয়া মোট আদায় (collection) ২৮,৮৬৬১৲ আটাশ লক্ষ আট হাজার ছয় শত একষট্টি টাকা ;—ততোধিক আশ্চর্য্যের কথা এই যে অর্থাভাবে সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিলেন না বটে কিন্তু কল্যাণকর অনুষ্ঠানের জন্য দান করিবার ইচ্ছা হইলে যেমন করিয়াই হউক মণীন্দ্রচন্দ্রের অর্থাভাব হইত না।

এই অর্থাভাবের মধ্যেও দেখিতে পাই তিনি তাঁহার হিতৈষী 'গার্জ্জেন' মথুরানাথ দত্তের গৃহ-দেবতার মন্দির নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান করিলেন। এতদ্ব্যতীত মহারাজ হইবার পর হইতে তাঁহার মাসিক ২৫৲ টাকা সাংসারিক খরচ বাবদ সাহায্য ত চলিয়াই আসিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ঋণদায়ে বিব্রত হইয়া সাহায্যের জন্য সাহিত্য-সুহৃদ, দুঃস্থ সাহিত্যিকের আশ্রয়স্থল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, ১০ই ভাদ্র তারিখে সমাজপতি মহাশয়ের ঋণশোধ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে এককালীন ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিলেন।

এই বৎসরেই দেখিতে পাই স্বজাতির ও স্বসমাজের উন্নতি বিধান কল্পে নিজের উদ্যোগ ও চেষ্টায় "তিলিজাতি সম্মিলনী"র প্রতিষ্ঠা হইল। সমাজ ও জাতির কল্যাণে যে কোনও অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিতে কাশিমবাজার মহারাজের ধনভাণ্ডার আজীবন উন্মুক্ত থাকিত।

এই বৎসরেই অর্থাৎ সন ১৩০৮ সালে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় আইন সভার (Bengal Legislative Council) সদস্যপদ প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ তাঁহাদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন।

মহারাজ সভা মনোনীত হইলেন,—এই উপলক্ষে মহারাণী স্বর্ণময়ীর সভাপণ্ডিতের ত্রয়োদশ-বর্ষবয়স্ক পুত্র বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিত, কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মহারাজকে বালকোচিত কবিতা রচনা করিয়া একটি অভিনন্দন প্রদান করেন। এই রচনায় মুগ্ধ হইয়া মহারাজ এই বালক কবিকে উৎসাহিত করিবার জন্য একখানি মূল্যবান শাল এবং এক প্রস্থ হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী উপহার দিলেন। এই প্রকার রাজোচিত গুণগ্রাহিতার দৃষ্টান্ত মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই আনন্দের দিনে কনিষ্ঠ মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইলেন ;—বহু চিকিৎসার পর শ্রীশচন্দ্র দেড় মাস পরে আরোগ্য লাভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্য সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য লাভের জন্য মহারাজ সপরিবারে স্পেশাল ট্রেণে বীরভূমে গিয়া দুই মাস কাল অবস্থান করেন। বীরভূম তখন বাঙ্গলা দেশের অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের "দরিদ্র নারায়ণের সেবা"র উদাত্ত বাণী তখন সমগ্র বাঙ্গলা দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণের মনকে আলোড়িত করিতেছে। —দরিদ্রের সেবাই নারায়ণের সেবা, নরই নারায়ণ—নর-নারায়ণের সর্ব্ববিধ সেবার মধ্যে মনুষ্য-জীবনের সফলতা রহিয়াছে—এই নবীন শিক্ষায় তখন যুবজনের মন উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালী যুবকের কণ্ঠে কণ্ঠে সভাসমিতিতে তখন ঘোষিত হইতেছে—

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই, —ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

বিবেকানন্দের এই দরিদ্র-নারায়ণসেবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কলিকাতায় দরিদ্র অনাথগণের সাহায্য ও সেবাকার্য্যের জন্য তখন সমাজের যে সকল গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ অগ্রসর হইয়াছিলেন—বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। দেশপ্রেমিক দরিদ্র-বৎসল নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় "অনাথবন্ধু-সমিতি" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল—তাহার স্থায়ী সভাপতি হইলেন—দরিদ্রবন্ধু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

ছোটলাট স্যর জন্ উড্‌বার্ণ মহারাজের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন—এই বৎসর মহারাজ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য কামানের গোলা সংগ্রহ করিয়া ছোটলাট সাহেবকে উপহার দিলেন ;—উপহারের এই অভিনবত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লাটসাহেব মহারাজকে অশেষ ধন্যবাদে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার রাজবাটীর দক্ষিণে "তিলিবাগান" নাম দিয়া একটি বহুবিস্তৃত ফলমূল ও শাকসব্জির বাগান করিয়া নিজে সেই বাগানের কাজকর্ম্ম দেখিতেন। এমন কি সেই বাগানে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে নিজের হাতে বীজ রোপণ করিতে দেখা গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও মহারাজ তিলিবাগানে একবার না আসিলে অস্বস্তি বোধ করিতেন। কয়েকবার মহারাজ অসুস্থ অবস্থায় পাল্কি করিয়া তিলি-বাগানের কাজ দেখিতে গিয়াছেন।—কর্ম্মের প্রতি এই যে আসক্তি

ইহাকে কেহ কেহ বাড়াবাড়ি বলিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক কর্ম্মেই মণীন্দ্রচন্দ্রকে এক প্রবল প্রেরণা পরিচালিত করিত—তাঁহার চরিত্রের ইহাও একটি বিশেষত্ব।

মণীন্দ্রচন্দ্রের মাথরুণ জীবনে কৃষিকার্য্যের প্রতি যে অনুরাগ দেখা গিয়াছিল সেই অনুরাগই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। এই সালে রাজনাথ রায় নামক জনৈক কৃষিতত্ত্ববিদ্‌কে তিনি ৩০০/০ তিনশত বিঘা জমি উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে কৃষি ও বাগান বিভাগ ব্যাপক ভাবে রাজসেরেস্তার অধীনে আসিল।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকামী বলিয়া তিনি বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিলেন, তাই সন ১৩০৮ সালের (ইং ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) নলহাটীর শিল্প প্রদর্শনীতে পুরস্কার বিতরণের জন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে অযাচিত ভাবে মহারাজ স্বয়ং ৪টী রৌপ্যপদক উপহার দিয়া আসিয়াছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না।

সন ১৩০৯ সালের কথা—

বাঙ্গলা দেশের শিল্প ও কৃষিকর্ম্মে উৎসাহ দান কল্পে তিনি ইং ১৯০৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী কাশিমবাজার হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ব্যাণ্ডেটিয়ার বাগানে প্রতিবৎসর কৃষি, শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাই "ব্যাণ্ডেটিয়া কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী" বা "মুর্শিদাবাদ এডোয়ার্ড প্রদর্শনী" বলিয়া খ্যাত। এখানে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এমন কি ভারতবর্ষের বহু স্থান হইতে কৃষি ও শিল্পজাত বহু সামগ্রীর আমদানী হইত। গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিকে

উৎসাহ দান ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদক মহারাজ স্বয়ং প্রতিবৎসর পারিতোষিক দিতেন। আমরা বহরমপুরে পাঠ্যাবস্থায় এই প্রদর্শনী-মেলার অভিনবত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই প্রদর্শনী খোলা থাকিত—সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ নানা প্রকার নৃত্য-গীত, যাত্রা গান, থিয়েটার, সারকাস্, বায়স্কোপ, আতসবাজীর ব্যবস্থা মহারাজ বাহাদুর স্বব্যয়ে নির্ব্বাহ করিতেন। লোকশিক্ষার জন্য ছায়াচিত্রসহযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকিত, বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করিবারও সুযোগ হইত। কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এইরূপ বিরাট মেলা ও প্রদর্শনী এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের মফঃস্বলে কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কি করিয়া কর্ম্মীকে উৎসাহ দান করিতে হয় তাহা তিনি ভালরূপই জানিতেন—এবং বাঙ্গলা দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য কৃষি ও শিল্প-প্রচেষ্টার উৎকর্ষসাধন যে একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই নিজের তত্ত্বাবধানে কৃষিকার্য্য এবং ব্যাপকভাবে প্রদর্শনী ও মেলা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভূত অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। উন্নত উপায়ে এই কৃষিকার্য্যের পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জ্বর-গায়ে পাল্কী করিয়া 'তিলিবাগান' পরিদর্শন করিতে গিয়া সেই স্যাঁতা জায়গার 'জলো' হাওয়াতে ম্যালেরিয়ার যে ভয়াবহ বিষ তিনি শরীরে গ্রহণ করিলেন—আমার মনে হয়, তাহাই তাঁহার শেষ জীবনে বারবার রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবার একমাত্র না হইলেও অন্যতম কারণ। আমরা মহারাজকে নিজের হাতে বেড়ার ধারে ধারে জঙ্গলের মধ্যে নারিকেলের চারা রোপণ করিতে দেখিয়াছি। আবাদ কার্য্যে তাঁহার এমনি আকর্ষণ ছিল যে, নিজের হাতে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই যেন তিনি বিশেষ তৃপ্তি পাইতেন।

এই সময়ে বড়লাট লর্ড কুর্জ্জন সস্ত্রীক বহরমপুর কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে আগমন করেন। সভাভঙ্গের পর লাটদম্পতি কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদের গাড়ী-বারান্দার নিম্নে আগমন করেন। অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন দেখিয়া বড়লাট সাহেব বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র তখন বালক মাত্র, বড়লাট তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া কর মর্দ্দনপূর্ব্বক মহারাজকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন।

এই বৎসর মহারাজ বাল্যকালের সেই শিরঃপীড়ায় খুব কষ্ট পাইতে লাগিলেন। যে অবস্থায় অন্যে শয্যা গ্রহণ করে—সে অবস্থায় মণীন্দ্র-চন্দ্রের কাছারীর কাজ ঠিক অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতে লাগিল।

এই সময় "কুইন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল" স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল,—কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। এই বিরাট সৌধ নির্ম্মাণের ভার পাইয়াছিলেন—বাঙ্গালী জাতির গৌরব অসাধারণ কর্ম্মী স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্থাপত্য বিভাগের স্যর প্যাট্রিক প্লে ফেয়ারকে (Sir Patrick Playfair) মহারাজ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে জানাইলেন যে তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ডে ১,০০,০০০৲ এক লক্ষ টাকা দান করিবেন—তখনকার বড়লাট লর্ড কুর্জ্জন মহারাজের এই দান সাদরে গ্রহণ করিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার জাগেশ্বরডিহী নিবাসী উমেশচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় ঋণদায়ে বিব্রত হইয়া মহারাজের দ্বারস্থ হইলেন। তাঁহার ঋণ শোধের জন্য ১৫৮০৲ টাকা এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীর সভাপণ্ডিত স্বর্গীয় রমাপতি তর্কভূষণের পত্নীর শ্রীবৃন্দাবন ধামে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা দান করিলেন।

গুণীর মর্য্যাদা করিতে মণীন্দ্রচন্দ্র কোনও দিনই কার্পণ্য করিতেন না। শিল্পী, সাহিত্যিক ও গায়ক গুণানুসারে মহারাজের নিকট হইতে সম্মান পাইয়াছেন। মুর্শিদাবাদ নবাব হাই স্কুলের ড্রইং মাষ্টার শ্রীশচন্দ্র

পালিত চিত্র বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তৈল-চিত্র অঙ্কনে তাঁহার বিশেষ হাত আছে জানিতে পারিয়া মহারাজ প্রাসাদ-কক্ষ সুসজ্জিত করিবার জন্য তাঁহার দ্বারা ক্লিয়োপেট্রা প্রভৃতির বৃহদাকার ছবি আঁকাইয়া লইলেন। আজ পর্য্যন্তও সেগুলি রাজপ্রাসাদে সম্পদ্ স্বরূপ রক্ষিত হইতেছে।

কাশিমবাজার এষ্টেট হাতে পাইয়া উহার স্থাপয়িতা কান্তবাবুর কথা মহারাজ বিশেষ ভাবে মনে করিতেন। কান্তবাবুর একখানি বিশদ জীবনী লিখাইবার ইচ্ছা তাঁহার বহুদিন হইতেই ছিল। এই কার্য্যের ভার মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের উপর দেওয়া হইল। মহারাজের আর্থিক সাহায্যে এই কার্য্য করিবার জন্য ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নিখিলবাবু কলিকাতার "রাণী কুঠীতে" আসিলেন। ২৪ দিন কাজ করিবার পর অর্থাৎ উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহা পুস্তকাকারে লিখিয়া যাইবার পর সেই পাণ্ডুলিপিকে পুনরায় ভাল করিয়া (fair) লিখিবার জন্য নিখিলবাবুর পত্রানুযায়ী মহারাজ মাসিক বেতনে একজন সহকারীও নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

নিখিলবাবু এই সময় মুর্শিদাবাদ-কাহিনী লিখিতেছিলেন—সেই পুস্তকের ব্লক ইত্যাদির খরচ বাবদ মহারাজ তাঁহাকে ৩০০৲ টাকা দান করিলেন। কিন্তু সে যাহা হউক, নিখিল বাবুর লিখিত কান্তবাবুর জীবনী আমরা দেখি নাই—লেখা হইয়াছিল বলিয়াও আমাদের জানা নাই। কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস লেখার ভার তিনি আর একটি যোগ্য ব্যক্তি পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের উপর দিয়াছিলেন ;—অর্থব্যয়ও তাঁহার তাহাতে কম হয় নাই। লণ্ডনে অবস্থানকালীন পৃথ্বীশবাবু ইণ্ডিয়া অফিস সংলগ্ন বিরাট পুস্তকাগার হইতে অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া আনিবেন এইরূপ নাকি কথাবার্ত্তা ছিল। কয়েক পৃষ্ঠা কাগজে টাইপ করা সে অমূল্য উপাদান মহারাজ বাহাদুরের কাঠের বাক্সে উত্তরকালে কোনও গবেষকের হাতে পাঠোদ্ধারের আশায় সংরক্ষিত

রহিল! মহারাজেরই অর্থব্যয়ে কান্তবাবুর জীবনী লিখিয়াছেন ঢাকার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ; সে পুস্তকের নাম কান্তনামা।

বর্ষার শেষে জলপ্লাবনে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের রেলপথ রামপুর-হাট হইতে বারহারোয়া পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়। সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ এই বন্যায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গবাদি পশুর জীবন নষ্ট ও বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়ে।

মহারাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এই দুঃস্থ গ্রামবাসিগণের সাহায্যার্থ যে সাহায্য ভাণ্ডার খুলেন তাহাতে তাঁহার নিজের দান ছিল ১৫০০০৲ পনের হাজার টাকা।—দেশের এই দারুণ দুরবস্থাতেও সে সময় খাগ্‌ড়ার বাজারে খাঁটি গব্য ঘৃতের সের এক টাকা এবং মফঃস্বলে উহার মূল্য তখন ৸৴০ চৌদ্দ আনা। সময়ের এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমরা দুঃখ সহিবার, সকল অভাবের সহিত নিজেদের মানাইয়া চলিবার সুযোগ পাইয়াছি।

ঘটনাসূত্রে এই বৎসর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় হয়। বাঙ্গলা দেশে সাহিত্য সম্মেলনের প্রবর্ত্তন ব্যাপারে এই পরিচয় আরও গভীর হইয়াছিল।

অল্পকালের মধ্যেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সুনাম ও দানের কথা বাঙ্গলা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল—দেশের অভিজাত সম্প্রদায় মহারাজের নাম লইয়া গৌরব করিতে লাগিলেন। ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁহার ৭৭নং লোয়ার সারকুলার রোডের বাড়ীতে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। সভাস্থ হইবার কিছুক্ষণ পরেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র হঠাৎ শিরোরোগের আক্রমণে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। একটি স্কুলের ছাত্র ঐ নিমন্ত্রণ সভায়

উপস্থিত ছিলেন, তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় মহারাজের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ মহারাজ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন ; ছাত্রটিকে সেদিন আর কিছু বলিলেন না কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র তাহার কথা ভুলিতে পারেন নাই।

এই ছাত্রটির নাম নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—ইনি সার্পেন্টাইন লেনে থাকিতেন। ইহার কিছুদিন পরে, তখন শীতকাল—মহারাজ ছাত্রটির জন্য নগদ ১০০৲ এক শত টাকা ও একখানি বহুমূল্য শাল পাঠাইয়া দিলেন। অথচ একদিন মহারাজকুমারের জন্য শাল কিনিবার অনুমতি চাহিয়া কর্ম্মচারী যতীন্দ্রবাবু মহারাজের নিকট হইতে যে উত্তর পাইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বিখ্যাত কবি ও জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর সুপারিশে সত্যভূষণ গুপ্ত নামে একজন বিলাতপ্রবাসী চিত্রশিল্পীর সাহায্যকল্পে মহারাজ মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনী মোটামুটি ভাবে ধরিতে গেলে তাহা সুবিস্তৃত দানের বিবরণ বলিয়া মনে হওয়াও বিচিত্র নহে।

এই বৎসরে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্সের প্রেসিডেন্ট্ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র দিল্লীর দরবারে বিশেষ নিমন্ত্রণ পাইয়া ২রা পৌষ তারিখে দিল্লী রওনা হইলেন।

সেখান হইতে ফিরিয়াই বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীর আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন—নাটোরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়,—মহারাজ নিজে ছিলেন—ইহার অন্যতম উদ্‌যোক্তা।

নাটোরের মহারাজ ব্যাঞ্জেটিয়া হাউসে কাশিমবাজারের অতিথি হইয়াছিলেন। এইভাবে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র স্বদেশ ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর কীর্ত্তি শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

মহারাজকুমার কীর্ত্তিচন্দ্র

মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র

চলিলেন তাহা নহে—ক্রমশঃ তাঁহার কার্য্যকলাপে তাহা আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙ্গলা সরকার অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে জমিদারবর্গের নিকট হইতে সেই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা চলিতে লাগিল, সেই প্রসঙ্গে মহারাজ বাহাদুর রংপুর জজকোর্টের উকিল বরদাপ্রসাদ বাগচীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অন্যায়ের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ পাইলেও রাজতন্ত্রের প্রতি কোনও প্রকার বিদ্বেষের ভাব দেখা যায় না। সেই পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"• • • Permanent Settlement বন্দোবস্তে গভর্ণমেণ্ট অনুতপ্ত, বঙ্গদেশের এই অনুগ্রহ-প্রাপ্ত জমিদারবর্গের উপর পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। এই মতে আমি আপনার সহিত ভিন্নমত নহি। যাহা হউক what can not be cured must be endured. রাজভক্তির সহিত আমাদিগকে সবই সহ্য করিতে হইবে।"

সন ১৩১০ সালের কথা—

মধ্যম মহারাজকুমার কীর্ত্তিচন্দ্র ১১ই কার্ত্তিক, গোষ্ঠাষ্টমীর দিন মাত্র আঠার বৎসর বয়সে মারা গেলেন। বার বৎসর বয়সে কীর্ত্তিচন্দ্র কাশিমবাজার রাজভবনে আসিয়াছিলেন, রূপে গুণে তিনি সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহারাজ ও মহারাণীর সুখের জীবনে ইহাই প্রথম শোক—অতি মর্ম্মন্তুদ পুত্রশোক!

কীর্ত্তিচন্দ্র যখন মর্ত্ত হইতে বিদায় লইতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়েই রাজবাটীতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গোষ্ঠাষ্টমীর উৎসব-উপলক্ষে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ এই হৃদয়বিদারক সংবাদে রাজধানী শোকার্ত্ত হইয়া উঠিল। অসাধারণ ধৃতিমান মণীন্দ্রচন্দ্রও সেদিন পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা

এই যে, সেই দিনই অপরাহ্নে তাঁহার ইংরাজি বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী জগৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া গঙ্গাতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মহারাজ ঘরে ফিরিলেন।

প্রিয়তম পুত্রের আকস্মিক বিয়োগে মহারাজ খুবই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে কিন্তু রাজার উপযুক্ত ধৈর্য্য তাঁহার ছিল, লৌকিক কর্ম্মের কোনও ত্রুটিই তিনি হইতে দিলেন না। পরবর্ত্তী মাসের ২০শে তারিখে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন ও সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিয়া পুত্রশোকে শান্তি পাইবার আশায় মহারাজ সপরিবারে পুরী রওনা হইলেন। কিছুদিন তথায় বাস করিবার পর তিনি রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে মনোযোগ দিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ঘরের সুখদুঃখের সহিত মহারাজের জীবনসূত্র সর্ব্বদা বাঁধা থাকিত। মুর্শিদাবাদ নবাব-বংশ সম্মানে বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়। এই শীর্ষস্থানীয় নবাববংশের সহিত মহারাজের কিরূপ আত্মীয়তা ছিল তাহা সন ১৩১০ সালের ২৪শে চৈত্র মহারাজের প্রাইভেট্ সেরেস্তা হইতে বহরমপুরের আমমোক্তার বিহারিলাল গাঙ্গুলীকে লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায়ঃ—

"মৃত সুলতান সাহেবের পুত্র আলিমীর্জ্জা ওরফে নবাবমীর্জ্জা তাঁহার মাসিক পেন্‌সন হইতে তাঁহার স্ত্রী নবাব দিলসাদ্ বেগমকে মাসিক ২৫০৲ টাকা পেন্‌সন দিতে অঙ্গীকার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বরাবর দলীল লিখিয়া দিয়াছেন। সেই টাকা আদায়ের জন্ত উক্ত দিলসাদ্ বেগম আপনাকে power of attorney দিতেছেন। আপনি তাঁহার টাকা মাসিক নেজামৎ পেন্‌সন ফণ্ড হইতে আদায় করিয়া শ্রীযুক্ত হুজুর মহারাজ বরাবর পাঠাইয়া দিবেন। উক্ত দিলসাদ্ বেগমের খুল্লতাতদ্বয় এই আমমোক্তারনামার সাক্ষী। বোম্বাই হাইকোর্টের জজ বদরুদ্দিন সাহেব মহারাজকে একজন আমমোক্তার নিয়োগ করিতে অনুরোধ করায় মহারাজ আপনার নাম লিখিয়া পাঠাইতে এই আমমোক্তারনামা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যদি ইহার বলে কার্য্য হয় ভালই, নচেৎ যাহা করিতে হইবে মহারাজ আসিলে তিনি তদ্বিধ কার্য্য করিবেন।"

বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর ও স্বর্গীয় মহারাজের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুখে দুঃখে উভয়ের মধ্যে ভাববিনিময় হইত। মুর্শিদাবাদ নবাব-বংশের মান-মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। প্রয়োজন হইলে রাত্রি দ্বিপ্রহরেও সকলের অজ্ঞাতসারে মুর্শিদাবাদ নবাবপ্রাসাদে উপস্থিত হইতে মণীন্দ্রচন্দ্র বিন্দুমাত্র আলস্য বোধ করিতেন না।

সন ১৩১১ সালের কথা—

১৯শে বৈশাখ তারিখে মধ্যম মহারাজকুমারী কুমুদিনীর সহিত রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর পুত্র নিরোদচন্দ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ বদরুদ্দিন তায়েবজী এবং তাঁহার ভ্রাতা বোম্বাই হাইকোর্টের এটর্ণী আমিরুদ্দিন তায়েবজী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই তায়েবজী ভ্রাতৃদ্বয় মহারাজের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কাশিমবাজার রাজবাটীতে কোন বৃহৎ কর্ম্ম বা উৎসবে বাঙ্গলার বাহিরে সুদূর মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য-ভারত, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ হইত। এক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্যের কোনও স্থান ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সব সম্প্রদায়ের সকল বন্ধুই মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট সমান সমাদর লাভ করিতেন। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে মণীন্দ্রচন্দ্রের লৌকিকতাপূর্ণ পত্রাবলী পাঠ করিলে তাঁহার জাতিনির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা যে কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময় বাঙ্গলা দেশের শিল্পোন্নতির জন্য স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া "ইণ্ডিয়ান ইনডাষ্ট্রীয়াল এসোসিয়েশন" নাম দিয়া যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তাহার স্থায়ী

সভাপতি ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই—কিন্তু এই সব ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা অনুষ্ঠানের সহিত মহারাজের প্রত্যক্ষ যোগ দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে জাতিগঠনের দিক দিয়া কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে এই স্বদেশসেবক কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করিয়া গিয়াছেন। দেশের উন্নতিকর কোনও প্রচেষ্টা মণীন্দ্রচন্দ্রের সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই,—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অনেকক্ষেত্রে আহ্বানের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইতেন। দেশপ্রাণতার ইহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় আর কি হইতে পারে?

৩০শে বৈশাখ তারিখে বাঙ্গলা দেশের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান সি, আই, ই এবং একজন বিখ্যাত হিন্দু জমিদারের যথাক্রমে ৮,০০০৲ আট হাজার ও ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট তামাদী হইতেছে দেখিয়া মহারাজ তাঁহার কলিকাতাস্থ এজেণ্ট যোগীন্দ্রনাথ ঘোষকে পত্র লিখিতে বাধ্য হইলেন।—উক্ত ঋণগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদ্বয়ের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় অথচ টাকা আদায়ের চেষ্টা না করিলেও হ্যাণ্ডনোট তামাদি হইয়া এষ্টেটের এতগুলি টাকা নষ্ট হইয়া যায়;—কিন্তু টাকার তাগাদা করিতে গেলে পাছে তাঁহাদের সম্ভ্রমের হানি হয় এই আশঙ্কা করিয়া মহারাজ যোগীন্দ্রবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্রে জানাইলেন যে,—তাঁহাদের নিকট টাকা আদায় করিতে গিয়া যাহাতে কোনরূপে তাঁহাদের সম্ভ্রমের হানি না হয় এমন বিনীতভাবে তাগাদা করিতে হইবে। যদি তাঁহারা নিতান্তই টাকা দিতে না পারেন—তবে বাধ্য হইয়া হ্যাণ্ডনোট বদলাইয়া লইতে হইবে।

অপরের মান-সম্ভ্রম সম্বন্ধে এমনি তাঁহার ধারণা ছিল বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের কোনও জমিদারের দুরবস্থাগতিকে সম্ভ্রমহানি হইতেছে জানিতে পারিলে, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন এবং সেই চেষ্টা করিতে গিয়া বহু জমিদারীর

ট্রাষ্টী হইয়া তিনি যে কি পরিমাণ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

১৫ই ভাদ্র মহারাজের নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া বাঙ্গলার ছোট লাট স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার বহরমপুর বাঞ্জেটিয়া এড্ওয়ার্ড-কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর পারিতোষিক বিতরণ করিতে কাশিমবাজার আগমন করেন; তখন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ই, এ, মর্ফি এম্-এ, এই প্রদর্শনীর কার্য্যকরী সভার সভ্য ছিলেন।

এই বৎসরেই (ইং ১৯০৪ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র "কাশিমবাজার কুর্জ্জন চেরিটেবল ডিস্পেনসারী" নামক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ছোট লাট এই চিকিৎসালয়গৃহের ভিত্তি-শিলা (Foundation stone) স্থাপন পূর্ব্বক ডিস্পেন্সারির দ্বার-উদ্ঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যু-দিবসে রাজবাটীতে থাকা কষ্টকর মনে করিয়া মহারাজ সপরিবারে মহাপ্রভু ও তাঁহার শিষ্যগণের শ্রীপাট দর্শনের ইচ্ছায় ৫ই কার্ত্তিক, নবদ্বীপ কাটোয়া প্রভৃতি স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অগ্রদ্বীপের চরের নিকট হইতে দেখা গেল, একখানি বজরা হইতে বার বার নিশান দিয়া কে যেন কি ইঙ্গিত করিতেছে। মহারাজ নিজের নৌকা থামাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—কিছুক্ষণ পরে ক্যাশিয়ার জ্ঞানবাবু প্রভৃতি বালুচরের উপর দিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া মহারাজসমীপে কাশীতে রাণী হরসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ নৌকা ফিরাইয়া কাশিমবাজার আসিলেন এবং অবিলম্বে কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে কাশীতে পৌঁছাইতে না পারায় এবং অশৌচের নির্দ্দিষ্ট দিন অবগত না থাকায় মাতামহীর শ্রাদ্ধাদি তখন কিছুই হইল না। ১৩ই কার্ত্তিক কাশীধাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া—মহারাজ ১৬ই কার্ত্তিক কাশিমবাজার রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ৭ই কার্ত্তিক

হরসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছিল; ২১শে পৌষ তারিখে তাঁহার বিরাট দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া মহারাজ মাতামহীর প্রতি নিজের যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন।

এই বৎসরের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—**বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনে** মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রকাশ্য ভাবে যোগদান। এই বঙ্গ-ভঙ্গ * (Bengal partition) সমগ্র বাঙ্গলা দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিবার জন্য বাঙ্গলা দেশের নেতৃবর্গ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে দেশব্যাপী আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া সভাসমিতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক চেতনায় বাঙ্গলা দেশ জাগিয়া উঠিল। এই বঙ্গ-ভঙ্গের আদেশ রদ করাইবার জন্য ভাদ্র মাসে কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহূত হইল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে বাঙ্গলা দেশে এপ্রকার বিরাট সভা তখনকার দিনে সর্ব্বপ্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গলা দেশের রাজা মহারাজ ও জমিদার কেহই গভর্ণমেণ্টের এই ঘোষণা পছন্দ করেন নাই; কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও প্রকাশ্য-ভাবে সভা-সমিতিতে কেহই যোগদান করিতে সাহস করিলেন না। উপাধিধারী বা উপাধিশূন্য ছোটখাটো ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র এবং মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য সেই সময় বঙ্গের ঠিক দুই দিক হইতে চন্দ্র সূর্য্যের মত রাজনৈতিক গগনে উদিত হইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিলেন। সেই বিরাট বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ বিলাতী-বর্জ্জন-নীতি গ্রহণের নিমিত্ত আহূত জনসভার সভাপতি

* 'বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন'—শীর্ষক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

হইলেন—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র।—তিনি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মপদ্ধতির তীব্র সমালোচনাপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিলে সভায় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।

উপাধিধারী মহারাজের এই প্রকার প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক মতামত প্রচারে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন—কিন্তু স্বদেশপ্রেম এমন ভাবেই মহারাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জনমতের প্রতি বাঙ্গলা সরকারের উপেক্ষা তাঁহাকে এমনি ভাবে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল যে, বাঙ্গলা সরকার 'উপাধি' কাড়িয়া লইবেন এই ভীতি প্রদর্শিত হইলেও তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"গেলই বা আমার 'মহারাজ' উপাধি—আমি আবার যে 'মণীন্দ্রবাবু' সেই মণীন্দ্রবাবুই হইব।"

কথায় ও কাজে কি করিয়া সামঞ্জস্য রাখিতে হয় তাহা দেখাইয়া মহারাজ সর্ব্বপ্রথম নিজে স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া এক সঙ্গে ১৬ খানি তাঁত বসাইলেন এবং সেই তাঁতের কাপড় রাজপরিবার ও রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রচলন করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের সম্মুখে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহার জমিদারীর বড় বড় পরগণা ও মাহালগুলির মধ্যে স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্প-প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারী দ্বারা প্রজাগণের প্রতি বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী দ্রব্য ক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিলেন। এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণাতেই ব্যাণ্ডোটিয়া কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর সৃষ্টি। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে মুর্শিদাবাদবাসী ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণের সহানুভূতির অভাবে, মহারাজের অবস্থাবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি দেশহিতকর অনুষ্ঠান লুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যে কতখানি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা কলিকাতার শ্যামবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ স্কুলপাঠ্য পুস্তকরচয়িতা জগবন্ধু মোদককে ২১শে ভাদ্র (১৩১২ সালে) তারিখে লিখিত তাঁহার এই নিম্নের পত্র হইতে বুঝা যায়—

"* * * বঙ্গের পার্টিসন লইয়া খুব একটি গোলমাল ঘটিয়া গেল। কার্য্য কিছুই হইল না। গভর্ণমেণ্ট আমাদের কথা শুনিলেন না। আমাদের বিশেষ অসুবিধা ঘটায় প্রকাশ্যভাবে টাউন হল মিটিংএ যোগদান করিতে হইয়াছিল। * * * অবশ্য আমাদের দয়ালু গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু ইহা না করিলে আমার উপায় ছিল না। * * * স্বদেশজাত দ্রব্য যাহাতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণ লোকে তাহা ব্যবহার করে তাহার জন্য এক্ষণে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের দেশে বিলাতী বস্ত্র এবং আমাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাহাতে উৎপন্ন হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।"

স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা লইয়া মহারাজ স্বদেশী বস্ত্রের প্রতি যে কতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা অমৃতবাজার পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক মতিলাল ঘোষকে লিখিত পত্রের শেষাংশ হইতে বুঝা যায়—

"I have not seen Jahari Lal's loom. But I believe it to be superior to all other looms when you quoted the name of our friend who has seen it with his own eyes. I am ready to contribute to the fund a sum of Rs. 500/- required to start a small manufactory by Jahari lal."

৫ই চৈত্রের একটি পরামর্শ-সভায়, মহারাজের মধ্যস্থতায় ও নির্দ্দেশ অনুসারে রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের সহিত তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেত্রনাথ পালের (খেতন বাবু) সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা হইয়া তাঁহারা 'পৃথক' হন। উক্ত পরামর্শ-সভা বৈকুণ্ঠনাথ সেন, হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন বহরমপুরের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে লইয়া গঠিত হইয়াছিল। এই সময় শ্রীনাথ পাল মহাশয় মহারাজকে এই পারিবারিক মধ্যস্থতা করিবার ভার দিয়া তাঁহার উপর যেরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়াছিলেন তাহাতে মহারাজের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

সন ১৩১২ সালের কথা—

১৭ই বৈশাখ তারিখে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের চূড়াকরণ-উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইল।

মহারাজের মাথরুণের পৈতৃক বাটী পাকা ছিল না—এই সালের প্রথমেই এই বাড়ীখানির পাকা ইমারতের কাজ আরম্ভ হয়। এই ভিটার উপর মহারাজের যে বিশেষ মমতা ছিল—তাহা তাঁহার নানা কথাবার্ত্তায় আমাদের বুঝিবার অবকাশ হইয়াছিল। একদিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণপ্রয়াসী জনৈক ভদ্রলোককে বলিতেছিলেন —"দেখুন, দেশ বিদেশে নিজের য'খানা ইচ্ছা বাড়ী তৈরী করুন— নিজের পৈতৃক ভদ্রাসনখানি সংস্কার করিয়ে রাখ্‌বেন। আমার মাথরুণের বাড়ীখানি আমি প্রতিবৎসর সংস্কার করে থাকি। কি জানি ম'শায়, কপালে কখন কি ঘটে—যে অবস্থাতেই পড়ি, মাথরুণের পৈতৃক ভিটে থেকে ত কেও আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।"—

মহারাজ বিলাত যাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন। তিনি বলিতেন, বিলাতে না গেলে স্বাধীন দেশের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার বিষয় শুধু ঘরে বসিয়া সম্যক জানিতে পারা যায় না। নিজের দেশে ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজের ব্যবহার খুব ভদ্র, সদাশয় ও সহানুভূতি-পূর্ণ বলিয়া শুনিয়াছি—হতভাগ্য পরাধীন ভারতের ভাগ্যে স্বাধীন ইংরাজ জাতির ব্যবহার ত দিবারাত্রি স্বচক্ষে দেখিতেছি;—মুষ্টিমেয় সহৃদয় ইংরাজবন্ধুগণের ব্যবহারে তাহা ভুলিতে পারা যায় না।— মাটির দোষ, অদৃষ্টের দোষ—জাতিগত ভাবে আমাদের এই স্বল্পেতুষ্ট ভারতবাসীর দোষের ত আর অন্ত নাই। কিন্তু স্বচক্ষে একবার ইংরাজ জাতিকে তাহাদের আপনার দেশে দেখিতে চাই। যে জাতি আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইলে হয়ত বা তাহার সে কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইতে দুঃখ বা দ্বিধা বোধ হইবে না—কিন্তু যাহাকে ভাল করিয়া জানিলাম না—বুঝিলাম না—আত্মীয়তা দূরের কথা

শাসক ও শাসিত সম্পর্কে যাহার ও আমার মধ্যে শুধু ব্যবধানেরই সৃষ্টি হইয়া চলিল—তাহাকে জাতির শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সসম্মানে বরণ করিয়া লইতে যে কুণ্ঠা ও দ্বিধা জাগে—নিঃশেষে তাহা জয় করিতে হইলে দুই জাতির মধ্যে ভাবের সত্যকার বিনিময়, কৃষ্টির অকৃত্রিম পরিচয় হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।—আমরা কতকাল আর 'সাত সমুদ্র তের নদী'র ব্যবধানকেই একান্ত মনে করিয়া আপনার ঘরে কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিব?" হিন্দু হইয়াও মহারাজের কোনও প্রকার গোঁড়ামী ছিল না; স্বদেশের হিতকামী হইয়াও বিদেশের প্রতি কোনও প্রকার বিদ্বেষের ভাব তাঁহার মনে কখনও স্থান পাইত না।

নানা কারণে সুযোগের অভাব ঘটিল—মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না—কত বিদ্যার্থী, শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষাভিলাষী যুবককে যে তিনি অর্থসাহায্য করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়াছিলেন তাহার সংখ্যা করা যায় না।

এই সম্পর্কে তিনি দুঃখ ও ক্ষোভ করিয়া বলিতেন—"কয়জনই বা মানুষ হইল? কয়জনই বা স্বাধীন হাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া, উন্নত বলিষ্ঠ জাতির সান্নিধ্য লাভ করিয়া দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিল? ফিরিঙ্গিয়ানা শিখিয়া, চাল বাড়াইয়া যাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিল বা আসিল না, তাহারা আমার অর্থ নষ্ট করিল বলিয়া আমার তত দুঃখ হয় না—যত দুঃখ হয় তাহাদের অধঃপতনে দেশের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত ক্ষুণ্ণ হইতেছে দেখিয়া। আমাদের জীবনকে, চরিত্রকে যদি দেশের সম্মুখে আদর্শরূপে ধরিতে না পারিলাম তবে কর্ম্মের সকল উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হইয়া গেল!"

সন ১৩১৩ সালের কথা—

অনেকেই মনে করেন মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাজ হইয়া প্রথম জীবনের অশেষ দুঃখ ও অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, বিপুল

সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, ইচ্ছানুরূপ ব্যয় করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি নিশ্চয়ই আনন্দে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজিতে একটা বড় কথা আছে "Uneasy lies the head that wears a crown" অর্থাৎ রাজমুকুট কণ্টকাকীর্ণ,—এ কথা মণীন্দ্রচন্দ্রের "মহারাজ-জীবনে" বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া গিয়াছে।—তিনি যে কি পরিমাণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় জীবন যাপন করিতেন তাহা তাঁহার পরম বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ বসুকে (ব্যাঙ বাবু) লিখিত একখানি পত্র হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—১৩১৩

প্রিয় ব্যাঙ,

সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আমি অস্থির হইয়া আছি। হৃদয়ে আমার সুখ নাই। সুখ আমাকে ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। "অর্থ বিষম অনর্থের মূল" ইহা চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম। এতদিনে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। মনে করিয়াছিলাম আমার প্রয়োজন দূর হইলেই আমার অর্থাভাব হইবে না, অর্থাভাবজন্য কষ্ট পাইব না। এক্ষণে দেখিতেছি, সংসারে যতকাল থাকিব অর্থাভাব ততদিন থাকিবে। সুতরাং আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইবে। আমার এমন সময় নাই যে, সময়ে দুজনে মনের কথা কহিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করি। চারিদিকে হাহাকার—টাকা টাকা। চারিদিকে টাকা টাকা—টাকা আমাকে পাগল করিতেছে।

তোমার মণি

কিন্তু এ টাকার জন্য পাগল হওয়া কি নিজের জন্য?—ব্যক্তিগত সুখ সম্ভোগের জন্য?—তাহা নহে;—তাঁহার টাকার নিত্য প্রয়োজন ছিল অপরের দুঃখ-অভাব দূর করিবার জন্য, পরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য। তাঁহার মনে হইত, দুই হাতে বিলাইয়া যাইব;—বিলাইয়াছেনও সেই ভাবে, কিন্তু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ধনভাণ্ডারেরও ত সীমা আছে?—অভাব হইলেই তিনি দুঃখবোধ করিতেন কিন্তু নিজের জন্য কখনও তিনি কোনও অর্থের অভাব অনুভব করেন নাই। তাঁহার অর্থব্যয়ের ধারা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।

এই মাসেই মহারাজ ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার মুর্শিদাবাদী আম কিনিয়া বাঙ্গলা দেশে তাঁহার পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

'রাজযোগে' মহারাজের জন্ম,—'ঋণযোগ' বলিয়া কোনও যোগ জ্যোতীষ শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না কিন্তু জীবনব্যাপী এই দুর্য্যোগে তিনি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছেন। নিম্নলিখিত পত্রখানি এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করা হইল ;—

Babu Ramlal Mullik
17, Kaliprasad Dutt's Street,
Calcutta.

২৮শে আষাঢ়, ১৩১৩।
কাশিমবাজার রাজবাড়ী

নমস্কারান্তে নিবেদনমিদং—

আপনার ২৭শে আষাঢ়ের পত্র পাইয়াছি। ৫৲ টাকা সুদে ১২,০০,০০০৲ বার লক্ষ টাকা কর্জ্জ লইতে রাজী আছি। আপনি কথাবার্ত্তা চালাইয়া ঠিক হইলে লিখিবেন। যাহা করিতে হয় করা যাইবে। এত টাকা একটু সুদ কমে করিবার চেষ্টা দেখিবেন। কৃতকার্য্য হইতে পারেন ভালই নচেৎ transaction পাঁচ টাকা সুদে শেষ করিবেন।

ভবদীয়—
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

কার্ত্তিকমাসে মহারাজ স্পেশাল ট্রেণযোগে সপরিবারে, সবান্ধবে এবং বহু কুটুম্বসমভিব্যাহারে সর্ব্বসমেত প্রায় তিন শত সহযাত্রী লইয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তীর্থযাত্রা করেন। যাত্রার পূর্ব্বদিনে রাজবাড়ীর বহু ছবি ভস্মীভূত হইয়া যায়। অনেকে যাত্রা করিতে নিষেধ করিল—কিন্তু মহারাজ সে নিষেধে কর্ণপাত করিলেন না। আজিমগঞ্জ রেলপথে প্রথমে গয়ায় আসিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার বিশেষ বন্ধু পশুপতি বাবুর বাড়ীতে কুড়িদিন অতিথি হইয়া থাকিলেন।

পশুপতিবাবু ভূরিভোজন করাইয়া—প্রতিদিন বাইনাচ দেখাইয়া রাজ-অতিথি ও তাঁহার সহযাত্রিগণের চিত্তবিনোদন করিলেন। সেখানে কাঙ্গালিদিগকে কম্বল দান করিয়া মহারাজ কাশী আসিলেন ;—কাশীতে তিন মাস কাল থাকা হইল। মহিমচন্দ্র নিজে একজন উচ্চ শ্রেণীর "ঘোড়সোয়ার" ছিলেন—তাই তাঁহার নিজের ঘোড়াটি সঙ্গেই আসিয়াছিল।—এখানে আসিয়া সেটীর মৃত্যু হইলে মহিমচন্দ্র অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন—"আমি মরিলেই ভাল হইত।"

মহারাজ সদলবলে কাশী হইতে রেলপথে অযোধ্যা হইয়া হরিদ্বার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফাল্গুন মাসের ১৩ই তারিখের মধ্যে কন্‌খল প্রভৃতি দর্শন শেষ করিয়া তাঁহারা ১৬ই ফাল্গুন স্পেশাল ট্রেণে মথুরায় আসিলেন। সেখান হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া সকলে মহারাজের "পুলিনকুঞ্জে" কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় দিঘাপতিয়ার বাড়ীতে মহারাজের মধ্যম ভগ্নীর কলেরায় মৃত্যু হইল। কিন্তু তাহাতে মহারাজ তীর্থযাত্রার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন না। সহযাত্রিগণের মধ্যে ছিলেন—মহারাণী, মহারাজকুমারদ্বয় ও মহারাজ-কুমারীগণ, মহারাজ বাহাদুরের ভগ্নীগণ, বৈবাহিক হেমেন্দ্রবাবু; কর্ম্মচারি-গণের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানবাবু, নৃত্যগোপাল বাবু, শিববাবু ডাক্তার, কেরাণীখানার কালীবাবু, ভাণ্ডারের নৃসিংহবাবু, তোষাখানার রামনিরঞ্জন বাবু, ফরাসখানার জনৈক কর্ম্মচারী।

আট ক্রোশ অশ্বারোহণে বন-পরিক্রম করিতে করিতে যখনই পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন তখনই সেইস্থানের জল পান করিয়া মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র রাধাকুণ্ডে আসিবামাত্র প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। জ্বর ক্রমে সাংঘাতিক টাইফয়েডের আকার ধারণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তীর্থযাত্রীর দল গোবর্দ্ধনে আসিয়া পৌছাইল, সেখানে মহিমচন্দ্র একুশ দিন একভাবে শয্যাগত থাকিলেন। স্থানীয় ডাক্তার কেদার বাবু বলিলেন টাইফয়েডের জ্বর। তাহার পর জ্ঞানবাবুকে পাঠাইয়া

আগ্রা হইতে বিখ্যাত ডাক্তার রমাপ্রসাদ বাগচী এবং সেখানকার সিভিল সার্জ্জনকে আনা হইল। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! সন ১৩১৩ সালের ১১ই চৈত্র বৈষ্ণবচূড়ামণি মণীন্দ্রচন্দ্রের বৈষ্ণবপ্রাণ প্রিয়দর্শন পুত্র গিরিগোবর্দ্ধনের পবিত্র রজের উপর ২৫ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মধ্যম পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—সে শোক প্রশমিত হইতে না হইতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই অকাল মৃত্যুতে মহারাজ দারুণ শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; মহারাণী কাশীশ্বরী তখন পুত্রশোকে উন্মাদিনী। মায়ের প্রাণে এতও সহ্য হয়!

মহিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর সকলেই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। গোবর্দ্ধনে পর্ব্বতশ্রেণীর নিকটে মহিমচন্দ্রের নশ্বর ভৌতিক দেহের সংকার করা হইল।

তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩১৯ সালের ১৪ই চৈত্র তারিখে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র প্রিয়তম পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থ এই পুণ্যতীর্থ গিরি-গোবর্দ্ধনে একটি সুন্দর মঠ বা ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেখানে প্রতিদিন সাতজন অতিথির আহারের ব্যবস্থা আছে—নিরাশ্রয় তীর্থযাত্রীও দু'এক দিনের জন্য সেখানে আশ্রয় পাইতে পারে।

গঙ্গায় দিবার জন্য মহিমচন্দ্রের অস্থি সঙ্গে লইয়া পর দিনই মহারাজ স্পেশাল ট্রেণযোগে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময়েই অর্থাৎ ইং ১৯০৬ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে হ্যাণ্ডনোট দ্বারা মহারাজ কলিকাতা হাটখোলার শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও সাধুচরণ রায়চৌধুরীর নিকট হইতে শত করা ৭৲ টাকা সুদে ১ লক্ষ টাকা এবং ১৮ই নভেম্বর ঐ সুদের হারে আরও ৫০ হাজার টাকা উক্ত রায়চৌধুরী মহাশয়দিগের নিকট হইতে

কর্জ্জ করিলেন। মহারাজ এই সমস্ত টাকা সুদ সমেত ১৩১৪ সালের ২০শে আষাঢ় পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববর্ণিত বিপুল যাত্রিবাহিনীর সহিত তীর্থযাত্রায় মহারাজের কত ব্যয় হইয়াছিল তাহা জানিতে না পারা গেলেও, নিত্য অভাবগ্রস্ত মহারাজ-বাহাদুরের তহবিলে যে ঋণের এই টাকা মজুত ছিল না—অতএব তীর্থযাত্রাকে সমসাময়িক ঋণের প্রধানতম হেতু মনে করা অসঙ্গত নহে।

সন ১৩১৪ সালের কথা—

মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের অকাল মৃত্যুজনিত এই হৃদয়বিদারক শোকের অব্যবহিত পরেই আরও একটি শোকাবহ দুর্ঘটনা এই রাজ-দম্পতির সংসার-যাত্রার পথে অপেক্ষা করিতেছিল।

—২৪শে বৈশাখ রাত্রিশেষে দ্বিতীয় জামাতা নীরোদচন্দ্র পাল চৌধুরীর অতি অল্প বয়সেই মৃত্যু হইল। বিবাহিত জীবনের অনুভূতি হইতে না হইতে মহারাজকুমারী কুমুদিনীর অকাল বৈধব্য ঘটিল। সুকুমার বয়স হইতেই তিনি যে-প্রকার কঠোর বৈধব্য-ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন, বহু দিবস যাবৎ যে প্রকার মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দু বিধবার পক্ষে শ্লাঘার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজান্তঃপুরের অন্তরালে পতিহীনা মহারাজকুমারী আজীবন যে কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া আসিলেন,—সর্ব্বপ্রকার রিক্ততায় তিনি যে ভোগ-সম্ভোগের তুচ্ছতা প্রমাণ করিলেন, অন্তরের মণিকোঠায় সমাহিত সাধনায় তিনি এখনও পর্য্যন্ত যে পরমধনের সাধনা করিতেছেন—তাহাতে পিতৃবংশ উজ্জ্বল হইয়াছে—শ্বশুরকুল গৌরবান্বিত হইয়াছে। আর মহারাণী-মাতা কাশীশ্বরী? দুঃখ-বেদনার সে মর্ম্মভেদী ইতিহাস বুঝি লিপিবদ্ধ করিবার নহে। প্রতি দণ্ডপলে

অরুন্তুদ বেদনার সে অগ্নিদাহ—একমাত্র বুঝি তাঁহার মত মহিয়সী নারীর পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব !

সন ১৩১৪ সালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা কাশিমবাজারে **বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন।**

১৭ই কার্ত্তিক তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন প্রভূত অর্থব্যয়ে কাশিমবাজার রাজবাটীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠানে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহারাজের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। * মহারাজের আন্তরিক ইচ্ছা ও ঐকান্তিক

---

* নয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকতা-গ্রহণের পর একদিন যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া মাননীয় শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিত্য-পরিষদের ঢাক বাজাইয়াছি। যখনই অবসর হইয়াছে, কাঁধ হইতে ঢাক নামাইয়া পরিষদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা এবং অন্যের উপদেশ-গ্রহণ আমার ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট যখনই গিয়াছি, তখনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া আসিয়াছি। সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গালাদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতিসম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বার্ত্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙ্গালীজাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্য্যটার সূচনা হইতে পারে। বিলাতের British Association for the Advancement of Science যেমন বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন নগরে উপস্থিত হইয়া নূতন জ্ঞানের আহরণ ও পুরাতন জ্ঞানের প্রচার করিয়া থাকেন, সাহিত্য-পরিষদও সেই পথে চলিতে পারেন। British Association কেবল বিজ্ঞান-শাস্ত্রেরই আলোচনা করেন। বাঙ্গালাদেশে ঐরূপ

অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও রামেন্দ্রসুন্দরের চেষ্টাতেই তিনি এই সম্মিলনীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে-সময় পীড়িতা কন্যাকে লইয়া উৎকণ্ঠিত মনে নদীয়া জেলার শিলাইদহ গ্রামে নিজেদের কাছারী বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন।—কন্যার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় সম্মিলনে যোগদান করিতে পারিবেন না বলিয়া সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম উদ্যোগী, বহরমপুরের ডাঃ রামদাস সেনের পুত্র মণিমোহন সেনকে একখানি পত্র লিখেন। মণিবাবু মহারাজকে এ কথা জানাইবামাত্র তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন—

বিজ্ঞান-সভা গঠিত হইবার এমনও সময় হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎকে সাহিত্যের সকল বিভাগেই কাজ করিতে হইবে। আজ যদি আমি স্বীকার করি যে, রবীন্দ্র নাথের এক একটা কথা এক এক সময়ে মন্ত্রের ন্যায় আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে নিতান্ত ক্ষীণজীবী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। এই প্রস্তাবটিও তদবধি আমার মোহ জন্মাইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের লোকবল এবং ধনবল আমার অজ্ঞাত ছিল না। সেই ক্ষীণশক্তি লইয়া পরিষৎ কিরূপে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, সেই চিন্তা বহুরাত্রি আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ১৩১২ সালের শেষভাগে হঠাৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা হয়। রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এবং বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রায় এক সঙ্গে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবিগণকে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। বরিশালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু বরিশালের সাহিত্য-সম্মিলন সেই বৎসর বরিশালে আহূত রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনের পুচ্ছ আশ্রয় করিতে যাওয়ায় সম্মিলন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পর বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানও দৈবক্রমে নিষ্ফল হয়। তার পর বৎসর কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের আহ্বানে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ঘটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেখানে সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের সেই প্রথম বৎসরে বিজ্ঞান আলোচনার বিশেষ কোনও সুবিধাই ঘটে নাই। পর বৎসর রাজসাহী হইতে নিমন্ত্রণ আইসে। সেখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

Sreejut Ravindranath Tagore
Shilaidah. (Nadia)

কাশিমবাজার রাজবাড়ী
৭ই আশ্বিন, ১৩১৪

সসম্মান ও বিনয়সহকারে প্রণামান্তে নিবেদনমিদং

আপনার ২১শে ভাদ্র তারিখের শিলাইদহ হইতে শ্রীযুক্ত মণিবাবুর নামীয় পত্র পড়িয়া আপনার কন্যার পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ভগবৎ কৃপায় তিনি আরোগ্য লাভ করুন।

আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে আপনিই ধ্রুবতারা। আপনাকে ছাড়িয়া সাহিত্য-সম্মিলন হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। আপনি যদি ঐ সময়ে আসিতে না পারেন তাহা হইলে আমাকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। যাহা হউক আপনার কন্যার বর্ত্তমান অবস্থা এক্ষণে কিরূপ অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। লক্ষ্মীপূজার দুইতিন দিন পরে দিনস্থির করা আমাদের ইচ্ছা। আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি—

প্রণতঃ
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

শশধর রায় মহাশয়, সম্মিলন কোন পথে চালিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। সাহিত্যের নানা বিভাগের সম্যক্ আলোচনার জন্য সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান এই তিন শাখায় আপাততঃ বিভাগ করা যাইতে পারে, এই অভিপ্রায় আমি জানাইয়া-ছিলাম। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের আদর্শ আমার মনে জাগিতেছিল।

রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনকে শশধর বাবু যেরূপে প্রায় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পরিণত করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমিও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িয়া ছিলাম। সেবার সভাপতি ছিলেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কতকটা সেই কারণে এবং কতকটা শশধর বাবুর সূত্রচালনায় রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিকের এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ঘনঘটা হইয়াছিল। পর বৎসর ভাগলপুরে এবং তৎপর বৎসর ময়মনসিংহে বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ জটলার অবসর পান নাই। তবে ময়মনসিংহে স্বয়ং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটাই বৈজ্ঞানিকের অভিভাষণ।

মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখার কয়েক দিন পর হইতেই রবীন্দ্র নাথের কন্যার শরীর সুস্থ হইতে থাকে। কয়েকদিন পরেই শিলাইদহ হইতে তিনি কলিকাতার বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-সম্মিলন প্রসঙ্গে কবি-গুরুর বাটিতে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়া তাঁহার সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে ত্রিবেদী মহাশয় সেই দিনই কাশিমবাজার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের মুখে মহারাজ এই সুসংবাদ শুনিয়া কবিগুরুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

পর বৎসর ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনকে বিভিন্ন শাখায় বিভাগের প্রস্তাব যথারীতি উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তখন উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পর বৎসর হুগলীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লইয়া যে কয়েক জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কতকটা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। শশধর বাবু এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকদিগের একটি স্বতন্ত্র অধিবেশন হইয়াছিল এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরবৎসর চট্টগ্রামে আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই; কিন্তু যে কয়েকজন বিজ্ঞানসেবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে কতকটা স্বাতন্ত্র্যপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্মিলনের এই বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাস এই চারি শাখায় সাহিত্য-সম্মিলনকে বিভক্ত করিবার কল্পনা হইয়াছে এবং আমার উপর বিজ্ঞানসভার নকিবি-ভার অর্পিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ শাখাবিভাগ সর্ব্বত্র সাধ্য হইবে কি না বলা দুষ্কর। কলিকাতার পক্ষে যাহা সাধ্য স্থানাভাব, কালাভাব এবং লোকাভাবে মফস্বলের ক্ষুদ্র নগরগুলির পক্ষে তাহা সাধ্য না হইতে পারে।

(সাহিত্য-সম্মিলনী—কলিকাতার অধিবেশন; বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অভিভাষণ হইতে।)

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

শ্রীচরণেষু

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, কলিকাতা।

কাশিমবাজার রাজবাড়া।

২২শে আশ্বিন। ১৩১৪

সম্মান ও বিনয়সহকারে প্রণামান্তে নিবেদনমিদং

অদ্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রমুখাৎ আপনার কন্যার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল ও আপনি আমাদের সম্মিলনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবেন এই দুই সংবাদে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতেছি। মঙ্গলনিদান ভগবান আপনার কন্যাকে শীঘ্র রোগশূন্যা করুন।

গত রবিবার ১৯শে আশ্বিন আমরা একটি সাধারণ সভার আহ্বান করিয়া আগামী ১৭।১৮ই কার্ত্তিক ইং ৩।৪ঠা নভেম্বর রবি ও সোমবার আমাদের সম্মিলনের অধিবেশনের দিনস্থির করিয়াছি। বোধ হয় সে সময়ে আপনার আগমনের কোন অসুবিধা হইবে না। * * *

প্রণত:

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

এই প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন মণীন্দ্রচন্দ্র; "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"এর রচয়িতা ও 'উপাসনা'র প্রথম সম্পাদক চন্দ্রশেখর বাবু হইয়াছিলেন সম্পাদক এবং ধনরক্ষক হইয়াছিলেন মণিমোহন সেন। সম্মিলনের জ্ঞাতব্য বিবরণ উক্ত সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস হইতে পরিশিষ্টে উৎকলিত করা হইয়াছে। কাশিমবাজার রাজবাটীতে সাহিত্য ও সঙ্গীত-সম্মিলনী একত্র অনুষ্ঠিত হয়। একদিকে সাহিত্য-সম্মিলনে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মণীষিগণ, অন্যদিকে সঙ্গীত-সম্মিলনীতে সমাগত ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-বিশারদ এবং যন্ত্রীগণ—সকলে মিলিয়া এই যুক্ত অধিবেশনের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।—এইরূপ যুক্তভাবে সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মিলনীর বিরাট

অধিবেশন কেবল বাঙ্গলা কেন ভারতবর্ষেও এই প্রথম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে মহারাজের ১২,০০০৲ বার হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সাহিত্য-সম্মিলনের সাত দিন পরে অর্থাৎ ২৫শে কার্ত্তিক (১৩১৪) তারিখে একটি কন্যা * প্রসবের ১২ দিন পরে মহিমচন্দ্রের পত্নীর মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদ বিষ্ণুপাড়া হইতে একটি মাহিষ্যজাতীয় স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া তাহারই স্তন্যদানে নব-প্রসূত কন্যার জীবন রক্ষা করা হয়।

মহিমচন্দ্রের পত্নীর মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। মৃত্যু দিবসের পূর্ব্ব রাত্রিতে দরজা খোলার শব্দ পাইয়া বধূরাণী বলিয়া উঠিলেন—"দরজা বন্ধ করিও না, আমি যাইতেছি।" পুত্রবধূর এই উক্তিতে মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। দরজা বন্ধ হইল না—বধূরাণীর অমর আত্মা মুক্ত দ্বার-পথে চিরশান্তি লাভ করিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি মহারাজের গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তাঁহার সুখ দুঃখে মহারাজের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ পাইত।

এই সালের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়—রবীন্দ্রনাথের এই গভীর শোকে মহারাজ সমবেদনা প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিতেছেন—

* মহিমচন্দ্রের কন্যার নাম শ্রীমতী অন্নপূর্ণা।—হাটখোলার বিখ্যাত ধনী, ভাগাকুল নিবাসী মুরলীধর রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ রায় বি-এর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে।

কাশিমবাজার রাজবাড়ী
১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

সসম্মান প্রণামান্তে নিবেদনমিদং—

আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু সংবাদে বড়ই কষ্ট পাইলাম। যে ব্যক্তি স্বদেশের ও স্বজাতীর ভাষার উন্নতিকল্পে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার শোক নিশ্চয়ই জাতীয় শোক। আপনার এই দুঃখে আমরা সকলেই মহা দুঃখিত। শ্রীশ্রীভগবান আপনার মনে শান্তি দান করুন। এই প্রার্থনা।

প্রণত—
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

এই সময় কলিকাতা হিষ্টোরিকাল সোসাইটির ৫৮ জন ইউরোপিয়ান সভ্য, মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেণে কাশিমবাজার আসেন। তাঁহারা সকলেই মহারাজের আহ্বানে কাশিমবাজার রাজবাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষ আপ্যায়িত ও মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া যান।

সন ১৩১৫ সালের কথা—

সন ১৩১৩ সালের চৈত্র মাসে মাথরুণের 'নবীনচন্দ্র ইনষ্টিটিউসন'এর পাকা ইমারতের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া যায়, মহারাজ পিতৃনাম স্মরণীয় করিবার জন্য এই উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের পাকা ইমারতের দ্বারোদ্ঘাটন-কার্য্য সন ১৩১৫ সালের বৈশাখ মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার সাহেব সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ মুক্তাগাছার মহারাজ জগৎকিশোর আচার্য্যকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া কাশিমবাজার রাজবাটীতে আনিয়া মহারাজ রাজোচিত

সম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত করেন। জগৎকিশোর মণীন্দ্রচন্দ্রকে যে তাঁহার সারকুলার রোডের বাড়ীতে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন—ইহা তাহার প্রতিনিমন্ত্রণ হইলেও ইহার মধ্যে এমনি আন্তরিকতা ও সদাশয়তা ছিল যে সেই হইতে এই দুই রাজপরিবারের মধ্যে সত্যকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়।

২রা ভাদ্র (ইং ১৯০৮; ১৮ই আগষ্ট) বঙ্গের ছোটলাট স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনে আগমন করিয়া মহারাজের আহ্বানে বহরমপুর কলেজ-স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ করেন। লাট বাহাদুর সপার্ষদ কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদে আসিয়া চা পান করেন। ছোটলাটের সম্বর্দ্ধনার জন্য মহারাজ রাজবাটী, কলেজ ও কলেজ-স্কুল এই তিনস্থানেই বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও বিপ্লবী আততায়ী নাকি ছোটলাটের জীবননাশে সচেষ্ট হইয়াছিল সেকারণ প্রথমতঃ তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণে রাজী হন নাই কিন্তু মহারাজের আশ্বাসে ও উৎসাহে কৃষ্ণনাথ কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল রেভাঃ মিঃ হুইলারের চেষ্টায় ছোটলাট বহরমপুর আসিয়া যখন বিপুল অভ্যর্থনা পাইলেন তখন তাঁহার মনের অমূলক সন্দেহ দূর হইল এবং মহারাজের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই সালের কার্ত্তিক মাসে মহারাজের শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। উপর্য্যুপরি পুত্রশোকে কাতরা মহারাণী কাশীশ্বরী পুনরায় একটি গভীর শোক পাইলেন।

কাশিমবাজার রাজ-এষ্টেটের সর্ব্বপ্রধান পরগণা বাহারবন্দের কার্য্য-পরিচালনায় কিছুদিন হইতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা হইতেছিল। এই সালের পৌষমাসে বহরমপুরের উকিল, মহারাজের আমমোক্তার শ্রীযুক্ত

হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি-এল মহাশয়কে মহারাজ উক্ত পরগণার নায়েব নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। *

হরেন্দ্রবাবুর যোগ্যতার পরিচয় মহারাজ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; এই নির্ব্বাচনে বিশেষ ফল হইল। জমিদারী কার্য্যে গভীর জ্ঞান,—কর্ম্মপরিচালনায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ব্যবহারে উদার ও সদাশয়, কর্ত্তব্যে দৃঢ় ও বিচার-বিবেচনায় পক্ষপাতশূন্য, সর্ব্বোপরি মহারাজের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুরক্ত, সুদর্শন ও মিষ্টভাষী নবনিযুক্ত এই নায়েবের সুব্যবস্থায় বাহারবন্দ পরগণার জমিদারীর মধ্যে সুশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

হরেন্দ্রবাবুর কার্য্যকালে গয়াবাড়ীর বন্দোবস্তই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। চারি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি বিদ্রোহী প্রজাগণের সহিত একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টিণ্ডেল্ এই মীমাংসায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। যে খাজানা মাত্র ৪০ হাজার আদায় হইত তাহা হরেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় এক লক্ষ টাকায় পরিণত হয় এবং ১২ বৎসরে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া

---

* ইংরাজি ১৮৯৬ সালে হরেন্দ্রবাবু বি, এল্ পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। বহরমপুরে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার যাতায়াত ছিল। তিনি বহরমপুরের খ্যাতনামা উকীল রায় বৈকুণ্ঠ নাথ সেন বাহাদুর, সি, আই, ই মহোদয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺ত্রৈলোক্য নাথ সেনের তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করায়, বহরমপুর সহরের অধিকাংশ লোকই তাঁহাকে চিনিত। তিনি যখন ওকালতি আরম্ভ করেন তখন মহারাজ বহরমপুরে তারণ মণ্ডলের দরুণ বাড়ীতে থাকিতেন। এই সময়েই মহারাজের সহিত হরেন্দ্র বাবুর পরিচয় হয় এবং তাঁহার নিকট প্রত্যহই তাঁহার যাতায়াত চলিতে থাকে। মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর মহারাজ বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা সম্বন্ধে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহার উপস্থিতিতে কাশিমবাজার ও সৈদাবাদ রাজবাটী ম্যাজিষ্ট্রেটকর্ত্তৃক তালাবন্ধ হইয়াছিল। মহারাজ রাজ্যভার পাইলে তিনি অন্যান্য উকীলগণসহ রাজএষ্টেটের জুনিয়ার উকীল নিযুক্ত হন এবং অল্পদিন পরে মহারাজের একটী ভাগিনেয় এক ব্রাহ্মণকুমারকে প্রহার করা উপলক্ষে একটী ফৌজদারী মোকর্দ্দমা হইলে, সেই মোকর্দ্দমা পরিচালনের ভার

সপারিষদ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

(সন ১৩১৪ সাল)
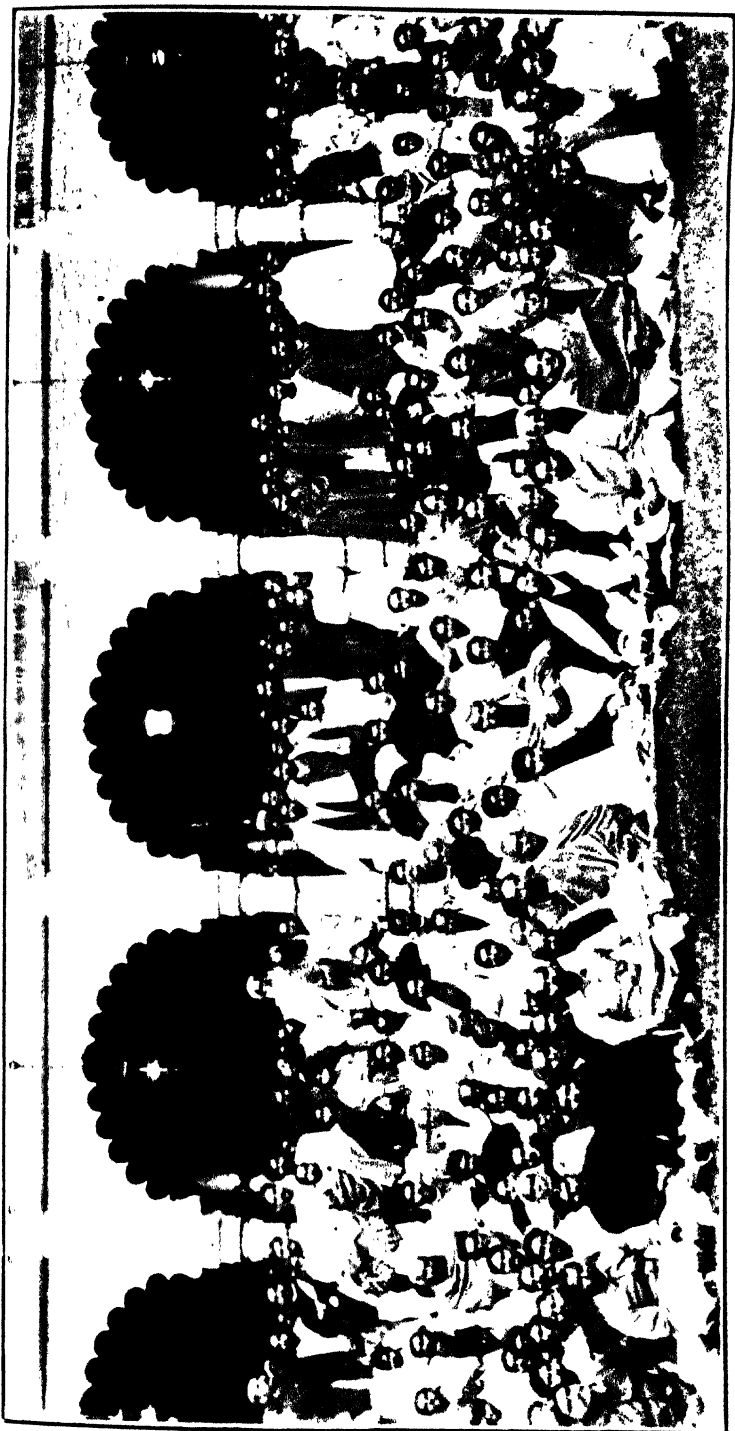
ভবিষ্যতে দুই লক্ষাধিক হইবে ইহাই উক্ত মীমাংসায় স্থির হয় অথচ প্রজাগণ ইহাতে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। বিদ্রোহী প্রজাগণের সহিত যে সকল মোকর্দ্দমা চলিয়াছিল, তাহা পরিচালনের জন্য তৎকালীন হাইকোর্টের উকিল সারদাচরণ মিত্র ও রাসবিহারী ঘোষকে লইয়া যাইতে হইয়াছিল।

এই সকল মোকর্দ্দমায় বাহারবন্দের ভবিষ্যৎ খাজনা বৃদ্ধিরও রীতি (principle) স্থিরীকৃত হইয়াছিল। যে সকল জোতসমূহে জমায় হাজত দেওয়া আছে তাহা মহারাজ বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ যে কোন সময়ে এককালীন বা ক্রমশঃ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন ইহাই হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা করিয়া সাব্যস্ত হয়। এই কার্য্যটী সম্পূর্ণতা লাভ করিলে মহারাজের ন্যূনাধিক দুই লক্ষ টাকার বার্ষিক জমা বিনা মোকর্দ্দমায় বৃদ্ধি হইবে।

হরেন্দ্র বাবুর বাহারবন্দের চাকুরীকালে মহারাজ বাহাদুরকে তাঁহার দুই দুইবার মাহাল পরিদর্শনকালে মহকুমার লোক ও প্রজাসাধারণেরা

হরেন্দ্রবাবুর উপর পড়ে। তাঁহার দক্ষতায় মোকদ্দমা আপোষ হইয়া গেলে তাঁহার প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহার কার্য্য-কুশলতা, মক্কেলগণের সহিত ব্যবহার, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সর্ব্বদা আইন ও নজীর পড়ার অভ্যাস দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার 'জুনিয়ার' করিয়া লইয়াছিলেন এবং ইহাতে জেলার বড় বড় জমিদারগণও তাঁহার ওকালতীর সহায়তা করিতেন। শীঘ্রই তিনি রাজকর্ম্মচারীদের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন; মহারাজ তাঁহাকে সদরের "ল-এজেন্ট" নিযুক্ত করিয়া তৎকালে বেলডাঙ্গায় যে প্রজাবিদ্রোহ চলিতেছিল তাহার সমুদয় মোকদ্দমা পরিচালনের ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে দুইবার মুন্সেফি করিয়া আসিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃই আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিলেন। তিনি সরকারী উকীল নিযুক্ত হইয়া বহরমপুরে এক বৎসরকাল সুখ্যাতির সহিত কাজ করেন এবং সেই সময় বাহারবন্দের ম্যানেজারি পদ খালি হওয়ায় রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠ নাথ সেনের পরামর্শমত তিনি উক্ত পদের প্রার্থী হইলে মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে সেই পদে নিযুক্ত করেন।

-যেরূপ অভ্যর্থনা দিয়াছিল তাহা সচরাচর দেখা যায় না। প্রজাগণের জমিদার-প্রীতি দেখিয়া মহারাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রজাগণও রাজদর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। মহারাজ সকলকে নাচ-গানে এবং সর্ব্বোপরি তৃপ্তি সহকারে আহার করাইয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। যে "আগমনী" নজর মহারাজকে প্রথমবার ফেরৎ দিতে হইয়াছিল দ্বিতীয় বারে জোতদারগণ নিজেরা তাহা পুনরায় দিবার প্রস্তাব করায় মহারাজ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়া দুই বৎসরে এই টাকা আদায় হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যকালে লাট সাহেব কুড়িগ্রাম ও রংপুরে দুইবার গমন করিয়াছিলেন,—লাট-সংবর্দ্ধনার ভার হরেন্দ্র বাবুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল এবং হরেন্দ্রবাবুর সুব্যবস্থায় লাট সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হরেন্দ্র বাবুকে বিশেষ প্রশংসাপত্র দান করিয়াছিলেন। হরেন্দ্রবাবুর আমলে বাহারবন্দের অনেকগুলি নিম্নপ্রাথমিক, মধ্যইংরাজি, উচ্চইংরাজি ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ; ডাকবাংলা, উলিপুর চিলমারী রাস্তায় এবং গাইবান্ধার নদীর উপর সেতু প্রস্তুত হইয়াছিল।

সন ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্নে কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নূতন গৃহপ্রবেশের দিন স্থির হয়। মহারাজ ঐ দিন কাশিমবাজারের বহু জরুরী কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজের স্বভাবসুলভ মিষ্ট বাক্যে ও সদাশয় ব্যবহারে পরিষদের সভ্যগণকে নূতন আশা ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিলেন। সাহিত্য পরিষদের গৃহ যে ভূমিখণ্ডের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রই স্বেচ্ছায় দান করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতি মহারাজের যে অকৃত্রিম মমতা ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। পর বৎসর রাজসাহীতে

সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হইলে যে গোলযোগ উপস্থিত হইবে তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের কলিকাতা সম্মিলনের অভিভাষণে পাই। সাহিত্য-সম্মিলন যে মহারাজের কতখানি প্রাণের বস্তু ছিল এবং তাহার গোলযোগের সূত্রপাতে তিনি যে কতখানি বিচলিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাবলী হইতে বুঝিতে পারা যায়—

Babu Ramendra Sundar Trivedi M.A.
8, Madhusudan Gupta's Lane, East.

পরমপূজনীয়—

আপনার ২৪শে পৌষের পত্র পড়িয়া আমি সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে নানা রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল দেখিয়া মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলাম। শ্রীযুক্ত শশধর বাবুকে আমার মতামত জানাইলাম। আমার মতে সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ হওয়া উচিত নহে। রাজসাহীতে না হয় কলিকাতায় হউক। কলিকাতায় হইবার সময়ও অনেক আছে। যদি শশধর বাবুরা ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে ভালই, নতুবা একবার চেষ্টা করিয়া যাহাতে কলিকাতায় অধিবেশন হয় তাহার চেষ্টা আপনাকে করিতে হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিস্তৃত বিবরণী আগামী কল্য আপনার নিকট একখণ্ড পাঠাইব ও পরে অন্যান্যগুলি পাঠাইব। ইতি—

প্রণত—
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি মহারাজের কতখানি অনুরাগ এবং বঙ্গবাণীর সেবার প্রতি তাঁর কতখানি শ্রদ্ধা ছিল তাহা নিম্নের আরও তিন খানি পত্রে জ্ঞাত হওয়া যাইবে—

Maharaja Jagadindra Narayan Roy
Natore.

কাশিমবাজার রাজবাড়ী
২৮শে পৌষ, ১৩১৫।

সপ্রণাম নিবেদনমিদং

আপনার অভিপ্রায়ানুসারে রাজসাহীতে বর্ত্তমান বর্ষে সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনের প্রস্তাব হয়। কিন্তু এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু শশধর রায় এম-এ বি-এল,

মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, আপনি সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে সম্মত নহেন। নাটোর রাজবংশ শুদ্ধ রাজসাহীর নহে সমগ্র বঙ্গদেশের গৌরবস্থল। আপনি সেই সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের বর্ত্তমান প্রতিভূ।

সাহিত্যসম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনের সহিত আপনার সংশ্রব না থাকিলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। আর আপনার ন্যায় ব্যক্তি উদাসীন থাকিলে আমিই বা উক্ত সম্মিলনে কিরূপে উপস্থিত হই? যাহা হউক যে কারণে আপনার এরূপ মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহাতে তাহার অপনোদন হয় তদ্বিষয়ে প্রস্তুত হইতে পারি। ভরসা করি এই পত্রের প্রত্যুত্তর দানে বাধিত করিবেন। * * * ইতি—

Kumar Sarat Kumar Roy
Dighapatia P.O. (Raj.)

প্রিয় কুমার শরৎকুমার,

রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বর্ত্তমানবর্ষীয় অধিবেশনে আপনার ন্যায় সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তি যোগ না দিলে বিশেষ দুঃখের বিষয় হইবে। রাজসাহীতে শাখা পরিষদ স্থাপন কালে যদি এই মনোমালিন্যের কারণ উদ্ভূত হইয়া থাকে তাহা হইলে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে সেই কারণ অন্তরে স্থান দান করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির মতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আপনি যদি উক্ত মনোমালিন্যের কারণ যে উপায়ে দূরীভূত হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে এই পত্রের উত্তর দানে বাধিত করেন তাহা হইলে সেই মনোমালিন্যের কারণ দূরীকরণ পক্ষে আমি যত্নের ত্রুটী করিব না। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান বর্ষে যদি সম্মিলনের অধিবেশন রাজসাহীতে না হয় তাহা হইলে আমাদের বহুদিনের পোষিত আশাবীজ অঙ্কুরোদ্গমেই বিনষ্ট হইবে। * * *

Raja Pramadanath Roy
163, Lower Circular Rd., Calcutta.

প্রিয় রাজা প্রমদানাথ,

রাজসাহীতে বর্ত্তমান বর্ষে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তি সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে যোগদান করিবেন না শুনিয়া

বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। রাজসাহীতে নাটোর ও দীঘাপতিয়া রাজবংশ এরূপ মহৎকার্য্যে উদাসীন হইলে সম্মিলনের বড় দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যদি কোন কারণে আপনার এই ঔদাসীন্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইলে যাহাতে তাহার অপনোদন হয় তৎপক্ষে আমি বিশেষ চেষ্টিত থাকিব। ভরসা করি প্রত্যুত্তর দানে বাধিত করিবেন। * * *

রাজসাহীতে সাহিত্য-সম্মিলনকে ব্যর্থ করিবার জন্য যাঁহারা দলবদ্ধ হইয়াছিলেন মহারাজ নিজের চেষ্টা ও যত্নে তাঁহাদের মত ফিরাইয়া, রাজসাহীতেই মহারাজ জগদিন্দ্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণকে দিয়াই উক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

মাঘ মাসের ১৮ই ও ১৯শে তারিখে রাজসাহীতে সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়—এ ব্যাপারে মহারাজের যে কি পরিমাণ যত্ন ও চেষ্টা ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে বুঝিতে পারি। প্রধান নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। শশধর রায় মহাশয় সম্পাদক ছিলেন বটে কিন্তু কাশিমবাজার রাজবাটী হইতে বহু ধনী, গুণী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে পত্র লিখিয়া যাহাতে তাঁহারা সমবেত হইয়া সম্মিলনকে সার্থক করেন তাহার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র। সম্মিলন দিবসের পূর্ব্বদিন তিনি রাজসাহীতে উপস্থিত হইয়া দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দুইদিন অবস্থান করেন। শরৎকুমারের সৌজন্য ও আতিথেয়তায় তিনি এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সে কথা বহু লোকের নিকট বহুবার বলিয়াছেন। এই সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহারাজ ৫০০৲ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যু হইলে মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর শাখা-সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯০৯) এক বিরাট শোক-সভা আহূত হয় এবং মহারাজই এই মৃত কবির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য সমগ্র বাঙ্গলা দেশকে আহ্বান করেন।

মহারাজের জীবিতাবস্থায় যতগুলি সাহিত্যসম্মিলন বা সাহিত্যিক অনুষ্ঠান হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটিতে তিনি নিজে উপস্থিত হইয়াছেন ও আর্থিক সাহায্যে উৎসাহিত করিয়াছেন।

এই সালেই বর্দ্ধমান বিভাগীয় মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের প্রতিনিধি-রূপে মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হন। সন ১৩১৩ সালে তিনি জেলাবোর্ডের তরফ হইতে এই সদস্যপদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। এই পদের প্রার্থিরূপে দাঁড়াইয়া তিনি যে কোনও বার অকৃতকার্য্য হন নাই, দেশের মধ্যে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তাই তাহার একমাত্র কারণ।

ইংরাজী ১৯০৯ সালের ২০শে জানুয়ারী বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কন্যা লেডী ভায়োলেট ইলিয়টের বিবাহে মহারাজ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিন্তু কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুতে সে নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে পারেন নাই। লাট-কন্যার বিবাহে মহারাজ হীরকমণ্ডিত বহু মূল্যের 'নেকলেস্' ও 'টায়রা' উপহার পাঠাইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড মিণ্টো এই উপলক্ষে প্রাপ্ত উপহারসমূহের পুরোভাগে এই বহুমূল্য উপহার দুইটিকে স্থান দিয়াছিলেন।

ফাল্গুন মাসে ঢাকা সহরে বাঙ্গলা ও আসাম গভর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক "ঢাকা ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল কনফারেন্স" আহূত হইয়াছিল। এই কন্‌ফারেন্সে নিমন্ত্রিত হইয়া ১১ই ফাল্গুন মহারাজ ঢাকা যাত্রা করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সংবর্দ্ধনা গ্রহণ করিবার পর মহারাজকে ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। ঢাকাবাসীর সশ্রদ্ধ অভিনন্দনে মহারাজ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রতিদিন বহু দর্শনপ্রার্থী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। মহারাজ সকলকে যথাযোগ্য ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন। মহারাজ নিজে অনেক বার আমাদের নিকট বলিয়াছেন পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাকে আশাতীত ভক্তিশ্রদ্ধায় অভিনন্দিত করিয়াছিল।

এই বৎসরে মহারাজের একটি উল্লেখযোগ্য দান ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা। এই টাকা তিনি বেদগ্রন্থ ছাপাইবার জন্য কলিকাতা ফড়িয়াপুকুরনিবাসী এম, এন, দত্ত এম-এ মহাশয়কে দান করেন। বেদ ছাপা শেষ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় এবং কয়েক শত বেদগ্রন্থ মহারাজের কলিকাতার বাটীতে প্রেরিত হইয়াছিল এরূপ কথাও তাঁহার পত্রাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আমরা সে গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই বলিয়া সে বিষয় বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না।

সন ১৩১৬ সালের কথা—

ইং ১৯০৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর মহারাজের বিশিষ্ট বন্ধু কলিকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত জমিদার পশুপতিনাথ বসুর মৃত্যু হইয়াছিল। পশুপতি বাবু মহারাজের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন—সাংসারিক প্রয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকীয় ব্যাপারেও পশুপতি বাবুর নিকট মহারাজ সাহায্য ও সৎপরামর্শ লইতেন। পশুপতি বাবুর কর্ম্মচারী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহারাজের কলিকাতা এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র এখন কলিকাতার বাড়ীর কর্ম্মচারী। প্রত্যেক বৎসরই পশুপতি বাবু কাশিমবাজার আসিয়া বন্ধুবরের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। পশুপতি বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার শিশুপুত্র ও বিধবা পত্নীর সাংসারিক ব্যয়ের সাহায্য বাবদ ডাকযোগে ৬০০৲ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটের মন্মথনাথ সেনের নিকট পাঠান হয়। তিনটি পুত্র রাখিয়া পশুপতি বাবু মারা যান, কনিষ্ঠ পুত্র অনাথনাথ তখন নাবালক। পশুপতি বাবু নিজে খুব 'খরচে' লোক ছিলেন, তখনকার দিনে তাঁহার মত সৌখীন বাবু কমই ছিল। তাঁহার দান ছিল, সদ্ব্যয়ও ছিল। পশুপতি বাবুর দুই পুত্র দুই বৎসর জমিদারী

কার্য্য-পরিচালনা করিতে গিয়া এমনি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সে-সময় মহারাজ ইহাঁদের সাহায্যকল্পে না দাঁড়াইলে আজ পশুপতি বাবুর জমিদারীর অবস্থা কি হইত বলা যায় না। ১৯০৯ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে (বাঙ্গলা ১৩১৭ সালে) মহারাজ বরাবর পশুপতি বাবুর সাবালক পুত্রদ্বয় ট্রাষ্টীডিড্ লিখিয়া দিলে তিনি উক্ত জমিদারীর ট্রাষ্টী হইয়া সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিলেন। পশুপতি বাবুর কণিষ্ঠ পুত্র * অনাথনাথের অভিভাবক রূপে আজীবন তিনি জমিদারীর কার্য্যপরিচালনা ও বন্ধু-পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

আষাঢ় মাসে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত নাগ বি-এ (ক্যাণ্টাব) মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয় (ইনি 'নাগ সাহেব' বলিয়া সুপরিচিত) শ্রীশচন্দ্রের এম-এ পড়িবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। ইনি শ্রীশচন্দ্রের বিশেষ হিতকামী—দীর্ঘকাল শ্রীশচন্দ্রের শিক্ষকতা করিয়া খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদের সঙ্গী হওয়াতে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটি মধুর আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে মতানৈক্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের আপ্রাণ চেষ্টায় রাজসাহী সম্মিলনের অধিবেশনে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সম্মিলনের ভাগলপুর অধিবেশনে পাছে কোনও গোলমাল

* প্রসিদ্ধ এটর্ণি ও বাঙ্গলা দেশের নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে। কলিকাতা এল্‌বার্ট হলে, নিখিল বঙ্গীয় ছাত্র-সমিতির দ্বারা আহূত স্মৃতি-সভার সভাপতিরূপে, নির্ম্মলচন্দ্র মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। ৩০।১১।২৯

ঘটে এজন্য পূর্ব্ব হইতে প্রতিপক্ষের নেতা রাজসাহীর শশধর রায় মহাশয়কে মহারাজ পত্র লিখিতেছেন—

শ্রীযুক্ত শশধর রায়,
রাজসাহী।

কাশিমবাজার রাজবাটী
১৩১৮—১লা ভাদ্র

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

শারদীয়া পূজা আগতপ্রায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন যাহাতে পূজাবকাশের মধ্যেই হয় এখন হইতে তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। অতএব মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাগলপুরস্থ সাহিত্য-সেবীদিগকে শীঘ্র উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করুন এবং তাঁহাদের মন্তব্য যাহাতে অবিলম্বে জানিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত হউন। এবার সম্মিলন যাহাতে সম্পূর্ণ সফল হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভাগলপুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেই বঙ্গের সকল সাহিত্য সভার প্রতিনিধিগণকে কলিকাতায় একত্র আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্যের অবধারণ করা হইবে এবং কতকগুলি সাহিত্যিকের মধ্যে পরস্পরের যে মনোমালিন্য আছে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা যাইবে। * * *

এক বৎসর পরেই সাহিত্য-সম্মিলনের ময়মনসিংহের অধিবেশনের সময় পাছে সাহিত্যিকগণের কলহের ঢেউ লাগিয়া গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া যায় এজন্য মহারাজ প্রারম্ভ হইতেই সতর্ক হইতেছেন—

Kumar Sarat Kumar Ray
The Rajbari, Dayarampur.

কাশিমবাজার রাজবাড়ী
২১ চৈত্র, ১৩১৭

কল্যাণবরেষু—

আমি কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া অদ্য এখানে আসিয়াছি। ময়মনসিংহে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তখন আপনি বরেন্দ্র ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিয়া ময়মনসিংহের সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়, রাজসাহীর শশধর রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

ত্রিবেদী মহাশয় ও অন্যান্য কতিপয় সাহিত্যানুরাগী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনার অনুপস্থিতির সম্ভাবনা দেখিয়া আমাকে আপনার উপস্থিতির জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন। আপনার মত লোকের এই সব সাহিত্যবিষয়ক উদ্যোগে উৎসাহ ও উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এজন্য আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে বর্ত্তমান বরেন্দ্রভ্রমণ স্থগিত রাখিয়া ময়মনসিংহ সম্মিলনে উপস্থিত হইবেন ও কোন তারিখে রওনা হইবেন আমাকে লিখিলে পরমসুখ লাভ করিব। আপনাদের মঙ্গল লিখিয়া সুখী করিবেন। * * *

সাহিত্য-সম্মিলন মহারাজের প্রাণস্বরূপ ছিল ; আমরা ৭ম অধিবেশন (১৩২১) কলিকাতা-সম্মিলনের কথা ব্যক্তিগত ভাবে জানি। ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সম্মিলনের সভাপতি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে সভায় উপস্থিত। বর্ত্তমান 'সরকার গুপ্ত কোং'র' প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র দে সরকার এবং অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহীতোষ কুমার রায়চৌধুরী এই দুই জনের নেতৃত্বে আমরা এই সাহিত্য-সম্মিলনের স্বেচ্ছাসেবক হইয়াছিলাম। বেদী-মণ্ডপের সন্নিকটেই আমার নিজের 'ডিউটি' ছিল। মহারাজ বাহাদুর বেদীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতায় অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না ; মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন,—"সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করিলে আমরা সকলেই সুখী হইব।" মৃদুহাস্যে রবীন্দ্রনাথ অভিভাষণটি পাঠ করিলেন। প্রতিনিধিগণের স্থান হইয়াছিল স্বনামখ্যাত ভূপেন বসু মহাশয়ের হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটের অফিস-বাড়ীতে। কলিকাতা টাউন হলে এই সম্মিলনের অধিবেশনে সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকের সংখ্যা পূর্ব্বের অধিবেশন অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। সভার শেষে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র উচ্চ হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সেই সভায় সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শক প্রভৃতি সকলকেই তাঁহার ৩০২নং অপার সারকুলার

রোডের বাড়ীতে (রাণী কুঠিতে) সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকগণের সাহচর্য্য তাঁহার এমনি প্রিয় ছিল। বহরমপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা-সম্মিলনীর প্রত্যেক অধিবেশনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। তখন বহরমপুর সাহিত্যের আলোচনা ও অনুশীলনের কেন্দ্রস্থল ছিল—সঙ্গীতাচার্য্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর অধ্যক্ষতায় মহারাজের ব্যয়ে একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় পরিচালিত হইত। বাঙ্গলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত গিরিজা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গীতবিদ্যার সম্যক অনুশীলন—'গোঁসাইজি'র নিকটই হইয়াছিল। কয়েকবার সঙ্গীত-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করিয়া মহারাজ গুণীজনের একত্র মিলিবার যে সুযোগ দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার মত ঘটনা বটে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত ও সঙ্গত-বিদ্যায় ধুরন্ধরগণ মহারাজের সাদর আহ্বানে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে সমবেত হইতেন —গুণানুসারে পারিতোষিক লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে দেশে ফিরিতেন। —মহারাজের গুণগ্রাহিতার কথা এই ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে যে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার পশ্চাতে এই প্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ইতিহাস আছে। এই সব বৃহৎ অনুষ্ঠান আর কেহ করিবেন কিনা কিংবা করিতে পারিবেন কি না জানি না কিন্তু বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া যিনি তাহার ব্যবহার-নীতির এইরূপ আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারেন ধনিবিমুখ 'বলসেবী' (Bolshevist) নেতাগণ তাহার কাছে কোন্ জবাবদিহির দাবী করিবেন ?

কবি রজনীকান্ত সেন রাজসাহীর উকিল ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতগুলি বাঙ্গলা দেশের ঘরে ঘরে ব্রতকথার মত ছড়াইয়া পড়ে।—

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন দুখিনী মা যে মোদের
তা'র বেশী আর সাধ্য নাই।"

"আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোটো
আছি সাত কোটি প্রাণ জেগে ওঠো।
জুড়েদে ঘরের তাঁত সাজা দোকান
বিদেশে না যায় যেন গোলারি ধান,
হারাসনে তোরা ভাই এমন সুদিন
মায়ের পায়ের তলে এসে জোটো।"

"তাই ভাল মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত,
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব
মার বাগানের কলার পাত।"

এই সব সঙ্গীতে কান্তকবি রজনীকান্ত জনসাধারণের কবি বলিয়া এই সময় বাঙ্গলা দেশে সুপরিচিত হইয়া পড়েন। রাজসাহী সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহার সহিত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের আলাপ পরিচয় হয়। মহারাজ তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া একবার কাশিমবাজার আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। ঝুলন উপলক্ষে মহারাজের নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া তিনি ১০ই ভাদ্র (১৩১৬) কাশিম-বাজার রাজবাড়ীতে অতিথি হইলেন। সাহিত্যিকের সম্মান যে কি করিয়া রাখিতে হয়—সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু মণীন্দ্রচন্দ্রের তাহা অবিদিত ছিল না—তাই রজনীকান্ত গৌরবান্বিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

সন ১৩১৭ সালের কথা—

প্রতিবারই শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইত ; সমস্ত বহরমপুর, খাগড়া, সৈদাবাদ, গোরাবাজার নিমন্ত্রিত হইত—কলেজ ও কলেজস্কুলের ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দকে পরিতোষ-সহকারে খাওয়ান হইত। মহারাজ নিজে প্রত্যেক ছাত্রের কাছে উপস্থিত হইয়া কে কেমন খাইতেছে না খাইতেছে তাহার তত্ত্ব লইতেন। কোনও একজন কলেজের ছাত্র, ২৪খানি লুচি (আর সে যেমন-তেমন লুচি নয়—যে না দেখিয়াছে তাহাকে সে লুচির পরিধি বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র) ১০ কটরা ক্ষির, ১০।১২ কটরা দই এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মিষ্টান্ন খাইয়া—মহারাজকে সন্তুষ্ট করিয়া দক্ষিণা পাইল—কলেজ ও হোষ্টেলে বিনা খরচায় পড়িবার ও থাকিবার সুবিধা (Free studentship)।

এই ছাত্রটি এখন বাংলা দেশের কোনও একটি বিখ্যাত গভর্ণমেন্ট কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক।

এবার অন্নপূর্ণা পূজায় ৩রা হইতে ৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত তিনদিন মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতসমাজের ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন রাজবাড়ীতে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে প্রসিদ্ধ তব্‌লাবাদক অবনিনাথ গাঙ্গুলীর দ্বারা কলিকাতার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্‌গণকে এবং ভারতসঙ্গীত সমাজের সভ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহারাজ কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে লইয়া আসেন। দেশবিদেশের কালোয়াত, যন্ত্রী এবং সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদগণের সমাগমে এই অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়।

বৃন্দাবনে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর দেবকীনন্দন প্রেসে ১০,০০০০ দশ সহস্র দশমস্কন্দ ভাগবতগীতা ছাপাইয়া ভাগবতগুলি কলিকাতার বাড়ীতে আনা হইয়াছিল। উক্ত ভাগবত ছাপাইতে মহারাজের প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। দেবকীনন্দন প্রেস কিছুদিন পরেই কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে মহারাজের "উপাসনা" পত্রিকা মহারাজের কাশিমবাজার সত্যরত্ন

প্রেস হইতে এখানে ছাপাইতে দেওয়া হয়—তখন উহার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বৎসরাবধি অসুস্থতার পরে কবি রজনীকান্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া মাঘ মাসে মেডিকেল কলেজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৩০শে তারিখে তাঁহাকে ১২নং কটেজ ভাড়া করিয়া জেনারেল ওয়ার্ড হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই কটেজে সাত মাস কাল রোগভোগ করিয়া কবি রজনী কান্তের ২৮শে ভাদ্র তারিখে মৃত্যু হয়।

সেই সময়, বাঙ্গলার জনপ্রিয় কবি রজনী কান্ত তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে অশরণের শরণ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র এবং দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে সাহায্যকারী বন্ধুরূপে লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ হাসপাতালে কবিকে মাসিক ৮০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। কুমারের মাসিক সাহায্যও মোটারকমের ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। দুঃস্থ মৃত্যুপথযাত্রী কবিকে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কয়েকবার উক্ত ওয়ার্ডে দেখিতে গিয়াছেন—রোগীর যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাহা মিটাইয়াছেন—কাশিমবাজার হইতে নিয়মিত পত্রাদি লিখিয়া রোগীর খবর লইয়াছেন।—

Babu Rajani Kanta Sen, B.L.
Cottage 12.
Medical College Hospital, Calcutta.

সসম্মান নমস্কারান্তে নিবেদনমিদং—

আপনার ১৯শে এপ্রিলের পত্র পাইলাম। আপনি পীড়িত। কোথায় আমরা আপনার নিয়ত খবর লইব, না আপনি পত্রোত্তরে একটু বিলম্ব করিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন! ভগবানের কাছে সতত প্রার্থনা করি আপনি শীঘ্রই নীরোগ হউন।

আপনার সুমিষ্ট গানটী আপনার গলায় না শুনিলে ভাল লাগিবে না। এখন কেমন আছেন একটু লিখিবেন। ইতি—

Babu Rajani Kanta Sen, B.L.
Medical College Hospital, Cottage no 12.
Calcutta.

১৩১৭।১লা আষাঢ়

সসম্মান নমস্কারান্তে নিবেদনমিদং—

আপনার ৩০শে জ্যৈষ্ঠের পত্র পাইয়াছি। আপনি অনেকটা ভাল আছেন জানিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। মঙ্গলময় ভগবান আপনাকে একেবারে সুস্থ করুন। আপনার কর্ত্তৃক আমাদের মাতৃভাষার ঢের কাজ হইবে। আপনার অমৃতনিঃষ্যন্দী বীণার ঝঙ্কার কে না ভালবাসে? আপনার নিকট আপনার অভয়ার প্রথম প্রুফ পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিব। যাহাতে ঐ পুস্তকখানি শীঘ্র মুদ্রিত হয় তাহার বিধান করিতেছি। * * *

উপরের মুদ্রিত পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়—কবির অভয়া পুস্তকখানির মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করিয়া মহারাজ মৃত কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কবির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের পড়াইবার সমস্ত ব্যয়ভার মহারাজ নিজে গ্রহণ করিলেন। বিনা সুদে ১৩০০০৲ তের হাজার টাকা ধার দিয়া উত্তমর্ণগণের হাত হইতে কান্ত কবির যাবতীয় সম্পত্তি দায়মুক্ত করিয়া বিপন্ন পরিবার বর্গকে রক্ষা করিলেন। কান্ত কবির পুত্রগণ ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া পিতৃনামের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। রজনীকান্তের মৃত্যুর পরও তাঁহার পরিবারবর্গকে সাংসারিক খরচ বাবদ মহারাজ কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিত ৪০৲ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য করিয়াছিলেন। রজনীকান্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'অভয়া' কাব্যগ্রন্থখানি মহারাজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ-কবিতায় লিখিত আছে—

আপনি খুঁজিয়া নিয়া, শাপভ্রষ্ট দেবতার মত
আসিয়াছ কুটীর-দুয়ারে—
শারীর-মানস শক্তি—বিবর্জ্জিত সেবক তোমার
রুগ্ন আজি কি দিবে তোমারে?

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

*　　*　　*　　*

যে সাজি লইয়া আমি বার বার আসিয়াছি ফিরি'
তা'তে দু'টি শুষ্ক ফুল আছে ;
দেবতা গো ! অন্তর্য্যামী ! একবার নিয়ো করে তুলি'
রেখে যাই চরণের কাছে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখিতে আসিলে, রজনীকান্ত তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—'মহাপুরুষ। আকাশের মত প্রাণটা—আমার কাছে এসেছেন। আমি কি দিই ? আমি নির্ব্বাক, নির্ব্বাণোন্মুখ। আমি বৃহৎ পরিবার রেখে গেলাম, আমার আনন্দবাজার—কেমন আনন্দবাজার তাত জানেন না। আমি তা ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছি। আমি—গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা। আমাকে হরিনাম দিন, মা'র নাম দিন। আমার কোন্ সুকৃতি ছিল যে, আমার যাবার রাস্তায় আপনার মত সাধু মহাপুরুষের দর্শন পেলাম। এই রুগ্ন বিপন্নের সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করুন, আমার আর কিছুই নাই যে দেবো। যদি বাঁচি তবে দেখাবার চেষ্টা করবো যে আমি অকৃতজ্ঞ নই। যদি মরি, তবে আমার সমাধির কাছে মহারাজের কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

মহারাজ চলিয়া যাইবার পর রজনীকান্ত তাঁহার পত্নীকে মহারাজের সম্বন্ধে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—"আমি ঢের মানুষ দেখেছি, এমন মানুষ দেখিনি যে, ধূলো থেকে একেবারে বুকে তুলে নেয়। ওঁর নাম যেখানে হয়, সেস্থান অতি পবিত্র ও মহাতীর্থ। ও ত মানুষ নয়, ও ত মানুষ নয়—, ছল ক'রে শাপভ্রষ্ট দেবতা এসেছে, জানো না ?

মহারাজ রজনীকান্তের কণ্ঠে তাঁহার রচিত তত্ত্বসঙ্গীত শুনিতে চাহিয়াছিলেন,—এই উপলক্ষে রজনীকান্তকে ব্যাকুলভাবে লিখিতে দেখি,—"দয়াল, আর একদিন কণ্ঠ দে, দেবতাকে দেবতার নাম

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কালেজ

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কালেজ-স্কুল
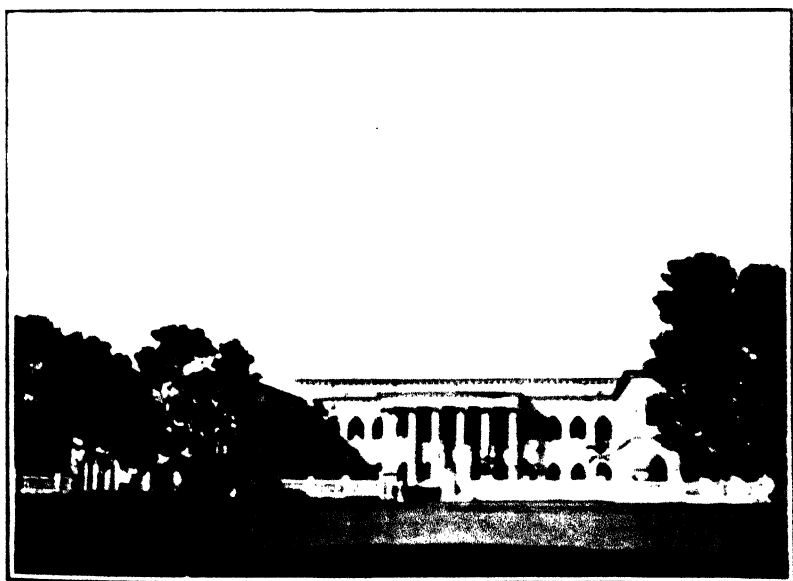
শোনাই। একদিন কণ্ঠ দে, দয়াল। খালি ওঁকেই শোনাব, তারপর কণ্ঠ বন্ধ করে দিস্।" *

যিনি দান করিতেছেন, সাহায্য করিতেছেন, সমবেদনা জানাইতেছেন—বন্ধুর মত, সখার মত দারুণ রোগযন্ত্রণায় সান্ত্বনারূপে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইতেছেন—তিনি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দান করিতেছেন না, সাহায্য করিতেছেন না—সান্ত্বনা দিতেছেন না।—তাঁহার সমগ্র প্রাণের এই দানপবিত্র নৈবেদ্য বঙ্গভারতীর চরণেই নিবেদিত হইতেছে। কবি রজনীকান্তের প্রতি মহারাজের এই সদাশয় ব্যবহারে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

যিনি দান গ্রহণ করিতেছেন—মূক কণ্ঠে তাঁহার ভাষা ফুটিতেছে না সত্য, ফুটিতে পারিলে বুঝি তাহা প্রকাশের আনন্দে ফাটিয়া পড়িত;—বাকরুদ্ধ কণ্ঠ, কিন্তু লেখনীর মুখে হৃদয়ের রক্তে সামান্য যে কয়েকটি কথা ফুটিল, তাহা কৃতজ্ঞতার মহত্ত্বে অমর হইয়া রহিল।

ইং ১৯০৯ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে ছোট লাট্ বেকার সাহেব বেলা ১০টার সময় 'রোটাসে' বহরমপুর আগমনপূর্ব্বক মহারাজের পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী 'মহারাজ' উপাধি পাইবেন, রোটাসের দরবারে মহারাজকে এই সনন্দ দিয়া গেলেন। এই সনন্দের বলে কাশিমবাজার এষ্টেটের মালিকগণ উত্তরাধিকারসূত্রেই বস্তুতঃ "মহারাজ" খেতাবের অধিকারী হইয়াছেন।

সাহিত্যপ্রচারকল্পে মহারাজের দানের দৃষ্টান্তের অন্ত নাই। এই সালে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে "লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদীঘির তাম্রশাসন" ক্রয় করিবার জন্য মহারাজ ৩৮৫৲ টাকা

---

* কান্তকবি রজনীকান্ত—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

দান করিলেন। এই তাম্রশাসন এখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে সংরক্ষিত আছে। রাখালদাস ও রামেন্দ্রসুন্দরের চেষ্টাতেই উক্ত তাম্র-শাসনটির উদ্ধারসাধন হয়।

তাঁহার দান যে কোনও সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ ছিল না—একথা বলাই বাহুল্য। ঢাকার সেখ আব্‌দুল জব্বরকে 'জেরুজিলামের ইতিহাস' মুদ্রণের ব্যয় বাবদ তিনি ২২১৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

ভাদ্র মাসে কলিকাতার শোভাবাজার সাহিত্য-সভার গ্রন্থপ্রচার বিভাগের গ্রন্থপ্রচারকল্পে অতিরিক্ত সাহায্য বাবদ মহারাজ ১০০৲ টাকা চাঁদা দিলেন।

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার Indian Shipping নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের মুদ্রণব্যয় বাবদ ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে (তাং ২রা সেপ্টেম্বর ১৯১০) ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান স্বরূপ প্রেরণ করিলেন।

কৈচর জাগেশ্বরডিহি নিবাসী কুলগুরু রাধারমণ ঠাকুরকে জমি খরিদের জন্য মহারাজ এই বৎসর ৫০০৲ টাকা দান করিলেন।

কাশিমবাজার এষ্টেটের মধ্যে বেলডাঙ্গার জমিদারী মহারাজের অন্যতম প্রধান সম্পত্তি। রাজধানী হইতে দশ বার মাইল দূরস্থিত বেলডাঙ্গার প্রজাগণ মহারাজের হাতে এষ্টেট পড়িবার পূর্ব্ব হইতেই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিল এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময়ে এই জমিদারী লইয়া বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় এষ্টেটের বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। মহারাজ এই অশান্তি দূর করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রজাগণ জমিদারের সহিত লড়িবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলে মোকর্দ্দমা সমানভাবে চলিয়া অবশেষে অগ্রহায়ণ মাসে একপ্রকার মিটমাট হইল।

একন্দাজ জরীপ হইয়া নূতন করিয়া বন্দোবস্ত হইলে, এই মাহালে মাত্র ৫ হাজার টাকা জমা বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু মোকর্দ্দমায় মহারাজের দুই লক্ষ টাকার উপর খরচ হইয়া গিয়াছিল। প্রজাগণও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে প্রীত করিবার জন্য এবং সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ে জমিদারের সহিত বিরোধ না করিলে তাহাদের ভবিষ্যতে সমূহ কল্যাণের সম্ভাবনা আছে এই শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি সমগ্র ব্যয়ভার নিজে বহন করিয়া বেলডাঙ্গায় তাঁহার মাতৃদেবী গোবিন্দসুন্দরীর নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন এবং তথা হইতে উত্তীর্ণ যে কোন ছাত্র, বহরমপুর কলেজে পড়িবার জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইলে, প্রায়ই তাহাকে বিমুখ হইতে দেখা যাইত না।

ষোড়শ শতাব্দিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের ফলে * মুর্শিদাবাদ জেলায় বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। মহারাজের পূর্ব্বে বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভৃত পরিশ্রমে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারে যত্নবান হন। তাঁহারই অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য মহারাজ প্রভূত অর্থ ব্যয়ে বহু বৈষ্ণব সাহিত্যের পুস্তক প্রকাশ করেন।

বৈষ্ণবচূড়ামণি মণীন্দ্রচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্বের চর্চ্চা ও অনুশীলনের জন্য বৈষ্ণব সম্মিলনের সৃষ্টি করেন। সাহিত্য সম্মিলনের ভাবধারাই বোধ হয় এই কার্য্যে মহারাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ১লা হইতে ৩রা চৈত্র পর্য্যন্ত কাশিমবাজার রাজবাটীতে এই বৈষ্ণব সম্মিলনের অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে ছয়শত প্রভুপাদ ও আচার্য্য-সন্তান এবং বৈষ্ণবগণের সমাগম হয়।

৮ই চৈত্র মুর্শিদাবাদের জজ বরদাচরণ মিত্রের বিদায়-ভোজও কাশিমবাজার রাজবাটীতে বিশেষ ধূমধামের সহিত সমাধা হইল।

---

* পরিশিষ্ট ১১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২১-২৪শে চৈত্র পর্য্যন্ত সঙ্গীতসম্মিলনীর অধিবেশনও কাশিমবাজার রাজবাটীতে মহা সমারোহে সম্পাদিত হইল।

এইরূপ একটির পর একটি কর্ম্মের উন্মাদনা ব্যতীত কর্ম্মযোগী মহারাজ স্বস্তি পাইতেন না। ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম্মে, উৎসবে ও আন্দোলনে নিজেকে ব্যস্ত রাখিতে পারিলে তিনি বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইতেন। সামাজিক ও লৌকিক ব্যবহার এবং উচ্চ নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদনে মহারাজ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন।

সন ১৩১৬ হইতে ১৩১৭ সাল পর্য্যন্ত মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল। এই সময় প্রায়ই তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেন। এই কারণে মহারাজ তাঁহার প্রিয়তম পুত্র শ্রীশচন্দ্রকে ১৩১৭ সালের বৈশাখের প্রথমেই দার্জ্জিলিং পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু অমন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়াও মহারাজকুমারের আরোগ্যের কোনও লক্ষণই দেখা গেল না বরং রোগের বৃদ্ধিই প্রকাশ পাইতে লাগিল বলিয়া তাঁহাকে কাশিমবাজার ফিরাইয়া আনা হইল। মহারাজ-কুমারের বয়স তখন বার তের বৎসর মাত্র—তিনি মায়ের প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট বোধ হইত। মায়ের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া মাতৃভক্ত পুত্র মনে মনে বিশেষ আনন্দ বোধ করিলেন।

১৯শে আশ্বিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার "বাঙ্গলার বাঘ" স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর কলেজ পরিদর্শনে আসিয়া দুইদিন মহারাজের অতিথি হইয়া ছিলেন। এই বিশিষ্ট অতিথির সেবা শুশ্রূষার জন্য মহারাজ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তাহা বাস্তবিকই গল্প করিবার মত। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, অতিথি ও বন্ধু হিসাবে মহারাজের নিকট সকলেরই সমান আদর ছিল। তাঁহার ব্যবহার বা অতিথিসৎকারের মধ্যে কোন তারতম্যই কেহ কোনও দিন দেখিতে পায় নাই। নতুবা তাঁহার

কন্যার বিবাহে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ বদরুদ্দিন তায়েবজী ও তাঁহার ভ্রাতা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন কেন? মাদ্রাজ প্রদেশের বেলারি জেলার আনাগন্দী নামক স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজা শ্রীরঙ্গদেব রায়লুর সঙ্গেই বা তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইবে কি করিয়া?

কার্ত্তিক মাস হইতে বন্ধুজনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি জমিদারগণের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইলেন বটে কিন্তু ৯ই চৈত্র মহারাজের বড় জামাতা ধর্ম্মদাস দে কাশিমবাজারে টাইফয়েড জ্বরে সাত দিনমাত্র রোগ ভোগ করিয়া পত্নী, তিনপুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। শোকসন্তপ্ত মহারাজ কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না, বাঙ্গলা সরকারের আয় ব্যয়ের বাজেট তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া বক্তৃতাটি পত্র সহযোগে আইন-পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কন্যার বৈধব্য-ব্যথায় মহারাণী মাতা বিশেষ অধীর হইয়া পড়িলে আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় সিতাব চাঁদ নাহার বাহাদুরের পত্নী ও পৌত্রী ১৯শে চৈত্র তারিখে কাশিমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা-বাক্যে সুস্থির করিতে চেষ্টা করেন। মহারাজের গুণে নিকট ও দূরের ছোট বড় সকল লোকই এমনি মুগ্ধ ছিল যে, কোনও সুযোগে তাঁহার কোনও কাজে আসিতে পারিলে সকলেই যেন বিশেষ শ্লাঘা বোধ করিত।

এই সময় ভারতপ্রসিদ্ধ মারহাট্টা সারকাস পার্টির অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হওয়ায় উহার কর্ত্তৃপক্ষগণ মহারাজের নিকট আসিয়া এই সারকাস পার্টির স্বত্ব খরিদ করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা ইহার সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। কোনও ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থিরূপে মহারাজের নিকট দাঁড়াইলে তাহাকে বিমুখ

করিতে তিনি পারিতেন না। সারকাস পার্টি চালাইয়া অর্থাগমের জন্য তিনি যে উহার মালেকান স্বত্ব ক্রয় করেন নাই একথা বলাই বাহুল্য। কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর জন্য ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হওয়ার পর সারকাস পার্টি উঠিয়া গেল। *

পৌষ মাসে মহারাজকুমারী কমলিনী ডবল নিউমনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলে জীবন সংশয়াপন্ন হয়;—তখন মহারাজ সপরিবারে রাঁচিতে। সেই সময় ভাগলপুরে সাহিত্য সম্মিলন—মহারাজ সেখান হইতেই সম্মিলন উপলক্ষে মাতিয়া উঠিয়া—শশধর রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়া—যাহাতে তাঁহারা সকলে উপস্থিত হন,—তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলন সারিয়া স্পেশাল ট্রেণে ২৫শে মাঘ তারিখে মহারাজ সপরিবারে কাশিমবাজার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শুধু সাহিত্য নহে ভারতীয় চিত্রকলার প্রতিও মহারাজের অনুরাগ কম ছিল না। ব্যাণ্ডেঠিয়া প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি চিত্র প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

* Mr. Ramrao Gadgil
Kolhapur (Bombay Presidency)

Dear Mr. Gadgil,

I am directed by the Hon'ble The Maharaja Bahadur to write to you in reply to your letter of the 8th inst, that he is sorry to say that the circus has ceased to exist. More than Rs. 50,000/- have been already spent for its upkeep and he is not willing to spend any more on that head, so you need not come here for that.

o o o o o

Yours sincerely
K. Choudhury.

Babu Abanindranath Tagore
6, Darakanath Tagore's Lane, Calcutta.
24/2/1910.

My dear Abani Babu,

I shall feel greatly obliged if you will kindly arrange to send a few choicest productions of the Oriental Arts to our Bangetia Exhibition to be held on the 1st March and the three following days. I shall consider myself highly gratified, rather flattered if you can make time to pass a day or two with me on this occasion. I stress this because people of this District like and appreciate your work so much that your very presence will make my Exhibition a grand success. * * * *

সন ১৩১৮ সালের কথা—

২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহারাজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। মহারাজের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গেল।

ইংরাজি ১৯১১ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে বাঙ্গলার ছোট লাট স্যর এডোয়ার্ড নরমান বেকার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলের "ফাউণ্ডেসন ষ্টোন" প্রতিষ্ঠা করেন। রেভাঃ মিঃ ই, এম, হুইলার তখন কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, আমরা তখন কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের সহিত এক সঙ্গে পড়িতেছি।

কলেজ স্কুলের বিস্তৃত হল-ঘরে বেকার সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাওয়া হইল,—প্রিন্সিপ্যাল হুইলার সভাভঙ্গের পর লাট সাহেবের সহিত মহারাজ কুমার শ্রীশচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঐ সভায় বিপুল জনতা হইয়াছিল;—স্কুল ও কলেজ কমিটির অন্যতম

সভ্য, বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় সেই বৎসরই 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছেন—এই প্রথম আমরা তাঁহার ও হুইলার্ সাহেবের বক্তৃতা শুনিলাম। রায় বাহাদুর অতি সুন্দর বক্তৃতা করিলেন—প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাঁহার লিখিত রিপোর্ট পাঠ করিলেন। সেই রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা গেল—এই প্রকার বৃহৎ অট্টালিকা বাঙ্গলা দেশের অন্য কোনও উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের নাই এবং ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে মহারাজ বাহাদুর ব্যয় করিয়াছেন—এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা।

মহারাজের বিপুল আয়ের সম্পত্তি ছিল—কয়লা খনির জমিদারী বা কলিয়ারি এষ্টেট্ (Colliery estate)। এই সালের প্রথমেই এই বিশাল সম্পত্তির ম্যানেজিং এজেন্সি দেওয়া হয় এইচ, ভি, লো কোম্পানীকে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ভোগে আসক্তি ছিল না—বিশাল ঐশ্বর্য্যের তিনিই যে মালিক একথা তিনি মনে করিতেন না। আজ কাল ধনাধিকার সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট মতবাদ আমাদিগকে নূতন আলোকে সচকিত করিতেছে—তাহা দীর্ঘ বিশ বৎসর পূর্ব্বে মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট ধন-বিনিয়োগের একমাত্র নীতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। বিশাল সম্পত্তিতে সকলের অধিকার—তিনি সকলের প্রতিনিধি মাত্র—এই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে কখনই তিনি এমন মুক্ত হস্তে দান করিতে পারিতেন না।—তাঁহার মৃত্যুর পর বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের সহিত দেওঘরে জনৈক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াও মহারাজের এই প্রতিনিধিত্বের প্রশংসাসূচক উপদেশ শুনিয়াছিলাম। তিনি শ্রীশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"পিতাকা মাফিক ভগবানকা ম্যানেজার বন্ যাও।"—এই আদর্শেই স্বর্গীয় মহারাজের সকল কার্য্য সম্পাদিত হইত। হরেন্দ্র নারায়ণ মিত্র নামক জনৈক বিলাতপ্রবাসী ভদ্রলোককে লিখিত পত্রখানিতে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যভোগে মহারাজের সম্পূর্ণ অনাসক্তি প্রকাশ পাইতেছে :—

Mr. Harendra Narayan Mittra,
20, South Hill park Gardens, Hampstead N. W.
London, 20/6/11.

Dear Harendra Babu,

আপনার ২রা জুনের চিঠি পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। আশা করি এতদিনে আপনার হাতের ব্যথা ভাল হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশে মানুষকে বাধ্য হইয়া পরিশ্রম করিতে হয়। পরিশ্রম তাহাদের উন্নতি মূল কারণ।

Crystal placeএর Exhibition খোলার সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দ পাইলাম। বাহিরের show জগতে কিছুই নয়। আমার কথা যাহা লিখিয়াছেন ও কিছুই নয়। উহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। **আমার মনে হয় আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে উক্ত সমস্তই পরের জন্য এবং ইহার জন্য আমি ভগবানের নিযুক্ত একজন কর্ম্মচারী মাত্র।**

বিদেশী সঙ্গীত ভাললাগা একটি acquired taste. আমরা উহা বিশেষ appreciate করিতে পারি না। আপনাদের পরীক্ষা কবে হইবে লিখিবেন। আশা করি তাহার জন্য ভাল করিয়া প্রস্তুত হইবেন। * * *

হরেন্দ্রবাবু কে, কি পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বিলাতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন কিছুই জানিবার উপায় নাই; কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যকে রাজা-ভিখারী মণীন্দ্রচন্দ্র যে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা এই সামান্য পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়।

এই সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে মহারাজের খাস কর্ম্মচারী নৃত্যগোপাল বাবুর লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে মহারাজ যে কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন ও সাধুগণের প্রতি যে কতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন তাহা জানিতে পারা যায়।

২রা শ্রাবণ ১৩১৮
কাশিমবাজার রাজবাড়ী।

Babu Benukar Sarkar
Mukteer Rampurhat.

নমস্কারান্তে নিবেদনমিদম্—

শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে আপনাকে জানান যায় যে, তারাপীঠে 'বামাক্ষ্যাপা' নামক যে একটি মহাপুরুষ থাকেন বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি

ইচ্ছামত নিজ ভরণপোষণে অক্ষম। তারাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ নাটোরের মহারাজার আদেশ সত্বেও আর যত্ন লয়েন না, এই কারণে তাঁহার মহা কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় তাঁহার তুইটী চেলা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করে। কিন্তু তারাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট যে উপঢৌকনাদি উপস্থিত হয় তাহা জোর পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যান। তাহাতে তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহার সেবক ও কুকুরদিগের আহারাদি চলে না। তাঁহার সেবাইত যুবকদ্বয়েরও সেবা হয় না। সম্প্রতি ঐ মহাপুরুষটী অসুস্থ হইয়াছেন। আপনি স্বয়ং তারাপীঠে গমন করিয়া সমস্ত অবস্থা জানিয়া এই রাজধানীতে রিপোর্ট করিবেন এবং রাজধানী হইতে কিরূপ ব্যবস্থা ঐ মহাপুরুষের করিলে তাঁহার সেবা হয় তাহা জানিয়া লিখিবেন। আপনি গোপনে অনুসন্ধান করিবেন। ইতি— * * * *

সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার এই প্রকার সশ্রদ্ধ ও সহৃদয় ব্যবহার তাঁহার সহিত হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গিয়া দেখিয়াছি। বৃন্দাবনে সাধু-সন্দর্শন ত মহারাজের নিত্যক্রিয়া ছিল। অনেক স্থলে সঙ্গে গিয়াছি—অনেক স্থলে মৃদুহাস্যে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন—'তোমরা সব নব্য আলোকপ্রাপ্ত—যা' বুঝতে পারবে না—তা' নিয়ে হয়ত বিদ্রুপ করবে'—ইত্যাদি। ভিক্ষার জন্য হাত পাতিয়া সাধু কেন—অসাধুও প্রায় বিমুখ হইত না, কিন্তু সাধুরা যাচ্ঞা করিয়া যে ভিক্ষা পাইতেন তাহার মধ্যে যেন বিশেষ রকমের মর্য্যাদার ভাব দেখা যাইত।

সন ১৩১৮ সালে রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনার জন্য যে বিরাট অধিবেশন হয় তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মুর্শিদাবাদ হইতে চাঁদা তুলিবার জন্য নদীয়া জমসেরপুরের জমিদার, কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ মহাশয় বহরমপুর গিয়াছিলেন। কাশিমবাজার হইতে মহারাজ এই কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক যতীন্দ্র বাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরের উকিল উক্ত কবিবরের ভ্রাতুষ্পুত্র ফকির চাঁদ বাবু ও কবিবরকে পরিচয়-পত্র দিয়া লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ;—

Raja Babadur Jogendra Nath Ray
Lalgola,

সসম্মান প্রণামান্তে নিবেদনমিদম্—

কবিবর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনাকে বেশী কিছু বলিতে হইবে না। তাঁহাকে সময়োচিত উপহার দিতে এবং বৃত্তিকোষ প্রতিষ্ঠিত করিতে ন্যূনকল্পে উপস্থিত ১০০০০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে। এক্ষণে সভা আহ্বান করিয়া উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক সভায় যোগদান করিলে বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে। যদি কোন কারণ নিবন্ধন আপনার সভায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হয় তাহা হইলে এই কার্য্যে যাহাতে আমরা সফলকাম হই তাহা করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বাগচী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী উভয়ে মহাশয়ের নিকট এই উদ্দেশ্যে যাইতেছেন। তাঁহারা সাক্ষাৎকারে সমস্ত বলিবেন। ইতি—* * *

মহারাজ নিজে এই সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে ২০০৲ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান লেখকের সম্পাদিত "উপাসনা"র মণীন্দ্রস্মৃতি-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মহারাজের যে দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন * সেই দান-কার্য্যটি এই সালেই সম্পাদিত হয়।

সন ১৩১৮ সালের ১২ই ভাদ্র শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গভাষায় অভিধান সঙ্কলন আরম্ভ করেন। এই অভিধান সঙ্কলনের পরিচালনার ভার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। এই কার্য্যের সহায়তাকল্পে উক্ত অধ্যাপক মহাশয়কে মহারাজ পারিশ্রমিক স্বরূপ এই সালের আশ্বিন মাস হইতে মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে কাশিমবাজার রাজ এষ্টেট হইতে দিবার বন্দোবস্ত করেন।

এই সালের শীতকালে অর্থাৎ ইং ১৯১১ সালের ১লা ডিসেম্বর—রাজা রাণীর আগমন উপলক্ষে সদলবলে স্পেশাল ট্রেনে (Guests Special

---

* পরিশিষ্ট—২য় পৃঃ দ্রষ্টব্য।

train) মহারাজ দিল্লী যাত্রা করিলেন। দরবারের নিমন্ত্রণ রক্ষাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। সেখান হইতে ফিরিয়া মহারাজ ৫ই জানুয়ারী কলিকাতার বাড়ীতে ভারতেশ্বরের আগমন উপলক্ষে উৎসবাদির আয়োজন—গান বাজনা থিয়েটার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিলেন। রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি বৃহৎ সান্ধ্যসম্মিলনীর (Evening party) আয়োজন হইল। এই উপলক্ষে ভারতেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ছোটলাট, তাঁহার পত্নী—অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও ভারতবাসী কলিকাতার "কাশিমবাজার হাউস"এ সমাগত হইয়া মহারাজের সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ দান ছাড়া অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

মহারাজের মীরমুন্সী যোগেন্দ্রবাবুর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ কবিশেখর মহাশয় এ সময় মহারাজের কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। তাঁহার পাঠ্য পুস্তক কিনিবার জন্য মহারাজ এককালীন ১০০৲ একশত টাকা দান করিলেন।

মুক্তাগাছা বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রিগণের জলখাবারের জন্য ২০৲ টাকা দান করিলেন।

অঙ্কশাস্ত্রে কোন ছাত্রকে বুৎপন্ন দেখিলে মহারাজ খুব সন্তুষ্ট হইতেন। মুক্তাগাছা হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর জনৈক ছাত্র অঙ্কে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে একটি স্বুবর্ণ পদক পারিতোষিক দিলেন।

হুগলি জেলার নওসেরাই নামক স্থানের উত্তমানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম নির্ম্মাণের সাহায্য কল্পে ৫০৲ টাকা দান।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রণীত "ভক্তের জয়" গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় বাবদ সাহায্য ১০০৲ টাকা।

দৌলৎপুর হিন্দু একাডেমীর ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য মহারাজের এককালীন দান ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা ।

"পদ্মরাগে"র কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "নির্ম্মাল্য" নামক ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ ছাপাইবার জন্য সাহায্য ৫০৲ টাকা।

সন ১৩১৯ সালের কথা—

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি, এল, রায়) তাঁহার নন্দকুমার চৌধুরীর লেনের বাড়ীতে Calcutta Evening club বা কলিকাতা সান্ধ্য সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিসভার অধিবেশনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সভাপতিত্ব করেন।—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নিজেও এই "ইভ্‌নিং ক্লাব"এর অন্যতম সভ্য ছিলেন।

"১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা (Museum) রামেন্দ্রবাবুর যত্নেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেন। কাশিমবাজার ও লালগোলার বদান্যবর নরপতিগণ ও অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তিদিগের যত্ন, চেষ্টা ও দানে চিত্রশালা গৌরবশ্রীতে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।" * বর্ত্তমান সালের আষাঢ় মাসে মহারাজ এই চিত্রশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২০০৲ দুই শত টাকা এবং ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদের পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৫০৲ টাকা দান করিলেন।

আশ্বিন মাস হইতে মহারাজ বাহাদুর ম্যালেরিয়া জ্বরে খুব পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সম্মুখে দুর্গাপূজা—বাড়ীর পূজা ফেলিয়া মহারাজ স্থানান্তরে যাইতে কিছুতেই রাজী হইলেন না ; সেই অসুস্থ ও দুর্ব্বল

* আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

অবস্থাতেই পূজা-উৎসবের তত্ত্বাবধান করিলেন। শারদীয়া পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্ত মহারাজ চুনার যাত্রা করিলেন।

কার্ত্তিক মাসে চুনার হইতে বিন্ধ্যাচল গিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তন ও বিশ্রাম যত হউক না হউক সে দিগের তীর্থস্থানগুলি সব দেখা হইয়া গেল। সেখান হইতে ৩০শে কার্ত্তিক শুক্রবার বেলা ১০টায় নৌকাযোগে কাশীযাত্রা করা হইল। কাশীতে ৫টার সময় পৌছাইয়া মাত্র এক রাত্রি থাকা হইল। পরদিন বেলা ৯টায় কাশী হইতে মহারাজ চুনারে আসিয়া যখন পৌছিলেন তখন রাত্রি ১টা। এই ভাবের পর্য্যটক-বৃত্তি মহারাজকে এক একবার পাইয়া বসিত। শরীর তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই বটে কিন্তু তাঁহার সাধের বৈষ্ণব সম্মিলন হইবে যে স্বজেলায় শ্রীখণ্ডে। অতএব জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদার ধূম পড়িয়া গেল—প্রত্যাবর্ত্তনের তাগিদ······আর মন স্থির করিবার উপায় নাই। ৫ই অগ্রহায়ণ সদলবলে কাশিমবাজার যাত্রা করা হইল।

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সম্মিলন শেষ হইতে না হইতেই—ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে সভ্য হইবার চেষ্টায় মহারাজ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।—তাঁহার চেষ্টা সফল হইল—তিনি বড়লাটের সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

ইহার পরেই মহারাজ তাঁহার কণিষ্ঠা কন্যা কমলিনীর বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফরিদপুর ডোমসার বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের পুত্র, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রায়ের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল—২৭শে মাঘ তারিখে মহারাজকুমারী কমলিনীর 'আশীর্ব্বাদ'ও হইয়া গেল।

এই সময় দেখিতে পাই মহারাজের পুণ্য চরিতকথা দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে—দেশ দেশান্তর হইতে বহু মহিলা কবি ও সাহিত্যিক স্ব স্ব রচিত গ্রন্থ মহারাজকে উপহার পাঠাইতেছেন।

এই বৎসরের বৃহৎ দান—৩০০০৲ তিন হাজার টাকা। মহারাজের এষ্টেটের সেরেস্তাদার গোপালকৃষ্ণ রায় মহাশয়কে, তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মহারাজ এই দান করিলেন। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত দানগুলির কথা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে,—

২৪শে মাঘ পাটনা কলেজের অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারকে তাঁহার 'প্রাচীন ভারত' নামক পুস্তক মুদ্রণের জন্য মহারাজ ২৫০৲ টাকা সাহায্য করিলেন।

শ্রীবিশ্বমঙ্গল ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' ছাপাইবার জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্য বিদ্যাভূষণকে ২০০৲ টাকা সাহায্য করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন গিরিগোবর্দ্ধনে ১৪ই চৈত্র স্বর্গীয় মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের সমাধিপ্রতিষ্ঠা হয়। এই উপলক্ষে ১২ই চৈত্র মহারাজ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সেখানকার এই শোকাবহ অথচ একান্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ২৩শে চৈত্র তিনি কাশিমবাজার প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজের আবাল্যের বন্ধু প্রবীণ সাহিত্যিক 'বাসিফুল' ও 'ওথেলো' প্রভৃতির রচয়িতা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু (ব্যাঙবাবু) সমাধিগাত্রে প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত সুন্দর কবিতাটি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন,—

"এ মানস-গঙ্গাকূলে, মানস-নয়ন খুলে
হের পান্থ জীবনের ভ্রান্ত আকিঞ্চন,
নিয়তি-প্রবাহে ভাসি, এই "রাধাকুণ্ডে" আসি,
চিতায় করিল পিতা পুত্র সমর্পণ।
দেখ হে সমাধি যার, ছিল সর্ব্বগুণাধার
"মহিম" মণীন্দ্রচন্দ্র-তনয় রতন,
কাশিমবাজার ধাম, কাশীশ্বরী মার নাম
পুণ্যভূমে মুক্তকাম বিমুক্তবন্ধন।
পান্থশালা এ সংসার, তুমি আমি কেবা কা'র
চরমে পরম শান্তি শ্রীহরি-চরণ।"

দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা মাঝে মাঝে মহারাজকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। ভারতবর্ষের বহু স্থান তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯শে পৌষ (ইং ৩রা জানুয়ারী ১৯১১) এলাহাবাদ প্রদর্শনী দেখিতে যাত্রা করেন। ৮ই মাঘ এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ ও কাশী হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। আবার ১৫ই মাঘ মাদ্রাজ-মেলে মহীশূর ও বাঙ্গালোর ভ্রমণে বাহির হইলেন। টাটা ইনষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষার একটু অজুহাতও ছিল। বাঙ্গালোর হইতে মেদুরা, ত্রিচিনাপল্লী, রামেশ্বর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনপূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন ১৩২০ সালের কথা—

মহারাজই কলিকাতার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর কর্ণধার ছিলেন। অর্থসাহায্য করিয়া, উপদেশ দিয়া, নানাভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়া তিনি এই সম্মিলনীকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া আসিতেছিলেন। বাঙ্গলা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিবার জন্য মহারাজের জীবনকালে ক্ষুদ্র বৃহৎ যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে—তাহাতেই কোনও না কোনও ভাবে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দান দেখিতে পাওয়া যায়।

১২ই বৈশাখ তারিখে জমিদারী পরিদর্শনের জন্য মহারাজ দ্বিতীয় বার বাহিরবন্দ যাত্রা করিলেন। বাহিরবন্দের জমিদারী কাছারী উলিপুর—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় সেখানকার ম্যানেজার বা নায়েব ছিলেন, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। উলিপুর যাইবার পথে রংপুরের জনসাধারণের আমন্ত্রণে সেখানে বালিকাবিদ্যালয়, টোবাকো ফ্যাক্টরী ও উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং তথাকার অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন।

সন ১৩০৫ সালে মহারাজ প্রথম তাঁহার রংপুর জেলাস্থিত প্রধান জমিদারী পরগণা বাহিরবন্দ পরিদর্শন করিতে যান একথা পূর্ব্বেও বলা

মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠা

হইয়াছে। সঙ্গে সেক্রেটারী ললিত বাবু, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ সেন ও অন্যান্য অমাত্যগণ ছিলেন। বাহিরবন্দে সে সময় রাণাঘাট নিবাসী প্রিয়নাথ রায় প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। মহারাজের উদারতা ও সদ্ব্যবহারে সমস্ত প্রজাগণ মুগ্ধ হইয়াছিল, মহারাজ বাহাদুরও সেখানকার দেবতাদের যথোচিত পূজা ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রজাবর্গকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। কোন কোন বড় প্রজা মহারাজকে তাহাদের বাড়ীতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সে অভ্যর্থনার তুলনা করা যায় না; প্রজাগণ নরনারী-নির্ব্বিশেষে কাতারে কাতারে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। বাগুয়ার সরকার জোতদারগণ জাতিতে কায়স্থ, বহুদিনের পুরাতন প্রজা এবং সে সময় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন, তাঁহারা মহারাজকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাজোচিত পূজা অর্থাৎ শাস্ত্রমত ভূস্বামীর পূজা করিয়াছিলেন এবং পুরস্ত্রীগণ মহারাজের পদধৌত করিয়া উন্মুক্ত কেশগুচ্ছ দিয়া তাহা মুছাইয়া লইয়াছিলেন। এ দৃশ্যে মহারাজ আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যকালে এই সরকার জোতদারদিগকে কোন প্রার্থনা হইতেই তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহাদের জোতজমা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রাজএষ্টেটের খাজনা বাবদ বহু টাকা বাকী পড়িলে মহারাজ তাঁহাদিগকে এক লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দিয়া বাকী টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া লইয়াছিলেন। জোতদারদের এখন প্রায় সকলেই মৃত এবং জীবিতগণের অবস্থাও এখন শোচনীয় হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাহিরবন্দের ২০ লক্ষ বিঘা জমীর বাবত ৮৫ হাজার টাকা মাত্র জমা ধার্য্য হয়। পথ, ঘাট, রাস্তা, জল নিকরে পাঁচ লক্ষ বিঘা জমি বাদ দিলেও কৃষিকর্ম্মের উপযোগী ১৫ লক্ষ বিঘা জমি ঐ জমিদারীতে বন্দোবস্ত করিবার মত বর্ত্তমান, কিন্তু মহারাজ বাহাদুরের প্রথম পরিদর্শনকালে উহার খাজানা মাত্র ৩ লক্ষ টাকা ছিল, ক্রমশঃ উহার খাজানা বৃদ্ধি হইতেছিল। হরেন্দ্রবাবু যখন সেখানে ম্যানেজার

হইয়া যান তখন হইতে উহার জমা বৃদ্ধি হইয়া এখন উহার আদায় দাঁড়াইয়াছে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। কিন্তু জমিদার বিঘা প্রতি মাত্র ১৲ টাকা হারে খাজনা পাইলেও ঐ সম্পত্তি হইতে তাঁহার ১৫ লক্ষ টাকা প্রাপ্য হওয়া উচিত।

মহারাজের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া এবং মাতামহীকে প্রতিশ্রুত টাকা দিবার জন্য তাঁহার প্রভূত ঋণ হওয়ার কথা জানিতে পারিয়া প্রজারা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে জমার উপর টাকা প্রতি ।৵৹ আনা করিয়া "আগমনী" নজর দিতে সম্মত হইয়াছিল। টাকা আদায়ের ভার প্রধান কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত হইলে, প্রজাগণ ঐ টাকা দুই বৎসরে দিবার অভিপ্রায় জানাইল কিন্তু প্রধান কর্ম্মচারী মনিবের প্রিয় হইবার বাসনায় একবৎসরে উহা আদায় করিবার চেষ্টা করায় একদল প্রজা তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া গভর্ণমেণ্টে দরখাস্ত দেয় এবং তাহার তদন্তে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ ম্যারিণডিন্ বাহির বন্দে উপস্থিত হন। প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলা সত্ত্বেও তিনি আদায়ী টাকা ফেরত দিবার জন্য আদেশ দেন, তদনুসারে ঐ টাকা খাজনায় মুসমা দেওয়া হয়। এই সময় হইতে বাহিরবন্দে বাকী খাজনার সুদ প্রবর্ত্তিত হয়, ইহার পূর্ব্বে সুদ লওয়ার রীতি ছিল না। অনুগত প্রজাবর্গ পুনরায় সুযোগ ও সুবিধামত "আগমনী" নজর প্রদান করিয়া মহারাজের সন্তোষসাধন করিবে এরূপ ইচ্ছা তাহাদের প্রবল ছিল, এ কারণ হরেন্দ্র বাবুর কার্য্যকালে মহারাজ বাহাদুর যখন বাহিরবন্দে দ্বিতীয়বার গমন করেন তখন প্রজারা নিজেই "আগমনী" নজর দিবার অভিপ্রায় জানায়। সে সময় মিঃ জে, এন, গুপ্ত আই, সি, এস ; সি, আই, ই রংপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। হরেন্দ্র বাবুর কার্য্যকুশলতায় কোনও বিরুদ্ধবাদ প্রকাশিত হয় নাই, দুই বৎসরে টাকা প্রতি ।৵৹ আনা নজর আদায় হইয়া গিয়াছিল। মহারাজ বাহাদুর এই টাকার মধ্য হইতে প্রজাদিগের উপকারার্থ রংপুরে কলেজ স্থাপনের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

রংপুরে কারমাইকেল কলেজ (Carmichael College) এর ভিত্তি স্থাপনের সময় মহারাজ বাহাদুর আমন্ত্রিত হইয়া তথায় শুভাগমন করেন। হরেন্দ্রবাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রংপুরের বাসাবাটীতে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন। স্থানীয় ভদ্রলোকগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন। মহারাজ বলিতেন যে কাহাকেও অর্থ দিয়া পরিতৃপ্ত করা যায় না কিন্তু খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারা যায় এবং তাহাতে বিশেষ আনন্দ আছে। সেই হিসাবে সহরের গণ্যমান্য উকীল, মোক্তার ও রাজকর্ম্মচারী সকলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইল। হঠাৎ সেই সময় মহারাজের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা সত্বেও প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া পরিবেষ্টাগণের কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

রংপুরের সেই বাসাবাটীতে লাট সাহেব মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বাটীখানি উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া সেখানে তাঁহাকে সান্ধ্য-সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা করা হইল। তিনি মহারাজের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যেখানেই মহারাজ উপস্থিত থাকিবেন, সেইখানেই ভূরি ভোজনের আয়োজন অনিবার্য্য। বাহিরবন্দের * সাধারণ প্রজার মঙ্গলের জন্য মহারাজ একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া এষ্টেটের ম্যানেজারকে তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সঙ্গত সুদে প্রজাগণ টাকা কর্জ্জ পাইলে তাহারা সুদখোর মহাজনদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং পাটের জন্য দাদন লইয়া যে-কোনও দরে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে না। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, বাহিরবন্দের এলেকায় যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তাহা নগদ টাকা দিয়া বা খাজনার বিনিময়ে গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চালান দিবেন; তাহাতে মধ্যবর্ত্তী

* বাহিরবন্দ এবং বাহারবন্দ—এই দুইটি কথারই প্রচলন আছে।

লোক (middle man) কোনও সুবিধা পাইবে না, প্রজাগণই সমুদয় লভ্যাংশ পাইবে। এই কাজের ভার একজন ইউরোপীয় সাহেবের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে প্রতিপালন না করায়, ঐ কাজে লোকসান হয় এবং এজন্যই উহা তিনি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। মহারাজের অভিপ্রেত বিষয়টি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একবার সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বাহিরবন্দে ন্যূনাধিক ৫০ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে, মণকরা ।০ আনা লাভ রাখিতে পারিলেও প্রতি মরসুমে ১২ লক্ষ টাকা আয় হয়। পাট বিক্রয়ের এই প্রকার ব্যবস্থা হইলে কাশিমবাজার এষ্টেটের ঋণভার বহুপরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে।

পরগণা বাহিরবন্দরের সদর কাছারীর নিকট ধামশ্রেণী নামক গ্রামে পূর্ব্বতন মালিক প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী সত্যবতীর স্থাপিত সিদ্ধেশ্বরী দেবীর এক পুরাতন মন্দির বিদ্যমান আছে। রাণী সত্যবতীর প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি সম্বন্ধে এ অঞ্চলে বহু গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নিজে নাকি ইহাঁর কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেন।

রাণী সত্যবতী বালবিধবাহেতু ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। তাঁহার বাল্যসখী রাণী ভবানী পরে যে সুবিস্তৃত জমিদারী ভোগদখল করিতেন এককালে তাহা সত্যবতীরই ছিল। রাণী সত্যবতী একবস্ত্রা হইয়া যে সময় গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিতে যান, সেই সময় তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি রাণী ভবানীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান, কিন্তু তিনি আর ফিরিয়া না আসায় রাণী ভবানীই উক্ত সম্পত্তির মালিকস্বরূপ ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দখলীকার ছিলেন। পরিখাবেষ্টিত রাণী সত্যবতীর বাড়ীটি গড়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। প্রাচীনত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মহারাজ বাহাদুর তাহার ভগ্নস্তূপগুলি খনন করিবার আদেশ দিলে, উহা খনন করা হয় কিন্তু তাহাতে মূল উদ্দেশ্য সফল হইল না; কিন্তু তাহাতে একটী বৃহদাকার পুষ্করণীর সংস্কার হইয়া

যাওয়াতে এখন পার্শ্ববর্ত্তী প্রজাবর্গের প্রভূত উপকার হইতেছে। এই স্থানটী অতিশয় মনোরম, মহারাজ পাদচারণা করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বহুক্ষণ মাতার মন্দিরে বসিয়া থাকিয়া বলিলেন—"এখানে আমার সন্তপ্ত হৃদয় অনেকটা শান্তি পাইল, ইচ্ছা হয় সমুদয় ছাড়িয়া এইখানেই থাকিয়া যাই।" কোনও নির্জ্জন দেবস্থান বা শান্তিময় আশ্রম দেখিলেই মহারাজের মনে—গভীর বৈরাগ্যের উদয় হইত। কর্ম্মবহুল জীবন যাপন করিয়া উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর মধ্যে আত্মস্থ হইবার ঐকান্তিক ইচ্ছা তাঁহার মাঝে মাঝে হইত—কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য মহারাজের বৈরাগী মনকে কর্ম্মযোগের মধ্যে আবার ডুবাইয়া দিত।

জমিদারী পরিদর্শন শেষ করিয়া উলিপুর হইতে ৯ই জ্যৈষ্ঠ রওনা হইয়া দার্জ্জিলিং মেলে ১০ই তারিখে বেলা ১১টার সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মোটরে করিয়া তাঁহার সারকুলার রোডের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় ময়লাফেলা রেল-গাড়ীর ইন্‌জিনের সহিত ধাক্কা লাগিয়া মোটর ভাঙ্গিয়া যায় এবং রেললাইনের উপর পড়িয়া গিয়া তাঁহার জীবন বিপন্ন হয়। এই প্রকার দুর্ঘটনাতেও মহারাজের দেহে কোনও প্রকার আঘাত লাগে নাই,—মনে হইল স্তিমিতনেত্রে তিনি যেন কাহার ধ্যান করিতেছেন,—ইন্‌জিনের নিম্ন হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিবামাত্র তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মৃদুহাস্যে বলিলেন—"আগে ভোলাকে দেখ; আমার জন্য চিন্তা নাই।" নিজের কথা ভুলিয়া এই ভাবেই তিনি আজীবন পরের কথাই ভাবিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অক্ষত দেহে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

এই মোটরের ড্রাইভার বা চালক ছিলেন বহরমপুর নিবাসী শ্রীভোলানাথ সিংহ। তাঁহার অসাবধানতার জন্যই এমন একটি মহার্ঘ জীবন নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল,—তবুও ভোলাবাবুর কর্ম্মচ্যুতি

হইল না—তাঁহাকে কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী করিয়া কাশিমবাজার পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

দুর্ঘটনা হইতে মহারাজের প্রাণরক্ষা হইয়াছে—এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ ও তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া ১১ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে মহারাজের বিপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য আনন্দ-প্রকাশ করিয়া পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল। মহারাজকুমারী কমলিনীর বিবাহ ২রা আষাঢ় স্থির হইয়াছিল—মহারাজ অবিলম্বে কাশিমবাজার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে মহারাজের গভীর জ্ঞানের কথা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ শ্যামপুকুর নিবাসী ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট তিনি উক্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রিয় আলোচনাগুলির মধ্যে জ্যোতিষবিদ্যা অন্যতম ছিল। গ্রন্থকারের পিতৃদেব, বসুমতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, বহুভাষাবিদ্ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত 'বরাহ মিহির ও খনা' পুস্তকখানি তিনি সাগ্রহে পাঠ করিয়া একদিন উক্ত পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে এমন করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলেন —যে সম্পূর্ণ অনধিকারীর পক্ষেও আলোচ্য বিষয় বুঝিতে কষ্ট হইল না।

জ্যোতিষশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচার লইয়া ভারতবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদগণের সঙ্গে তাঁহার অনেক আলোচনা ও বিচার বিতর্ক হইয়াছে—উক্ত শাস্ত্রে মহারাজের সবিশেষ অধিকার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত পণ্ডিত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট—মহারাজকুমারী কমলিনীর বিবাহের দিন স্থির লইয়া উলিপুর হইতে লিখিত একখানি পত্র হইতে জ্যোতিষে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাই।—

রংপুর,

২৫শে বৈশাখ, ১৩২০।

প্রণামান্তে নিবেদনমিদম্—

রাজকুমারী শ্রীমতী কমলিনীর বিবাহের দিনসম্বন্ধে আপনি যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গুপ্তপ্রেস, পি, এম, বাগচী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি পঞ্জিকাকারের মতে ২রা আষাঢ় বিবাহের ত্যাজ্যদিন বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ২রা আষাঢ় বিবাহের তিনটী লগ্ন আছে। আপনার উদ্ধৃত বচন অনুসারে ধনু লগ্নের সপ্তমে ক্রূর গ্রহ রবি আছে। চন্দ্র হইতে সপ্তমে শনি ও অষ্টমে রবি। সুতরাং ইহা ত্যাজ্যদিন। কিন্তু ধনু লগ্ন না করিয়া মকর লগ্ন করিলে লগ্নের সপ্তম অষ্টমে কোন পাপগ্রহ থাকে না। আর মুতহিবুকযোগে বিবাহ হইলে সর্ব্বারিষ্ট ভঙ্গ করে। কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত রবি মঙ্গল শনি ক্রূর গ্রহ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং ধনুলগ্ন হইতে সপ্তমগ্রহস্থিত রবি ক্রূর গ্রহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ২রা আষাঢ় শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকাইয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। * * *

খাগ্‌ড়া নিবাসী উক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া তৎপ্রদেশে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রতি মহারাজেরও বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাশয় মহারাজের সিদ্ধান্তই সমীচীন বিবেচনা করায় ২রা আষাঢ় সোমবার তারিখে রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পালের সহিত মহারাজকুমারী কমলিনীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

৭ই শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে যে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি স্থাপিত হয়—তাহাতে মহারাজ ২০০৲ দান করিয়াছিলেন।

এই সময় দামোদরের প্রবল বন্যায় চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়—মহারাজ রায় বাহাদুর সীতানাথ রায়ের হাত দিয়া ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিলেন।

অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারকে "প্রাচীন ভারত" গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য দ্বিতীয় দফায় ৪৭৯৲ টাকা এবং সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার "কমলকুমার" উপন্যাস মুদ্রণের জন্য মহারাজ ১০০৲ টাকা দান করিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে জে, ডব্‌লিউ, পেটাভেল সাহেবকে পরিচয়পত্র দিয়া রবীন্দ্রনাথ মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই পরিচয়ের পরই পেটাভেল সাহেবকে মহারাজ কলিকাতা পলিটেক্‌নিক্ ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।

বড় লাটের সভার সদস্য হইয়া উক্ত সভার জানুয়ারী মাসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য ৫ই জানুয়ারী মহারাজ দিল্লী যাত্রা করিলেন।

দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে মিরাট-প্রবাসী বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজার সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তথাকার বাঙ্গালিগণের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিলিয়া মিশিয়া আনন্দ করিয়া, বিপুল সম্মানে সংবর্দ্ধিত হইয়া মহারাজ কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন। মহারাজ আজীবন মিরাট দুর্গাবাড়ী ও সাহিত্যপরিষদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সন ১৩২১ সালের কথা—

এই বৎসর মহারাজের কয়েকটি বিশিষ্ট দান, একটা মোটা টাকার ঋণ গ্রহণ, তীর্থযাত্রা, দেশ ভ্রমণ ও কয়েকটি সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব করিবার ভার গ্রহণই উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যাইতে পারে। বৎসরের প্রথম হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ দানের কার্য্য আরম্ভ হইত, টাকার অভাব ঘটিলে ঋণ গ্রহণ করা হইত; সভাসমিতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন বা পরিচালন ব্যাপারে নিজেকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিয়া দেশসেবার আনন্দ লাভ—ইহাই ছিল মহারাজের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন-যাপনের কর্ম্মসূচী।

এই বৎসরের প্রথমেই মহারাজের খুব টাকার অভাব পড়ায় রাজা কৃষ্ণদাস লাহার নিকট তিনি দুই লক্ষ টাকা ঋণ করিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে রাজ তহবিলে কিছু বেশী টাকার আমদানী হওয়ায় আষাঢ় মাসেই এই টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইল।

চট্টগ্রামের মইস্‌খালের জমিদার অনারেবল প্রসন্নকুমার রায়কে, উক্ত জেলার মেধসেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় বাবদ (৭ই এপ্রিল ১৯১৪) ২০০০৲ টাকা সাহায্য পাঠান হইল। এইরূপ দেব-গৃহ বা মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে দানের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেও লিপিবদ্ধ করিয়াছি। জীর্ণ দেবমন্দিরের সংস্কার, নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে দান করিবার জন্য পরম হিন্দু "ভারত-ধর্ম্ম-ভূষণ" মহারাজ সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

এ বৎসরের নিম্নলিখিত দানগুলিতে মহারাজের সাহিত্য-প্রীতি ও বিদ্যানুরাগ প্রকাশ পাইতেছে,—

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার "অদৃষ্ট লিপি" নামক পুস্তক ছাপাইবার জন্য ১৫০৲ টাকা দান।

২। কলিকাতা ঢাকুরিয়া পাব্‌লিক লাইব্রেরীর জন্য সাহায্য ৫০৲ টাকা।

৩। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ মহাশয়কে "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন" এবং "বৈজ্ঞানিক জীবন" এই দুইখানি গ্রন্থ ছাপাইবার জন্য ২০০৲ টাকা দান।

৪। ১৩ই চৈত্র তারিখে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার The Foundations of Indian Economics নামক অর্থনীতির পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয় বাবদ মহারাজ ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিলেন।

৫। ১নং শঙ্কর ঘোষের লেনের চারুচন্দ্র বসু "মহারাজ অশোকের অনুশাসনের সটীক ব্যাখা" বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন

শুনিয়া মহারাজ আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন এবং উক্ত পুস্তক ছাপাইবার আংশিক ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এতদ্ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণের সাহায্য কল্পে মহারাজ ১৯শে আশ্বিন তারিখে—বীরভূম জেলার জয়দেব কেন্দুলির নৃসিংহদাস মুখোপাধ্যায়কে ১০০৲ টাকা এবং বাল্য শিক্ষক জগদ্বন্ধু মোদকের পৌত্রীর বিবাহে ২০০৲ টাকা সাহায্য করিলেন।

এই বৎসর মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শ্রীশচন্দ্র আমাদের ক্লাশের মধ্যে অন্যতম মেধাবী ছাত্র বলিয়া শিক্ষক ও সহপাঠিগণের নিকট প্রশংসিত ছিলেন। ইংরাজি, অঙ্ক ও ড্রয়িংএ তিনি প্রায়ই অধিক নম্বর পাইতেন। অঙ্কে শ্রীশচন্দ্রের বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া—বহরমপুর কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায়কে তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

মহারাজের সুবৃহৎ লাইব্রেরী বা পুস্তকাগারের অগণিত আধুনিক ও প্রাচীন পুস্তকের উপযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য পাটনা কলেজের অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়কে গ্রীষ্মাবকাশে আহ্বান করা হইল। সমাদ্দার মহাশয় মহারাজের প্রভূত উপকারের বিনিময়ে এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া দিলেন। এই পুস্তকাগারে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি এখনও আছে বলিয়া জানি। এই সঙ্গে বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের আধুনিক বহুবিষয়ের ইংরাজি পুস্তকের বিশদ সংগ্রহ একত্র করিলে—কাশিমবাজার রাজ-লাইব্রেরী বাঙ্গলা দেশের গৌরবস্থল বলিয়া সমাদৃত হইতে পারে।

রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন সি, আই, ই মহাশয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন—উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা

ও ঘনিষ্ঠতার কথা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। রায় বাহাদুরের মহাপ্রাণা, প্রাতঃস্মরণীয়া পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৯ই কার্ত্তিক তারিখে মহারাজ সপুত্র বৈকুণ্ঠ বাবুর আদি নিবাস আলামপুর যাত্রা করেন। বহু অর্থব্যয়ে এই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ অমায়িক ব্যবহারে শ্রাদ্ধ-সভায় অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে কাশিমবাজার রাজবাটীতে বৈষ্ণব সম্মিলনীর ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে বহু বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও ভক্তগণের সমাবেশ হয়।

কাশিমবাজারে বৈষ্ণব সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ অধিবেশন সম্পন্ন করিয়া মহারাজ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভায় যোগদান করিবার উদ্দেশে ৯ই জানুয়ারী তারিখে দিল্লী যাত্রা করিলেন। সেখানকার কাজ সারিয়া কাশিমবাজার প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় ৪ঠা ফাল্গুন সপরিবারে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র কাশিমবাজারেই থাকিয়া গেলেন। বৃন্দাবন হইতে মহারাজ দিল্লী পরিষদে যাতায়াত করিতেন।

এই সময় একাদশী উপলক্ষে বহু দূর দূরান্তের সাধুসন্ন্যাসিগণ বৃন্দাবনে যমুনা-স্নান করিয়া বৃন্দাবন পরিক্রমণ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বৃন্দাবনে প্রায় ৩ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত মহারাজের একখানি পত্রে ইহার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। মহারাণী ও অন্যান্য পুরো-মহিলারা সে সময় বৃন্দাবনে মহারাজের "পুলিন কুঞ্জে" অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ উক্ত পবিত্র দিনে বৃন্দাবনধামে ১৬০০০

ষোল হাজার সাধুসন্ন্যাসীকে একস্থানে বসাইয়া ভূরি ভোজন করাইলেন এবং প্রত্যেক সাধু বা সন্ন্যাসীকে একখানি করিয়া কম্বল দান করিলেন। দিল্লী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে এত অধিক সংখ্যক কম্বল পাওয়া গেল না,—নৃত্যগোপাল বাবুকে কলিকাতায় পাঠাইয়া বাকী কম্বল আনাইয়া লওয়া হইল। এ প্রকার বিরাট সাধু-ভোজনের ব্যাপারে মহারাজের প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ইহার বহুদিন পরে মহারাজের সহিত হরিদ্বারের পথে যখন বৃন্দাবন গিয়াছিলাম, তখনও দেখিয়াছি বৃন্দাবনধাম উক্ত সাধু-ভোজনের প্রশংসায় মুখরিত।

বৃন্দাবনের "কামদার" * মহাশয়কে জানাইবার জন্য দিল্লী হইতে তীর্থ পর্য্যটনের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া মহারাজ ২রা চৈত্র জ্ঞান বাবুকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

২৬শে মার্চ্চ—প্রাতের ট্রেণে দিল্লী হইতে বৃন্দাবন গমন।

২৭শে মার্চ্চ—প্রাতে গোবর্দ্ধন হইয়া রাধাকুণ্ডে স্নান ও অবস্থিতি।

২৮শে মার্চ্চ—গোবর্দ্ধন পরিক্রম, মানসগঙ্গায় স্নান, ৺হরদেব দর্শন, রাধাকুণ্ডে প্রত্যাগমন, ব্রজবাসী-ভোজন, রাত্রে অবস্থিতি।

২৯শে মার্চ্চ—রাধাকুণ্ড হইতে কাম্যবন যাত্রা, তথায় আহারান্তে বর্ষাণ যাত্রা।

৩০শে মার্চ্চ—বর্ষাণে অবস্থিতি, ব্রজবাসী-ভোজন।

৩১শে মার্চ্চ—বর্ষাণ হইতে প্রেমসরোবর, সংকেটহ্মম্মবন, পৌর্ণমাসীকুণ্ড, উদ্ধব খেয়ারী হইয়া নন্দগ্রাম, রাত্রে অবস্থিতি।

১লা এপ্রিল—নন্দগ্রাম, বড়চরণ পাহাড়ী দর্শন, ব্রজবাসী-ভোজন, আহারাদি।

২রা এপ্রিল—নন্দগ্রাম হইতে ১১।৪০ মিনিটের ট্রেণে মথুরা যাত্রা, মথুরায় অবস্থিতি।

৩রা এপ্রিল—৯।৩০ মিনিটের ট্রেণে কেরোলী যাত্রা, হিন্দলসিটিতে পৌছানো, রাত্রে কেরোলিতে অবস্থিতি।

৪ঠা এপ্রিল—কেরোলিতে ৺মদনমোহন দর্শন, দশটার সময় জয়পুর যাত্রা।

৫ই এপ্রিল—জয়পুরে অবস্থিতি, তথায় শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউ দর্শন।

* কুঞ্জের তত্ত্বাবধায়ক।

৬ই এপ্রিল—আজমীড় যাত্রা, পুষ্কর, সাবিত্রী দর্শন, আজমীড়ে অবস্থিতি।

৭ই এপ্রিল—আজমীড় হইতে মথুরা যাত্রা।

৮ই এপ্রিল—মথুরা দর্শন, চৌবে-ভোজন।

৯ই এপ্রিল—রাওন, গোকুল, দাউজী, মানসরোবর, বেলবন, ভাণ্ডীরবন দর্শন।

১০ই এপ্রিল—হরিদ্বার যাত্রা।

কিন্তু ৩রা হইতে ৫ই এপ্রিল (১৯১৫) পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থির হইল। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইবামাত্র মহারাজ তীর্থ পর্য্যটনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য ১লা এপ্রিল তারিখে বৃন্দাবন হইতে বর্দ্ধমান রওনা হইলেন। সাহিত্য যে তাঁহাকে এইভাবে আকর্ষণ করিত—ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

তিনি যে কেবল সাহিত্যানুরাগী অথবা বাঙ্গলা সাহিত্যের রক্ষক ছিলেন তাহা নহে; তিনি নিজে একজন সাহিত্য-যোদ্ধা ও সুলেখক ছিলেন—নিম্নের চিঠি এবং পরিশিষ্ট অধ্যায়ে মুদ্রিত তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতার নাট্যজগতে সুপরিচিত দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। মহারাজ উক্ত পুস্তকগুলির সমালোচনা করিয়া স্বীয় অভিমত জানাইতেছেন—

Babu Deb Kantha Bagchi,
Ahiritola St. Calcutta.

18-5-85

আপনার সযত্ন উপহার 'খেয়াল' পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। মানবহৃদয়ের চটুলচাপল্যের শিথিলবন্ধনের মধ্যে মধ্যে যে সকল গূঢ় ভাবসৌন্দর্য্য সংসারে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, আপনার খেয়ালে তাহার কতকগুলির আদর্শ দেখিতে পাইলাম। সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার কোমল প্রতিধ্বনি কোন কোন কবিতায় দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহাতে আপনার খেয়ালের মাধুর্য্য অনেকস্থলে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আপনার খেয়ালে যে সকল ভাব ইতস্ততঃ সংবদ্ধ দেখিয়াছি 'হেস্তনেস্ত' গীতিনাট্যে সেই গুলি প্রস্ফুট পুষ্পমালার মত সুকৌশলে সুবিন্যস্ত দেখিয়া সুখী হইলাম।

হেস্তনেস্ত নামটী বড়ই কৌতুকাবহ হইয়াছে। পল্লীগ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তি নাগরিক সভ্যতার চটুল চাকচিক্যের মধ্যে মগ্ন হইয়া কোর্টসিপের জন্য মনোনীতা পাত্রীকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি লিখিয়া দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে কোর্টসিপের যত বিড়ম্বনা সমস্তই সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। শেষে নিজের বিভ্রমের মধ্যে পড়িয়া বন্ধুবান্ধবদের কৌশলে স্বীয় পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীরই সহিত কার্ত্তিকচন্দ্রের পুনর্ম্মিলন মধুর হইয়াছে। নীলিমার মত সতী পত্নী এপ্রকার কৌতুক-গীতিনাট্যের প্রকৃষ্ট অলঙ্কার হইলেও ঘটনাস্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া সম্পূর্ণ-রূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তুলীর চিত্র সময়োপযোগী হইয়াছে। অপূর্ব্ব, গোপেশ্বর, ভোলানাথ, শ্যামসুন্দর ও নলিনাক্ষের চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যের মধ্যে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশে স্থানে স্থানে পাত্র বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে নানাকারণে পুস্তকের সৌন্দর্য্য নিরূপণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। সেই জন্য মনে হইতেছে এরূপ সমাজসংক্রান্ত কৌতুক গীতিনাট্যের চরিত্রপট একটু সঙ্কীর্ণ হইলে ভাল হইত। মোটের উপর 'হেস্তনেস্ত' সুরচিত এবং গানগুলি সুন্দর হইয়াছে। চর্চ্চা রাখিলে আপনি অল্পদিনের মধ্যেই সুলেখক ও সুকবি হইতে পারিবেন। * * *

৯ই এপ্রিল (১৯১৫) তারিখে হরিদ্বারে All India Hindu Sabha—নিখিল ভারতীয় হিন্দু সভার অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থিরী-কৃত হইল। এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সভাপতিত্বের ভার পড়িল—"ভারত ধর্ম্মভূষণ" মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের উপর। সভাপতি মহাশয়ের যুক্তি ও ঐকান্তিকতা পূর্ণ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সমাগত হিন্দুগণ বিশেষ উৎসাহবোধ করিয়াছিলেন। যোগ্যপাত্রেই হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি নির্ণয় করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল—একথা বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্ম্ম যাঁহার প্রাণস্বরূপ—ধর্ম্মান্ধতা যাঁহার মনে কখনও স্থান পায় নাই, ধর্ম্মের উদারতা ও মানবপ্রিয়তার যিনি

একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, তিনি নিখিল ভারতের সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়ের নিকট সম্মান পাইবার অধিকারী ছিলেন।

১৩ই জুন তারিখে মহারাজের প্রাণপ্রিয় ভাগিনেয় রাজেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুতে মহারাজ গভীর শোক পাইলেন। বারংবার পুত্রশোক, কন্যার বৈধব্য প্রভৃতিতে মহারাজের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ভাগিনেয়গণকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, তাই এই শোকে মহারাজ বিশেষ বিচলিত হইলেন।

সন ১৩২২ সালের কথা—

ভাদ্রমাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর (১৯১৫) মাসের প্রথমেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যমণ্ডলীর প্রযত্নে মহারাজকে সংবর্দ্ধিত করিবার আয়োজন হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় সাহিত্য-পরিষদ্ ভবনে মহারাজকে যথাযোগ্য ভাবে সংবর্দ্ধিত করা হইল।

এই ভাদ্র মাস হইতে মহারাজ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের মীরাট শাখার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে পরিগণিত হইলেন।

ইংরাজি সন ১৯১৬ সালের মার্চ্চ মাস হইতে মহারাজের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য শেষ হইবে। সেজন্য পুনরায় বঙ্গীয় জমিদার গণের পক্ষ হইতে উক্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদের জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল।

বাঙ্গলা দেশের যে কোনও স্থানে শিল্পপ্রদর্শনী হইলে মহারাজের উৎসাহের সীমা থাকিত না। প্রবর্ত্তক হিসাবে এই প্রকার শিল্পো-ন্নতিকর অনুষ্ঠানের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মহারাজের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত চন্দননগরে একটি প্রদর্শনী খোলা হইল—মহারাজ স্বীয় ব্যয়ে, নিজের পক্ষ হইতে

মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্তের শিল্পসম্ভার প্রদর্শনের জন্য বহরমপুরনিবাসী হস্তিদন্তের শিল্পী হরেকৃষ্ণ সাহাকে শিল্পদ্রব্যাদি সহ চন্দননগর প্রেরণ করিলেন। হরেকৃষ্ণ সাহা প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া বহরমপুর ফিরিয়া আসিলেন। যেখানেই মহারাজ দেশহিতকর এইরূপ কোনও অনুষ্ঠানের কথা শুনিতেন সেখানেই নিজের অর্থ-সামর্থ্য লইয়া অগ্রসর হইতেন। এই শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যস্ততা যাইতে না যাইতেই ১৩ই হইতে ১৬ই মাঘ পর্য্যন্ত শান্তিপুরে বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে মহারাজ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

বৈষ্ণবসম্মিলনী শেষ করিয়াই মহারাজ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিশিলা সংস্থাপন উপলক্ষে কাশী যাত্রা করিলেন। সঙ্গে ছিলেন—প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, খাস-কর্ম্মচারী বা 'পারসনাল এসিষ্টাণ্ট' শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার ও কেদারনাথ চৌধুরী। উক্ত উৎসবে যোগদান করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হইতে তিনি এই তিন জনের জন্য প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিয়া লইলেন। বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি বা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিশিলা প্রতিষ্ঠা-উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। বিদ্যাশিক্ষার এই বৃহৎ আয়তন-প্রতিষ্ঠায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মত এমন আনন্দিত বোধ আর কেহ হয় নাই।

মহারাজের বিশিষ্ট বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'বাসিফুল' ছাপাইবার জন্য মহারাজ ৭০০৲ টাকা সাহায্য করিলেন এবং মহারাজ উক্ত পুস্তকের একখণ্ড কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার মতামত জানাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন।—বন্ধুর জন্য স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এই কার্য্য করিলেও—ইহার মধ্যে জননী বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই বৎসরেই মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে ইণ্টার মিডিয়েট আর্টস্‌এ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, সি-আই-ই
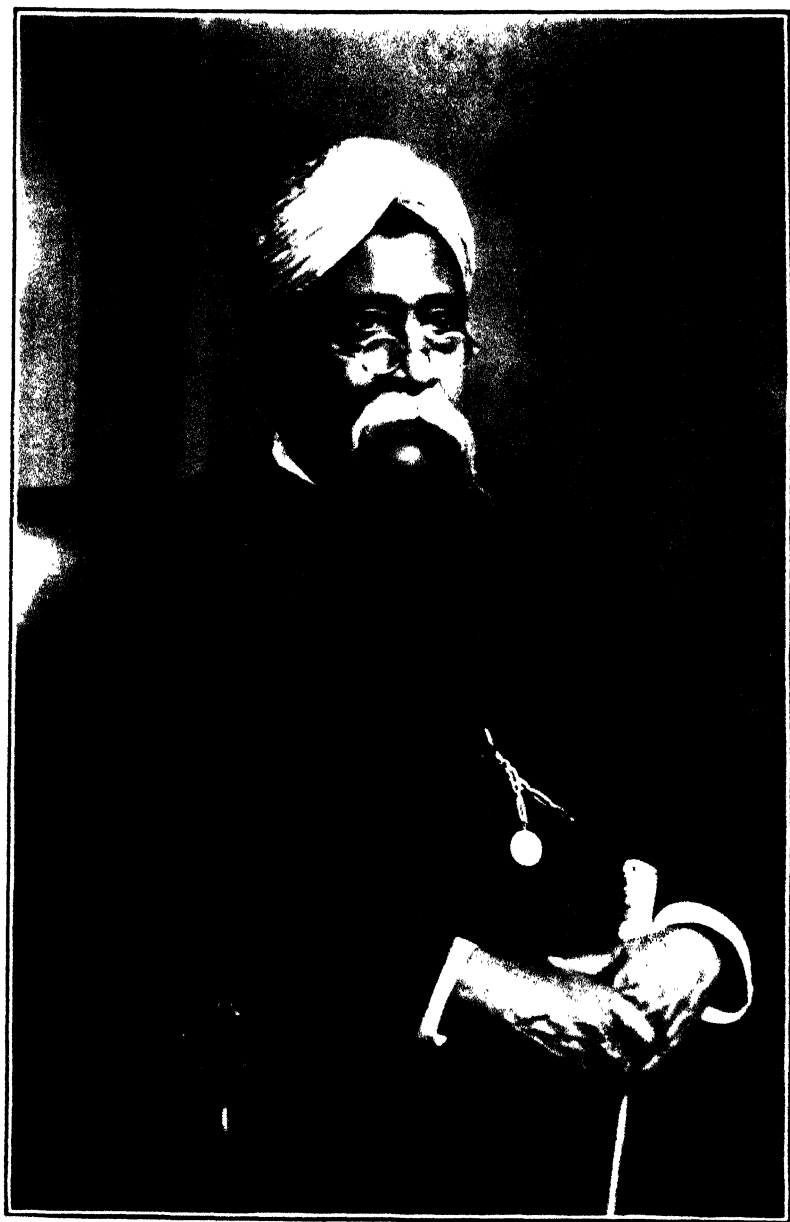
সন ১৩২৩ সালের কথা—

এই সালের ২০শে বৈশাখ তারিখে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের সহিত দিঘাপতিয়ার রাজকুমারী শ্রীমতী নীলিমাপ্রভার শুভপরিণয় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। এই বিবাহে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মাসাধিককাল ধরিয়া লোকজন খাওয়ান, যাত্রা, বাইনাচ, থিয়েটার, বায়োস্কোপ প্রভৃতির বিপুল আয়োজন হইয়াছিল।—শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ ব্যাপারটা বাঙ্গালা দেশের একটা গল্প হইয়া আছে। কাশিমবাজার রাজবংশের সহিত দিঘাপতিয়া রাজবংশের এই প্রকার বৈবাহিকসূত্রে মিলন-সংঘটনের 'ঘটকালী' করিয়াছিলেন—স্বর্গীয় নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ এবং বর্দ্ধমানাধিপতি বিজয়চন্দ্র মহাতাপ।

এই বৎসরেই মহারাজের তিন লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হওয়াতে মনে হয়—বিবাহ-উৎসবে তাঁহার বরাদ্দের অনেক বেশী টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এদিকে দানের খাতাও খোলা ছিল; পাটনা কলেজের অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার তাঁহার প্রত্যেক পুস্তক প্রকাশের সময়ই প্রায় মহারাজের আর্থিক সাহায্য পাইয়া আসিয়াছেন। এ বৎসরেও তিনি অর্থনীতির ২য় সংস্করণ মুদ্রণের জন্য ৩০০৲ টাকা এবং "ইংরাজের কথা"র ইংরাজি সংস্করণের মুদ্রণ ব্যয়ের জন্য ১০০০৲ টাকা সাহায্য পাইলেন।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "গৌড়মগধ শিল্পরীতি" মুদ্রণের জন্য সাহায্য পাইলেন ৬০০৲ ছয় শত টাকা।

যশোহর চিরুণীর কারখানার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষকে 'সুপ্ত জাপান' ছাপাইবার জন্য মহারাজ সাহায্য করিলেন ২১০৲ দুই শত দশ টাকা।

কবিশেখর কালিদাস রায় বি, এ মহাশয় তখন মহারাজের রংপুর জেলার উলিপুর উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার "পর্ণপুট" নামক কাব্যগ্রন্থের ২য় সংস্করণ

প্রকাশিত হইলে—তিনি একখানি পুস্তক মহারাজকে ডাকযোগে পাঠাইয়াছিলেন। কবি কালিদাস রায়ের কবি-প্রতিষ্ঠায় মহারাজ শ্লাঘাবোধ করিতেন—তাঁহার কাব্যগ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে কোনও সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বা চিন্তাশীল গবেষণা মহারাজের গুণগ্রাহী মনকে আকৃষ্ট করিত।

মাঝে মাঝে গঙ্গার হঠাৎ প্লাবনে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সমূহ ক্ষতি হইত—উক্ত প্রদেশের ছোটলাট গঙ্গার বাঁধ সংস্কার উদ্দেশ্যে সর্ব্বসমক্ষে বাঁধ পরিদর্শন এবং সমবেত আলোচনার জন্য ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আহ্বান করেন। এই উপলক্ষে আহূত হইয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও ১লা পৌষ বোম্বাই মেলে হরিদ্বার যাত্রা করেন। এই প্রকার ভারতবর্ষের প্রত্যেক জনহিতকর কার্য্যে মহারাজ আহূত হইতেন—সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এই আলোচনা-সভায় যোগদান হইতেই সে কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সন ১৩২৪ সালের কথা—

মহারাজ বাহাদুর জমিদারী পরিদর্শনার্থ ফরিদপুর জেলার হাবাসপুর যাত্রা করিলেন। হাবাসপুর কাছারীর অন্তর্গত সমগ্র মাহাল স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি এক সপ্তাহ কাল তথায় অবস্থান করিলেন। তৎপূর্ব্বেই এই মাহালের প্রজাগণের মধ্যে কর্ম্মচারী-সম্পর্কে ক্ষোভের উদ্ভব হইয়াছিল—এবং সেজন্য তিনি মাঝে মাঝে রাজধানীতে অনুযোগ ও অভিযোগপূর্ণ পত্র পাইতেন। মহারাজের উপস্থিতিতে এবং তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে,—অনুযোগের কারণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার বা উত্থাপিত অভিযোগ ক্রমশঃ নিরাকরণের প্রতিশ্রুতিতে প্রজাবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হইল। মহারাজের সৌম্যমূর্ত্তি

দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল এবং তাঁহার সদয় ব্যবহারে রাজাপ্রজায় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

১৭ই ভাদ্র তারিখে মহারাজ কাউন্সিলের কাজে সিমলা যাত্রা করিলেন। এই সময় কলিকাতার বাড়ীর তৎকালীন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব বাগচীকে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিতে মহারাজ একখানি পত্র লিখিতেছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়—পূর্ব্ব বৎসরের সঙ্কল্পিত তিন লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণ করা হয় নাই—ইতিমধ্যেই প্রয়োজনের মাত্রাধিক্যে তিন লক্ষ পনের লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

আশ্বিন মাসে সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মৃত্যুতে মহারাজ একজন সাহিত্যিক বন্ধু হারাইলেন—৫ই অক্টোবর (১৯১৭) তারিখের সংবাদপত্রে এই মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মহারাজ বিশেষ ব্যথিত হইলেন।

ইহারই তিন চার মাস পরে অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথম হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভ্যগণের মধ্যে ঘোরতর মনোমালিন্য ঘটে এবং ক্রমশঃ দলাদলির মাত্রা এতই অধিক হইয়া পড়ে যে, পরিষদের কার্য্য একপ্রকার অচল হইয়া উঠে; মহারাজ ১৮ই মাঘ হইতে দিল্লী কাউন্সিলের কার্য্যব্যপদেশে এলাহাবাদ অবস্থান করিতেছিলেন। সভ্যগণের বাদবিসংবাদে পাছে সাহিত্যপরিষদ উঠিয়া যায় এই আশঙ্কায় মহারাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তথা হইতে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ও লালগোলার রাজা বাহাদুরকে মধ্যস্থতা করিয়া এই মনোমালিন্যের নিষ্পত্তি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিলেন।—তিনি দূরে আছেন—অথচ তাঁহার প্রাণাধিক পরিষদের এই সঙ্কট অবস্থা—মহারাজ সে সময় যে কি পরিমাণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতেছিলেন, তাহা তাঁহার পত্রের মর্ম্মগ্রহণ করিলেই বুঝা যায়।

দিল্লীতে মহারাজকে লিখিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ২৩শে ফেব্রুয়ারীর (১৯১৮) পত্রে "বসু-বিজ্ঞান-মন্দির"এর উন্নতিকল্পে

সর্ব্বসাধারণের আগ্রহাতিশয্যের বিষয় জানিতে পারা যায়।—বোম্বাই প্রদেশবাসীর উৎসাহের কথাও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল—ইহাতে মহারাজ বিশেষ আশান্বিত হইয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে পত্র দিলেন। "বসু-বিজ্ঞান-মন্দির"এর প্রথম পরিদর্শক হইলেন তদানীন্তন গভর্ণর, মণীন্দ্রচন্দ্রকে দ্বিতীয় পরিদর্শকরূপে মনোনীত করিয়া সম্মানিত করা হইল।

রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের সহযোগিতায় এই সময় বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনের অধিবেশন বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হইল—উহার সমগ্র ব্যয়ের চতুর্থাংশ মহারাজ নিজে বহন করিয়াছিলেন।

বাহিরবন্দের নায়েব হরেন্দ্রবাবুর শরীর সেখানে সুস্থ থাকিতেছে না এবং সেই সময় কাশিমবাজার সদরের চিফ্ সেক্রেটারী ললিত বাবু অসুস্থতাপ্রযুক্ত পূর্ব্বের ন্যায় কাযকর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া উক্ত চিফ্ সেক্রেটারীর পদ গ্রহণের জন্য মহারাজ হরেন্দ্রবাবুকে কাশিমবাজার আসিতে বলিলেন। হরেন্দ্রবাবু সেই সময় হইতে ঐ পদে নিযুক্ত আছেন।

সন ১৩২৫ সালের কথা—

১২ই বৈশাখ তারিখে মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের একমাত্র সন্তান, কুমারী অন্নপূর্ণার সহিত ভাগ্যকুলের শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ ও তদানুসঙ্গিক উৎসব-ক্রিয়া যথারীতি ব্যয়ে সুসম্পন্ন হইল।

এই বৎসর মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন,—তদুপলক্ষে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে আনন্দোৎসব হইল;—সহরের ভদ্রলোকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইল, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বায়স্কোপ কোম্পানীর ছায়াচিত্র প্রভৃতি দেখাইয়া, অভ্যাগতগণের চিত্তবিনোদন করিবার ব্যবস্থা হইল।

ভাদ্র মাসে সিমলা, আশ্বিনমাসে মধুপুর ও দেওঘর হইয়া মহারাজ কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন। এ বৎসর অধিকাংশ সময়ই মহারাজ দেশ দেশান্তর ভ্রমণ মানসে অথবা কার্য্যব্যপদেশে দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

.মাঘ মাসের প্রথম হইতে আর এক নূতন উন্মাদনা মহারাজকে পাইয়া বসিল। কাশিমবাজার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু স্ত্রীপুরুষ দরিদ্র যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে স্পেশাল জাহাজে মহারাজ বাহাদুর গঙ্গাসাগর যাত্রা করিলেন।

মাননীয় প্যাটেল এই বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য একটি বিল উপস্থিত করিলেন। প্রতিবাদকল্পে সমগ্র বঙ্গদেশবাসী হিন্দুগণের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ও আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার নেতা ছিলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র। যাহাতে তাঁহার বিশাল জমিদারীর মধ্যে সকল স্থানে প্যাটেল-বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেক আন্দোলন-সভা হইতে যাহাতে প্রতিবাদ-পত্র তৎতৎ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয় সেজন্য ৫ই পৌষ তিনি ২৮জন নায়েবকে পরোয়ানা যোগে স্বীয় আদেশ জানাইয়া দিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসুকে "পৃথ্বীরাজ" মহাকাব্য ছাপাইবার ব্যয়বাবদ মহারাজ ১০০৲ টাকা এবং সাহিত্যপরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য ২৫৲ টাকা সাহায্য করিলেন।

এই বৎসর এস্ পি, সিংহ মহাশয় "পিয়ারেজ" পদে বা "লর্ড" উপাধিতে অভিষিক্ত হইয়া ব্রিটিশ মিনিষ্ট্রির সভ্য এবং পার্লামেন্টের ভারতসম্পর্কে সহযোগী সম্পাদক (Member of the British Ministry, Parliamentary under-Secretary of State for India) নিযুক্ত হইলেন। 'বঙ্গীয় মহাজন সভার' পক্ষ হইতে সভাপতিরূপে মহারাজ লর্ড সিংহকে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে

অভিনন্দিত করিয়া সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবটি * লণ্ডনে, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সন ১৩২৫ সালের শেষভাগে সুবিখ্যাত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার শোচনীয় আর্থিক অবস্থা চরম সীমায় উপস্থিত হয়। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে মহারাজ তিন লক্ষ টাকা দিয়া উক্ত পত্রিকা ক্রয় করিয়া লন। মহারাজের পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবুর পুত্র স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ বসুকে মহারাজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য বেঙ্গলীর ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইল। কিছু দিনের মধ্যেই পার্ব্বতী বাবুর সহিত সুরেন্দ্রনাথের বনিবনাও না হওয়াতে পার্ব্বতীবাবু মহারাজের নিকট এ বিষয় অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। সহসা মহারাজ কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না—বিশেষ তৎকালে সুরেন্দ্রনাথের উপর যে ভার অর্পিত ছিল—অনুযোগ মাত্রেই সে সম্বন্ধে প্রতিকার করিতে যাইবার মত হঠকারিতা তাঁহার ছিল না; কোনও বিষয়ে কাহারো উপর ভার দিয়া পর মুহূর্ত্তেই সে সম্বন্ধে কর্তৃত্ব করিবার নির্ব্বুদ্ধিতাও কোন দিন তাঁহার দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ সুরেন্দ্র নাথের মত লোকের বিরুদ্ধে বন্ধুপুত্রের অনুযোগে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না—এমন কি নিজের স্বার্থহানির সম্পূর্ণ আশঙ্কার কথা শুনিয়াও তিনি লিখিলেন—

"I do not believe that the object of Mr. Banerjee is to cripple your powers in the office by placing you in the eastablishment. You need not be anxious as long as you are devoted to the interest of my cause." 27. 3. 19.

---

* "That this meeting heartily rejoices at the appointment of Lord Sinha as a member of the British Ministry and as Parliamentary under-Secretary of State for India, and offers the heartiest congratulations of the Indian commercial community on his unique appointment and elevation to the peerage and also beg to thank the Prime Minister for his magnanimous and highminded statesmanship."

—দুই মাস পরে আবার পার্ব্বতী বাবুর চিঠির উত্তরে লিখিলেন—

"I do not like to interfere in this matter until I hear from Mr. Banerjee about the arrangement he is going to make in this respect." 10. 5. 19.

স্বদেশের সেবা হইবে—বাঙ্গলার তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার পথে বিশেষ সহায়তা করিবে—দেশবাসীর অভাব অভিযোগ সাধারণ্যে প্রকাশ ও দৃঢ় রাজনৈতিক মতে দেশবাসীকে শিক্ষিত করিবার পথ সুগম হইবে ইত্যাদি সম্পূর্ণ লোকহিতকর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়াতেই তিনি "বেঙ্গলী" পত্রিকা প্রভূত অর্থ ব্যয়ে ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থব্যয় সফল হইল না;—আজ "বেঙ্গলী"র শ্মশান-শয্যার উপর নির্লজ্জতার কালিমাঙ্কিত যে পতাকা সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, মহারাজের কত অর্থ ব্যয়ই না মহৎ উদ্দেশ্যের নামে এমনি করিয়া এই দুর্ভাগা দেশে বিফল হইয়া গিয়াছে। যে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের তিনি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা—যাহার জীবন প্রতিষ্ঠাকল্পে সাত লক্ষ টাকার দেনার দায় তিনি স্বেচ্ছায় হাসিমুখে আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন—তাহারই বা আজ কি শোচনীয় অবস্থা! কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দোষ আজ দিব না—কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট শুধু প্রার্থনা করিব—হে ভগবান, বাঙ্গালীকে মানুষ কর।

সন ১৩২৬ সালের কথা—

মহারাজ বৈশাখের প্রথম হইতে ২৫শে আষাঢ় পর্য্যন্ত পুরীধামে অবস্থানের পর কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিয়া বিশেষ ধুমধামের সহিত তীর্থভোজের আয়োজন করিলেন।—ইহারই কিছু দিন পরে কাশিমবাজার, খাগড়া, বহরমপুর এবং মফঃস্বলের নানা স্থানের সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া—জার্ম্মান মহাসমরে

সম্রাটের জয়লাভে সন্ধিস্থাপন উপলক্ষে ৩রা শ্রাবণ, প্রাতঃকাল ৭টার সময় একটি বিরাট মিছিল বাহির করিয়া আনন্দ প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন।

ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী আষাঢ় মাসে বহরমপুর আগমন করেন। কলেজ-স্কুলের হলে, সুশিক্ষা ও সদাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য মহারাজ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সেই বহুজনসমাকীর্ণ সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়। *

শ্রাবণ মাসে সাহিত্যপরিষদের প্রাণস্বরূপ, মনীষী আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের পরলোক গমনে মহারাজ আন্তরিক দুঃখে অভিভূত হইলেন। কি উপায়ে এই আচার্য্যদেবের স্মৃতিরক্ষা করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভ্যগণের উদ্যোগে ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বে ১৮ই শ্রাবণ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দানব্যপদেশে ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

---

* মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের উৎসাহ পাইয়া আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব মোহিনীমোহন রায়, চূড়ামণি মহাশয়কে বহরমপুর নিজ গৃহে লইয়া আসেন। প্রিয় শিষ্য মোহিনী-মোহনের আগ্রহাতিশয্যে চূড়ামণি মহাশয় বহরমপুরে স্থায়ী ভাবে বাস করিয়া বাকী জীবন গঙ্গাতীরে এবং গ্রন্থপ্রণয়ন কার্য্যে কাটাইবার সঙ্কল্প করেন। আমাদের গৃহেই চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রথম পরিচয় ঘটে। চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশাদি শুনিবার জন্য মহারাজ সে সময় প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন এবং তাঁহার অমৃতসম উপদেশাবলী শুনিয়া তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে প্রচার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' নামক একখানি গ্রন্থ চূড়ামণি মহাশয় লেখেন; মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের অভিপ্রায়ে তিনি এই ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা গ্রন্থখানি নূতন আকারে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং মহারাজের অর্থসাহায্যেই উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে 'বেদব্যাস' পত্রিকায় তাঁহার যে সকল বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত

তৃতীয় জামাতা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ পাল

চতুর্থ জামাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রায়

বাহারবন্দ পরগণার জমিদারী পরিদর্শনের জন্য মহারাজ ৮ই কার্ত্তিক কাউগ্রাম কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রজাবৃন্দ বিপুল আয়োজনে মহারাজকে অভ্যর্থিত করিল। সেখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং মহারাণী, বধূরাণী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ৬ই ডিসেম্বর তারিখে কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। সেখানে রাজোচিত ভাবে ধর্ম্মকার্য্যাদি সম্পন্ন হইল। ত্রিরাত্রি বাসের মধ্যেই কামাখ্যামাতার পূজা, কুমারী-ভোজন, সধবা-ভোজন এবং কাঙ্গালী-বিদায় প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া মহারাজ সপরিবারে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গত বৎসর শ্রীযুক্ত প্যাটেলের অসবর্ণ বিবাহের বিল সম্পর্কে মহারাজের যে কি মনোভাব ছিল এবং উক্ত বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি যে কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,

---

হইয়াছিল, তাহা নূতন আকারে লিখিত হইয়া 'সাধন-প্রদীপ' নামে প্রকাশিত হয়। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের অর্থসাহায্যেই ইহা মুদ্রিত হয়। 'ভবৌষধ' গ্রন্থখানিও নূতন আকারে লিখেন এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের উদ্ধারকল্পে মহারাজ চূড়ামণি মহাশয়ের সাহায্য ভিক্ষা করেন এবং এজন্য একটী চতুষ্পাঠী খুলিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই সময়ে আমার পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটায় মহারাজের উক্ত সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রিয় শিষ্য মোহিনীমোহনের অকালমৃত্যুতে চূড়ামণি মহাশয় সাতিশয় সন্তপ্ত হয়েন এবং প্রধান উদ্যোগীর অভাব ঘটায় তাঁহার গ্রন্থ-প্রচারকার্য্যে বিঘ্ন ঘটে। বন্ধুবিয়োগ হেতু এবিষয়ে মহারাজেরও উৎসাহ কমিয়া আসে, তবে চূড়ামণি মহাশয় অধ্যাত্ম দর্শন সম্বন্ধে সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন তাহা সত্বর যাহাতে প্রকাশিত হয় এজন্য তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করিতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে লেখার কাজ তাড়াতাড়ি হইবে না, এই আশঙ্কায় তিনি মাসিক মাহিনায় একজন লেখকও নিযুক্ত করিয়া দেন। একাদিক্রমে দশ বৎসরের পরিশ্রমেও চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার সুবৃহৎ 'চূড়ামণি দর্শন' গ্রন্থ সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা লেখা হইয়াছে তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে বিশাল

তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পুনরায় এই বিল সম্পর্কে মহারাজ ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯২০) লাহোরের অমৃতলাল রায়কে যে পত্র লিখিতেছেন তাহাতে জানা যায় যে, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক প্যাটেল বিলের বিরুদ্ধে, কাউন্সিলের সভ্যগণের মধ্যে রাজা রামপাল সিং, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়, রাও বাহাদুর বি, এন, শর্ম্মা এবং মহারাজ স্বয়ং প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের অধিকাংশ প্রতিনিধিগণই উহার সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া উহা সিলেক্ট কমিটীতে যায়। ভারতের অধিকাংশ প্রতিনিধি এই বিল সমর্থন করায় মহারাজ খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তীক্ষ্ণধী এবং তৎকালে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় নেতা ছিলেন বটে কিন্তু তিনি স্বধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতেন না, অর্থাৎ নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন না এবং তাঁহার নেতৃত্বের অহঙ্কার ছিল, সেজন্য মহারাজ মনে মনে যে বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রের একাংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

গ্রন্থই হইবে এবং বলা বাহুল্য দর্শন শাস্ত্রে ইহা অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই গ্রন্থে চূড়ামণি মহাশয় যে মনীষা, পাণ্ডিত্য ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা পরিমাপ করিতে যাওয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। দুঃখ এই, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই। দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি মহারাজের শ্রদ্ধা অবিচল ছিল। চূড়ামণি মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ শুনিবামাত্র, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রেও মহারাজ শ্মশানে উপস্থিত হইলেন এবং যতক্ষণ দাহ-কার্য্য সমাধা না হইল ততক্ষণ তিনি রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই মহাপুরুষের স্বর্গগত আত্মার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-বাসরে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মূর্ত্তিখানি এখনও চিত্তপটে সজাগ রহিয়াছে—কখনও তিনি বিদেশাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের আদর অভ্যর্থনায় ব্যস্ত, কখনও বা ব্রতী আচার্য্যগণের

* * * শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে আপনার pamphlet এবং গত আগষ্ট মাসের এক কপি Mahamandal Magazine পাঠাইয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়া waste paper basket এ ফেলিয়া দিয়াছেন। তিনি যাহা ভালবাসেন না তাহা কখনও পড়েন না। যে মত তিনি তাঁহার হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কেহ বলিলে তাহা শুনিতে চাহেন না। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক, অন্য মত বা যুক্তি ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন তাঁহারা Reformer। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সহিত এ বিষয়ের আলোচনা চলে না। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজতন্ত্র তাঁহাদের মত সমর্থন করেন। সুতরাং তাঁহারা যে ক্রমেই সমাজ জয় করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা কি বলিয়াছেন, কি যুক্তি দেখাইয়াছেন তদ্বিষয়ে কেহ চিন্তা করেন না। এ অবস্থায় কি আমাদের মঙ্গল আছে? * * * এ অবস্থায় কাহারও আশ্রয় লইবার উপায় নাই। কল্কী অবতারের আবির্ভাব না হইলে এ স্রোত ফিরাইবার আর কাহারও ক্ষমতা নাই। * * * হিন্দুর হিন্দুত্ব নাই বলিয়াই হিন্দু নীরব। যদি হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিত তাহা হইলে কখনো হিন্দু ঘুমাইয়া থাকিত না। * * * ক্ষোভে দুঃখে মনস্থির রাখিতে না পারিয়া অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম, প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। * * *

মহারাজের প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের নানাস্থানে কার্য্যব্যপদেশে গমন ও অবস্থান—বাঙ্গলা দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে বিভিন্ন

কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে বিভোর, আবার কখনও বা ব্রাহ্মণ-ভোজনের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যুবকের উৎসাহে সমাগত দরিদ্র-নারায়ণের সেবা নিজ হস্তে করিয়া শ্রাদ্ধের সকল কার্য্য সমাধা হইলে পর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের পবিত্র স্মৃতিতে যে মহারাজের এই অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা নিবেদন, তাঁহাকে আমি আমার প্রণতি জানাই।

—[শ্রীপ্রতিভারঞ্জন রায় লিখিত "উপাসনা" ১৩৩৩, ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।]

অনুষ্ঠানে যোগদানের বিস্তৃত তালিকা হইতেই তাঁহার কর্ম্মজীবনের অনন্যসাধারণ ব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে বিশাল জমিদারী পরিচালনার গুরু দায়িত্ব, অন্যদিকে রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে নিজের কঠোর কর্ত্তব্য, এতদুভয়ের ধারাবাহিকতায় মহারাজের কর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কর্ম্মক্ষেত্রের বৈচিত্র্য, উৎসাহ ও উন্মাদনার আধিক্য তাঁহাকে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন কর্ম্মপথের সন্ধান দিয়াছে, তাই দেখি তাঁহার নেতৃত্ব ও সহযোগিতার ক্ষেত্র মাত্র বাঙ্গলা দেশেই সীমাবদ্ধ নহে—ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত।

গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে কুমিল্লায় বৈষ্ণব সম্মিলনীর অধিবেশনে নেতৃত্ব করিয়া ১৮ই চৈত্র হইতে ৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণের পর মহারাজ কাউন্সিলের কাজে দিল্লীযাত্রা করিলেন। এই অধিবেশনে ভারতগভর্ণমেণ্ট রাউলাট্ (Rowlatt Act) * আইন পাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের জিদ্—

* ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। জার্ম্মাণের পরাজয় হইল। যুদ্ধের পর সন্ধি আলোচনার সময়ে ভারতবর্ষ হইতে স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ), স্যর জন মেষ্টন ও বিকানীরের মহারাজা প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন।

উপর্য্যুক্ত ঘটনা ঘটিবার কয়েকদিনের মধ্যেই রাজদ্রোহ বিষয়ক কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। এই প্রতিবেদনে ভারতের নানাস্থানে বিপ্লবকারীদের ষড়যন্ত্রের যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অতি ভীষণ। দেশময় রাজদ্রোহ প্রচার করিবার জন্য, রীতিমতভাবে লুণ্ঠন ও অর্থ সংগ্রহাদির জন্য, এক প্রদেশের সহিত আর এক প্রদেশের নেতাদের যোগস্থাপন হইয়াছিল; দেশীয় সৈন্যগণকে বিদ্রোহী করিবার জন্য প্রবাসী ভারতবাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অর্থ ও অস্ত্র আনয়নের জন্য বহু প্রকার আয়োজন দেশ মধ্যে হইতেছিল। ভারতরক্ষা-আইন যুদ্ধের পর ছয়মাস মাত্র কার্য্যকরী; অথচ সাধারণ দণ্ডবিধির দ্বারা বিপ্লবকারীদের অতিসতর্ক ব্যবহার ও কার্য্যাবলীকে শাসনের মধ্যে ফেলা যায় না। এইজন্য ভারতের দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল। এই সময়ে মহাযুদ্ধ শেষ হইল; কাজেই সন্ধিপত্র

কোনও কারণেই এই আইন মুলতুবি রাখা চলিবে না। একই দিনে তিন তিনবার কাউন্সিল সভার অধিবেশন হইল। ভারতগভর্ণমেণ্টের তরফের তোড়জোড়ে পরাজয় অনিবার্য্য জানিয়া জাতীয় দলের নেতা শত-যুদ্ধজয়ী সুরেন্দ্রনাথও আর শেষ অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন না। কিন্তু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের কর্ত্তব্য-জ্ঞান এমনি দৃঢ় ছিল যে, তিনি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া সরকারের বিরুদ্ধে নিজের ভোট দিয়া তবে বাসায় ফিরিলেন। বাঙ্গালীজাতির মান রক্ষা করিতে, তাহার ন্যায্য দাবী অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কোনও দিনই পশ্চাৎপদ হন নাই।

স্বাক্ষরিত হইবার ছয়মাস পরে ভারতরক্ষা-আইন পরিত্যক্ত হইলে রাজদ্রোহিগণকে আটক করা সম্ভব হইবে না, এই আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট রৌলট কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী দুইটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। প্রথম বিলটির স্থূল মর্ম্ম এই যে, সকৌন্সিল বড়লাট প্রয়োজন বোধ করিলে বৃটীশ ভারতের যে কোন স্থানে ভারতরক্ষা আইনের অনুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বিলের উদ্দেশ্য ভারতের ফৌজদারী আইনের বাঁধন আরও দৃঢ় করিয়া পুলিসের উপর অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা।

১৯১৯ সালের প্রারম্ভে প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রত্যেক স্থানেই এই বিলের বিরুদ্ধে সভা হইল। জননায়কগণ একবাক্যে বলিলেন যে, প্রস্তাবিত বিল দুইটি ন্যায় ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্রবিরোধী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী। সরকার বলিলেন—নির্দ্দোষ ব্যক্তির ভয়ের কোনো হেতু নাই; এগুলি বিপ্লবকারীদের দমন করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে উল্লিখিত বিল দুইটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে বেসরকারী দেশীয় সদস্যগণ একযোগে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে উহার বিরুদ্ধে লড়িলেন; কিন্তু সরকার কিছুতেই মূল বিল প্রত্যাহার বা পরিবর্ত্তন করিলেন না। শেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য হেতু বিল দুইটি বেসরকারী সদস্যগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাশ হইয়া গেল।

* ভারত-পরিচয়।—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দিল্লী হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া যমুনার বাঁধ সম্পর্কে আলোচনা সভায় যোগদান করিয়া তিনি কাশিমবাজার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ বৎসর কয়েকটি গোপন দান ব্যতীত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ঢাকুরিয়া সাধারণ পাঠাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য মহারাজের ১০০৲ টাকা সাহায্য দেখিতে পাই।

মুক্তাগাছার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্যের সহিত মণীন্দ্রচন্দ্রের গভীর আত্মীয়তা ছিল। 'মহারাজ' হইবার পর মণীন্দ্রচন্দ্রকে তিনিই সর্ব্বপ্রথম যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনায় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। মহারাজও তাঁহার আহ্বানে মুক্তাগাছায় অতিথি হইয়া সে সদাশয় ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐশ্বর্য্য, মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ ও অসূয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—মহারাজের উদার চরিত্র সে কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

সন ১৩২৭ সালের কথা—

সারকুলার রোডের বাড়ীতে ৫ই শ্রাবণ, (২১শে জুলাই, ১৯২০), অপরাহ্ণ ৫টা ২১ মিনিটের সময় মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের কন্যা কল্যাণীয়া অণিমাপ্রভার জন্ম হয়। একমাত্র পুত্রের প্রথম সন্তান— পিতামহের প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিল। মনের সাধ মিটাইয়া অণিমাপ্রভার অন্নপ্রাশন হইল ৬ই মাঘ। স্নেহের পুতলী অণিমাকে লইয়া মহারাজকে অফিস কামরাতেও আদর করিতে দেখিয়াছি। "দিদি" "দিদি" বলিয়া ডাকিয়া যেন তাঁহার খেদ মিটিত না।

এই বৎসর রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সি, আই, ই উপাধি পাইলেন। ইহাতে মহারাজ বিশেষ আনন্দ সহকারে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন।

সুকবি কালিদাস রায় বি-এ মহারাজের উলিপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ঢাকা সলিমুল্লা কলেজে বাঙ্গলার অধ্যাপকের পদ খালি হইলে কালিদাসবাবু সেই পদের জন্য চেষ্টা করিবার মনস্থ করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট একখানি পরিচয়-পত্র দিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করেন। কালিদাসবাবু মহারাজের মীরমুন্সীর পুত্র—বাল্যকাল হইতেই মহারাজের স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি উলিপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কল্পনা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া মহারাজ বিশেষ অস্থির হইয়া কালিদাসবাবুকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলেন—।

প্রিয় কালিদাস, তোমার তারিখবিহীন পত্র পাইলাম। তুমি ঢাকায় সলিমুল্লা কলেজে চাকুরীর চেষ্টা করিতেছ ও তজ্জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট একখানি পরিচয়-পত্র চাহিয়াছ। পরিচয়-পত্র দেওয়ার পূর্ব্বে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি উলিপুর ছাড়িতে চাহিতেছ? আমার নিকটে সরল ভাবে অকপটে মনের কথা বলিবে। আশা করি তুমি কুশলে আছ। অত্রত্য রাজবাড়ীর কুশল।

কালিদাসবাবু এই পত্র পাইয়া কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে ভবিষ্যতের উন্নতির আশা থাকা সত্ত্বেও মহারাজের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধাবশে উলিপুর ত্যাগের কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ যাহাকে স্নেহ করিতেন ভালবাসিতেন, অভিভাবক ও আশ্রয়দাতা হিসাবে যাহাকে সুখে দুঃখে প্রতিপালন করিতেন—তাহার গুণে ও প্রশংসায় তিনি নিজেও শ্লাঘা বোধ করিতেন—প্রতিষ্ঠায় আনন্দ পাইতেন। ব্যক্তিগত ভাবে জীবনীলেখকের তাহা কতবার উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। বহরমপুরে আর একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন—স্বর্গীয় শরদিন্দুনাথ রায়, বি-এ। তিনি শুধু কবি নন, তিনি সঙ্গীত, নাটক ও রসরচনায় বাঙ্গলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তাঁহার রচিত হিমালয় সঙ্গীত

বঙ্গসাহিত্যের সম্পদবিশেষ। তিনি ছিলেন আমাদের সকলেরই "ইন্দুদা"। তিনি তাঁহার অপ্রমেয় প্রীতি-শক্তিতে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা, গান, তাঁহার অভিনয়, তাঁহার হাসি—সবার উপর তাঁহার ব্যগ্র বাহুর স্নেহবন্ধন আজও যেন অন্তরকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে। তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন, মহারাজের নিকটও তাঁহার বিশিষ্ট স্থান ছিল। মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের সহপাঠী ও বন্ধু বলিয়া ততখানি নহে, যতখানি মহারাজ তাঁহাকে সুসাহিত্যিক বলিয়া স্নেহ করিতেন, সম্মান করিতেন। যথাযোগ্যস্থানে সমাদর পৌঁছাইয়া দিবার অকৃত্রিম ইচ্ছা—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের আচরণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত।

সন ১৩৩০ সালে শরদিন্দুনাথ কাল যক্ষ্মারোগে দেহত্যাগ করেন। বহরমপুর এডোয়ার্ড্ রিক্রিয়েশন ক্লাবে তাঁহার বিরাট স্মৃতিসভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র। সেদিনের সভায় বর্ত্তমান জীবনীলেখকের প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর, মহারাজ বক্তৃতা করিতে উঠিয়া উক্ত প্রবন্ধের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে সাশ্রুনেত্রে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"ইহারা যে আমাদেরই একান্ত আপনার জন, আমাদের স্নেহমমতার আশ্রয়ে শুভ ইচ্ছার পরিবেষ্টনীর মধ্যে ইহারা যে আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের কবিপ্রতিষ্ঠা যে আমাদেরই চোখের সম্মুখে গড়িয়া উঠিয়াছে—তাই এই শোকের দিনে মৃত ও জীবিত, আমাদের আত্মীয় কবি ও সাহিত্যিকগণের কৃতিত্বের জন্য গৌরব বোধ করিতেছি।"

শরদিন্দুবাবুর প্রতি বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের শ্রদ্ধাসম্মান যে কতখানি গভীর ছিল, তাহা তাঁহার "মন-প্যাথী" বইখানির উৎসর্গ পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত গুণের সমাদর করিতে কাশিমবাজার কোনও দিন কুণ্ঠিত হয় নাই।

মহারাজ এ বৎসর আবার ভারতীয় আইন পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

দৌহিত্রগণ—বনমালী, অনিলচন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ, অরুণকুমার, কল্যাণকুমার

তথাকথিত সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি মহারাজের হৃদয়ে আঘাত করিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব ও তাৎপর্য্য সাধারণ বৈষ্ণবে বুঝে না—বৈরাগী-গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান বা অজ্ঞানকেই তাহারা পরম পদার্থ মনে করে—অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফলেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, ইহাই ছিল মহারাজের বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া মহারাজ পৌষ-সংক্রান্তির দিনে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সভাপতিত্বে নবদ্বীপে "বৈষ্ণবদর্শন বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মহারাজ সম্পর্কে অনেকের ধারণা এই যে, তিনি তাঁহার এষ্টেটের মধ্যে কর্ম্মচারিবৃন্দের কর্ত্তব্যের অবহেলা, চৌর্য্যবৃত্তির কথা জানিতেন না বা বুঝিতেন না। জানিতেন সব, বুঝিতেনও সব কিন্তু সহৃদয়তা ও ক্ষমাগুণে তিনি তাঁহার জীবননাশে সচেষ্ট আততায়িগণকেও হাস্যমুখে ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, বন্ধুভাবে, পরমশত্রুকেও আত্মীয় করিয়া আলিঙ্গন দিয়াছেন। মহারাজের উদারতা ও সদাশয়তার প্রশ্রয় পাইয়া রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে কার্য্যে অবহেলা, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য চুরি ও অন্যায় আচরণে এষ্টেটের বিশেষ ক্ষতি হইতে থাকে। তিনি কর্ম্মচারিগণের এই সব অপরাধে ক্ষুণ্ণ হইলেও যে সমুচিত শাস্তি বিধান করিতে পারিতেন না, ইহা ঠিক। কিন্তু করুণাপরবশ হইয়া দণ্ডবিধান না করিলেও তিনি যে ইহা বুঝিতেন না একথা ঠিক নহে।

একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে লিখিত একখানি পত্র উল্লিখিত মন্তব্যের পোষকতা করিবে।

* * * বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে, কেবল কাশিমবাজার রাজ এষ্টেট চলিতেছে না। ইহাতে নিয়ম স্থাপন করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। চাকর বেহারা দ্বারবানেরা তাহাদের ওয়াদার কার্য্য করে না, কারণ তাহাদের দেখিবার কেহ নাই। শুনিতে কটু হইলেও

আপনি জানিবেন, রাজবাড়ীর মোতালক বিভাগ গুলি চোরে পরিপূর্ণ। প্রতিদিনই চুরি হইতেছে। ভাণ্ডারে অতিথি সেবার ব্যবস্থা আছে, সেই খানেই যত চুরি। অর্থাৎ ৪ জন অতিথিকে সিধা দিয়া ১০ জনের নামে খরচ লেখা। * * * দ্রব্যাদি খরিদের সময় অতিরিক্ত মূল্য স্থির করিয়া রাজবাড়ীর খাতায় জমা করা ইত্যাদি প্রকারে কত টাকা যে অন্যায় রূপে অপহৃত হয় এবং হইতেছে তার ইয়ত্তা নাই। এই সকল নিবারণ করে এরূপ হিতৈষী আমার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * * *

সন ১৩২৮ সালের কথা—

কয়েকদিন হইতে নানা দুশ্চিন্তায় মহারাজের মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। একদিন রাত্রি ১টার সময় কলিকাতার বাড়ীতে সাংঘাতিক শিরঃপীড়ায় মহারাজ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। রাত্রি ২টার সময় ফুস্‌ফুসের অসহ্য বেদনা আরম্ভ হইল। কলিকাতার বাড়ীর ডাক্তার অতুল ঘোষ এম-বি, এবং রামদাস সরকার তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; পরদিন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ ক্যালভার্ট আসিয়া পরীক্ষান্তে বলিলেন, অম্ল সঞ্চয় হইয়া এইরূপ প্রাণসংশয়কারী রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক কয়েকদিন মধ্যেই মহারাজ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

জীবজন্তুর প্রতি মহারাজের যথেষ্ট মমতা ছিল, সামান্য একটি ঘটনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজধানীর ফরাসখানার সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌ কাশিমবাজারের উত্তরদক্ষিণে স্থিত কালীগঙ্গায় কুম্ভীর মারিতে গিয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লোকমারফৎ আমোদচ্ছলে এই জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। জীবজন্তুর প্রাণ লইয়া খেলা মহারাজ খুবই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

কালীঘাটের বিখ্যাত ব্যাঞ্জোবাদক, কালীপ্রসাদ সরকার বহুদিন যাবৎ মহারাজের কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে ব্যাঞ্জোবাদক ছিলেন।

সঙ্গীতবিদ্যায় তাহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতকলা শিক্ষার জন্য জাপান এবং আমেরিকাপ্রভৃতি স্থানে স্বব্যয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদেশে থাকাকালীনও মহারাজ তাঁহাকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করিতেন।

প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে মহালয়া পর্য্যন্ত মহারাজ সপরিবারে সৈদাবাদ রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন। এবার যাত্রাকালে একটি বিষধর সর্প মহারাজের গাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহার গায়ের উপর দিয়া বাহিরে যাইয়া পড়িল।—শিরঃপীড়া রোগের ন্যায় ইহাও বর্ত্তমান বর্ষে মহারাজের জীবনহানিকর একটি দুর্ঘটনা সন্দেহ নাই কিন্তু তিনি স্মিতহাস্যে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলেন; মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যও যে হইয়াছে—এমন বোধ হইল না।

বঙ্গের বাহিরে যে সকল মহিলা-সাহিত্যিক আছেন—তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের পুস্তক মুদ্রণের জন্য মহারাজের নিকট হইতে এই বৎসর অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

সন ১৩২৯ সালের কথা—

সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের পুঞ্জীভূত ঋণের জ্বালায় মহারাজ বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িলেন।—ততোধিক জ্বালা হইল—প্রাণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দানের অক্ষমতার জন্য। অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথা দেশের লোক বুঝে না—প্রার্থী আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়—দরিদ্র ভিক্ষার ঝুলি উন্মুক্ত করিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে—দীনজন চোখের জলে দুঃখ জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করে;—দাতার প্রাণ সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠে, উপকারের উচ্চবৃত্তি সজাগ হইয়া বিবেককে ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলে—আর অক্ষমতার ক্ষোভে ও লজ্জায়—নৈরাশ্যের গভীর বেদনায় দাতার নিকট স্বীয় জীবন বিড়ম্বিত বলিয়া মনে হয়।

যখনই সৎকার্য্যে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে—ব্যক্তিগত জামিনে, হ্যাণ্ডনোটে, বন্ধকী বা হুণ্ডিতে তখনই মণীন্দ্রচন্দ্র দলিলে স্বাক্ষর দিয়া হাসিমুখে টাকা লইয়াছেন—প্রফুল্ল অন্তঃকরণে যাহাকে যাহা দিবার দিয়া স্বস্তি অনুভব করিয়াছেন ; কখনও ভবিষ্যতের অশান্তি ও দুঃখের কথা তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই।—নিজের জন্য ত এক কপর্দ্দকও নহে—পরের জন্য, স্বদেশ ও স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজের জন্য,—দুঃখীর জন্য, অভাবী ও বিপন্নের জন্যই ত তিনি এই সুবিশাল জমিদারীকে ঋণগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন। যে দেশের কল্যাণে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিলেন, যে জাতির অভ্যুত্থানের জন্য তিনি নিঃস্ব হইয়া শেষজীবনে বৃত্তিভোগী হইয়া থাকিলেন—সেই দেশ ও সেই জাতির নিকটই ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার লজ্জা বড় হইয়া উঠিল। উত্তমর্ণ তাগিদের উপর তাগিদ দিতে লাগিল, সুদের অঙ্ক চক্রবৃদ্ধি হারে আসল টাকার বহু উপরে উঠিল।—হ্যাণ্ডনোট্ তামাদি হয়, হুণ্ডির ওয়াদা ফুরাইয়া আসে—অর্থের প্রাচুর্য্য যাঁহাদের দেশপ্রসিদ্ধ তাঁহারাও অপেক্ষা করিতে চাহেন না। মণীন্দ্রচন্দ্র ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতে লাগিলেন। কি উপায়ে সমস্ত ঋণের টাকা এক সঙ্গে পরিশোধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল।

মহারাজের আমলে এষ্টেটের আয় সর্ব্বপ্রকারে আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইলেও, তাঁহার দান করিবার প্রবৃত্তি এতই বৃদ্ধি পাইতেছিল যে আয়ের দ্বারা তাঁহার রাজ এষ্টেটের অপরাপর খরচ চালাইয়া দেনার সুদ দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠিত না। এষ্টেটের একটী "বাজেট" না করিলে কিছুতেই চলিতে পারে না, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলেও মহারাজ কখনও বাজেটের মধ্যে থাকিতে ভালবাসিতেন না।

এষ্টেট ঋণ-জালে একবার এইভাবে জড়িত হইলে তাহার উদ্ধার হওয়া খুব কঠিন। কলিকাতার সম্পত্তি এষ্টেটের মূল্যবান্ সম্পত্তি,

তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া কলিকাতার 'উঠ্‌তি' বাজারে যে-টাকা পাওয়া যাইত তাহাতে কপর্দ্দক দেনাও থাকিত না, কিন্তু মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র চিরদিনই সম্পত্তিবিক্রয়ের বিরোধী ছিলেন; বরং তিনি কর্জ্জ করিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লোকসান দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার অর্জ্জিত প্রধান কলিয়ারি এক্‌রা এক কোটী টাকায় বিক্রয়ের প্রস্তাব পাইয়াও তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কিন্তু পরে যখন "ইংলিস্ লোন" (English Debenture Loan) গ্রহণের প্রস্তাব হইতেছিল, তখন এক একবার কলিকাতার সম্পত্তি বিক্রয়ের ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইত। কলিকাতার সম্পত্তির আয় দেড় লক্ষ টাকা, তাহা ছাড়িয়া দিলে তৎকালে যে ঋণ ছিল তাহা পরিশোধ হইয়া যাইত; এক্ষণে বার্ষিক যে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা করিয়া সুদ ও আসলে দিতে হইতেছে তাহা হইতে দেড় লক্ষ টাকা কম হইলেও ন্যূনাধিক ছয় লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর বাঁচিত, তাহাতে পুনরায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি খরিদ হইতে পারিত, কিন্তু মহারাজ সম্পত্তি বিক্রয়ের পরামর্শ গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেন না। মহারাজ সমুদয় মহাজনদের দেনা মিটাইয়া একস্থানে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। যে দেনা প্রথমে বার্ষিক ৫৷৷০ টাকা সুদে রাজা কৃষ্ণদাস লাহা দিগরের নিকট ছিল, সেই দেনা পরিশোধ করিবার জন্য ভাগ্যকুলের মহাজনদের নিকট দেনার সুদ ক্রমশঃ শতকরা ১০৲ টাকায় পরিণত হয়। ইহা ছাড়া শতকরা ১২৲ টাকা সুদেও বহু টাকা তাঁহাকে কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল। পুরাতন মহাজনের সুদ ও আসল মিটাইবার জন্য বর্দ্ধিত হারে সুদ ও খরচা (কমিসন) কবুল করিয়া গৃহীত নূতন ঋণ ক্রমশঃ প্রায় কোটী টাকায় দাঁড়াইল। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এ দেনা অনায়াসেই শোধ দেওয়া যাইত কিন্তু তাহা না করিয়া গিলেণ্ডার কোম্পানীর সাহায্যে ১ কোটী টাকার "ইংলিস লোন" (debenture)

করাইয়া একস্থানে ঋণ করার সংকল্প হইল। গিলেণ্ডার কোম্পানী ন্যূনাধিক এক বৎসর কাল এষ্টেটের সমুদয় কাগজপত্র পরীক্ষা করাইয়া অবশেষে এষ্টেটের মূল্য (Valuation) ন্যূনকল্পে ৪ কোটী টাকা সাব্যস্ত করিয়া এই টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল। এষ্টেটের সমুদয় কাগজপত্র 'সিজিল' করিয়া দিতে হরেন্দ্রবাবু ও জমানবীশ ৺সত্যসিন্ধু মুখোপাধ্যায়ের যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া মহারাজ বাহাদুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তবে ইহাঁরা এ কার্য্যে সহানুভূতি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কেবল মহারাজের আদেশ প্রতিপালন ও মহারাজ-কুমারের ইচ্ছা ছিল বলিয়া এ বিষয়ে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করেন নাই। এই কার্য্য যাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইতেছিল, তিনি কিছুদিনের জন্য এই এষ্টেটে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় হরেন্দ্রবাবুর চক্ষুর পীড়া হওয়ায় তাঁহার পড়িবার ক্ষমতা একবারে গিয়াছিল, কানে শুনিয়া তিনি পরামর্শ দিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁহারা মহারাজের বন্ধু ও বিশ্বস্ত উকিল ছিলেন, তাঁহারা মহারাজের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ করেন নাই। সম্পাদিত দলীল একতরফা হইয়াছে তাহা মহারাজ পরে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার এষ্টেটের ম্যানেজার লায়াল সাহেব ও বোর্ডের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কাজ চালাইতে পারেন নাই। অনেক চেষ্টা করিয়া কিছু কিছু সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কয়লাখনির ম্যানেজিং এজেন্সি লইবার মধ্যে যে আইনের ফাঁকি ছিল তাহা তিনি জীবদ্দশায় ভুলিতে পারেন নাই।

গিলেণ্ডার অফিসের কয়লা-বিভাগের বড় বাবু, মহারাজের বেলডাঙ্গা নিবাসী প্রজা, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় ঋণ গ্রহণের চেষ্টায় মহারাজের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী হেমেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গী ছিলেন। এই ব্যাপারে ১২ই ভাদ্র মহারাজ কলিকাতায় আসিলেন। প্রারম্ভিক কথাবার্ত্তা হইবার পর ১৩ই তারিখে আবার তিনি কাশিমবাজার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৯২২ সালে ২৩শে আগষ্ট মহারাজ যে সর্ত্তে ঋণ

গ্রহণ করিতে রাজী হইতে পারেন তাহার একটা খসড়া উক্ত সওদাগরী অফিসে পাঠাইয়া দিলেন।

একে ঋণের জ্বালায় বিপর্য্যস্ত তদুপরি নানাবিধ ক্ষতি, বিশ্বাস-ঘাতকতা, চুরিপ্রভৃতির দুঃসংবাদ পাইয়া মহারাজ বিশেষ মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। কয়লার খাদে আগুন লাগিয়া বহু টাকার কয়লা এই বৎসরই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

এই অশান্তি ও মনঃপীড়ার মধ্যে লালগোলার রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে মূল ও বঙ্গানুবাদসহ অমূল্য উপহার তুলসী দাসের রামায়ণ মহারাজকে বিশেষ শান্তি দিল। তিনি লালগোলার মহারাজকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পত্র দিলেন—

আপনার প্রেরিত অমূল্য উপহার * * পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। এতাদৃশ গ্রন্থ দেশের মঙ্গলসাধক এবং ভাষার উন্নতিবিধায়ক। এমন সুন্দর ভাব জগতের অন্য কোনও ভাষার গ্রন্থে আছে কিনা জানি না। সাধক তুলসীদাস অমর কবি। আপনি সেই কবির রামায়ণ বঙ্গানুবাদ করাইয়া নিজে অমর ও চিরস্মরণীয় হইলেন।

বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মহারাজের "কাউন্সিল সেক্রেটারী" নিযুক্ত হন। তাঁহার বেতন ছিল ৪০০৲ টাকা। আজীবন তিনি মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়াও যখন অজুহাত করিয়া মহারাজের নামে বাকী মাহিনার মোকর্দ্দমা করিলেন, তখন কত লোকে কত কথা বলিতে লাগিল কিন্তু ক্ষমাশীল মণীন্দ্রচন্দ্রের মুখে কেহ কোন দিন কোন প্রকার খেদোক্তি শুনিতে পাইল না।

বৌবাজারে যে শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের মন্দির আছে, তাহার তলস্থ জমি মহারাজ বাহাদুর দান করিয়াছিলেন। ঐ জমি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দখলভুক্ত (acquire) হওয়ায় মহারাজ তাহার মূল্য ধরিয়া নগদ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে নিম্নমুদ্রিত পত্রখানি দ্রষ্টব্য :—

Sj Kripasaran Mahasthabir

President, Bengal Buddhist Association.

B. N. Ry. Hotel, Ranchi.

৮ই ভাদ্র। ২৯

সসম্মাননমস্কারান্তে নিবেদনমিদম্

আপনার ১৬ই আগষ্টের পত্র পাইয়া বিস্তারিত জ্ঞাত হইলাম। শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের মন্দিরে অস্থিস্থাপন কল্পে যে জমি দেওয়া হইয়াছে তজ্জন্য আপনারা ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে লজ্জা দিয়াছেন মাত্র।

আপনাদের ঐ জমির উপরে যখন যে কার্য্য হইবে তাহার তালিকা আমাকে দিবেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনি শারীরিক অসুস্থতা হেতু বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য রাঁচি গিয়াছেন, তথায় কেমন থাকেন জানাইবেন। ইতি—* * *

হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যর জন্ উড্রফ্ মহারাজের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে, মহারাজ তাঁহার বিদায়-অভিনন্দনের আয়োজন করিয়া কলিকাতার বাড়ীতে বিশেষ ধূমধামের সহিত 'টিপার্টি' (Tea Party) দিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ লেখক উড্রফ্ সাহেব ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সভ্যতার অনুরাগী বলিয়া তাঁহার বিদায়কালীন 'টিপার্টি'তে খাদ্যাদির ব্যবস্থা সমস্ত দেশীভাবে হইয়াছিল। ইহাতে উড্রফ্ সাহেব বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিত সাহেবগণও এই দেশী খাদ্যের ব্যবস্থায় প্রীত হইয়াছিলেন।

আট মাস পূর্ব্বে গিলেণ্ডারস্ কোম্পানীতে মহারাজপ্রেরিত ঋণ গ্রহণের খসড়ার উত্তরে উক্ত কোম্পানী অদলবদল করিয়া আর একখানি খস্ড়া মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে রাজ এষ্টেটের খাতাপত্র দেখা চলিতে থাকে। কোম্পানী উক্ত বিষয় তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য মহারাজকে তাগিদ দিলে—মহারাজ ১৬ই মার্চ্চ (১৯২৩) তাঁহাদের জানাইলেন যে, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায় ও অশ্বিনী কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মারফতে প্রেরিত খসড়া তিনি পাইয়াছেন।
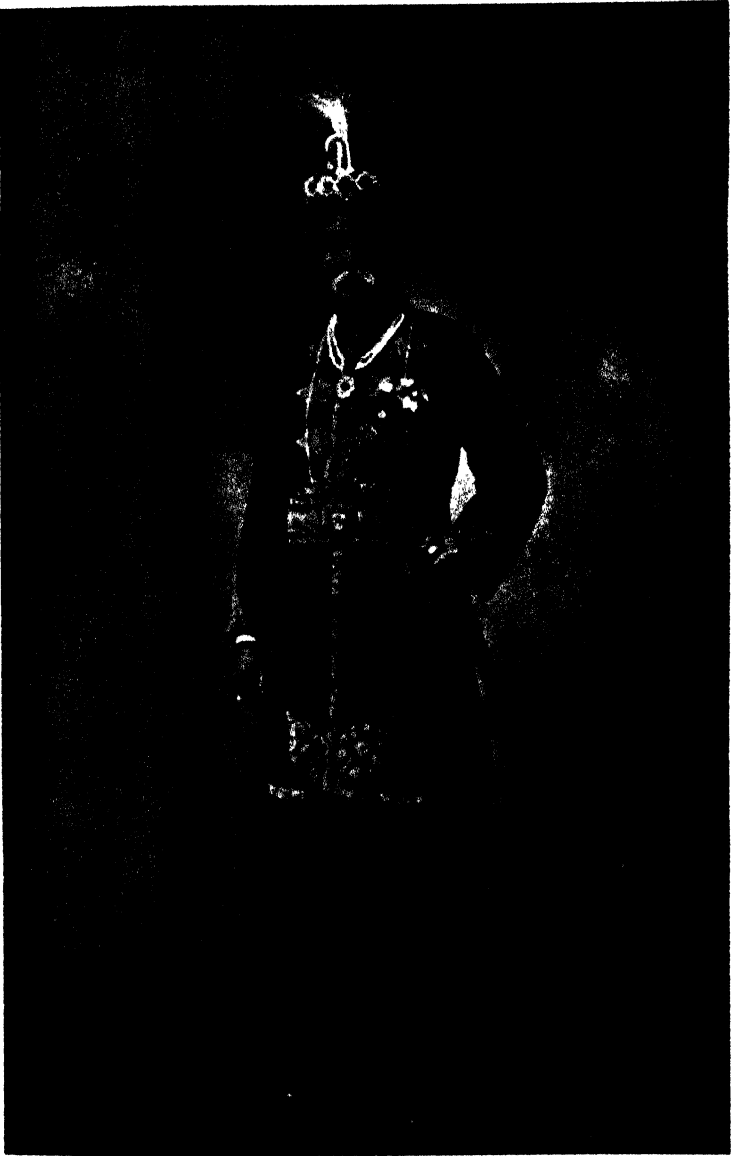
Manindra Chandra Nandy
29/12/26

তিনি নিজে খসড়াখানি পড়িয়া তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজ কুমার শ্রীশচন্দ্রের সহিত কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। সপ্তাহকাল মধ্যেই তিনি এ বিষয়ে শেষ নিষ্পত্তি করিবেন বলিয়া জানাইয়া দিলেন।

কিন্তু গিলেণ্ডার কোম্পানী ব্যবসায়ী, নিজ স্বার্থের প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকাই তাহাদে পক্ষে স্বাভাবিক ; সে কারণ দীর্ঘদিন ধরিয়া সর্ত্তাদি লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা, খসড়া লেখাপড়ায় যোগ বিয়োগ ও সংশোধন চলিতে লাগিল। ১৮ই মাঘ মহারাজ দিল্লী হইতে বৃন্দাবন গেলেন, ২৪শে তারিখ পর্য্যন্ত ব্রজমণ্ডলের তীর্থস্থানগুলি ঘুরিয়া ২৫শে তারিখে তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি কৃষিকমিশন হইতে ফিরিয়া আসিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে একটি কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হয়। মহারাজের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়—ঋণ গ্রহণের চেষ্টা হইতেছে—এই প্রকার বিব্রত অবস্থার মধ্যেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারকে বাঞ্ছেটিয়ায় একখানি বাড়ী ও ১০০ বিঘা জমি উক্ত কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্য দিবার অঙ্গীকার করিয়া মহারাজ হরেন্দ্র বাবুকে দিল্লী হইতে পত্রযোগে তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশ দিতেছেন ,—

"* * * Calcutta Universityর Vice Chancellorকে আমি বাঞ্ছেটিয়ার একটি বাড়ী এবং ১০০ বিঘা জমি Agricultural Collegeএর জন্য ৫ বৎসর ব্যবহার করিতে দিতে স্বীকৃত হইয়াছি। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা উক্ত বাড়ী ও জমি দেখিতে যাইবেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সেন উকিল মহাশয় তাঁহার যাওয়ার সংবাদ আপনাকে জানাইলে আপনি তাঁহার জন্য ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইবেন। তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত এবং বাঞ্ছেটিয়ার নেঙড়ী বিবির হাতার বাড়ী দেখাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যেন কোনও অযত্ন না হয়।"

৩১

৪ঠা ফাল্গুন তারিখে দিল্লী হইতে ফিরিয়া ঋণগ্রহণ সম্পর্কে গিলেণ্ডার কোম্পানীর সহিত আবার কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন—কিন্তু সর্ত্ত লইয়া দুই পক্ষ একমত হইবার পক্ষে কেবল বাধা ঘটিতে লাগিল। এই ঋণগ্রহণবিষয়ে যিনি প্রধানতঃ দালালী করিতেছিলেন—তাঁহাকে মহারাজ ২৬শে চৈত্র পত্রযোগে জানাইলেন—

"বিলাতে এখন কম সুদে টাকা পাওয়া যাইতেছে আপনারাই লিখিতেছেন। আমাদের এগ্রিমেণ্টে সাড়ে ছয় পারসেণ্টে টাকা পাইব এইটি লিখাইয়া লইতে পারিলে আমার এগ্রিমেণ্ট দস্তখত করার আর কোনও বাধা থাকিবে না।"

ভাগ্যচক্রে

সন ১৩৩০ সালের কথা—

বিপরীত গতিতে ভাগ্যচক্র দিক্‌পরিবর্ত্তন করিল ; যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গেল। ইংরাজ কোম্প্যানীর নিকট হইতে মহারাজকে মাসিক বৃত্তি (allowance) গ্রহণ করিয়া আজীবন কাটাইতে হইবে। তাঁহার মান-মর্য্যাদার কথা, দানের আকাঙ্ক্ষা ও অক্ষমতার ব্যথা ব্যবসায়ী হইয়া তাহারা কি বুঝিবে ? যে দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, সাহিত্য-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, ব্যবসায়-বাণিজ্য—এক কথায় জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনের জন্য মহারাজ দানযজ্ঞে শেষ আহুতি দিয়া বিরাট চরিত্র-মহিমায় উন্নতশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার সে উন্নত শির সমুন্নত রাখিবার জন্য দেশ কোন প্রয়োজনই আজ অনুভব করিল না। —মহারাজের উত্তমর্ণগণ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, অসম্ভব ও অন্যায় হারে সুদ গ্রহণ করিয়াও তাহাদের ধনলিপ্সা চরিতার্থ হইল না—সময় দিয়া ঋণ শোধ করিবার উপযুক্ত অবসরও তাহারা দিতে রাজী হইল না। উত্ত্যক্ত হইয়া তাই মহারাজ দেশের ধনী সম্প্রদায়, রাজা মহারাজ, মহারাজাধিরাজ ইত্যাদির নিকট ঋণ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেন—বিদেশী ব্যবসায়ীর হাতে কাশিম-বাজার এষ্টেট্ চলিয়া যাইবে, এ আশঙ্কাতে মহারাজ যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হায়—অদৃষ্টের পরিহাস!—মানীর মান কেহই রাখিল না,—না রাখিল উত্তমর্ণ, না রাখিল ধনী। অবশেষে নিরুপায় হইয়া মহারাজ গিলেণ্ডার্স কোম্পানীর নিকট "এগ্রিমেণ্ট" বা চুক্তিপত্র সহি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।—

Messrs. Gillanders Arbuthnot & Co.
8, Clive Street, Calcutta.

Kasimbazar
15th. April, 1923.

Dear sirs,

I am in receipt of your letter of 10-4-23., and beg to inform you that I send today to messrs. Watkins & Co. the agreement duly signed. I am sorry that there has been some delay in completing the agreement owing to various reasons. I trust the matter will be expedited from now. You have in your letter mentioned that the market conditions are raised now and that a rate of interest even less than 7% per annum may possibly be secured. You also tell me what I know from before, that it may be possible to secure for me the full benefit of the market conditions. In that hope I have put 6½ in place of 7% in the original draft. I doubt not that you will not mind the alteration and do your best to secure that rate in veiw of the extent of the floatation and costs thereof.

You will notice that while the total loan to be floated remains 6,7,500 of equivalent, at Rs 15/- per £ to Rs 1,01,25,000/- as originally proposed, the reserve fund is put at Rs. 1000000/- instead of Rs. 1500000/- so that 5 lakhs may be left for clearance of the liabilities of the Estate and practically all the existing debts may be paid up.

Hoping to be excused for the delay.

* * *

গিলেণ্ডারস্ কোম্পানীকে লিখিত উক্ত পত্র খানি চিফ্ সেক্রেটারি হরেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়া মহারাজ তাঁহাকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রযোগে কলিকাতার কোনও ধনকুবেরের নিকট শেষ চেষ্টা করিবার ক্ষমতা দিতেছেন—

২রা বৈশাখ, ১৩৩০

Gillandersদের সহিত এগ্রিমেন্ট আমি দস্তখত করিয়া আপনাকে অর্পণ করিলাম ও তাহাদের নামীয় পত্র আপনাদের সঙ্গে দিলাম। * *

* * বাবুরা আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবমত সর্ত্তে টাকা দেন বা না দেন, যদ্যপি ২৫ বৎসরের জন্য তাঁহাদের দেনার বাবদ নালিশ করিবেন না ও বর্ত্তমান দেনার সুদের হার শতকরা ৮৸০ করিয়া দেন ও তাহা আগামী কল্য লিখিয়া দেন, তবে আপনি Gillandersদের agreement তাহাদের দিবেন না। * * বাবুরা ২৫বৎসরের সময় দিতে কিম্বা সুদের হার কমাইয়া দিতে রাজী না হন, তবে আপনি এগ্রিমেণ্ট Gillandersদের দেওয়ার জন্য আমাদের Solicitor Messrs. Watkins & Co.কে দিয়া আসিবেন। ইতি— * * *

স্বদেশী স্বজনের নিকট সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবার আশা তখনও মহারাজের অন্তরে ছিল এবং যাহাতে বিদেশীর কর্ত্তৃত্বাধীনে কাশিমবাজার এষ্টেট্ চলিয়া না যায়—তাহার জন্য তিনি শেষপর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই কিন্তু তাঁহার মত মানুষের মানসম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার যোগ্যতাই বা পৃথিবীতে কয় জনের আছে? সে সদিচ্ছা, সে সদাশয়তা, সে কৃতজ্ঞতা এ দেশের থাকিলে আজ কাশিমবাজার এষ্টেটের ঠিক এই অবস্থা হইত কিনা সন্দেহ।

শুনিতে পাওয়া যায়—গিলেণ্ডারসের এগ্রিমেণ্ট সহি করিতে গিয়া কতবার তিনি পিছাইয়া আসিয়াছেন,—অ-দিন অ-ক্ষণের অজুহাতে কতদিন তিনি সহি মুলতুবি রাখিয়াছেন। চুক্তিনামা সহি করিবার পূর্ব্বরাত্রে তিনি নাকি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, বিদেশী কোম্পানীর হাতে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিবার পূর্ব্বে বহু বিনিদ্র রজনীই তিনি চিন্তাকুল হৃদয়ে যাপন করিয়াছেন।

১৩ই বৈশাখ তারিখে কলিকাতাস্থিত গিলেণ্ডারস্ কোম্পানী ৬৷০ টাকা হার সুদে ঋণের টাকা তুলিবার জন্য তাঁহাদের বিলাতের অফিসে পত্র লিখিলেন।

মহারাজের মানসিক অবস্থা খুব শোচনীয় হওয়াতে তিনি ২৫শে বৈশাখ তারিখে পুরীধামে চলিয়া গেলেন।

গিলেণ্ডারস্ এণ্ড আরবুথনট্ কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীনে কাশিমবাজার এষ্টেট চলিয়া গেল। কিন্তু মহারাজ যাঁহার একদিন অন্নদাতা ও রক্ষা-

কর্ত্তা ছিলেন—এ ব্যাপারে তিনি মধ্যস্থ থাকিয়া শুধু নিজের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য করিলেন এবং সেই স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া তিনি মহারাজের যে সমূহ ক্ষতি করিলেন, হৃদয়-হীনতায় তাহা বিবেচনার মধ্যেই আনিলেন না। মহারাজ হরেন্দ্র বাবুকে লিখিতেছেন—

"* * * সকল বিষয়েই অপর পক্ষের নিকট উস্‌কাইয়া দিতেছেন ইহা সত্য। তবে আপনাদের * * * সবই সহ্য করিতে হইবে। ২৮-২-৩০।"

শুনিতে পাওয়া যায় মহারাজের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত আরও কয়েকজন ভদ্রসন্তান—বিশেষতঃ মহারাজের বহু অর্থ-ভক্ষক জনৈক স্বনামখ্যাত ব্যবহারাজীব অর্থলোভে মহারাজের স্বার্থহানিকর কার্য্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। যাহা হউক বিধিবিড়ম্বনায়—কাশিমবাজার রাজ এষ্টেট গিলেণ্ডারস্‌ কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীনে চলিয়া গেল—মহারাজ পরিচালক সভার (Board of management) সভাপতি এবং মহারাজকুমার অন্যতম সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্র একজন বিশিষ্ট সাহিত্যরসিক। নাট্য সাহিত্য ও অভিনয়কলা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন। তিনি 'দস্যুত্থহিতা',—'মন-প্যাথি', 'ক্যাবলার কলপ' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক নাটিকা রচনা করিয়াছেন এবং সেগুলি কাশিমবাজার, বহরমপুর ও কলিকাতায় অভিনীত হইয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই বৎসর স্বর্গীয় মহারাজের ইচ্ছায় মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে কাশিমবাজার ক্লাবকর্ত্তৃক "দস্যুত্থহিতা"র অভিনয় হইল।

এই বৎসর মহারাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "উপাসনা" মাসিক পত্রিকা-খানির সম্পাদনের ভার বর্ত্তমান লেখকের উপর অর্পণ করিলেন। ইহার একটু বিস্তৃত ইতিহাস আছে—তাহাতে মহারাজের বদান্যতা ও স্নেহশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া, ব্যক্তিগত হইলেও তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

—সন ১৩২৭ সালের মাঘ মাসে (১৯২০) কল্যাণীয়া অনিমাপ্রভার শুভ অন্নপ্রাশনে কাশিমবাজার গিয়াছিলাম। উৎসবের দিন "সঙ্গীন" দালানের দিকে যাইতেছি, নাটমন্দির হইতে নগ্নপদে মহারাজ আমার দিকে আসিতেছেন।—আমার পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিলেন—"কি হে, বি-এ ত পাশ কর্‌লে, এখন কর্‌বে কি ?" আমি হঠাৎ এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কি করিব না করিব তখনও ভাবি নাই; কেবল এম-এ টা পড়িব স্থির করিয়াছিলাম। বলিলাম "বাঙ্গলা এম্-এ টা পড়্‌ব, আর একটা চাক্‌রি করতে হবে—যাতে কিছু আয় হয়।"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, চাক্‌রি যা তুমি করবে তা' আমি জানি। এক কাজ কর—ছোট খাটো একটা প্রেস দিচ্ছি—"উপাসনা"টা চালাও আর ছাপাখানাটাকে আস্তে আস্তে Business wayতে চালানর চেষ্টা কর।" আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'উপাসনা'র সম্পাদক ছিলেন বটে কিন্তু পত্রিকা পরিচালনার ভার ছিল আমার উপর। মহারাজ সে কথা জানিতেন। তাই তাঁহায় একথার বিশেষ উৎসাহ পাইলাম।

স্পেশাল কংগ্রেসের কিছুদিন পর হইতেই—বাঙ্গলা দেশে ভাবের জোয়ার আসিল ;—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে—উকিল ওকালতি ছাড়িল, ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপক স্কুল কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিল। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগে এম-এ পড়িতেছি—গুজরাটি সাহিত্য বিশেষ বিষয় হিসাবে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৃত্তিও পাইতেছি।—সেদিন অপরাহ্নে ষ্টার থিয়েটার হলে কলিকাতার ছাত্রবৃন্দের বিরাট সভা। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা মহম্মদ আলী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত—ছাত্রদলের ভীড়ে তিল ধারণের স্থান নাই। সেই বিরাট স্মরণীয় সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন

অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকারের প্রস্তাবে ও দেশবন্ধুর আহ্বানে আমাকেই সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল ;—কারণ সেই দিন দ্বিপ্রহরে আমিই সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশ হইতে অসহযোগ করিয়াছি।

সেদিনের সে সুদুর্লভ অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করিবার এ স্থান নয়। পর দিন সকালের দৈনিক কাগজে এই সংবাদ পড়িয়া মহারাজ কি মনে করিবেন এই উৎকণ্ঠা ছিল আমার প্রবল। যিনি আমার ছাত্রজীবনের প্রতিপালক, আমার পরম কল্যাণকামী আশ্রিতবৎসল অভিভাবক,তিনি আমার এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ব্যাপারটী যে কি চক্ষে দেখিবেন—সে কথা আমি না ভাবিয়া পারি নাই। পর দিন খবর পাইলাম মহারাজ সহাস্য মুখে বলিয়াছেন—"সাবিত্রী ত এদিকে এক কাণ্ড করে বসেছে।"—ইহার পরে দেখা হইল, এ বিষয় কোনও প্রসঙ্গই তিনি তুলিলেন না। কাশিমবাজার হইতে পুরাতন প্রেসটি কলিকাতায় আনিবার আদেশ হইয়া গেল। প্রয়োজনীয় টাইপ ও একটী ট্রিড্‌ল মেসিন কিনিবার খরচ মহারাজ নিজেই দিতে স্বীকৃত হইলেন।

ইংরাজী ১৯২১ সালের জুলাই মাসের প্রথমেই (সন ১৩২৮ সাল) বন্ধুবর স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কাশিমবাজার হইতে উল্লিখিত প্রেসের সরঞ্জামাদি কলিকাতায় আমার ফকিরচাঁদ মিত্রের মেসে আনিয়া তুলিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ইণ্টালী শরৎ ঘোষের ষ্ট্রীটে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া মহারাজেরই প্রদত্ত নামে "উপাসনা প্রেস" স্থাপিত হইল।—প্রথম দুই মাস মহারাজ "উপাসনা প্রেসে"র সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন। শেষে একদিন আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"উপাসনা" ছাপা ও বাহিরের কাজ চালাইবার মত ছোট খাটো যা'হোক একটা ছাপাখানা তোমার হ'ল। মাসিক খরচের টাকা আমার কাছ থেকে পেতে থাক্‌লে তোমার আলস্য আসবে ; কোনও উন্নতির চেষ্টা হবে না। আমার কাছ থেকে সহজপ্রাপ্য মাসিক খরচা পাওয়ার জন্য অনেক ব্যব-সায় নষ্ট হয়েছে। তোমাকে সে পথে যেতে দিব না। 'উপাসনা'

বহরমপুরে মহাত্মা গান্ধী

কাগজখানি চালিয়ে কিছু আয়ের চেষ্টা কর—আর ছাপাখানায় বাইরের কাজ করে পরিবার প্রতিপালন ও প্রেসের শ্রীবৃদ্ধি কর।"—কথাটা আমার মনে খুব লাগিল। আমি সম্মতি জানাইয়া চলিয়া আসিলাম। সেই হইতে মহারাজের উপদেশমত কাজ করিয়া আসিয়াছি। উপাসনা প্রেসের উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে "উপাসনা প্রেস" অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রেস বলিয়া পরিগণিত ছিল; সামান্য অবস্থায় যাহার আরম্ভ—দশ বৎসরে অল্লাধিক ২৮ হাজার টাকা মূল্যের সরঞ্জামে সেই ছাপাখানাটী সজ্জিত হইয়াছিল। আমার দুর্ভাগ্য, মহারাজের দানের এই কীর্ত্তিটী রাখিতে পারিলাম না। তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি 'উপাসনা' মাসিক পত্রিকার ২৫শ বর্ষ চলিতেছে।—১৩৩০ সাল হইতে মহারাজেরই অভিপ্রায় অনুযায়ী সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়া এযাবৎ সুখে দুঃখে তাঁহার এই অমূল্য কীর্ত্তির সহিত তাঁহার পবিত্র নামটি সংযুক্ত রাখিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

সন ১৩৩১ সালের কথা—

ডাঃ গৌর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সহবাস-সম্মতির বয়স বৃদ্ধির জন্য তাঁহার সংশোধিত বিলের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিলেন। কলিকাতা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা এই বিলের প্রতিবাদ কল্পে দাঁড়াইতে ইচ্ছুক হইয়া মহারাজের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। মহারাজ নিজেও এ বিষয় পূর্ব্ব হইতেই চিন্তা করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণ সভার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য জেলার পরিচিত প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণগণকে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া সমবেতভাবে একখানি প্রতিবাদ-পত্র সিমলায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতির বিষয় মহারাজ সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। তাঁহার নিজের একটা বিশিষ্ট মতবাদ ছিল। তাঁহাকে প্রাচীনপন্থী বলিলে ভুল হইবে,—নবীনপন্থীর দল যে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হয়ত বা ইতস্ততঃ করিবে—বৃদ্ধ বয়সেও মণীন্দ্রচন্দ্রের সেখানে যাইতে কোনও রূপ কুণ্ঠা হইত না—যদি তিনি বুঝিতেন যে ইহাতে সামাজিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সংস্কার মাত্রকেই তিনি মানিতে চাহিতেন না,—সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণের অব্যর্থ উপায়রূপে কোনও প্রকার সংস্কারকে মানিয়া লইতে তাঁহার বাধিত না। বাঙ্গলা দেশের নারী-নির্য্যাতনের মর্ম্মভেদী ইতিহাসের কথা মনে করিলে—সহবাস-সম্মতির বয়স বৃদ্ধির আইন প্রণয়ন করিবার অনুকূলে মত দেওয়া উচিত নহে এবং যৌন সম্বন্ধের প্রকৃষ্ট জ্ঞান যে বয়সে হওয়া সম্ভব—সেই বয়সেই সহবাস সম্মতির বয়স নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত—ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং সেই মর্ম্মেই তাঁহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ যে শুধু পতনোন্মুখ জমিদারীর ট্রাষ্টি হইয়া যথাসাধ্য তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে—দেবস্থান ও মন্দিরপ্রভৃতি রক্ষার জন্যও তিনি বহুবার সচেষ্ট হইয়াছেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বৈষ্ণব-তীর্থ শ্রীপাঠ খেতুরের দেবালয়ের ট্রাষ্টি হইয়া উক্ত দেবালয় রক্ষাকল্পে বাহারবন্দ পরগণার জোতদারগণের নিকট সাহায্য চাহিয়া পত্র লিখিলেন—

৬ই জানুয়ারী, ১৯২৫

বাহারবন্দ এষ্টেটের অন্তর্গত মৌজার জোতদারগণ,

রাজসাহীর অন্তর্গত শ্রীপাট খেতুরের দেবালয়ের নাম আপনারা অবগত আছেন। আমি ঐ দেবালয়ের একজন ট্রাষ্টি হইয়াছি। হিন্দু মাত্রেরই এই দেবালয় রক্ষাকল্পে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। দেবালয়ের অন্যতম ট্রাষ্টি ও কার্য্যাধ্যক্ষ

রাজসাহীর উকিল শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাদের নিকট যাইতেছেন। অতএব আমার অনুরোধ আপনারা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে সমুচিত সাহায্য পাইবার সহায়তা করিবেন। আপনাদের দ্বারা দেবালয়ের উপকার হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব।"

মহারাজের নিকট লাটপত্নী কাউন্টেস্ অফ্ লিটন বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করায় ২৫শে মাঘ হইতে ২৯শে মাঘ পর্য্যন্ত সৈদাবাদ কুঠি বাড়ীতে মহা ধূমধামের সহিত "শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রদর্শনী" খোলা হইল।

গিলেণ্ডারস্ কোম্পানী কাশিমবাজার রাজ এষ্টেটের ভার লওয়ার পর বোর্ড অফ্ ম্যানেজমেণ্ট বা কার্য্যকরী-সভার অধিবেশন ২৫শে নভেম্বর ৬নং হেষ্টিংস্ পার্ক রোডে হইবে বলিয়া ধার্য্য হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে মহারাজ এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার ঋণ কতদিনে শোধ যাইবে ইহাই তাঁহার দিবারাত্র চিন্তা হইয়াছে। এই সময় নূতন কোনও বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদের সন্ধান বা সাক্ষাৎ পাইলেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু আশা করিবার মত কোনও কথাই শুনিতে পান না।

মহারাজের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্যার ডাঃ নীলরতন সরকার ও মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ বার্ণাডো সাহেব তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কিছুকালের মত তাঁহার চিকিৎসা করিলে—মহারাজ ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু এখন হইতে প্রায়ই মহারাজের শরীর কোনও না কোনও কারণে অসুস্থ হইয়া পড়িত। মহারাজ কখনও রোগ মানিতে চাহিতেন না—রোগকে এমন তাচ্ছিল্য করিতে খুব কম ব্যক্তিকেই দেখা যায়। মনের বল ছিল তাঁহার অসীম—সেই মনের বলে তিনি অতি কঠিন রোগের আক্রমণকেও পরাস্ত করিতেন কিন্তু ঋণভারে পীড়িত, পরমুখাপেক্ষী অবস্থাজনিত দারুণ মানসিক অশান্তিতে তিনি ক্রমশঃ কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দুই হাতে যিনি

লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার অকুণ্ঠ চিত্তে বিতরণ করিয়াছেন আজ তাঁহাকে যে সীমাবদ্ধ আয়-ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে পরাধীন অবস্থায় থাকিতে হইতেছে—দান-প্রবৃত্তির সঙ্কোচ সাধন করিতে হইতেছে—এই ক্ষোভ ও দুঃখই তাঁহার শেষ জীবনের প্রধান অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত ভোগী জীবনের দৈনন্দিন অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে, আমরা সাধারণ মানুষ বিব্রত হইয়া পড়ি, আর যিনি ত্যাগের নিত্য নূতন ব্রত-পালনের অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার বিব্রত অবস্থার বুঝি আর তুলনা হয় না।

সন ১৩৩২ সালের কথা—

বর্ত্তমান বর্ষের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে মহারাজবাহাদুরের চেষ্টা ও সহায়তায় মহাত্মা গান্ধীর শুভাগমন।

মহাত্মা গান্ধী তখন দেশবন্ধু স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন। কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রবৃন্দ ও অধ্যাপকগণ এই সুযোগে এক দিনের জন্য মহাত্মার সঙ্গলাভ ও তাঁহাকে তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পড়িলেন। মহারাজের নিকট তাঁহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র তিনি মহাত্মাজীকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে মহাত্মাজী ইং ১৯২৫ সালের ৬ই আগষ্ট (সন ১৩৩২ সাল) তারিখে বহরমপুর কলেজে পদার্পণ করেন। ছাত্রগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বক্তৃতাকালে মহারাজ বাহাদুরকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন—

"I have known his great charities since 1915, when I had the honour of coming in contact with the Maharajah Bahadur, but I never realised till I came here what was the quantity of these charities. I understand from reliable sources that they amount to more than One Crore of Rupees. I had flattered myself with the belief that my *Parsee* friends beat every one

on the face of the earth in their charities and I suppose now that statement will stand unchallenged so far as the whole community is concerned ; but so far as individuals are concerned I do not recollect a single *Parsee* name that has exceeded the charities of Cossimbazar."

—অর্থাৎ আমি ইং ১৯১৫ সালে যখন মহারাজ বাহাদুরের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করি, তখন হইতে তাঁহার প্রভূত দানের কথা আমি অবগত আছি। কিন্তু এখানে না আসা পর্য্যন্ত সে দানের পরিমাণ যে কত তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, সে দানের পরিমাণ—এক ক্রোর টাকারও অধিক! আমি এতদিন মনে ভাবিতাম, জগতের মধ্যে বুঝি আমার পার্শি বন্ধুগণের দানের তুলনা নাই—এখন দেখিতেছি যে এ ধারণা শুধুমাত্র পার্শি সম্প্রদায় সম্বন্ধেই খাটে; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এমন একজন পার্শির কথাও আমার মনে পড়ে না যাঁহার দান কাশিমবাজারের দানকে অতিক্রম করিতে পারে।

পরের সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণের জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কর্তৃক কাশিমবাজার এষ্টেটের প্রতিষ্ঠামূলে পাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের যে ধারণা আছে, তাহা সত্য হইলেও, মহারাণী স্বর্ণময়ীর জাতিনির্ব্বিশেষে প্রভূত দান এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সর্ব্বসমর্পিত দানযজ্ঞের কল্যাণস্পর্শে তাহা নিরাকৃত হইয়াছে এবং সাধু সঙ্কল্পের পবিত্র মহিমায় আজ কাশিমবাজার রাজবংশ যে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য।

মহাত্মা গান্ধী প্রধানতঃ মহারাজের শিক্ষাবিষয়ক দানের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দানের সমষ্টি অন্ততঃ তিন কোটি টাকার কম হইবে না। বিশদ ও সঠিক দানের তালিকা পাওয়া কঠিন—কারণ তিনি বহু দান গোপনে করিয়া গিয়াছেন—বহু দানের কথা তাঁহার নিজের দৈনন্দিন লিপিতেও লেখা নাই; অনেক স্থলে তাঁহাকে ব্যক্তিগত কারণে বা

দানগ্রহণকারীর সম্মানের জন্য দানের কথা গোপন রাখিতে হইয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র হইতে সন ১৩০৮ সাল (ইং ১৯০২) পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত একটি দানের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়,—

শিক্ষা সংক্রান্ত দান	১,৬২,১১২৲
চিকিৎসা " "	২৩,৫৭৯৲
ব্যক্তিগতভাবে "	৩৮৫,৬৩৯৲
পুষ্করিণী ও কূপখননের জন্য দান	১০,৯৯২৲
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সাহায্য	৩৪,৯৭৮৲
সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের উৎসাহবর্দ্ধনে দান	৫,৮১৩৲
মাসহারা	৫৮,০৭৯৲
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ডে (বহরমপুর হইতে) দান	২,০০০৲
মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের বিবাহ-উপলক্ষে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে "	৩,০০০৲
বহরমপুর জলের কলের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করিতে "	৯৮,৪২৭৲
কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ডে দান	১,০০,০০০৲
অ্যালবার্ট ভিক্টর হস্‌পিটাল ফাণ্ডে দান	১৫,০০০৲
বহরমপুর লালবাগ রোড্ নির্ম্মাণ কল্পে দান	৫,০০০৲
কাশিমবাজার রেসিডেন্সি সংরক্ষণের জন্য দান	৫,০০০৲

ইহা ছাড়া রাজ-সেরেস্তার একখানি মাত্র 'রোকড়' হইতে সন ১৩০৪-১৩৩৬ সাল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দান খয়রাতের হিসাব সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায়—সন ১৩০৪—১৩৩০ সালের বৈশাখ পর্য্যন্ত অর্থাৎ নিজের হাতে এষ্টেট্ থাকা কালীন প্রায় ২৬ বৎসরে এবং সন ১৩৩০—১৩৩৬ সালের কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত পরের হাতে এষ্টেট্ থাকা কালীন প্রায় সাড়ে পাঁচ বৎসরে অর্থাৎ সর্ব্বসমেত সাড়ে একত্রিশ বৎসরে মহারাজ বাৎসরিক একুশ হইতে বাইশ লক্ষ টাকা হিসাবে, সর্ব্বসমেত ৭০,৭২৫৪৪৸/১১ সত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা নয় আনা এগার গণ্ডা দান করিয়াছিলেন। কি ভাবে

তিনি দান করিতেন তাহা বুঝিবার পক্ষে নিম্নের তালিকাটি দ্রষ্টব্য বলিয়া মনে করি ;—

সাল	শিক্ষাবিষয়ে দান	বিভিন্ন বিষয়ে দান	ধর্ম্ম ও মঙ্গলকর্ম্মে দান	মোট দান
১৩০৪	১৫০০০৲	১৫৩২০০৲	৩৪০০০৲	২০২২০০৲
১৩০৫	৩০৫০৲	৬৪১০৪॥৶৬	২৫১১৯৲	৯২২৭৩॥৶৬
১৩০৬	৪৩৮১৲	৪৮৮৩৪৲	৭৮৭২৬৲	১৩১৯৪১৲
১৩০৭	১৬৯৩২৲	৭২৬৬৮৸৵০	২০৩০৯৲	১০৯৯০৯৸৵০
১৩০৮	৩৩৫২৭৸০	১২১১৩৯॥০	২২৬২০৲	১৭৭২৮৭।০
১৩০৯	৩১৯০৯৲	১২৪৯৬০৲	১৬৫৪৮৲	১৭৩৪১৭৲
১৩১০	৩৬৯১৪৲	১২৯৯৯১৲	১৭৪৭৪৲	১৮৪৩৭৯৲
১৩১১	৩৮৮৮৩৲	৭৬৩২২৲	৯৬৭৪৲	১২৪৮৭৯৲
১৩১২	৫৯৯২৪৸৶১০	৬৫৬৫৩৲	৫৮৪৪৲	১১১৪২১৸৶১০
১৩১৩	৪০৮৭১৲	৫৫৭০৭৲	২৫২৬৲	৯৯১০৪৲
১৩১৪	৪৬১৭৬৶৬	১৬২০৫৬/১০	২০৪৪২৲	২২৮৬৭৪৴১৬
১৩১৫	১১৪৩২৩৲	৪৪২১৭॥০	২৩৩২৩৸৵০	১৮১৮৬৪।৵০
১৩১৬	১৪২৪৮৩৲	৩২৬০৩৲	১৭৬৮৩৲	১৯২৭৬৯৲
১৩১৭	১১১৪০০৸০	১১৮২৩৩॥৵০	৪৭৮১৪৸৵৭॥০	৩০০৪৪৯৶৭॥০
১৩১৮	১৪১০৭৬॥০	৯৩৫২১৲	১৩৫৭০৶০	২৪৮১৬৭॥৶০
১৩১৯	১৩১৫৯১॥০	২৫৬৮৮৲	১২৭৭৫৪৲৬	২৮৫০৩৩॥৬
১৩২০	২৯৮৭৪৯॥৵০	১৬৩২৭৲	১৫৩৬৪৭৸৵০	৪৬৮৭২৪।৶০
১৩২১	২৬৬৩১০।৵৬	১৭৭৬৩৸০	১০০১২২৲	৩৮৪১৯৬৵৬
১৩২২	৭৫৬৬৮৸০	১৬৫২০৸৯	৯৮০৯৭৵৬	১৯০২৮৬॥৵১৫
১৩২৩	২৩৩০৭৭৲	৫৫০০৲	৪৬৩২২৲	২৮৪৮৯৯৲
১৩২৪	১৯৩৩২২॥৴০	৪৯২৬৲	৫৯৪৮৮॥৴০	২৫৭৭৩৭।৶০
১৩২৫	১১১৪৬৬৲	৫৫৭৬।০	১১২৯৪৪৶০	২২৯৯৮৬।৶০
১৩২৬	১৯০২০৯৴৭॥০	১৫০০০৲	৯৭৭২৫৲	৩০২৯৩৪৴৭॥০
১৩২৭	১৩৭৭৬৫।৴২	৪৩২৩/৯	১০৮০৭০৶০	২৫০১৫৮॥৶১১

সাল	শিক্ষাবিষয়ে দান	বিভিন্ন বিষয়ে দান	ধর্ম্ম ও মঙ্গলকর্ম্মে দান	মোট দান
১৩২৮	২৫৩৫৮৩৵০	১৬৮৮২০৲	৪৯০০০৲	৪৭১৪০৩৵০
১৩২৯	২১৮৯০৭৲	৪৩০০৮৲	৭২৩৮০৲	৩৩৪২৯৫৲
১৩৩০	১০০৪০০৲	২৮১২৯৩।৵৯	১১৬৪৯৬৲	৪৯৮১৮৯।৵৯
১৩৩১	৭০৫৯৯৲	২৯৩৭৮।/০	২২৮০০৲	১২২৭৭৭।/০
১৩৩২	৪৭০০০৲	২৭৫৩০৲	৩৩৭০০৲	১০৮২৩০৲
১৩৩৩	৪৫০০০৲	২৫৭০১॥৵০	২১০০০৲	৯১৭০১॥৵০
১৩৩৪	৪৫১৭২৲	৪২০৭॥৶০	৩০০০০৲	৭৯৩৭৯॥৶০
১৩৩৫	৫০৫০০৲	৬০০০৲	২৫০০৪৲	৮১৫০৪৲
১৩৩৬	২১০১০৲	৪০০৫০৲	১১৩১২৲	৭২৩৭২৲

১৩০৪-১৩৩৬ পর্য্যন্ত........................মোট—৭০৭২৫৪৫॥/১১

মাত্র একখানি 'রেকর্ড' হইতে উল্লিখিত দানের একটা মোটামুটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে—মহারাজের দানের অঙ্ক ইহাতে সম্পূর্ণ নহে। কারণ অনেকগুলি মোটা দানের অঙ্ক রোকড়ে ধরা নাই। যথা—

বেঙ্গলী পত্রিকা রক্ষার্থে	৩,০০০০০৲ তিন লক্ষ টাকা।
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়	২,০০০০০৲ দুই লক্ষ টাকা
বসু-বিজ্ঞান মন্দির	২,০০০০০৲ "
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ (বাৎসরিক প্রায় ৬০,০০০৲ টাকা হিসাবে)	২৫,০০০০৲ পঁচিশ লক্ষ টাকা
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে	১,৫০,০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

ইহা ছাড়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত স্কুল ও কলেজ পরিচালন ব্যাপারে যে টাকা অনটন পড়িয়াছে—মহারাজ তাহা সাহায্য স্বরূপ দিয়া আসিয়াছেন।

দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তিনি অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন—সে ব্যয় কখনও ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে করেন নাই,—লাভের
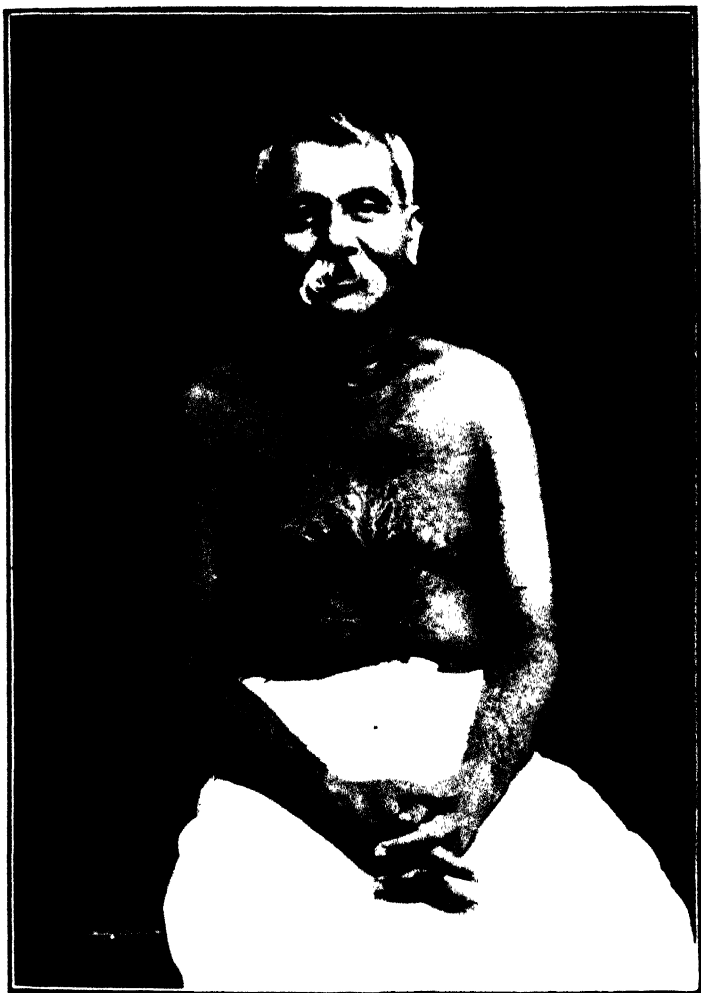
দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র

প্রত্যাশাও তাঁহার কখনও ছিল না। তিনি বলিতেন, "দেশের শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ধনী হইয়া যদি আমরাই না অগ্রণী হই তবে সাধারণ লোকের সাহস বাড়িবে কি করিয়া?"—এসব ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া তিনি যে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন—তাহাকে অনায়াসেই দান-পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে—উদাহরণ স্বরূপ—

বেঙ্গল পটারিস্ ওয়ার্কস	...	...	১,০০০০০ এক লক্ষ টাকা
বহরমপুর উইভিং ওয়ার্কস্	...	...	২৫,০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা
বহরমপুর ট্যানারি	...	...	৯৫,০০০৲ পঁচানব্বই হাজার টাকা
কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক (যুক্ত দায়িত্বে গৃহীত)		...	৭,০০০০০৲ সাত লক্ষ টাকা

—উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া গ্লাস ওয়ার্কস, স্যাণ্ড ওয়ার্কস, চায়না ক্লে, ষ্টোন ওয়ার্কস, ইন্সুরেন্স, ব্যাঙ্কিং, টিন প্রিন্টিং, সংবাদপত্র পরিচালন, উইভিং, এনামেলিং ও এনগ্রেভিং ওয়ার্কস, সমবায় ম্যান্সন্স্ প্রভৃতি ব্যবসায়ের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁহার প্রভূত দান ছিল। বিদ্যা-শিক্ষার দিক হইতেও প্রথম শ্রেণীর কলেজ দুইটি, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় অন্ততঃ পঞ্চাশটি, মধ্য ইংরাজি ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় যে কতগুলি তাহার সম্পূর্ণ তালিকাও নাই; এথোরা মাইনিং স্কুল, বহরমপুর কমার্সিয়াল কলেজ, কলিকাতা পলিটেক্‌নিক্ স্কুল, রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, পুরী বেদ-বিদ্যালয়, নবদ্বীপ বৈষ্ণব-দর্শন বিদ্যালয়, কলিকাতা গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদিক বিদ্যালয়, মূক ও বধির বিদ্যালয় এবং কমার্সিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রভৃতিতেও তাঁহার প্রভূত দান ছিল;—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেলগেছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রভৃতিও তাঁহার ভারতবিশ্রুত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

সাহিত্যিকগণকে তিনি যে দান করিতেন তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বৎসরের পর বৎসর দিয়া গিয়াছি। কয়েকখানি সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশের জন্য

তিনি যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন তাহারই বিশেষ উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মেজর বি, ডি, বসু আই, এম, এস কৃত Indian Medical Plants, শ্রীধর স্বামী ও সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির টীকা সহ ৫৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা, ৪০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত শ্রীশ্রীগোপাল চম্পূ (শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জীবন-কথা) ইংরাজি ও দেবনাগরী ভাষায় মুদ্রিত ঋক্ বেদ সংহিতা প্রভৃতি বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ গ্রন্থ প্রকাশের সাহস একমাত্র মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রেই সম্ভব ছিল।

কাশিমবাজার, বহরমপুর, মাথরুণ, উলিপুর, চিলমারী, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তিনি হাসপাতাল ও ডিসপেন্‌সারীর ব্যয়ভার বহন করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বহরমপুরে মেডিকেল স্কুল স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং নিজের এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থার মধ্যেও তিনি এই উপলক্ষে ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক ৪০,০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

এই সব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দানের লিপিবদ্ধ তালিকা না থাকিলেও বিক্ষিপ্ত বিবরণগুলি সংগ্রহ করিয়া দেখিতেছি **দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের পরিমাণ ন্যূনাধিক তিন কোটি টাকার কম হইবে না।**

কোনও দেশের ইতিহাসে এই প্রকার সার্ব্বজনীন কল্যাণযজ্ঞে আত্মাহুতির কথা লিপিবদ্ধ আছে কি না জানি না—তবে ভারতবর্ষের তথা বাঙ্গলা দেশের মাটিতে এই প্রকার ক্ষণজন্মা মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়—ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস এই সব মহার্ঘ উপাদানেই গঠিত হইয়াছে।

বৈশাখ মাস হইতে মহারাজের আবার প্রতিদিন একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ২২শে তারিখে তিনি পুরী যাত্রা করিলেন, ২৪শে তারিখে বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুরী অবস্থানকালে কৃষ্ণনাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলার

অধ্যাপক "রাজস্থান" প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা, পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে * মহারাজ বিশেষ দুঃখিত হইলেন। "স্বাধীনতার ইতিহাস" নামক বহু খণ্ডে বিভক্ত—একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার ভার মহারাজ যজ্ঞেশ্বর বাবুর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ যজ্ঞেশ্বর বাবুর উন্মাদ রোগ হইয়া পড়ায় এই কাজটি আর অগ্রসর হয় নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র পুরী হইতে ট্রেণযোগে দাক্ষিণত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। সঙ্গে ছিলেন মহারাজের ছোট জামাতা বিজয়কৃষ্ণ, ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলচন্দ্র ও আমাদের বন্ধুবর নলিনাক্ষ সান্ন্যাল। পথিমধ্যে এলোর ষ্টেশনে ভীষণ ঝড় উঠে, ঐ ঝড় দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার ফলে পাঁচ মাইল ব্যাপী বন্যা আসিয়া পড়ে। সেই বন্যাজলে মানুষ, গো-মহিষাদি ভাসিয়া যায়—রেল হইতে নামিয়া যাহারা অন্য স্থানে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে তাহারা প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রেলপথ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় শ্রীশচন্দ্রকে বহুক্ষণ ট্রেণে অপেক্ষা করিতে হইল। সংস্কার হইবার পর আবার ট্রেণ চলিতে থাকে। যাহা হউক ভগবানের কৃপায় মাদ্রাজভ্রমণ শেষ করিয়া মহারাজকুমার পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৫ই ভাদ্র মহারাজের ৪র্থ ভগিনীর মৃত্যু হয়। ভগিনীরা মহারাজের নিকটেই থাকিতেন—ইহাঁর মৃত্যুতে মহারাজের সহোদরা বলিতে আর কেহই থাকিল না।

বৈষ্ণবতীর্থ রামকেলীর "রূপসাগরের" পঙ্কোদ্ধারের সাহায্যের জন্য দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর সিং, নসীপুরের রাজাবাহাদুর

---

* "যজ্ঞেশ্বর বাবু আর ইহলোকে নাই, বোধ হয় সে খবর পেয়েছ। তাঁর পক্ষে জীবন-মৃত্যুর চেয়ে এ মৃত্যু ভাল, কয়েক বছর আগে হলে হয়ত আরো ভাল হ'ত। কিন্তু দেশের যে স্থান তাঁর অভাবে শূন্য হ'ল তা কি কখনও পূর্ণ হবে?

(গ্রন্থকারকে লিখিত মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের পত্র হইতে উদ্ধৃত)

ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিং, নেহালিয়ার রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, লাল-গোলার মহারাজ বাহাদুর যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, চাঁচলরাজ শরৎচন্দ্র রায়, হাটখোলার রাজা জানকীনাথ রায়, পাবনার রাধাপদ রায়, দিনাজপুরের মহারাজ জগদীশ নাথ রায় প্রভৃতির সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর ৭ই আশ্বিন তারিখে পত্র লিখিলেন।

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে মহারাজ সপরিবারে কাশীতে আসিয়া রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাশীতে তাঁহার শরীর বেশ ভালই থাকিত এবং বেশ আনন্দেই দিন কাটিত। এখান হইতে তিনি বিন্ধ্যাচল, মির্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসিলেন।

হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বসু সর্ব্বাধিকারী মহারাজের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজ তাঁহার পরিবারবর্গ এবং সম্পত্তি রক্ষার অভিভাবক হইয়াছিলেন—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পরিবারবর্গ বহরমপুর গোরাবাজার অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন—মাঝে মাঝে ইহাঁদের মধ্যে পারিবারিক কলহ উপস্থিত হইত—মহারাজ দূরে থাকিলে পত্রযোগে এবং কাশিমবাজার থাকিলে তাঁহাদের বাড়ীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মধ্যস্থতা করিয়া কলহ মীমাংসার চেষ্টা করিতেন। নিজের আশ্রিত যে কোনও ব্যক্তির গৃহে মহারাজের উপস্থিতি একান্তই সুলভ ছিল। তাহাদের অতি ক্ষুদ্র প্রয়োজনেও মহারাজের সাহায্য ও পরামর্শ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইত না।

মহারাজের ঋণ যখন ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা তখন তাঁহার প্রিয় ভাগিনেয়ী রাধারাণীর কন্যার বিবাহে প্রার্থিত ১৩০০৲ টাকা স্থলে মাত্র ২০০৲ টাকা দিয়া বিশেষ দুঃখ করিয়া ১৭ই ফাল্গুন তারিখে তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। এমন অবস্থার মধ্যেও জনহিতকর কার্য্যের প্রতি মহারাজের অবহেলা দেখিতে পাই না। বৃন্দাবনের নীচে যমুনা নদী শুকাইয়া

অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে। যাহাতে যমুনা বৃন্দাবনধামের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য মহারাজ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি 'যমুনা ড্রেনিং এসোসিয়েসন' বা যমুনা সংস্কার সমিতির একজন প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে থাকা কালীন বহু লোকের সহিত এ বিষয় আলোচনা ও পরামর্শ হইতে দেখিয়াছি।

২১শে ফাল্গুন কাশী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাহায্যকল্পে প্রতিশ্রুত ১০০৲ টাকা পাঠান হইল; কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি মহা-মহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক "কাশী রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের" অভিভাবক হইবার জন্য আহূত হইয়া মহারাজ সানন্দে সম্মতি দিলেন। দারুণ দুর্দ্দশায় পড়িয়াও মহারাজ বাহিরের লোককে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছিলেন কিন্তু আত্মীয় স্বজন পূর্ব্বেকার মত সাহায্য পাইতেছে না, এজন্য মহারাজ বিশেষ দুঃখবোধ করিতেছিলেন! কিন্তু ইহার কোনও উপায় ছিল না।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র পরম বৈষ্ণব ছিলেন। যোগ্যের যথাযোগ্য গুণানুধাবন পূর্ব্বক সন ১৩১৫ সালে কাশিমবাজার প্রথম বৈষ্ণব সম্মিলনীতে সম্মিলিত নবদ্বীপ ও পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে "শ্রীগৌড় রাজর্ষি" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণতার জন্য সন ১৩১৬ সালে, বৃন্দাবনবাসী অদ্বৈত বংশের পরমহংস গোস্বামী প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী কাশিমবাজার দ্বিতীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে মহারাজকে "ধর্ম্মরাজ" এই আখ্যায় সম্মানিত করেন। ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তি-প্রদায়িনী সভা হইতে তিনি "ভক্তিসাগর" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। সন ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে নবদ্বীপ পঞ্চম বৈষ্ণব সম্মিলনীতে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'বিদ্যারঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন। সন ১৩২২

সালের ১২ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর (ইং ১৯১৫ সাল) কাশীতে ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সময় তিনি "ভারত-ধর্ম্মভূষণ" এই উপাধিতে ভূষিত হন।

কর্ম্মক্ষেত্রের সম্মান-গৌরবেও তিনি গৌরবান্বিত ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের ও বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ইং ১৯১৫ সালের ৩রা জানুয়ারী তিনি কে, সি, আই, ই, খেতাব পান। নিখিল ভারত হিন্দু সভার সভাপতি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনের সৃষ্টিকর্ত্তা, বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের প্রবর্ত্তক, উপাসনা মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি; President, Land Holders' Association (1918-20), British Indian Association (1922-23) Murshidabad Association(since 1897), All India Exhibition, Calcutta (1818, 1922); Member, Indian Legislative Council (1913-21), Bengal Council (1901-1904), (1909-12), Council of State (1921-24) Imperial Council (1913-1916) Hony. Fellow of the University of Calcutta হিসাবে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ছোট বড় অসংখ্য সভা-সমিতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনি তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন।

জীবনে বহু উপাধি তিনি তাঁহার নানা সদ্‌গুণের জন্য পাইয়াছিলেন —অযোগ্যের উপর অযথা সম্মান বর্ষিত হয় নাই—যোগ্য পাত্রে পড়িয়া উপাধির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

তিনি যে কি পরিমাণ বৈষ্ণবজনোচিত গুণের অধিকারী ছিলেন,—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার যে কতখানি প্রেম-ভক্তি ছিল তাহা শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুরকে লিখিত একখানি পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়,—

আমি "রসরাজ গৌরাঙ্গস্বভাব ও শ্রীখণ্ডে মধুর ভাব" নামক পুস্তকখানি দেখিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলাম। আপনারা শ্রীশ্রীরঘুনন্দনের বংশধর, সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। কিন্তু আপনারা কি করিয়া এইরূপ জঘন্ত অশাস্ত্রীয় অশ্লীল গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিলেন ও আদ্যোপান্ত সংশোধন করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই পুস্তকের ভাষা এত অশ্লীল, রুচি এত বিকৃত যে, কোন ভদ্রলোকই উহা হাতে করিতে পারেন না। অথচ এই বই আপনাদের সহানুভূতিতে রচিত ও প্রচারিত হইল? ধর্ম্মের নামে শ্রীখণ্ড হইতে যদি এইরূপ ব্যভিচার চলে তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্রধর্ম্ম আর কোথায় অবিকৃত থাকিবে!

এই গ্রন্থ কিরূপভাবে সাধারণের চরিত্র খারাপ ও মত বিকৃত করিয়া দিতেছে তাহা নবদ্বীপের "বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। মহাপ্রভুর পবিত্র চরিত্র, মধুর সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তগণের দাস্য ও সখ্য ভাব সমস্তই ঐ পুস্তকে অশ্লীলরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং আমার ইচ্ছা এই যে, এই গ্রন্থের যেখানে যত কপি আছে সমস্ত আমার হাতে সমর্পণ করা হউক। এই গ্রন্থ লোকসমাজে প্রচলিত থাকিলে অত্যন্ত অনিষ্টের সম্ভাবনা বলিয়া এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি। আপনারা অতি সত্বর যাহা যুক্তি স্থির করিলেন জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—* * *

২৮শে জ্যৈষ্ঠ পুরী হইতে কাশিমবাজার পৌঁছিয়া মহারাজ ২৯শে জ্যৈষ্ঠ রামকেলীর মেলায় রওনা হইলেন, ২রা আষাঢ় ভোরের ট্রেণে কাশিমবাজার ফিরিয়া ৩রা তারিখে পুনরায় পুরীধাম যাত্রা করিলেন, ১০ই হইতে ১৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিয়া বহরমপুরে দেশবন্ধু-স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় ভুবনেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহারাজ সেখান হইতে ২৩শে আষাঢ় সপরিবারে কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন।— মহারাজ যে কিরূপ কর্ম্মঠ ও উৎসাহী ছিলেন, তাহা সন ১৩১৯ সালের পরিভ্রমণ দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়।

ঘটনার পূর্ব্বাপর সমাবেশে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখে ধরা

পড়িবে, এজন্য গ্রন্থকারের মন্তব্য অনেকস্থলে বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সন ১৩৩৩ সালের কথা—

জমিদারী সেরাস্তার কাজে মহারাজের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সুবিশাল কাশিমবাজার এষ্টেট শুধু জমিদারী নহে ;—কলিয়ারি, ষ্টোন ওয়ার্কস্, চায়নাক্লে মাইনস্, সুন্দরবনের বাঁধ, বহুলক্ষ টাকার ইমারতের সম্পত্তি প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক বিভাগের যে কোনও খুটিনাটি বিষয় মহারাজের নখদর্পণে ছিল,—নিজের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বিভিন্ন সেরেস্তার বহুবিধ কাগজ পত্রে সহি করিতেন। সেরেস্তার কাগজপত্র রাখিবার পদ্ধতিও ছিল অতি সুন্দর। অতি পুরাতন কোনও দলিল বা প্রয়োজনীয় কাগজ আদেশমাত্র পাওয়া কষ্টকর ছিল না। ইহার সত্যতা মিঃ লায়েল, এই এষ্টেট পরিচালনার ভার লইয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাকে পুরাতন রেকর্ড বা নথিপত্র সম্পর্কে মহারাজের সাহায্য লইতে হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা মহারাজের মধ্যে অতিমানবের বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও সম্যক্ বিষয়বুদ্ধির অভাবেই কাশিমবাজার এষ্টেট গিলেণ্ডার কোম্পানীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। একথা সত্য নহে। তিনি যখন এষ্টেটের ভার হাতে লন, তখন শুধু জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল ছয় লক্ষ টাকা এবং তাঁহার মৃত্যুকালে উক্ত আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আঠার লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

তিনি 'জবরদস্ত' জমিদার হিসাবে অক্ষমের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া যে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহা নহে। পরন্তু যখনই জমিদারীতে অজন্মা বা দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে—তখনই

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র,　　মহাত্মা গান্ধী,　　অধ্যক্ষ ভূষণচন্দ্র

তিনি যে শুধু খাজানা মাপ করিয়াছেন তাহা নহে—প্রয়োজন হইলে রাজ-তহবিল হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতেও কার্পণ্য করেন নাই।

তিনি তথাকথিত জমিদারগণের মত শুধু রায়তবর্গের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া সেই আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কোনও দিন বসিয়া থাকিতেন না। কি উপায়ে বহু লোক প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নব নব পন্থায় এষ্টেটের আয় বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার বিনিযুক্ত অর্থের আশানুরূপ প্রতিদান পাইতেন না কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইবার মত মানসিক দুর্ব্বলতা তাঁহার ছিল না। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময় কয়লাখনির আয় একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয় কিন্তু মহারাজের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল বলিয়াই তাঁহার কয়লার খনিগুলি এপ্রকার স্বর্ণপ্রসূ হইয়াছিল। যে কলিয়ারি তিনি অত্যন্ত সুবিধা দরে ক্রয় করিয়াছিলেন—এখন বোধ হয় তাহা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম উৎকৃষ্ট কলিয়ারি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়লাখনির সম্পত্তি হইতে ক্রমশঃ বার্ষিক আয় দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং তিনি এই আয় হইতে বহু সদ্ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যিনি দুই হাতে খরচ করিয়াছেন—প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করা যাঁহার নিত্য ব্রত ছিল,—তিনি এখন ইচ্ছানুরূপ দান করিতে পারিতেছেন না, আবেদনকারীকে অর্থাভাবে বিমুখ করিতে হইতেছে ;—ইহা অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে আর কি অধিক ক্ষোভের কারণ হইতে পারে। গিলেণ্ডার কোম্পানীর নিকট হইতে এষ্টেট ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন ;—দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজের নিকট এই ব্যাপার লইয়া তিনি যে দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাদটীকায় মুদ্রিত হইল।(১) ইহা হইতে কি সর্ত্তে কাশিমবাজার

---

(১) To Maharajadhiraj Bahadur of Darbhanga
1 Middleton street, Calcutta.

Kasimbazar, 10-1-27.

My dear Maharajadhiraj Saheb,

Many thanks for your letter of the 3rd instant, a separate reply to which is being sent. As regards the P. S. of the said letter I have to

এষ্টেট গিলেণ্ডার কোম্পানীর হাতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় মহারাজের এ চেষ্টা সফল হয় নাই, পরবশ্যতার মর্ম্মযাতনা লইয়াই তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল।

ধ্বংসোন্মুখ জমিদারগণকে ঋণদায় হইতে উদ্ধার করিবার প্রবল ইচ্ছা, (২) বনিয়াদী বংশের মানমর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সদাশয় ব্যবহার অধিকাংশ স্থলে তাঁহাকে বিব্রত

---

say that you may be aware of the fact that I had to raise a debenture loan in England at 6½% interest. Messrs. Gillanders A. & Co.'s firm in England are the Trustees of the loan and their firm in Calcutta conduct supervision work.

A mortgage bond or in other name a Trust deed was executed by me, a copy of which is sent for your perusal, whereby Rs. 1,01,25,000/- was borrowed. The loan is to run for 30 years with option of payment after 15 years with a premium of 2½% on the outstanding balance. The debt is to be paid annually at the rate of Rs 7,59,000/- with an addition of Rs. 25000/- for the Trustees' remuneration. With the exception of a few properties excluding collieries are under mortgage. Under the terms of the Trust deed the management of the Estate has to be made under the supervision of a Board of Management of which myself is the President, the manager of the Estate, a nominee of mine and another of the firm and a representative of a big firm are the members.

(২) রায় রজনীভূষণ মুখার্জ্জি বাহাদুর। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি। বাবু কালীপ্রসন্ন মুখার্জ্জি। বাবু কালীকুমার ব্যানার্জ্জি। বাবু ভুজঙ্গভূষণ মুখার্জ্জি। বাবু গিরিজাপ্রসন্ন মুখার্জ্জি। বাবু বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি। বাবু ইন্দুভূষণ মুখার্জ্জি। বাবু অতুলকৃষ্ণ মুখার্জ্জি।—কুণ্ডলা।

প্রণামান্তে নিবেদনমিদম্—

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আপনাদের নিকট প্রস্তাবগুলি লইয়া যাইতেছেন। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রস্তাবে রাজী হইয়া বনয়ারীবাদ রাজ-এষ্টেটকে রক্ষা করিলে আমি বিশেষ সুখী হইব। এবং আপনারা যে ভাবে উক্ত এষ্টেটকে এতদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহার ফল হইবে।

করিয়া রাখিয়াছিল। বহু জমিদারীর তিনি ট্রাষ্টি বা ন্যাসরক্ষক হইয়া বিপুল অর্থব্যয়ে দুঃস্থ জমিদারের ভরণ পোষণ এবং জমিদারী পরিচালনা করিতে গিয়া অধিকাংশ স্থলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কয়েক ক্ষেত্রে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছিল, বর্ত্তমান গ্রন্থের যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সন ১৩১৬ সাল হইতে মণিপুর রাজ্যের বিখ্যাত বীর টিকেন্দ্র সিংএর পুত্র মহারাজকুমার ভদ্রজিৎ

The Manager is to be appointed by me subject to the approval of the Trustees.

The Manager frames the budget which has to be sanctioned by the Board. I am to receive a minimum sum of Rs 3,00,000/- a year to meet my household expenses and I am to get the surplus of the income at the end of the years.

Three years have already passed, and in my opinion although the estate has gained efficiency there has been enormous cost in the management.

The collieries which were hithertofore under my *khas* management are now being managed by Messrs Gillanders Arbuthnot & Co. and these are being run at a far greater cost than before which appreciably reduces the income.

I have been trying to have a crore and twenty five lacs of rupees to clear the debenture loan as well as some outstanding unsecured debts.

I have corresponded with Messrs G. A. & Co if they would accept the money now and in reply I was told to disclose the name of the party that would advance the loan and to make a deposit of one

আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে, আপনাদের সকল সরিকের সকল প্রকারের দেনার একটী বহুকালব্যাপী কিস্তীবন্দী করিয়া এই এষ্টেটকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব, আপনারা সকল সরিকে মিলিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে কাশিমবাজার রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই নিষ্পত্তি সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হউন।

তৃতীয় প্রস্তাব এবং আমার বিশেষ করিয়া অনুরোধ যে, মুর্শিদাবাদ জেলার এই প্রাচীন জমীদার ঘরটীকে আপনারা রক্ষা করুন। * * *

সিং, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কাশিমবাজার 'গোলাবাড়ী'তে দীর্ঘকাল অবস্থান করার পর মহারাজ তাঁহাকে কলিকাতার সারকুলার রোডের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

উক্ত মহারাজকুমার বিশেষ বিপন্ন হইয়া মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত দীর্ঘকাল নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। বনয়ারীবাদ এষ্টেট্, পশুপতি বসু এষ্টেট্, সর্ব্বাধিকারী এষ্টেট, উলার বাবুদের এষ্টেট, রাণাঘাট হেমেন্দ্র পাল চৌধুরী এষ্টেট ইত্যাদি বহু এষ্টেটের রক্ষাকল্পে ট্রাষ্টি হইয়া মহারাজ নিজের এষ্টেটকে জড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহারাজের মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়াতে কোনও কোনও এষ্টেট রক্ষা পাইয়া গেল বটে কিন্তু এমনি অদৃষ্টের ফের যে, শেষ বয়সে তাঁহাকেই

---

tenth of the money with them for the fulfilment of his obligation if the Home Trustees agree to accept the repayments on such terms on payment of premiums as they would think reasonable.

Considering the present rate of exchange the rate of interest has practically come down to Rs 5-10-0 so I intend to raise present loan at an interest not exceeding 5%.

I have been advised that I can cancel the Managing Agency of the collieries on six months notice and may place the management of the same together with colliery-zemindery property in the hands of the party who would advance the loan. So that the interest and principal may be realised from the income of the said collieries and the colliery-zemindery. The debt will be thus automatically wiped off within a specified period. The rest of the properteis although to be kept under mortgage will remain under my management on such terms as may be arranged between the parties.

I shall be much obliged if you would kindly help me in the matter.

I may send my representative conversant with all the details of working for your further enlightenment. With kind regards,

I remain
Yours sincerely
Manindra Chandra Nandy.

নিজের এষ্টেটকে পরের কর্ত্তৃত্বাধীনে দিতে হইল। পরের বোঝা তিনি সানন্দে আজীবন বহিয়া আসিলেন—কিন্তু জীবনের সন্ধ্যা কালে তাঁহার নিজের বোঝা এমনি দুর্ভর হইয়া উঠিল যে, তাহা বহন করিবার ভার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের উপর দিতে হইল। ইহাই অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস!

এই দুরবস্থার মধ্যেও মহারাজ পূর্ব্বের ন্যায় নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিদ্যালয়কে মাসিক ১৭৫৲টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্যাপারেও অল্পাধিক খরচ হইতে লাগিল।

গভর্ণর লর্ড লিটনের সহিত মহারাজের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ আপন আপন প্রতিকৃতি (ফটো) বিনিময় হইয়াছিল। ১৭ই জানুয়ারী পত্নী সমভিব্যাহারে লাট সাহেবের আগমন উপলক্ষে কাশিমবাজারে উৎসব হইল। এই উৎসবে জেমো কাঁদির কুমার শরদিন্দুনাথ রায়ের আট নয় বৎসর বয়স্ক পৌত্রের তবলা বাজনা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

২রা মার্চ্চ বুধবার হইতে ১৭ই মার্চ্চ (১৯২৭) সোমবার পর্য্যন্ত "নারী-শিক্ষা সমিতি"র শিল্পপ্রদর্শনী খুলিবার জন্য মহারাজ তাঁহার কলিকাতা বাড়ীর ড্রয়িং রুম ও প্রাঙ্গণ আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নীকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই দুরবস্থার মধ্যেও মহারাজ রামরাজাতলা শঙ্কর মঠের গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যকল্পে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ২০০৲ টাকা দান করিলেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সুবিখ্যাত পুস্তক প্রণয়ন করিতে রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন—তাহারই মর্য্যাদা স্বরূপ মহারাজ তাঁহাকে ১০৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দিতেন।

বিপুল ঋণজালে জড়িত হইয়াও শিক্ষাবিষয়ে মহারাজের যে কতখানি অনুরাগ ছিল,—নিজে বিব্রত হইয়াও দেশবাসীকে শিক্ষার

উন্নত করিতে গিয়া তিনি যে নিজের স্বার্থের দিকে দৃক্‌পাতও করিতেন না, নিম্নের পত্রখানিই তাহার প্রমাণ।

Swami Satyananda Giri & Others
Bramhacharjya Bidyalaya,
Ranchi.

Kasimbazar Rajbari
March, 8, 1927.

নারায়ণ স্মরণান্তর,

আপনার সুদীর্ঘ পত্র অদ্য প্রাতে প্রাপ্ত হইলাম। পত্রোত্তর এক্ষণে দিতে পারিলাম না। কেন না পত্রের উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিলাম না। মহারাজ কাশিমবাজারের অন্য আয় কিছু না থাকিলেও তাঁহার এষ্টেট হইতে বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের সাহায্য বাৎসরিক ১২০০০৲ বার হাজার টাকা না পাইবার কোনও কারণ দেখা যায় না। অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় যদি বাৎসরিক বার হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি করিতে পারেন এবং এই আয় সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে আরও অধিক টাকা সংগ্রহ করেন তাহা হইলে উক্ত বিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধনের যথেষ্ট উপায় হইতে পারিবে। এক্ষেত্রে আপনাদের মনে কিসের আশঙ্কা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। উক্ত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের accomodation সম্বন্ধে আপনাদের কোনরূপ সন্দিহান হইবার কারণও বুঝিতেছি না। যে বাড়ীতে আছেন, সে বাড়ী হইতে উচ্ছেদের কোনও আশঙ্কা নাই। কাশিমবাজার রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার সাহেব যদি কিছু ভাড়ার দাবী করেন, তাহা হইলে সে টাকা আমি দিতে পারিব। সুতরাং স্কুলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বরদিগের এবং কর্ম্মীদের মনে কি কারণে অন্যরূপ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

উক্ত বিদ্যালয়কে চিরস্থায়ী করিবার জন্য যদি কোনরূপ টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার কোনও আপত্তি করিবার কারণ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া যদি তাঁহারা স্বাধীনভাবে তাঁহাদের পছন্দমত একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি বিশেষ সুখী হইব। তাঁহাদের

সহিত কবে দেখা করিতে পারিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আগামী বৈশাখ মাসে দেখা করিবার ইচ্ছা করিতেছি, ভগবান তাহা কার্য্যে কতদিনে পরিণত করিবেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে এবং আপনাদের সহিত আলোচনা না করিলে আলোচ্য বিষয়ের সদুত্তর দিতে পারিব না। ইতি * * *

ইংরাজি ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের (Bengal Legislative Council) নির্ব্বাচনে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইংরাজি ১৯২৬ সালের আগষ্ট "সেসন"এর পর আবার নূতন নির্ব্বাচনের সময় উপস্থিত হইলে—শ্রীশচন্দ্র পুনরায় মুর্শিদাবাদ জেলার অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন—ভোট দাতাগণের নিকট ইংরাজি ১৯২৬ সালের ৮ই নভেম্বর বহরমপুর বাঁধা ঘাটের বিরাট জনসভায় শ্রীশচন্দ্র ঘোষণা করিলেন—

"আমি প্রজার অকল্যাণকর কোন প্রস্তাবে ভোট দিব না, সর্ব্বদা প্রজাসাধারণের হিতের জন্য কাউন্সিলে যত্নবান্ থাকিব। যদি কোনও দিন আমি আমার এ দায়িত্বের অপব্যবহার করি—আমি সেই দিনই আমার সদস্য পদে ইস্তফা দিব। দেশের কল্যাণকল্পে আমার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইব না—অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা যুদ্ধ করিব—তা' সে আমলাতন্ত্রই হউক আর যে তন্ত্রই হউক।"

ইংরাজি ১৯২৫ সালে মহারাজকুমারের নির্ব্বাচনপ্রসঙ্গে বাঙ্গলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন—

"কাশিমবাজার রাজপরিবারের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই।—মুর্শিদাবাদ হইতে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে পারৎপক্ষে আমরা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাইব না। শ্রীশচন্দ্রও যেন আমাদের পক্ষে থাকিয়া কাউন্সিলের কাজ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।"

বিগত কাউন্সিলে সর্ব্বসমেত ৮৭টি অধিবেশনের মধ্যে মহারাজকুমার ৮২টি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন * এবং যথাসাধ্য দেশের কল্যাণকর কার্য্যে ভোট দিয়াছিলেন—তত্রাচ স্বরাজ্য দল তাঁহাদের পক্ষ হইতে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গুপ্তকে শ্রীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলেন।

মহারাজকুমারের সেই নির্ব্বাচন ব্যাপারে বর্ত্তমান লেখক প্রচার বিভাগের ভার লইয়া কিছুদিন কাশিমবাজার রাজবাটীতে বাস করিতেছিলেন। মহারাজ নির্ব্বাচন ব্যাপারে অযথা ব্যয়বাহুল্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, প্রতিপক্ষ নির্ব্বাচন-প্রার্থনা প্রত্যাহার করিলে মহারাজবাহাদুর বহরমপুর সহরে গঙ্গাজলের কলের জন্য ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। স্বরাজ্য দলের কয়েকজন নেতা বহরমপুর আসিলে—মহারাজ তাঁহার প্রতিনিধি পাঠাইয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলেন কিন্তু তাঁহারা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করায় অগত্যা মহারাজ বাহাদুরকে কংগ্রেসসম্পর্কিত স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইতে হয়। মহারাজকুমারের নির্ব্বাচনসংক্রান্ত অফিস পরিচালন—তাহার কাগজ পত্র রাখিবার পদ্ধতি, লোকজনের দৈনন্দিন কার্য্যসূচী প্রস্তুত ও তাহার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কাজ মহারাজ নিজে করিতেন। সে সময় তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, মন্ত্রগুপ্তি সহকারে সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাচনব্যাপার পরিচালনা করিবার দক্ষতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি।

মহারাজকুমার বিগত কাউন্সিলে কোনও উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কার্য্য করেন নাই—এই অজুহাতে প্রতিপক্ষ দলের প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল বটে কিন্তু মহারাজকুমারের তরফ

---

* Council sat eightyseven days, you were absent in five—Secretary, Bengal Council. 11. 11. 26.
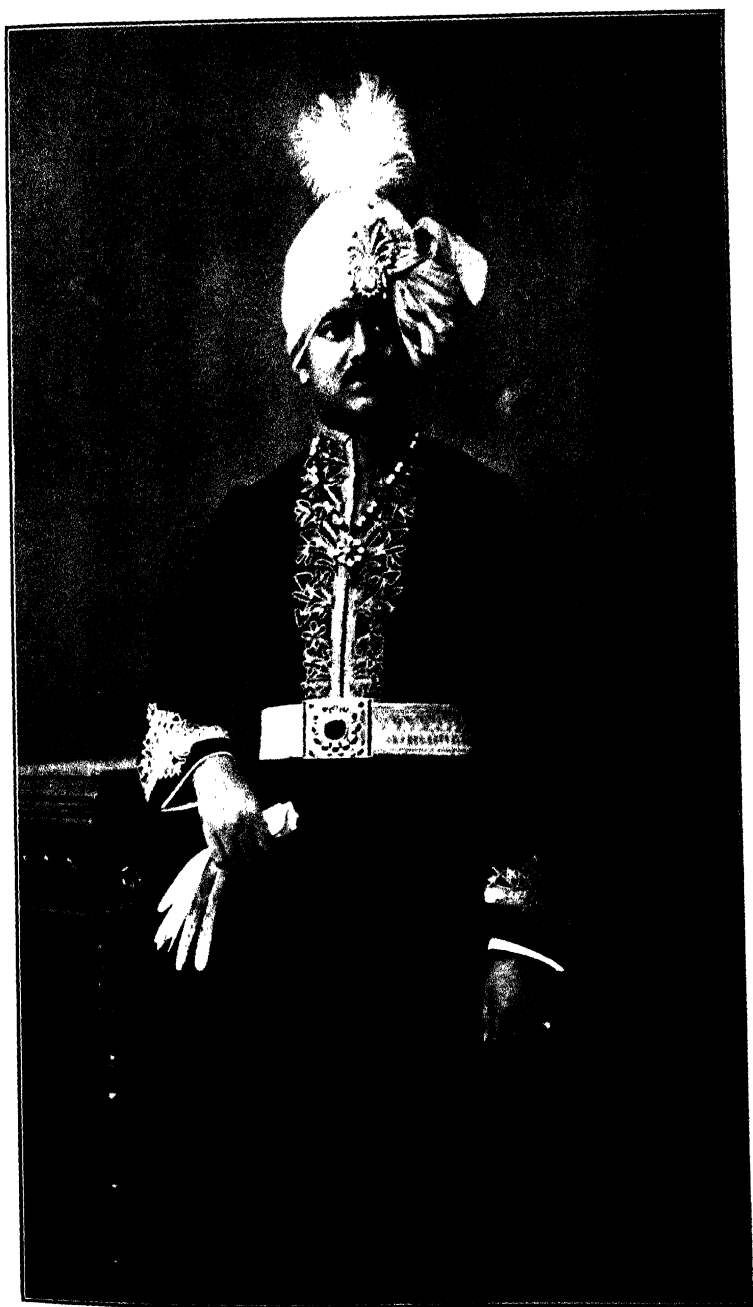
মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম্-এ. এম্-এল্-সি.

হইতে বলিবার কথা অনেক ছিল,তন্মধ্যে মহারাজ বাহাদুরের উপদেশমত মহারাজকুমারের কাউন্সিলসংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্য্যসমূহের উল্লেখ ও প্রচার তাঁহার নির্ব্বাচনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল—;

(১) অর্ডিন্যান্স আইন সম্পূর্ণভাবে নাকচের প্রস্তাবে (মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র) ভোট দিয়াছিলেন। (১১-১২-২৫)

(২) মন্ত্রীবেতনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন— (২৬-৮-২৪)

(৩) মন্ত্রীগণের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিবার (no confidence) জন্য কাউন্সিলের কাজ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব উঠিলে তিনি স্বরাজ্যদলের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধেই ভোট দিয়াছিলেন— (২০-৮-২৪)

(৪) কাশিমবাজার এষ্টেটের কলিকাতার ঘরভাড়া বাবদ বাৎসরিক আয় প্রায় লক্ষ টাকা—তৎসত্ত্বেও মহারাজকুমার কলিকাতা ঘরভাড়া আইনের (Calcutta Rent Act Bill.) সময়বৃদ্ধির পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। (১৯-২-২৪)

(৫) পুলিসের খরচ বাবদ ২৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "The police expenses are as inflated as ever against popular clamours. The pampered police is to absorb the largest portion of the revenue."

(১-৩-২৬)

পুলিস বিল্ডিংয়ের জন্য ১৬ ক্রোর টাকা মঞ্জুরের কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "Rs 16 Crores are provided in 2 years out of loan funds for police buildings. Magnificent mansions for the police ! How beautiful they look ! But what a contrast to the wretched dwelling house of the average taxpayer of the province." (১-৩-২৬)

পুলিসের 'উপরি' কার্য্যের জন্য ৮,৯০,০০০৲ টাকা। গুপ্তচর বিভাগের জন্য ৩৫০,০০০—টাকা, গভর্ণমেণ্ট হাউস ও রাইটার্স বিল্ডিংস্এর জন্য ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী চাহিলে তিনি সে সমস্তের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

(২০-২-২৫) (২৬-২-২৬)

(৬) হাওড়া সেতুসংস্কারে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যয় বন্ধ করিবার জন্য তিনি দেশের পক্ষেই ভোট দিয়াছিলেন।

(৭) তিনি হজ যাত্রীর স্থবিধার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

(৮) জাতিগঠন-বিভাগে উপযুক্ত অর্থের বরাদ্দ করার প্রস্তাবে—তাঁহার বক্তৃতা পড়িলেই তাঁহার স্বাদেশিকতা বুঝা যাইবে। (২৬-২-২৫)

(৯) গত তিন বৎসর তিনি কাউন্সিলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন।—এই কমিটিতে তাঁহার রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের বিষয় আলোচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১০) প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস কমিটীর তিনিই একমাত্র হিন্দু সদস্য ছিলেন।

(১১) শিল্পশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা, এবং উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাবে তিনি জনসাধারণের পক্ষে ভোট দিয়াছেন ও অনেক বিষয়ে তিনি নিজেই প্রস্তাব করিয়াছেন। (২৬-২-২৫)

(১২) ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গলার স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে উপস্থাপিত অধিকাংশ প্রস্তাব ও প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন তাঁহারই। (২৬-২-২৫)

(১৩) শিশু ও মাতৃমঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রস্তাব তাঁহার। (১-৩-২৬)

(১৪) দরিদ্র শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব তাঁহার। (১-৩-২৬)

(১৫) নানাবিধ রোগে আক্রান্ত দেশবাসীর চিকিৎসার স্থবিধার জন্য দেশে বহুসংখ্যক মেডিকেল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব তিনি নিজে করিয়াছেন এবং অন্যের প্রস্তাবে তিনি দেশের পক্ষেই ভোট দিয়াছেন।

(১৬) গবাদি পশুসংরক্ষণ প্রস্তাবে ভোট দিয়া তিনি হিন্দুর মান রক্ষা করিয়াছেন। (১৭-৮-২৬)

(১৭) কৃষির ফলন বাড়াইবার জন্য সরকার হইতে যাহাতে ভাল বীজ দরিদ্র প্রজাদের সরবরাহ করা হয় তাহার জন্য এবং পল্লীরক্ষাকল্পে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য ব্রতীদল (Boy Scout) গঠন ও তাহার উন্নতিকল্পে মহারাজকুমারের সরকারী সাহায্য আদায় করিবার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

(১৮) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুণ অর্থসঙ্কটে সরকারী সাহায্য যাহাতে প্রচুর ও স্থায়ী হয় তাহার জন্য তাঁহার চেষ্টা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের কাছেই গৌরবের কথা।

(১৯) বহরমপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীগণের প্রতি দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার নির্ভীক উক্তি বিশেষ শ্লাঘার বিষয়।

(২০) নির্ব্বাচন ব্যাপারে মহিলাগণের ভোট দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবে তাঁহার সহযোগিতা তাঁহার উদারতার পরিচায়ক।

(২১) তাঁহারই চেষ্টায় বহরমপুরে চিকিৎসা-বিদ্যালয় (Medical School) স্থাপনের ব্যবস্থা, কান্দীতে সেতু নির্ম্মাণ ও জিয়াগঞ্জের মহিলা হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(২২) কিরূপে সংরক্ষিত বিভাগের (Reserved department) ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া জাতিগঠনের জন্ম হস্তান্তরিত বিভাগের (Transfered Department) বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টাতেই তাঁহার গঠন কার্য্যের প্রতি আস্থা ও দেশপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে।

মার্চ্চ সেসন (১৯২৫) ও আগষ্ট সেসন (১৯২৬)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কাউন্সিল-নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই যে ফতোয়া বাহির করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে—"যে সব উপায়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং শিক্ষা-বিস্তার, দেশের অর্থনৈতিক, কৃষিসম্পর্কিত, শিল্পসংশ্লিষ্ট ও ব্যবসায়গত উন্নতি সাধিত হইতে পারে সে সব উপায়ের জন্ম প্রস্তাব ও আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিতে হইবে।"

মহারাজের সদুপদেশে অনুপ্রাণিত মহারাজকুমার—"জাতীয় জীবনের উন্নতি" সাধনের অনুকূল প্রস্তাবে বরাবরই ভোট দিয়া আসিয়াছিলেন, তত্রাচ স্বরাজ্যদল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ বিশেষ দুঃখ করিয়া বলিতেন—"আমরা কি কংগ্রেস ছাড়া?"

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—"কংগ্রেস যেন আমাদের পক্ষে একটা বনিয়াদি চাল হইয়া না দাঁড়ায়। * * * কেবল প্রাচীন ও বিরাট প্রতিষ্ঠান বলিয়াই যে ইহার সিদ্ধান্তের সহিত মতের অমিল হইলেও তাহা মানিয়া লইতে হইবে ইহা আমার অভিমত নহে। অধিকাংশের মতকে (যেমন আজ কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের সভ্যই অধিকাংশ) নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে। * * *

গণতন্ত্রতার অর্থ এরূপ নহে যে দেশবাসী তাহা মেষবৎ ব্যবহার করিবে। গণতন্ত্রতায় প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত মত ও কাজের স্বাধীনতা সতর্কতার সহিত রক্ষা করা হয়। * * * কংগ্রেসে যাঁহারা অল্পসংখ্যক, তাঁহারা যদি কংগ্রেসের নামে কাজ না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াও বহু মতের বিরুদ্ধে কাজ করিবার সঙ্গত অধিকার তাঁহাদের আছে।"

লালা লাজপৎ রায় বলিয়াছিলেন—"দেশের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার জন্য কাউন্সিল এবং এসেম্ব্লীতে সেই সব লোকদেরই পাঠান উচিত, যাঁহারা সত্য সত্যই কাউন্সিলের কাজে আস্থাবান এবং হিন্দুর স্বার্থে আঘাত পড়িলে যাঁহারা তাহার প্রতিকার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।"

কংগ্রেস নেতাগণের এই নীতি অবলম্বন করিয়াই মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব পরিচালিত হইয়াছিল। ২৬শে নভেম্বর (১৯২৬) তারিখে ২২৫৬ ভোট বেশী পাইয়া মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই বৎসরের প্রথম হইতে মহারাজ বিষম জ্বর ও যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে facial paralysis হইয়া মহারাজ কষ্ট পাইতে লাগিলেন। চিকিৎসাসম্বন্ধে চিরদিনের মত এবারও হতশ্রদ্ধ হইয়া মহারাজ ঔষধ সেবনে আপত্তি করিলেন—সেক তাপ দেওয়া হইতে লাগিল, কিছুতেই উপশম হইল না, শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, পা অল্পাধিক ফুলিয়া গেল। সেই অবস্থায় মোটর যোগে বেলডাঙ্গা দাতব্য চিকিৎসালয় গৃহের প্রতিষ্ঠা উৎসবে হাজি ইউসুফ মিঞার অনুরোধে মোটর যোগে বাদলের মধ্যেও মহারাজ বেলডাঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। সাঁটুইএর 'চট্টরাজ' মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়া কাশিমবাজার ফিরিয়া আসার কয়েক দিন পরেই চৈত্র

সংক্রান্তি উপলক্ষে হরিদ্বার কুম্ভমেলা যাইবার জন্য মহারাজ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না—কোন চিকিৎসকও সঙ্গে লইলেন না,—বলিলেন,—পশ্চিমের হাওয়ায় সব রোগ সারিয়া যাইবে। মার্চ্চ মাসে হরিদ্বারের পথে বৃন্দাবন যাত্রা করা হইল। *

সন ১৩৩৪ সালের কথা—

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে মহারাজবাহাদুর তাঁহার কাশিমবাজারস্থিত "সত্যরত্ন প্রেস"কে সুসংস্কৃত করিয়া নূতনভাবে পরিচালনা করিবার জন্য গ্রন্থকারকে উক্ত ছাপাখানার ম্যানেজার বা কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। সৈদাবাদে মহারাজের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র যে বাড়ীতে বাস করিতেন—সেই বৃহৎ বাড়ীখানি সাজসরঞ্জাম সমেত গ্রন্থকারকে সপরিবারে বাস করিবার জন্য দেওয়া হইল। কোনও প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা যাহাতে না হয় মহারাজের অনুগ্রহে তাহার সকল ব্যবস্থাই হইয়া গেল। নবনিযুক্ত ম্যানেজারের প্রস্তাব অনুযায়ী নূতন টাইপ ক্রয় করা হইল—কাশিমবাজার হইতে খাগড়ায় তারণ মণ্ডলের দরুণ "মণীন্দ্র বাবুর" আদি বাড়ীতে উক্ত ছাপাখানাটি স্থানান্তরিত হইল। সম্পূর্ণ নূতনভাবে ছাপাখানার কাজ কর্ম্ম চলিতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যেই ছাপাখানার পরিচালন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে চিফসেক্রেটারী হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, এষ্টেট্ ইনজিনিয়ার কবিবর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বন্ধুবর গোপিকাকান্ত দে, শ্রদ্ধাস্পদ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী প্রভৃতির উদ্যোগে এবং মহারাজের আনুকূল্যে বর্ত্তমান লেখককে সম্পাদক করিয়া "স্বদেশ" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার আয়োজন করা হয় কিন্তু লেখক হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় বহরমপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হন—প্রেসের অন্য ব্যবস্থা

* পরিশিষ্টের ৬০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "হরিদ্বারের পথে" দ্রষ্টব্য।

করিতে হয় এবং উক্ত পত্রিকা প্রকাশের আয়োজনও বিফল হইয়া যায়।

ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যেও মহারাজের যথাসাধ্য দান ও কর্ম্ম-ব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া যায়।

৩রা আষাঢ় কলিকাতায় শ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন-মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন এবং ৪ঠা আষাঢ় উক্ত উৎসব সম্পর্কীয় প্রদর্শনী ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মহারাজ ১০০৲ টাকা দান করিলেন—এবং স্বয়ং তথায় উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব সাধন করিলেন। জিয়াগঞ্জ এডোয়ার্ড্ করোনেশন ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রাচীর নির্ম্মাণের জন্য স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট নিজে আর্থিক সাহায্য পাঠাইয়া দিলেন।

ভাদ্রমাসে পাবনা হিমাইতপুরস্থিত 'সৎসঙ্গ' আশ্রমে সেখানকার সাংবৎসরিক অধিবেশন ও উৎসবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য মহারাজ বাহাদুর আমন্ত্রিত হইলেন। সেখানে মহারাজের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হইল—উৎসব-সভায় মহারাজ—"তপোবনের আদর্শ" সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ্চ) লর্ড এস, পি, সিংহকে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে বিশেষ সমারোহে "গার্ডেন পার্টি" দেওয়া হইল। মিস্ ক্যাথারিন মেও'র 'মাদার ইণ্ডিয়া' * নামক বিদ্বেষমূলক ঘৃণিত পুস্তক

---

* Mrs. R. Sinha
Berhampur

Saidadad Rajbari
10. 9. 27.

Dear Madam,

* * I have every sympathy with the object of the meeting protesting against such false and malicious allegations as are published in Miss Catharine Mayo's "Mother India." You can take the name of the Maharanee when you propose the resolution and I heartily accord my consent to it. * * *

প্রকাশের বিরুদ্ধে আহূত প্রতিবাদ সভায় মহারাজ বাহাদুর নিজের যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন।

মানসিক অশান্তির উপর আশ্বিন মাস হইতেই মহারাজের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। নানাবিধ ব্যাধি আসিয়া শরীরে আশ্রয় করিতে লাগিল।—কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর উঠিয়া দাঁড়াইতে কষ্ট হয়, প্রস্রাবের দোষ দেখা দিয়াছে, হাতের আঙ্গুলগুলিতে তেমন বল পান না। কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিকের চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

এ সময় বধূরাণীর শরীরও খুব অসুস্থ, তিনি অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইল, মহারাজেরও শরীর অসুস্থ—এই কারণে ২৫শে আশ্বিন সপরিবারে মহারাজ রাঁচি যাত্রা করিলেন।

রাঁচিতে আসিয়া মহারাজ সুস্থতা বোধ করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়াও তাঁহার বিশ্রাম নাই। কার্ত্তিক মাসে রাঁচির "আদর্শ সরস্বতী বিদ্যালয়" পরিদর্শনকালে কর্ত্তৃপক্ষগণ মহারাজকে বিশেষভাবে সংবর্দ্ধিত করিলেন। পৌষ মাসে পাটনা—রাজগীর যাত্রা করা হইল। রাঁচি হইতে রাজগীর ২১৩ মাইল। ছয় সাতখানি মোটর করিয়া সপরিবারে দীর্ঘপথ অতিবাহন করিয়া মহারাজ রাজগীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া মহারাজ শরীরে অনেকটা বল পাইলেন—দুই বেলা খুব বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শন এখানে পর্য্যাপ্ত আছে—মহারাজ সেই সকল দেখিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া গয়ায় পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করিয়া কিউলের পথে মাঘ মাসে কাশিমবাজার ফিরিয়া আসিলেন।—এ ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া মহারাজের কর্ম্মব্যস্ত অনলস জীবনযাপনের পরিচয় পাওয়া যায়।—রাঁচি হইতে ফিরিয়াই মহারাজ বগুড়া জেলার হিলি সহরে হিন্দু-মিশন কর্ত্তৃক

অনুষ্ঠিত গৌরাঙ্গ সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার ভার লইলেন।

৩রা ফাল্গুন কল্যাণীয়া শ্রীমতী অণিমাপ্রভার (বর্ত্তমান মহারাজ-কুমারী) * হাতে আঘাত লাগাতে—মহারাজ নিজে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন ও মেডিকেল কলেজের প্রথম সার্জ্জেন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ করনাল্‌ ষ্টীন সাহেবকে দেখাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মহারাজপৌত্রী আরোগ্য লাভ করিলেন।

ফাল্গুনমাসে বহরমপুরে লর্ড সিংহের মৃত্যু এ বৎসরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লর্ড সিংহের পুত্র অনারেবল্‌ সুশীলচন্দ্র সিংহ সে সময় বহরমপুরের জেলা-জজ্‌। তাঁহারই বাড়ীতে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটে। রাত্রে আহারাদির পর লর্ড সিংহ নিদ্রা যান, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার ঘর খুলিয়া দেখা গেল তিনি মৃত অবস্থায় শয্যার উপরে শায়িত রহিয়াছেন। মহারাজ-কুমার শ্রীশচন্দ্রের পত্রে মহারাজ হিলিতে গৌরাঙ্গ সম্মিলনীর অধিবেশন সভায় এই মৃত্যুসংবাদ পান। লর্ড সিংহের মৃত্যুতে তিনি একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে হারাইয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া লিখিতেছেন ;—

---

* গত ২৮শে আষাঢ়, সন ১৩৩৬ সাল, মঙ্গলবার কলিকাতা হরিঘোষ ষ্ট্রীট-নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বর্গীয় প্রহ্লাদচন্দ্র পাল মহাশয়ের পৌত্র এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ পালের সহিত মহারাজকুমারী অণিমাপ্রভার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে বরপক্ষ মাঙ্গলিক হরিদ্রা 'এরোপ্লেন' যোগে কাশিমবাজাররাজ বাড়ীতে পাঠাইয়া ছিলেন। প্রায় সহস্রাধিক বরযাত্রী দুইখানি স্পেসাল ট্রেণে কাশিমবাজার পৌছিলে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বরকে বিবাহ মণ্ডপে আনা হয়। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্র সেদিন অভ্যাগত ভদ্রলোক, আত্মীয়, কুটুম্ব ও বন্ধুগণকে আদর-আপ্যায়ন ও স্বভাবসুলভ অমায়িকতায় এবং ভূরিভোজনের ব্যবস্থায় এমনি পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন যে সকলেই "যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান" বলিয়া তাঁহাকে এক বাক্যে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পিতামহ মণীন্দ্রচন্দ্র ও পৌত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র

"When presiding over the function of the most crowded meeting at Hilli, I received the sad message from Sris Chandra about sudden death of Lord Sinha, which shocked me terribly. I feel the agony keenly because only a few hours before I had his enjoyable company at Kasimbazar."

সন ১৩৩৫ সালের কথা—

মহারাজের আর্থিক কষ্ট সমান ভাবেই চলিতেছে। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি যে আজ ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারিতেছেন না—ইহাই তাঁহার মানসিক অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ৬ই বৈশাখ তারিখে জনৈক ভদ্রলোককে লিখিত মহারাজের একখানি পত্রে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন দেখিতে পাই।— প্রসঙ্গক্রমে মহারাজ লিখিতেছেন যে জমিদারী ও কলিয়ারী একযোগে তাঁহার এষ্টেটের বার্ষিক আয় ৩২ লক্ষ টাকা—অথচ আজ তাঁহাকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকার মুখ চাহিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে।

এই সময় ইংলণ্ড হইতে পি, সি, রায় চৌধুরী নামক জনৈক ভদ্রলোক আমেরিকা হইতে ঋণ সংগ্রহপূর্ব্বক গিলেণ্ডার কোম্পানীর ঋণশোধ করিয়া দিবার প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু সে প্রস্তাব মহারাজ বাহাদুর ভাল বুঝিতে না পারায় তাঁহাকে সেই মর্ম্মে উত্তর দেন— তাহার পর উক্ত চৌধুরী মহাশয় আর সে বিষয় কোনও উচ্চবাচ্য করেন না।

১০ই বৈশাখ তারিখে কলিকাতা হইতে গোমো প্যাসেঞ্জারে মহারাজ পুরুলিয়া যাত্রা করিলেন। তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় এম-এল-সি মহাশয় মহারাজকে অভিনন্দন প্রদান করিলেন। মহারাজকে সম্মান প্রদর্শন ছাড়া এ অভিনন্দনের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম-এ মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলে—মহারাজ সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন—এমন কি কাশিমবাজারের রাণী সরোজিনী দেবী অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও যাহাতে ভোট দিতে পারেন তদ্বিষয়ে তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুমার শরৎকুমার উক্ত সদস্য-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

পাটনা কলেজের অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহারাজের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি ছয় সাত মাস হইতে পীড়িত শুনিয়া মহারাজ তাঁহার চিকিৎসার সাহায্যার্থে ১০০৲ একশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

বন্ধুবর নলিনাক্ষ সান্ন্যাল সে সময় লণ্ডনে থাকিয়া "অর্থনীতি"তে "ডক্টরেট" উপাধির জন্য অধ্যয়ন করিতেছিলেন ;—এই দুরবস্থার মধ্যেও মহারাজ তাঁহাকে তাঁহার মাসিক সাহায্য নিয়মিত ভাবে পাঠাইতেন। তাঁহাকে লিখিত মহারাজের দুইখানি পত্রে মহারাজের বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহার হিতৈষী বন্ধু বহরমপুরের খ্যাতনামা জমিদার বিষ্ণুচরণ সেনের মৃত্যুতে তিনি যে কি পরিমাণ ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহাও বুঝিতে পারা যায়,—

Nalinaksha Sanyal Esqr.,
112, Gower Street, London. W. C. I.

Kasimbazar
The 21st June 1928.
৭ই আষাঢ়, ৩৫।

প্রিয় নলিনাক্ষ,

তোমার ৩১শে মের পত্র পাইলাম। পত্রখানি আগাগোড়া পড়িলাম। এবার বাংলাদেশের অনেকস্থানে দুর্ভিক্ষ তাহার করাল মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে জলাভাব আসিয়া যোগ দেওয়ায় দেশে মড়ক খুবই হইয়াছিল। কলেরা ও বসন্ত দিন কয়েক খুবই মৃত্যুর বহর বহাইয়াছিল। বর্ষাগমে দেশ একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কমে নাই।

পাশ্চাত্ত্য দেশের উদ্যম ও উৎসাহ সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তোমরা থাকিতে থাকিতে একবার ঐ দেশ ভ্রমণ করিতে পারিলে আনন্দ হইত, কিন্তু এখন আর উপায় নাই। বার্দ্ধক্য ও বিশাল সংসার আর এখন ওসব কথা ভাবিতেই দেয় না।

মধ্যে তোমাদের সাহিত্যসেবার সম্বন্ধে খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম। সুদূর বিলাতেও তোমরা যে বঙ্গভাষার চর্চ্চার জন্য সম্মেলন করিয়াছিলে ইহা বড়ই সুখের বিষয়। যতটা পার স্বতঃপরতঃ দেশের মঙ্গল করিবে। অন্ততঃ চেষ্টা করিবে।

তোমার নিকট পাঠানর জন্য অদ্য ৩০০৲ টাকা কলিকাতার Thomas Cook এর নিকট পাঠাইলাম। আমি মধ্যে দিনকয়েকের জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলাম।

* * *

৺বিষ্ণুবাবুর তিরোভাবে আমি একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়াছি। তাঁহার মত সজ্জন লোক বহরমপুরে খুবই কম আছে। তাঁহার বিরহে খুবই কষ্ট ভোগ করিতেছি।

তোমার শরীর ভাল আছে জানিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। ভগবৎ-কৃপায় আমরা ভাল আছি। তোমার মঙ্গল হউক। ইতি— * * *

ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যালকে লিখিত আর একখানি পত্র—

কাশিমবাজার

ক্ষেমাস্পদেষু্ ২৩ আশ্বিন, ১৩৩৫

তোমার ১২ই সেপ্টেম্বরের পত্র পাইয়া স্বল্প কথায় ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। গ্রীষ্মকালে লেক ডিষ্ট্রিক্টগুলি ঐ সব দেশে দেখিতে অতীব সুন্দর হয় ও তুমি সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছ জানিয়া আনন্দ হইতেছে। * *

হল্যাণ্ডে বিশ্বযুবক-সম্মিলনীতে তুমি যে বক্তৃতা করিয়াছ তাহা আমরা এখানে কাগজে দেখিয়াছি। তুমি যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া কথাগুলি বলিয়াছ, তাহা কি তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া আমাদের হিতসাধন করিবেন, আশা কর?

নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য এখানে একটা চেষ্টা চলিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার ফলাফল কি হইবে তাহা কালের গর্ভে নিহিত। পাশ্চাত্ত্য দেশ সর্ব্ববিষয়ক উন্নতির পথে দ্রুত ধাবিত হইয়াছে। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার মঙ্গলসংবাদে সুখী হইলাম।

পড়াশুনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করিবে। যাহা শিখিতে গিয়াছ তাহা ভাল করিয়া শিখিয়া আসিবে। তোমার পাঠের খরচ ৫০০৲ টাকা আগামী কল্য Thomas Cook এর নিকট পাঠাইব। * * *

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

সন ১৩৩৫ সালের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা—সকলের পক্ষে অতীব আনন্দের কথা—কলিকাতার বাড়ীতে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম। ২০শে ভাদ্র, সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময়, পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। বহু আকাঙ্ক্ষার পর শ্রীশচন্দ্রের পুত্রসন্তান হইয়াছে—কাশিমবাজারের আনন্দ-তুলাল, নয়নানন্দ শিশু পৌত্রের মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ পিতামহের চিন্তাক্লিষ্ট আননে হাসি ফুটিল, সমস্ত রাজপরিবারের মধ্যে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল।

এ বৎসরের মধ্যভাগ হইতে মহারাজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছিল। তিনি কেবল ঋণের উপর ঋণ করিয়া—তুশ্চিন্তা ও অশান্তিতে বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলেন। এদিকে নিজের স্বাস্থ্যও ভাল নয়—জীর্ণজ্বরে ভুগিতেছিলেন বলিয়া পুরীধামে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে ২রা জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্নে কলিকাতা নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা* উপলক্ষে অমৃতলাল বসুর আমন্ত্রণে মহারাজ উহার নেতৃত্ব করিয়া পুনরায় পুরী ফিরিয়া গেলেন। †

---

* পরিশিষ্ট ১৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যাচার্য্য
৩, শ্যামস্কোয়ার, কলিকাতা।

পুরী
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৮

মহাত্মন্,

আপনার ৪ঠা ডিসেম্বরের পত্র পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। গিরিশ স্মৃতি সমিতির কার্য্যকরী সভা উক্ত মহাকবির মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামী ১৪ই ডিসেম্বর উক্ত কার্য্যের দিন স্থির করার অভিপ্রায় করিয়াছেন। এ কারণ আমি উক্ত সভাকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

পুরী অবস্থান কালে অগ্রহায়ণ মাস হইতে মহারাজের দৈহিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। সমুদ্রতীরস্থিত চক্রতীর্থ হইতে পায়ে হাঁটিয়া একদিন তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যান। এই পরিশ্রমে তাঁহার 'হার্টে'র অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়ে। সমুদ্র-তীরস্থিত নিজ বাড়ীতে কোনও প্রকারে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। সেদিন আর উত্থান-শক্তি ছিল না। মহারাজের 'হার্টে'র 'প্যাল্‌পিটেশন' বৃদ্ধি পাইল—প্রস্রাবের দোষ বৃদ্ধি হইল—ডাঃ অজিত বাবুর ঔষধ ছাড়িয়া মহারাজ ২০শে অগ্রহায়ণ পুরীর কবিরাজ মাগ্‌লী মিশ্রের ঔষধ সেবন আরম্ভ করিলেন। এই অবস্থার মধ্যেও তিনি দিবারাত্র পৌত্রের অন্নপ্রাশনের কথা ভাবিতে-ছিলেন—উক্ত উৎসব উপলক্ষে কোথা হইতে কোন্ দ্রব্য খরিদ করিতে হইবে—সে বিষয় কাশিমবাজারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণকে উপদেশ দিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অনেকটা সুস্থ হইবার পর—১০ই মাঘ পুরীর রাজার সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ হইল। তিনি মহারাজের সম্মানার্থ বহু রকমের আচার, বড়ি, লাড়ু ও নানাবিধ মিষ্টান্ন তাঁহাকে উপহার পাঠাইলেন।

—১৩ই মাঘ তারিখে মহারাজ সপরিবারে কাশিমবাজার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—নবকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্রের শুভ অন্নপ্রাশন মহা সমারোহে ৯ই ফাল্গুন সম্পন্ন হইল।

আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় ঐ দিনে ঐ কার্য্য সমাধা করিতে পারিব না। আর এক সপ্তাহ সময় দিলে আমি ঐ কার্য্য করিতে সক্ষম হইব এইরূপ আশা-করি। যদি আপনাদের সময় দিবার আপত্তি না থাকে তবে দিন ধার্য্য করিয়া আমাকে সংবাদ দিলে আমি ঐ সময়ে কলিকাতা যাইয়া ঐ কার্য্য সমাধা করিব। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের একটু সেবা করিতে পারিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। ইতি— * * *

অন্নপ্রাশনের সময় মহারাজ যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন —তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। নগ্ন পদে—সমগ্র রাজবাড়ীর উপর নীচ করিয়া সকল প্রকার ব্যবস্থার পর্য্যবেক্ষণ, কখনও কখনও নিজের হাতে আহারের স্থান করা, সর্ব্বশেষে চাকর-বাকর ও পরিবেশকদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া যাইত। কোনও দিন যদি বা এক আধ ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ পাইতেন—রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই আবার অফিস-কামরার সম্মুখের বারান্দায় মহারাজের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যাইত—তিনি একে একে সকলকে জাগাইয়া পুনরায় আগত দিনের কার্য্যসূচী ঠিক করিতে বসিতেন।

এই শুভ কার্য্য শেষ হইবার পরই আবার তিনি "বেবি সো" (Baby show) ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

সন ১৩৩৬ সালের কথা—

২০শে আষাঢ় হইতে মহারাজের ভাগিনেয় হেমন্তকুমার নন্দীর অসুস্থতা খুব বৃদ্ধি পায়। অনেক দিন হইতেই তিনি ভুগিতেছিলেন। মহারাজের নিকট সৈদাবাদ রাজবাটীতেই তিনি শয্যাগত অবস্থায় ছিলেন। দৈনিক জ্বর ১০৩° ডিগ্রী, প্রস্রাববন্ধ সহ নানাবিধ উপসর্গ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে "কটেজ" ভাড়া করিয়া সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারা গেল না। শ্রাবণ মাসেই তিনি রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

সৈদাবাদ 'স্বর্ণময়ী এসোসিয়েশন্' একটি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান। রোগীর শুশ্রূষা, অনাথের সাহায্য, সাহিত্যচর্চ্চা, ব্যায়াম শিক্ষা প্রভৃতি যুবকগণের আত্মোন্নতিমূলক কার্য্যকারী এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র।

বর্ত্তমান বর্ষে তাহার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য মহারাজ রায় বাহাদুর জলধর সেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সৈদাবাদ আনিয়াছিলেন। ছোট বড় সকল কাজেই তাঁহার এই প্রকার উৎসাহ দেখা যাইত। যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ ও সম্মিলনের জন্য চিন্তাকুল তিনিই আবার স্বর্ণময়ী এসোসিয়েশনের সাংবাৎসরিক অধিবেশনের সৌষ্ঠব সাধনের জন্য যত্নবান! এই প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মীর আদর্শ জগতে বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না।

গিলেণ্ডারস্ কোম্পানীর হাত হইতে কাশিমবাজার এষ্টেট বর্ত্তমান সালে "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস" (Courts of Wards)এর হাতে যায়। মহারাজের মনের অবস্থা ইহাতে আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস"এ এষ্টেট যাওয়ার সময় সম্পত্তির মালিককে "ওয়ার্ড" হিসাবে রাজীনামায় যে সব কথা লিখিয়া দিতে হয় তন্মধ্যে কয়েকটি কথা মহারাজের পক্ষে বিশেষ অপমানজনক সন্দেহ নাই। কারণ অপব্যয় বা অক্ষমতার জন্য ত তাঁহার বিশাল জমিদারী ধ্বংসোন্মুখ হইয়া "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্"এ যায় নাই—তিনি জানিতেন কি উদ্দেশ্যে তিনি অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাই নাম সহি করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি বলিয়াছিলেন—"**আমার ভাগ্যদেবতা আজ আমার সহিত চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ করিয়া লইলেন।** *

---

* চিফ সেক্রেটারী হরেন্দ্রবাবুকে ৬ই চৈত্র তারিখের লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"Court of Wards"এর আইন আমি জানি। যখন Court of Wardsএ আমার সম্পত্তি দিবার কথা হইয়াছিল তখন মেসার্স গিলেণ্ডারস্ কোম্পানীর নিকট যে সম্পত্তি মর্টগেজ আছে তাহাই দিবার কথা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গুপ্ত সাহেব আমার অন্যান্য দেনা পরিশোধের উপায়ের জন্য আমার অন্যান্য সম্পত্তি যাহা আছে তাহাও "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্"এ দিবার কথা বলেন। এক্ষণে সে মতের পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে গিলেণ্ডারস্‌দের অধীন হইয়া জমিদারীর গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম কিন্তু "কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্"এর অধীন হইয়া সেটুকুও যাইতে বসিয়াছে। দোষ কাহারও নাই—দোষ আমার ভাগ্যের এবং বুদ্ধির। যাহা হউক যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে তজ্জন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই।"

মহারাজের অর্থকৃচ্ছ্রতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহারাজ উত্তমর্ণের তাগিদে অস্থির হইয়া পড়িলেন। মান সম্ভ্রম যেন আর রক্ষা করিতে পারেন না এমনই অবস্থা। প্রতিদিন স্বাস্থ্যেরও ভয়াবহ অবনতি ঘটিতে লাগিল। এ সময় মহারাজ যে কি গভীর দুঃখ ও অসহনীয় মর্ম্মপীড়া সহ্য করিতেছিলেন তাহা হরেন্দ্র বাবুকে লিখিত ৯ই, ২৫শে ও ২৯শে শ্রাবণের তিনখানি পত্রে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সৈদাবাদ রাজবাড়ী
১৩৩৬।৯ শ্রাবণ।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় আপনি বলিয়াছিলেন, হাজার পঁচিশ টাকা যোগাড় করিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন। আমিও সেই আশায় এতদিন কাটাইলাম। পাওনাদারদের উত্তেজনায় আর তিষ্ঠাইতে পারিতেছি না। ভগবান্ যে কি মানসিক দুশ্চিন্তায় আমাকে ফেলিয়াছেন তাহা লেখনীদ্বারা জানাইতে পারিতেছি না। অর্থসংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে নতুবা অনেকগুলি প্রাণী অনাহারে মারা যাইবে। এই পত্র লিখিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে। Prestige prestige করিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, তাহা আর রক্ষা করিতে পারিতেছি না। কর্ম্মচারিদিগকে শীঘ্রই বলিতে হইবে—"আপনারা নিজের নিজের চেষ্টা দেখুন, আমি আর আপনাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিব না।" menialsদের তো কথাই নাই, যাও বলিলেই যাইবে। আশ্রিতদের যে কি উপায় হইবে তাহা ভাবিতে পারিতেছি না। * *

সৈদাবাদ রাজবাড়ী
২৫ শ্রাবণ ১৩৩৬

কাশিমবাজার রাজবাড়ীর শুভ পুণ্যাহ গতকল্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। * * *

টাকার তাগাদায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। * * * বাবু গত কল্য পুণ্যাহের সময় লোক পাঠাইয়াছিলেন। অনেক কষ্টে তাঁহাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিয়াছি। মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিংহ লিখিয়াছেন—

"I find that it will be impossible to think of that investment of a crore and twenty five lakhs."

আমি আগামী ২৮শে শ্রাবণ কলিকাতায় যাইব মনে করিতেছি। * *

শ্রীশচন্দ্র, অণিমাপ্রভা, মণীন্দ্রচন্দ্র, সোমেন্দ্রচন্দ্র

কাশিমবাজার রাজবাড়ী
২৯ আশ্বিন। ১৩৩৬

* * * গত সপ্তমী হইতে আমার জ্বর হইয়াছিল, প্রায় শয্যাগত অবস্থায় ছিলাম। মায়ের পূজা পর্য্যন্ত পূজার দালানে থাকিতাম। তৎপর সমস্ত দিনরাত্রি শয্যাশায়ী অবস্থায় কাটাইতাম। আজ দ্বাদশীর দিন অন্নপথ্য করিয়াছি ও ভাল আছি। গতকল্য হইতে মুকুন্দ কবিরাজের ঔষধ খাইতে আরম্ভ করিয়াছি। * * *

মা আনন্দময়ী যে সকলের পক্ষে আনন্দদায়িনী হন না তাহাতো আমি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। * * *। আমি মনে করিতেছি যখন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমাকে স্থানান্তরে যাইতেই হইবে তখন খরচ কমান কিরূপে যাইতে পারে তাহা তথা হইতে স্থির করা যাইবে। আশ্রিত পরিবারদের ভরণ পোষণই বড় কঠিন। তাঁহাদের মেজাজ ছোট করিবার উপায় নাই।

আস্তাবলের ব্যয় কমান বড়ই মুস্কিল। * * *। ইহা ছাড়া হাতীশালা, গোশালা, এমারতখানা রাখিতেই হইবে। বাগান কিছু রাখিতেই হইবে। এই সকল খরচ বজায় রাখিয়া চলিবার একটি হিসাব করিতে হইবে।

Court of Wards এর নিকট কোন প্রত্যাশা আমি রাখি না এবং করাও উচিত নয়। কলিকাতা ছাড়া অন্য কোন স্থানে যাইবার উপায় নাই। কারণ ছেলেদের লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। কলিকাতা Establishment একটী বৃহৎ খরচ হইয়া পড়িয়াছে তাহা আপনি দেখিয়াও দেখিতেছেন না।

প্রতি বৎসর মহালয়ার দিন ৺শিবনারায়ণ স্বামীর স্মৃতিপূজার উদ্দেশে তদীয় প্রধান শিষ্য শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সারাদিন ব্যাপী এক বিরাট হোমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উক্ত দিবসরাত্রিব্যাপী হোমে স্বামীজীর বহু ভক্ত একত্র মিলিত হন। কলিকাতা ও কলিকাতার বাহির হইতে বহু নরনারী এই যজ্ঞক্রিয়া দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন। বহু ভদ্রমহিলা ও ভদ্রসন্তান এই বিরাট হোমে যোগদান করিয়া থাকেন, একথা কলিকাতাবাসী সকলেই অবগত আছেন। এই যজ্ঞ মহারাজ বাহাদুরের কলিকাতাস্থ বাড়ীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

প্রতি বৎসর শারদীয় পূজার ছুটীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বহরমপুর কলেজের ছাত্রগণ একটি সামাজিক উৎসব (Social gathering) করিয়া থাকেন। এই উৎসবে সহরবাসী বহু ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া সম্মিলিত হন। ছাত্রগণের নিকট এই উৎসবটির বিশেষ মূল্য আছে। এই উৎসব ব্যাপারটির সাফল্যের জন্য মহারাজের যত্ন বা উৎসাহের কোনও দিন কোনও ত্রুটি দেখা যায় নাই।—স্থানীয় ব্যাপার সামান্য হইলেও একদিকে যেমন সে বিষয়ে তাঁহার অপরিশ্রান্ত উৎসাহ ছিল নাগরিক জীবনের বৃহত্তর কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতিও তেমনি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তৎকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের নিদর্শন চারিদিকে দেখা দিতে লাগিল। তথাকথিত স্বাধীনতা-প্রিয়তার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার, ব্যক্তিত্বের নামে দাম্ভিকতার ও দেশসেবার নামে সুলভ খ্যাতি অর্জ্জনের নেশা যুবকগণকে মাঝে মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে লাগিল; দেশের কল্যাণ-কর্ম্মে সমর্পিত-প্রাণ মণীন্দ্রচন্দ্র তাহা ভীতিবিহ্বল হৃদয়ে অনুভব করিলেন এবং ২৮শে অক্টোবর তারিখে বহরমপুর গ্র্যাণ্টহলে একটি সাধারণ সভার আহ্বান করিয়া লালগোলার মহারাজ-প্রমুখ জেলার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কর্ত্তব্য আলোচনার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সভার অধিবেশন হইল—আলোচনাও হইল কিন্তু মন্তব্য অনুসারে কার্য্য ও কর্ম্মিগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার ভার যিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন মহাকালের আহ্বানে তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইল।

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি এলাহাবাদ কুম্ভমেলায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভাল দেখিয়া বাড়ী ভাড়া লইবার জন্য এলাহাবাদের রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ১৫ই আশ্বিন পত্রও লেখা হইল। কিন্তু কুম্ভমেলা বসিতে না বসিতে মণীন্দ্রচন্দ্রের ভব-সংসারের মেলা চির দিনের জন্য ভাঙ্গিয়া গেল!

মাসাবধি কাল মহারাজের প্রত্যহ অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল—শরীরও

খুব দুর্ব্বল। কল্যাণীয়া অণিমাপ্রভার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি বহু লোককে পাত্র অন্বেষণ করিতে চিঠি লিখিতে লাগিলেন। আশঙ্কা হইয়াছিল, "দিদিমণির" বিবাহটা বুঝি আর দিয়া যাইতে পারিবেন না।

১৬ই কার্ত্তিক হইতে মহারাজের মৃদু জ্বর ক্রমশঃ প্রবল কম্প জ্বরে পরিণত হইল। দিনে দিনে উত্থানশক্তি প্রায় রহিত হইয়া আসিল। এই অবস্থায় মহারাজ বহরমপুরে আগত "ম্যালেরিয়া কমিশন"কে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সে জ্বরের আর কিছুতেই বিরাম হয় না! কলিকাতায় যাইয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য গৃহ-চিকিৎসকগণ মহারাজকে অনুরোধ জানাইলেন,—মহারাজেরও ইহাতে অমত ছিল না। কিন্তু দৌর্ব্বল্য এতই বৃদ্ধি পাইল যে ২০শে কার্ত্তিক তারিখে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ঐ দিন হইতেই মহারাজের হিক্কা আরম্ভ হইল।

মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র তখন কাশিমবাজারেই ছিলেন। কলিকাতার গৃহচিকিৎসক ডাঃ অজিতবাবুকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে কাশিমবাজার আসিবার জন্য তিনি চিফ সেক্রেটারী হরেন্দ্রবাবুকে কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন। ২৩শে কার্ত্তিক শনিবার মহারাজকে চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনিয়া—ডাঃ স্যর নীলরতন সরকারকে আহ্বান করা হইল। ডাঃ অজিত বাবু দিবারাত্র রাজবাড়ী থাকিতেন, স্যর নীলরতন দিনে রাত্রে যতবার প্রয়োজন হইত ততবার আসিতেন ও চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করিতেন।

ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার পরম যত্নে মহারাজের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। মহারাজের উপর স্যর নীলরতনের যে কিরূপ অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তাহা এই বিপদের সময় বেশ বুঝিতে পারা গেল। মৃত্যু-উন্মুখ মহারাজের রোগশয্যার পার্শ্বে অসময়ের বন্ধুর মত সহাস্য-বদনে স্যর নীলরতন বসিয়া আছেন—সন্ধ্যার পর রাত্রির প্রগাঢ়তা

নামিয়া আসিতেছে—তবু তাঁহার গৃহে ফিরিবার তাড়া নাই;—ধীরে ধীরে বেদানার রস মহারাজের মুখে দিতেছেন আর বিপুল আগ্রহভরে রোগের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করিতেছেন।—এ যেন নির্ব্বাণোন্মুখ গৃহদীপকে প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা।—কিন্তু শুভইচ্ছার সুস্নিগ্ধ স্পর্শকে উপেক্ষা করিয়া, স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা-প্রেম-বন্ধনকে দুই হাতে ছিন্ন করিয়া—প্রাণপাখী কোন দূর দূরান্তের আহ্বানে, কোন উর্দ্ধলোকের পরমালোকের ইঙ্গিতে—দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এ যেন যুগযুগান্তের স্বপ্ন-সৌধ—রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া অনাগত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়াছি—হঠাৎ তাহার আর কোনও অস্তিত্বই রহিল না—রহিল শুধু তীব্র বেদনার অসহনীয় অনুভূতি!—মৃত্যু যে আজ এমনি প্রত্যক্ষ হইয়া বাস্তব জীবনের সমস্ত ধারণাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে, মধ্য রাত্রির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও তাহা কেহ অনুমান করিতে পারে নাই।

সে দিন ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার, ইংরাজি ১২ই নভেম্বর (১৯২৯); —রাত্রি ১টা ২৩ মিনিটের সময় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র মহাপ্রস্থান করিলেন। একমাত্র উত্তরাধিকারী মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রকে বলিয়া গেলেন—"অযথা প্রশংসার জন্য অর্থব্যয় করিও না।"

এমন শান্তিময় মৃত্যু কদাচ কখনও দৃষ্ট হয়।—মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্ব্বে মহারাজ নিজে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিখানি চাহিয়া লইয়া প্রণাম করিলেন। নাভিশ্বাস মাত্র ১০মিনিট ছিল—মৃত্যুর কোন যন্ত্রণাই ছিল না। দুই হাতের কর জপ করিতে করিতে মহারাজ প্রশান্তভাবে ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

"মহারাজ নাই" "বাবা নাই", দাদাম'শায় নাই" নাই, নাই, নাই—'কাশিমবাজার' কথাটি উচ্চারণ করিবামাত্র যাঁহার কথা মনে হইত—'কাশিমবাজার' বলিতে যাঁহাকে বুঝাইত—তিনি আর নাই। ঘরে নাই, বাহিরে নাই,—কর্ম্মক্ষেত্রে নাই,—বিশ্রাম-ভবনে নাই। যাঁহাকে

আমরা আজ ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চাই তাঁহার নশ্বর ভৌতিক দেহটাই পড়িয়া আছে—দেবতার মন্দির শূন্য—দেবতা আজ অন্তর্হিত। মৃত্যু তাঁহার কর্ম্মজীবনের অখণ্ড পরিশ্রান্তির শেষে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে। অখণ্ডনীয় মৃত্যু, অপ্রধৃষ্য তাহার শক্তি, অপ্রমেয় তাহার প্রভাব—অনিবার্য্য তাহার গতি—কোন মুহূর্ত্তে দুর্নিরীক্ষ কোন এক অবকাশে সে আসিয়া এমনি করিয়া অসহায় মানুষের আত্মবিস্মৃতির উপর কঠোর দণ্ডাঘাত করিয়া চলিয়া যায়। স্থান মানে না, কালাকাল বিবেচনা করে না, পাত্রাপাত্র বিচার করে না;—সকাতর প্রার্থনা, সনির্ব্বন্ধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া জীবন-রঙ্গমঞ্চে পরিসমাপ্তির কৃষ্ণ যবনিকা ফেলিয়া দেয়। আজ সংসার-সমরাঙ্গনের যুধ্যমান সৈনিক তাহার প্রতপ্ত ললাটে মৃত্যু-শীতল স্পর্শ অনুভব করিল।—জনসেবার উচ্চাশা, পরদুঃখমোচনের আকাঙ্ক্ষা, স্বজনপ্রতিপালনের উদ্বেগ, আশ্রিতরক্ষণের দুশ্চিন্তা, মান-মর্য্যাদারক্ষার উৎকণ্ঠা—সবই আজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল !

মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রশস্ত ললাটে সে কি অমরত্বের উদ্‌ভাসিত জ্যোতি ! অসীম সমুদ্রের বিশালতা, অনন্ত আকাশের উদারতা, বিজন অরণ্যের স্তব্ধতা নির্জ্জন রাত্রির তন্ময়তা আজ যেন একসঙ্গে মণীন্দ্রচন্দ্রের মুখাবয়বে ছড়াইয়া পড়িয়া মৃত্যুকে এক অনুপম সৌন্দর্য্যে লোকচক্ষে প্রকাশ করিল !

এমনি করিয়া যিনি আপনার বিরাটত্বে মৃত্যুকেও পরাজিত করিয়া গেলেন, মানব-জীবনে তাঁহার সেই মহা তপস্যার আদর্শ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পরম শ্রদ্ধায় অনুসৃত হইবে—অভ্যুত্থানে বিশ্বাসপরায়ণ আমাদের অন্তর আজ এই কথাই বারবার স্মরণ করিতেছে।

মনুষ্যত্বের মহাতাপস

হে মনুষ্যত্বের মহাতাপস!

তোমার জীবনকালের চিরস্মরণীয় পবিত্র স্মৃতি মৃত্যুতে আজ অমর হইয়া রহিল, তাহার পূজার জন্য কোনও আয়োজন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই;—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্যে তোমার অলোকসামান্য চরিত্র, অনন্যসাধারণ জীবনের যে জীবন্ত স্মৃতি—নূতন করিয়া বাঙ্গালী আর তাহার কি উদ্‌যাপন করিবে? তোমার মৃত্যু তোমার চারিদিকে যে অনন্ত অবকাশ রাখিয়া গেল, তাহা আজ সমগ্র জাতিকে নূতন করিয়া তোমাকে চিনিবার সুযোগ দিয়াছে। তোমার পবিত্র স্মৃতি আজি হইতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মত পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে ধন্য করিবে।

রাজার অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তুমি ত্যাগ-ব্রতকে জীবনের পরম সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে—সহস্র নরনারীর হৃদয়-কমলে তাই তোমার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত।—আজ নিদারুণ বিয়োগ-দুঃখের মধ্যে তোমাকে স্মরণ করিয়া দেখিতেছি যে, দেহাবসানে তোমার কীর্ত্তি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—বিপদে আশ্রয় দিয়াছ, সম্পদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছ; দুঃখে কাঁদিয়া সুখে হাসিয়া তুমি পরমাত্মীয়ের মত মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধকে গভীর হইতে গভীরতর করিয়া তুলিয়াছ, তোমাকে বস্তু-জগতে যে হারাইলাম, আমাদের কল্যাণ-কর্ম্মে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, রাষ্ট্র-সমস্যায় যে তোমাকে আর আমাদের মধ্যে অগ্রণীরূপে দেখিতে পাইব না, এই অনুভূতিই আজ আমাদিগকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে।

হে মহাপুরুষ! দুর্ভাগা জাতির সহস্র অভাব ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে, অনন্ত দারিদ্র্য ও অসীম দুঃখ-বেদনার মধ্যে, অনশনে ক্ষীণ, অশিক্ষায়

দীন, অজ্ঞতায় পরাধীন বাঙ্গলার জনসমাজে তোমার অনির্ব্বাণ দানযজ্ঞের বহ্নি-শিখা ক্রমশঃ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে,—সেখানে তুমি মনুষ্যত্বের মহাতপস্যায় নিজের অজ্ঞাতে নিজে এমনি একটা দুর্ল্ভ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছ যে, সেখান হইতে তোমার নিত্য পূজার শঙ্খধ্বনি লোকে লোকে চিরদিনই বিঘোষিত হইবে।

দুর্দ্দিনের পরম বন্ধু! সঙ্কটময় দুর্গমপথে নিরুপায় পথযাত্রীর পরম শরণ ছিলে তুমি,—বিপদ তোমাকে বিচলিত করে নাই, নিষ্ফলতা তোমাকে অবসন্ন করিতে পারে নাই, সমুন্নত মস্তকে তুমি মানুষের আদর্শ পথে আপনার বলে আপনার পথ করিয়া গিয়াছ; সেখানে তোমার পদচিহ্নের সঙ্গে তোমার জীবনের অবিরাম যুদ্ধের যে বিচিত্র ইতিহাস জড়িত আছে, আগত ও অনাগত জীবন-যাত্রীর দল সেই লক্ষ্যেই আপনার পথ করিয়া চলিবে—এই অসহনীয় বিয়োগ-দুঃখের মধ্যে এইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

তুমি যে রাজা, সেকথা তুমি কোনও দিন কোনও কারণে কাহাকেও জানিতে দাও নাই। রাজত্বে রাজার অধিকার, তুমি তোমার দেবদুর্ল্ভ চরিত্রবলে আমাদের হৃদয়-রাজ্য চিরদিনের জন্য জয় করিয়া গিয়াছ। মণিরত্ন রাজার কাম্য, তুমি ছিলে রাজরাজেশ্বর,—বিশ্বের সুবিস্তৃত রাজপথে ক্ষুদ্র-মহতের সহিত তোমার নিত্য মিলন দেখিয়াছি, তাই সহস্র হৃদয়-পদ্মে বিরচিত অম্লান বিজয়মালিকা মহাযাত্রার দিনে তোমারই কণ্ঠে শোভা পাইতে দেখিলাম;—হৃদয়-বিজয়ী বীর, তোমায় কোটি কোটি নমস্কার!

The position of a man is estimated by the amount he leaves, but in this instance, the Maharaja of Kasimbazar is known by the amount he has given away.

Capital. Pitcher.
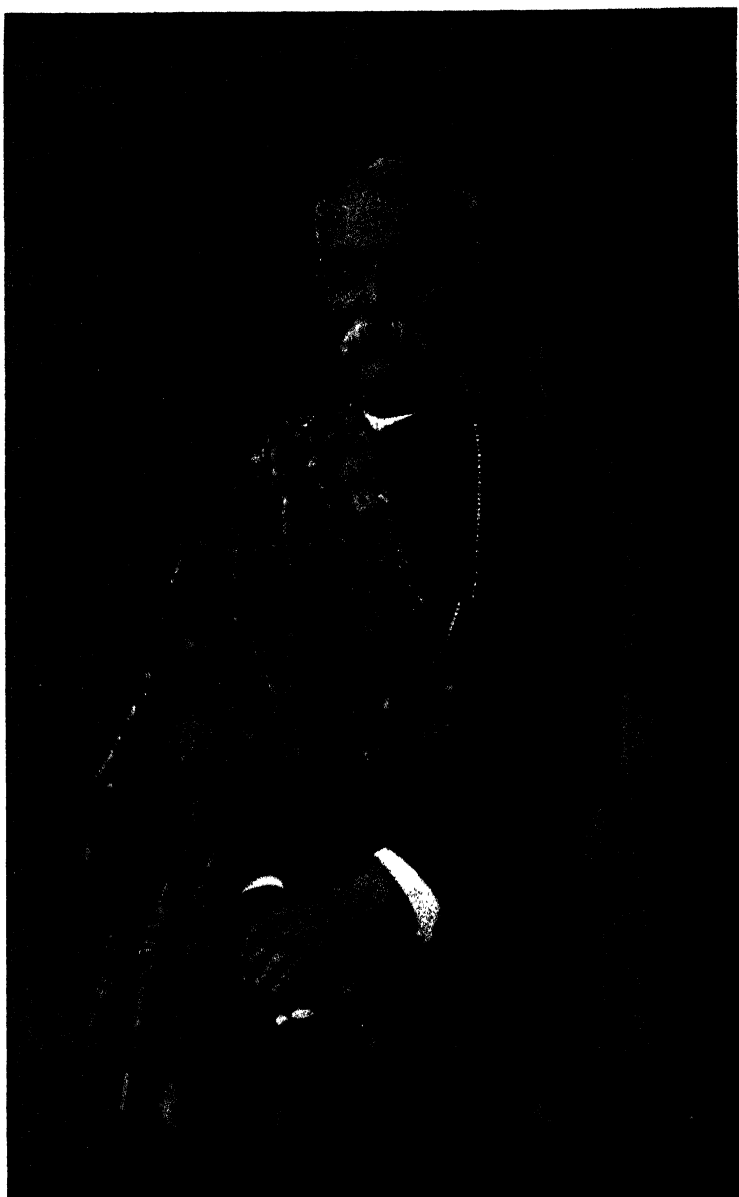
জীবন-স্মৃতি

জীবন-সমুদ্র-বুকে কভু সুখে কভু দুখে
তরঙ্গ উঠিয়া পুনঃ মিলায় কোথায়,
বেলাভূমে চিহ্ন তা'র রেখে যায় অনিবার
উপল খুঁজিয়া মরি বিফল ব্যথায়।

দুর্গম বন্ধুর পথ, কণ্টকিত সর্পভয়াকুল,
দুঃখের পসরা বহি' একা তুমি আসিলে পথিক ;
মন্দিরের দীপশিখা অন্ধকারে দেখাইল দিক
মায়াজাল ছিন্ন করি'—জিনে নিলে আশীর্ব্বাদী ফুল।

দুঃখের জীবন

"দুঃখ সুখের পূর্ব্বসূচী—প্রভাতোন্মুখ অদৃষ্টের শুকতারা"—মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার জনৈক বন্ধুকে একদিন এই কথা লিখিয়াছিলেন;—তাঁহার প্রথম জীবনের দুঃখময় দিনগুলির কথা আলোচনা করিলে তাঁহার নিজের এই অতি মূল্যবান সারগর্ভ উক্তির সত্যতা উপলব্ধি হয়।

কাশিমবাজার এষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হাতে আসিবার পূর্ব্বে কিরূপ দুঃখের জীবন লইয়া সঙ্কট পথে দীর্ঘদিন তাঁহাকে পাথেয়শূন্য অবস্থায় একাকী অগ্রসর হইতে হইয়াছিল তাহা আমরা এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট ঘটনাগুলি পাঠ করিলেই কতকটা ধারণা করিতে পারিব। অথচ তিনি দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ধনী না হইলেও তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা হীন ছিল না। পৈতৃক জমিজমা ও মাতামহ প্রদত্ত মাসহারা লইয়া তাঁহার নিজের সংসার 'বাবুর হালে' চলিতে পারিত। কিন্তু জ্ঞানোন্মেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মণীন্দ্রচন্দ্র স্বজন-প্রতিপালন ও পরার্থে ত্যাগ-ধর্ম্ম-আচরণ জীবনের অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইবার সুযোগ থাকে না—সেগুলি একান্তই আপনার রঙে আমাদের চোখের সম্মুখে ধরা দেয়,—মানুষটিকে বুঝিতে তাই আমাদের কষ্ট হয় না,—কল্পনা না করিয়াই আমরা আসল মানুষটিকে একেবারে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই।

দেওয়ান রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় শ্যামাদাস রায় (নসু বাবু) মাতুলের স্থলাভিষিক্ত হন। যাহাতে মহারাণী স্বর্ণময়ীর মন মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হয় এজন্য তিনি অনুনয়

বিনয় করিয়া নস্থবাবুকে বহু পত্র লেখেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় নস্থ বাবু মণীন্দ্রচন্দ্রকে দেখিলেই বিমূঢ় হইয়া পড়িতেন—তাঁহার নাম করিলেই কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিত্য নূতন সংবাদ সরবরাহের গুণে মহারাণী মণীন্দ্রচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শী আবেদনে কোন দিনই কর্ণপাত করেন নাই,—শোচনীয় দুর্দ্দশাতেও সহানুভূতি দেখান নাই। মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতার ব্যবহারে তাঁহার প্রতি মাতুলানী যে বিরূপ ছিলেন তাহা নস্থ বাবুকে লিখিত মণীন্দ্রচন্দ্রের পত্রাংশ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় :—

"শুনিতে পাই আমার পিতামাতা, মাতুলানীর বিষয়রক্ষার জন্য যথোচিত যত্ন চেষ্টা করিয়া তাঁহার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। একত্র বাসে ননদ ও ভ্রাতৃজায়ার পরস্পরের গৃহ-কলহের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। * * * আরও শুনিতে পাই মাতুলানী আমার মাতাঠাকুরাণীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিলে তিনি দাঁড়াইবার স্থানাভাবে আপন অর্থে একটি বসতবাটী নির্ম্মাণের জন্য মাতুলানীর নিকট আপন প্রাপ্য গহনার টাকা প্রার্থনা করিলে, তিনি অস্বীকৃতা হওয়ায় আদালতের সাহায্যে ঐ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। ইহাই যদি আমার পরিবারগণের পূর্ব্বাপর অসদ্ব্যবহারের কারণ হয় তবে ইহা অসদ্ব্যবহারের একশেষ বটে। এ ঘটনা কতদিনের ? বোধ হয় আমি তখন জন্মগ্রহণ করি নাই। যে প্রকৃতির যশ গগনব্যাপী, যাহার কীর্ত্তিভাতি জগতে অতুলনীয় সেই প্রকৃতিতে যদি এইরূপ বিশ্বাস ও ধারণা স্থান পাইয়া থাকে তবে তাহা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছে। আমি ভিক্ষার্থী, ভিক্ষাদাতার উপর আমার কোনও আক্রোশ হইতে পারে না। এই ভিক্ষাদাত্রীর অন্নে জীবন তাই অন্যত্র ভিক্ষা চাওয়া হেয়জ্ঞান করি।—তবে অযথা ভিক্ষা চাহি না। বৃথা নাম কিনিতে তেলা মাথায় তৈল দিতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার এক কড়াও চাহি না। * * * ক্ষমা গুণে আমাকে ক্ষমা করিতে বলিবেন।"

সন ১২৯৫ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, মণীন্দ্রচন্দ্র মাতামহী রাণী হরসুন্দরীর নিকট কাশীধামে (মদনপুরা, বাঙ্গালীটোলায়) পত্র লিখিয়া টাকা ধার চাহিতেছেন ;—

"* * * দৈববিড়ম্বনায় আমাকে সর্ব্বদাই অভাবী হইতে হয়, বিশেষতঃ নানাবিধ কারণে আমার অবশ্য পোষ্য এবং রক্ষণীয়গণের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে এবং মাতুলানী এককালীন সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন; * * * আমাকে কতকগুলি পোষ্য ও রক্ষণীয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহার উপর রোগ ;—তাই আমার কুলায় না। যদি প্রয়োজনীয় টাকা দিয়া আমাকে সাহায্য না করেন, তবে আমাকে ছয় শত টাকা ধার দেন, আমি মাসে মাসে আপনার আদেশানুযায়ী পরিশোধ করিব। এখানে টাকা ধার করিলে আপনাদেরই অপযশ।"

সাহায্য ত দূরের কথা মণীন্দ্রচন্দ্র এ পত্রের উত্তরও পাইলেন না। তিনি আবার অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিলেন ;—

"সংসারে অল্প দিন আসিয়াছি, কিন্তু বেশ বুঝিলাম মানুষকে বুদ্ধি ও কৌশলবলে আপনার করিয়া লইতে হইবে এবং ঐ বলে যতদিন আপনার রাখিতে পারিবে ততদিন আপনার থাকিবে! * * * স্নেহ, পরদুঃখকাতরতা, পরোপকার, সদা সদ্বিবেচনা প্রভৃতি মনুষ্যের ভাল ভাল গুণগুলি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে। স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি পৃথিবীকে অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী না হইলে কষ্টের একশেষ ভোগ করিতে হয়। হরি, সকলি তোমার ইচ্ছা।

মাতামহীঠাকুরাণি, আমার এ বিপদে যদি আপনি উদ্ধার না করেন তবে জানিবেন আপনার মৃত দৌহিত্রগণের মধ্যে আমিও একজন। আপনাদের অপ্রসন্নতায় ও অকৃপায় মরা বাঁচা সমান হইয়াছে।"

এ পত্রের পরও মাতামহীঠাকুরাণীর কোনও সাহায্য আসিল না। আষাঢ় মাসের (১২৯৫) ১০ই তারিখে নিরাশ হৃদয়ে মণীন্দ্রচন্দ্র মাথরুণ হইতে কাশীতে মথুরানাথ দত্তের নিকট পত্রে জানাইতেছেন—

* * * জিনিষ বন্ধক দিয়া দুই শত টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। * * * আর চারিশত টাকা কোথায় কিরূপে কর্জ্জ করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান অবস্থায় কলিকাতা যাওয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না। থাকিবার স্থান নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই। হাতে স্কুল রহিয়াছে। স্কুলটি উঠাইয়া

দিলে মাথকুণে এক মিনিটও থাকিতে পারিব না।" * * * তবে দুর্ব্বলের বল ভগবান! এই আমার ভরসা।"

ভগবান্ সত্যই দুর্ব্বলের বল। রাণী হরসুন্দরীর মন ফিরিল—৩০শে শ্রাবণ মণিঅর্ডার যোগে মণীন্দ্রচন্দ্র ৬০০৲ টাকা সাহায্য হিসাবে পাইলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী কিন্তু বিরূপই রহিলেন—২১শে ভাদ্রের (১২৯৫) পত্রে দেখিতে পাই মণীন্দ্রচন্দ্র মাতুলানীকে লিখিতেছেন—

মাগো, আজ যদি স্বর্গীয় মাতুল মহাশয় জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে কি আমার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত? তাঁহার নিকটে অপরাধী হইলেও তাঁহার নিকট জোর করিয়া যাইতাম, তাঁহার চরণ দুইটি ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। ক্ষমা না পাইলে চরণ ছাড়িতাম না; হা দুরদৃষ্ট! আমার কি দশাই ঘটাইয়াছ। মাতুলানীর বাটী যাইলাম, বাটীতে প্রবেশলাভ হইল না, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থী হইলাম, উত্তর পাইলাম—দেখা করিবার অবকাশ নাই। শেষে জানিলাম, আমি তাঁহার চরণে দোষী, এই কারণে এ জনমে তিনি আর এ হতভাগ্যের মুখ দর্শন করিবেন না।

মণীন্দ্রচন্দ্র বলিয়াছেন—তাঁহার মাতুলানী এক সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন—"তোমার মা আমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, আমি তাহা ভুলিতে পারি না।" সে সময় মণীন্দ্রচন্দ্র দুগ্ধপোষ্য শিশু, দুই বৎসরের কম তাঁহার বয়স, অপরাধ কি তিনি তাহা জানেন না। যে অপরাধের জন্য অতি পরোক্ষভাবেও তাঁহার বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নাই, তাহারই জন্য দীর্ঘকাল তিনি কি নির্য্যাতনই না সহ্য করিয়া গিয়াছেন। ইহাকেই বলে নিয়তি!

এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯শে কার্ত্তিক, (১২৯৬) তারিখে মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাণীকে সাহায্যের জন্য পুনরায় পত্র লিখিতেছেন—

"যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছি। দেনার বড়ই যন্ত্রণা হইয়াছে। পত্র লিখিলে আপনি বিরক্ত হইবেন বলিয়া এতদিন নিস্তব্ধ ছিলাম কিন্তু আর থাকিতে পারিতেছি না। গহনা বন্ধক পড়িয়াছে। উত্তমর্ণেরা এবং দোকানদারেরা বড়ই পীড়াপীড়ি

করিতেছে। যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। এ পত্রের উত্তর না পাইলে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইতে বাধ্য হইব। আমার আর উপায় নাই, রক্ষা কর মা।"

ফাল্গুন মাসে (১২৯৬) নবকুমারী সরোজিনীর অন্নপ্রাশন হইল। সামান্য গহনার জন্য মাতুলানীর নিকট প্রার্থনা জানাইয়া কোনও ফল হইল না, মাত্র ২৫৲ টাকা আশীর্ব্বাদী বলিয়া তিনি পাঠাইয়া দিলেন। লোক নিমন্ত্রণ করিবেন না স্থির করিয়া শেষে মণীন্দ্রচন্দ্র অনেক লোকের নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলিলেন। গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ গুলিকে খাওয়ান হইল।

সন ১২৯৭ সালে মহিমচন্দ্র দশম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। কর্ণবেধের কাল উপস্থিত। অনেক অনুরোধে ৫ই জ্যৈষ্ঠ রাণী হরসুন্দরী ১০০৲ টাকা সাহায্য পাঠাইলেন এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী পাঠাইলেন ২০০৲ টাকা। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শুভ কর্ণবেধ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। এই সময় ঋণের দায়ে মণীন্দ্রচন্দ্র বিব্রত; কিছুদিন পূর্ব্বেই গহনা বন্ধক পড়িয়াছে। তবুও প্রথম পুত্রের কর্ণবেধ উৎসব কিন্তু সাধারণভাবে হইল না। পঞ্চগ্রামীয় ব্রাহ্মণ এবং কুটুম্বাদি নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। প্রায় একশত ব্রাহ্মণ ও দুই শত কুটুম্ব ভোজন করান হইয়াছিল। উৎসবেরও অভাব হয় নাই। যাত্রা ও পুতুল নাচের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর হৃদয়ে করুণাউদ্রেকের জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র নিয়মিত ভাবে পত্র লিখিতেন, প্রত্যেক পত্রখানিই মর্ম্মস্পর্শী।—ব্যক্তিগত কারণে মণীন্দ্রচন্দ্রের কোনওরূপ ব্যয়বাহুল্য ছিল না। সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি স্বজনপ্রতিপালন ও আশ্রিতরক্ষণ ব্যাপারে তাঁহাকে অভাবের তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। সন ১২৯৭ সালের শ্রাবণ মাসে জনৈক বন্ধুকে লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, তখন তাঁহার নিজের আয় মাত্র ২৫০৲ আড়াই শত টাকা। কাঁদিয়া কাটিয়া দুর্দ্দশায় অর্থ সাহায্য চাহিয়া, প্রার্থনা জানাইয়া আশ্রিতপ্রতিপালনে কৃতসংকল্প মণীন্দ্রচন্দ্র আপনারই মাতামহী ও মাতুলানীর নিকট নিজেকে দিনের

পর দিন অপমানিত করিয়াছেন;—তাহাতে আপাতভাবে তাঁহাকে আত্ম সম্মানজ্ঞানহীন বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—কিন্তু সে সাহায্য ত তিনি নিজের সুখসুবিধা কিংবা বিলাসব্যসনের জন্য চাহেন নাই,—একান্ত প্রতিপাল্যগণের নিরুপায় অবস্থা ভাবিয়াই তিনি যে নিজে দাতার কাছে এমনি ক্ষুদ্র হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার মহৎ চরিত্রের একটা বড় দিকের পরিচয় পাই। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা যেমন দীনতা ও বিনয়গুণে কোমল, মানুষ হিসাবে ন্যায্য প্রাপ্য গণ্ডার দাবীতেও তেমনি স্থানবিশেষে কঠোর—একথা মাতুলানী ও মাতামহীকে লিখিত নিম্নের দুইখানি পত্রের অংশ বিশেষ হইতে বুঝিতে পারা যায়,—

"করুণাময় পরমেশ্বরের অদ্ভুত লীলায় আজ আমি হতভাগ্যের ন্যায় আপনার অনুগ্রহ লাভাশায় আপনাকে পত্র লিখিতেছি। কৃপাময় প্রসন্ন না হইলে আপনার কৃপালাভ এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঘটিবে না। দীনজননি, একবার প্রসন্ন হইয়া এ হতভাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এ হতভাগ্য বিনাদোষে আপনার নিকট দোষী হইয়াছে। আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে এ অনাথ মারা যায়। আপনার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছি। কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া এ অধমের শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করুন। * * * হৃদয় দেখাইবার নহে, অথবা আপনার নিকট উড়িয়া যাইবারও ক্ষমতা নাই—একারণ আপনাকে মনোব্যথা জানাইতে পারিতেছি না। কৃপাময়ি, আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার অনুমতি প্রদান করুন। আমি আর বাঁচি না।" * •

মণীন্দ্রচন্দ্র পত্রযোগে মাতামহীর সহিত কাশীধামে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তাহার উত্তরে তিনি জানাইলেন—"আমার বিনা অনুমতিতে তুমি আমার নিকট আসিও না—আসিলে পাথেয় পর্য্যন্ত পাইবে না।" এই নিষেধাজ্ঞা পাইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র ৩রা বৈশাখ (১২৯৭) তারিখে মাতামহীকে পত্র লিখিলেন—

"আপনাদের নিকট আমাদের মান অপমান নাই, ক্রোধ নাই, লজ্জা নাই। খাইতে না পাইলেই আপনাদের নিকট যাইব। কেন আপনারা খাইতে দিবেন

* মহারাণী স্বর্ণময়ীকে লিখিত—৩০শে শ্রাবণ, ১২৯৭

না? * * * কালমাহাত্ম্যে সকলই ঘটিতেছে। তাহা না হইলে আপনি কেন লিখিবেন, আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার নিকট যাইব না, যাইলে পাথেয় পর্য্যন্ত পাইব না। বজ্রাঘাতে আমার মৃত্যু হইল না কেন! আপনার মুখ হইতে আমার প্রতি এরূপ দুর্ব্বাক্য কেন নিঃসৃত হইল? বুঝিলাম সকলই বিধিলিপি।

* * * *

রাজবাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন, না জানি কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি বা কুপ্রবৃত্তির বশীভূতা হইয়া সে আশ্রয়টুকু কাড়িয়া লইলেন। স্বর্গীয় মাতামহ ঠাকুর আশ্রয় দিয়াছিলেন, আপনিও দিয়াছিলেন, আজ কালমাহাত্ম্যে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। আজ আপনি দত্তাপহারিণী হইয়াছেন—কি করি সকলি কালমাহাত্ম্য। * * *

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে আপনার একমাত্র জীবিত বংশ-রক্ষক, ৺মাতামহ-ঠাকুরের একমাত্র জীবিত পিণ্ডদাতা আমি, আমি আপনার বিরুদ্ধচারী নহি, আপনার অবাধ্য নহি, তবে কেন আমি আপনার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইব? * * * আমি অনাথ, আমি আশ্রয়হীন, আমার প্রতি আপনার দয়া করা কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে। আমাকে দয়া করিতেই হইবে।"

কাশীর উকীল যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের দুর্দ্দশার কথা লিখিতে লিখিতে মণীন্দ্রচন্দ্র এই কয়টি লাইন লিখিয়াছিলেন—

"হায় রে, যে দয়া নর-হৃদয়-ভূষণ
সেও উপেক্ষিত অর্থ তোমার কারণ।
তোমার দুর্দ্দম লোভে নিদয় অন্তরে,
কত না প্রবলে হায় ব্যভিচার করে।
বলে দুর্ব্বলের ভগ্ন কুটীরে পশিয়া,
হাসিয়া মুখের গ্রাস লইছে কাড়িয়া।
রে অর্থ সাবাসি তোরে শত শতবার।"

আর এক স্থানে তিনি লিখিতেছেন--

"মনে বড় দুঃখ যে আজ স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের দৌহিত্র অন্নের জন্য লালায়িত। কালে হয়ত অন্যত্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।"

নিতান্ত অর্থাভাব হওয়াতে মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজারে মাতুলানীর চরণদর্শন করিবার সঙ্কল্প করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী পাঠাইবার জন্য

সন ১২৯৭ সালের ১০ই পৌষ অনুরোধ করিয়া পত্র দিলেন। ১৩ই পৌষ—সঙ্গের লোকদিগকে রওনা করিয়া দিয়া রাত্রিকালে মণীন্দ্রচন্দ্র যাত্রা করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় অপরাহ্ন ৪।৪৫ মিনিটের সময় পদব্রজে দুইজন, কিছুক্ষণ পরে আর একজন সংবাদ-বাহক রেলপথে আসিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের হাতে শ্রীনাথপাল মহাশয়ের পত্র দিল—তাহাতে কাশিমবাজার যাইবার নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই নিষেধাজ্ঞার পর মণীন্দ্রচন্দ্র যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। কখনও রাণী হরসুন্দরী বা মহারাণী স্বর্ণময়ীকে এইরূপ পত্রের পর পত্র লিখিয়া, কখনও শ্রীনাথ বাবু বা উচ্চপদস্থ অন্য কোনও কর্ম্মচারীকে সুপারিশ ধরিয়া, কখনও কাশীর বা কাশিমবাজারের লোকের মারফতে অনুরোধ জানাইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাণীর চরণ দর্শনের চেষ্টা করিতেন কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টা কখনও সফল হয় নাই। মাঝে মাঝে এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রদান—সর্ব্ব প্রকার সাহায্য বন্ধ—বিনাদোষে মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া মহারাণী তাঁহাকে অপমানিত করিতেন। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের তিতিক্ষা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান যথেষ্ট ছিল বলিয়া তিনি উত্ত্যক্ত, অপমানিত ও বিড়ম্বিত হইয়াও কখনও হাল ছাড়েন নাই।—প্রার্থীকে দর্শন না দিয়া, তাহার প্রাণে বেদনা দিয়া—কর্ম্মচারিগণের দ্বারা অপদস্থ করাইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত মহারাণী আপনার জেদ বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সে জেদ রক্ষা করিবার উপযুক্ত উপাদানসংগ্রহে সুযোগ্য লোকের অভাব, অন্ততঃ সে সময় মহারাণী স্বর্ণময়ীর সেরেস্তায় ছিল না। শুনিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুকালে নাকি মহারাণী মণীন্দ্রচন্দ্রকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলে পাছে স্বার্থ-হানি ঘটে এজন্য কেহ মণীন্দ্রচন্দ্রকে সে খবর দেয় নাই। বহরমপুর বাস কালে—স্থানীয় অভিজাত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ও সাহেব মহলে মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 'সদরালা' বা 'উপরালা' সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে অনেকই মণীন্দ্রচন্দ্রের গৃহে

যাতায়াত করিতেন। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্রের গৃহে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার মত কোনও আসবাবপত্র ছিল না। তাই বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া তিনি মাতুলানীকে পত্র দিলেন ;—

"আমার এখানে স্থানীয় সাহেব ও মুসলমানগণ এবং বিভিন্নজাতির পেণ্টলুন পরিধানকারী ভদ্রলোকগণ মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহাদের বসিবার জন্য চেয়ারের প্রয়োজন হইতেছে। আপনি দয়া করিয়া এক ডজন কুসুম চেয়ার, একখানি কারপেট্ এবং একটি ফুলদানী পাঠাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

—ইহাতে কোন ফল হইল না। মহারাণী কর্ম্মচারী দ্বারা জানাইলেন —মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিলাদি রাজভবনে নাই।— মণীন্দ্রচন্দ্র উত্তরে নিবেদন করিলেন,—

"আমার প্রয়োজনীয় চেয়ার টেবিলাদি আপনার রাজভবনে না থাকিলেও আপনার ইচ্ছায় আমার সে অভাব পূরণ হইতে পারে। আপনার সম্মান রক্ষার জন্যই বর্ত্তমানে আমার চেয়ার টেবিলাদির বিশেষ প্রয়োজন—এই কারণে প্রার্থনা, যদি একেবারে দিবার অভিপ্রায় না থাকে তবে কিছুদিনের জন্য পাঠাইতে আজ্ঞা হয়।"

এ পত্রেও যখন কোনও ফল হইল না তখন মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার কলিকাতাস্থিত কর্ম্মচারীকে নিলাম হইতে সুবিধা মত দুইখানি কুসুম চেয়ার ক্রয় করিতে এবং তাঁহার পুরাতন গদীওয়ালা চেয়ারখানি মেরামত করাইতে হইবে বলিয়া পত্র লিখিলেন। সামান্য সামগ্রীর জন্য এমনি অভাব অসুবিধার মধ্যে তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইত। কখনও গাড়ী, কখনও ডাক্তার, কখনও কবিরাজ, কখনও বা আমের সময় পুত্রকন্যাগণের জন্য আম, নিজের জন্য সামান্য একখানি বালাপোশ —এমনি কত কি সামান্য জিনিষের জন্য তাঁহাকে কাতর প্রার্থনা জানাইতে হইয়াছে। কখনও সে সব প্রার্থনার আংশিক পূরণ হইয়াছে কখনও বা অবহেলা করিয়া পত্রের উত্তর পর্য্যন্তও দেওয়া হয় নাই। একবার শীতবস্ত্র আসিল কিন্তু তাহা একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য। মণীন্দ্রচন্দ্রের মত অনাড়ম্বর ভদ্রলোকের মুখ দিয়াও সে কথা বাহির হইয়া পড়িল,—

"মাতুলানীর নির্দ্দয় ব্যবহার আমাকে বড় কষ্ট দিতেছে। * * * মাতুলানী আমাদের শীতবস্ত্র দান করিয়াছেন। ঐ শীতবস্ত্রগুলি ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী নহে।"

চাকুরীর সুপারিশের জন্য মণীন্দ্রচন্দ্রকে কেহ অনুরোধ করাতে তাহার উত্তরে তিনি লিখিতেছেন—(১৭ই চৈত্র, ১২৯৮)

"বহুকালাবধি কাশিমবাজার রাজবাটীর সহিত আমার সে সংশ্রব নাই ;—আমি একজন ভিক্ষুক স্বরূপ আছি ; মধ্যে মধ্যে ভিক্ষার প্রার্থী হই এবং সময়ে সময়ে আক্ষেপ প্রকাশ করি। * * * বাবু এক সময়ে আমাকে চিনিতেন এক্ষণে পূর্ব্ব ভালবাসাটুকু আর নাই, তিনি এক্ষণে কাশিমবাজার রাজবাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। সাধারণ্যে * * * পদে অভিষিক্ত। আমি ক্ষুদ্র কীটানুকীট ; এক্ষণে তিনি চক্ষে চশমা অথবা অনুবীক্ষণ দিয়াও আমাকে দেখিতে পাইবেন না এবং পানও না। এরূপস্থলে উপস্থিত বিষয়ে আমার দ্বারা কোনও উপকার সম্ভবে না। * * * প্রকৃতই আমার হিতচেষ্টা বিপরীত ফল করিবে।"

এমনি করিয়া নৈরাশ্য ও অবহেলার বোঝা বহিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের দিন কাটিতে লাগিল।—

(১)

"আমার জীবন রক্ষা যদি আপনার অভিপ্রেত না হয় এবং আমাকে কষ্ট দেওয়াই যদি আপনার অভিপ্রায় হয় তবে এ হতভাগ্যের জীবন যাহাতে শীঘ্র বিনষ্ট হয় তাহার উপায় করিবেন। দগ্ধাইয়া মারা অপেক্ষা তীক্ষ্ণ অসির সাহায্যে এ হতভাগ্যের মুণ্ড ছেদন করাই কর্ত্তব্য। হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় এইরূপ লিখিলাম। যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন। আপনি মাতা, আপনাকে অধিক আর কি জানাইব ? দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। নতুবা মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা আপনাকে সাক্ষাতে জানাইতে পারিতাম।" *

(২)

"কালচক্র ঘুরিল, নূতন বর্ষ আসিল কিন্তু আমার শুভদিনের উদয় হইল না। আমার ভাগ্যদোষে আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হইলেন না। ক্ষমা মনুষ্য

* মহারাণী স্বর্ণময়ীকে লিখিত পত্র—বহরমপুর, ২৭শে মাঘ, ১২৯৯।

জীবনের একটি প্রধান ধর্ম্ম কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে সে ক্ষমাধর্ম্ম আপনাতে আমি দেখিতেছি না। মানুষের কর্ম্মদোষে এবং জগৎপতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে। আমি জানি না, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন্ অপরাধে আপনার অপ্রীতিভাজন হইয়া এরূপ ভবযন্ত্রণা এবং আপনার স্নেহাভাবের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। জননি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শনের অনুমতি দিন। আমার মনের ভাব, মনের কথা হৃদয়ের ব্যথা আপনাকে জানাইয়া আমার জন্ম সার্থক করি। জননি, আপনি আমাকে দেখা দিতেছেন না কিন্তু আপনি আমার অন্তরে নিয়ত জাগিয়া আছেন। সর্ব্বান্তর্য্যামীকে আমরা ওরূপ অন্তরে জাগাইতে পারি না। * * * আমার জীবন দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, আমাকে যদি দেখা না দেন তবে আমার জীবন নাশের পাপ আপনাতে অর্শাইবে। দয়াময়ী জননি, একবার দেখা দিন। * * *

সে দিন 'নরমেধ যজ্ঞ' অভিনয় দর্শন করিতে করিতে মনে হইল, সিদ্ধার্থপুত্র কুশধ্বজ যেরূপ জলন্ত অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, কবে আমার সেই সুদিন হইবে, যে দিন ভাগিনেয়মেধ যজ্ঞের জলন্ত অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিব। সিদ্ধার্থের ন্যায় ঋণযন্ত্রণায় প্রাণ বহির্গত হইয়াও হইতেছে না। দয়াময়ি, আমার প্রার্থনা, একবার আমাকে দেখা দিন।" *

মারণ-যজ্ঞ

নিজের প্রাণ-সংশয় সম্বন্ধে মণীন্দ্রচন্দ্র লিখিতেছেন—

"Krishna ballabh Rai, brother-in-law of Baikuntha nath Sen wrote to me that I must take care of my life, machinations are being made by my aunt to take away my life. So I should go to Calcutta."

মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের উপর ব্যক্তিবিশেষের যে আক্রোশ ছিল, তাহা ৫ই, ১৯শে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী, (১৮৮৮) তারিখের "Hope" নামক পত্রিকার বিশেষ মন্তব্যে জানিতে পারা যায়।

---

* মহারাণী স্বর্ণময়ীকে লিখিত পত্র—বহরমপুর, ১৩ই বৈশাখ, ১৩০০।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

সন ১২৯৫ সালের ৮ই আশ্বিন মণীন্দ্রচন্দ্র মাতামহী রাণী হরসুন্দরীকে মাথরুণ হইতে কাশীতে পত্রযোগে জানাইতেছেন—

"আমি মধ্যে মধ্যে কাশিমবাজার হইতে গুপ্ত লিপি পাইয়া থাকি, তাহাতে মহারাণীর ব্যবহার, কার্য্যাদির বিষয় অনেক কিছু লেখা থাকে। আমার জীবননাশের চেষ্টা এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের চেষ্টা বিশেষরূপে হইতেছে। সয়দাবাদে একটী নূতন বাটী হইয়াছে। স্ত্রীধনের একটী আলাহিদা তহবিল হইয়াছে। ঐ স্ত্রীধনের আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। স্ত্রীধন হইতে এক লাখ তিপ্পান্ন হাজার টাকা মুনফার সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে। পোষ্যপুত্র গ্রহণের নানাবিধ চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। পোষ্যপুত্র গ্রহণের সংবাদ মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল। আমার মারণের জন্য যাগাদি প্রতিনিয়ত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঐ অঞ্চল হইতে এক একজন লোক আসিতেছেন, কি অভিপ্রায়ে তাঁহারা এখানে আইসেন তাহার কারণ স্থির করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা মুখে আমাকে সাবধানে থাকিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। একদিনের অধিককাল এখানে থাকেন না।"

সরলতা

"আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই আমার অর্থের অভাব হয়। আমি বিলাসী নহি, ভোগী নহি, আমার স্বভাব কলঙ্কিত নহে। অসদ্ব্যয়ে আমার অর্থ ব্যয়িত হয় না। আপনার সদ্‌গুণের আদর্শে আমি ভগিনী এবং ভাগিনেয়গণের ভরণ পোষণ করিতেছি। নিজ পুত্র এবং ভাগিনেয়গণের শিক্ষা দেওয়ার সহিত স্বসম্পর্কীয় দুই একজন বিদ্যালাভ করুক এ ইচ্ছাও মনে রহিয়াছে। * * * আপনার সম্ভ্রমরক্ষার জন্য ব্যয় না করিলে আমার তো কোনও অভাব নাই। স্বর্গীয় পিতাঠাকুর যেরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ ভাবে আমাকেও কোনও অভাব বোধ করিতে হয় না। আমি বেশ সুখে থাকিতে পারিতাম। ভগবান্ আমাকে আপনার দৌহিত্র, ৺রাজাবাহাদুরের দৌহিত্র, ৺রাজা ও মহারাণীর ভাগিনেয় করিয়াছেন, তাহাতেই আমার অভাব।"*

---

* মাতামহীকে লিখিত পত্র।

শঙ্কাকুল স্বামী

* * গত পরশ্ব রাত্রে আহারান্তে আমার সহধর্ম্মিণী উঠানে বসিয়া কথা কহিতেছিলেন এমন সময়ে একটী পেচক বিকট চীৎকার করে। ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার সহধর্ম্মিণীর হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং মনের ভিতর কেমন একটী ভাবের উদয় হয় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। শরীর ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া আসে, সমস্ত রাত্রি ঐ অবস্থায় যায়। প্রাতঃকালে স্নানান্তে সহজ অবস্থা হইয়াছিল। গত রাত্রেও ঐ প্রকার খাইতে খাইতে মনের ভিতর কেমন হইল, বমন আরম্ভ হইল এবং সেই হইতে আহার বন্ধ হইয়া আছে। * * *

আমার মনে যে সুখটুকু ছিল, জগদীশ্বর বুঝি বা তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করেন। *

মণীন্দ্র-ভীতি

মণীন্দ্রচন্দ্র একপ্রকার জোর করিয়াই বহরমপুর আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন।—জীবন বিপন্ন করিয়া, অপমান ও অনাদর সহ্য করিয়া বিনাদোষে দোষী হইয়াও তিনি করুণাময়ী মহারাণীর প্রাণে করুণার সঞ্চার করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। অন্নপূর্ণার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মাঝে মাঝে যে ভিক্ষার অন্ন লাভ হইত—সূক্ষ্ম বিচারে তাহাকে কদন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রায় রাজীব লোচনের দেওয়ানীর আমলে মাতুলানীর নিকট তবুও মণীন্দ্রচন্দ্রের কিছু সমাদর ছিল কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে দীর্ঘ দশ বৎসর কাল প্রার্থনার পর প্রার্থনা জানাইয়াও মাতুলানীর দর্শন মিলিল না। কর্ম্মচারীর সাক্ষরিত বা মাতুলানীর জবানী দেওয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর কখনও কখনও আসিত, কখনও বা ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়া যাইত। আর্থিক সাহায্য মাঝে মাঝে যৎসামান্য মিলিত বটে কিন্তু অসীম অভাব-সমুদ্রে তাহা পাদ্যঅর্ঘ্য মাত্র।

* মথুরানাথ দত্তকে লিখিত পত্র। মাথরুণ—৩রা বৈশাখ, ১২৯৭।

মণীন্দ্রচন্দ্রকে বহরমপুর হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং তাঁহার সুযোগ্য অমাত্যবর্গের দ্বারা যে একটা ধারাবাহিক চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শুনিতে পাওয়া যায় রায় রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় নস্থ বাবু দেওয়ান হইয়া বসিলে মণীন্দ্র-ভীতি তাঁহাকে অতি হাস্যাস্পদ ভাবে চঞ্চল করিয়া তুলিত। একবার দুর্গোৎসবের সময় মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে যাইয়া মহারাণীর দর্শন প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হন এবং তৎক্ষণাৎ বিশেষ ক্ষুব্ধ ভাবে রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। নস্থ বাবু নাট মন্দিরের দিকে ছিলেন—সেরেস্তায় ফিরিয়া আসিয়া একথা শুনিয়া কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পূজার উৎসব যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি থাকিল, তিনি একেবারে বজরা হাঁকাইয়া আলমপুরে বৈকুণ্ঠ বাবুর বাড়ীতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাজির হইয়া বলিলেন,—"বৈকুণ্ঠ, তুমি বাঁচাও—মণি রাগ করিয়া পূজা বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তুমি একবার আমার সঙ্গে কাশিমবাজার চল।"—মৃদু হাস্য করিয়া বৈকুণ্ঠ বাবু বলিলেন—"আজ মহাষ্টমী, আমি আমার বাড়ীর পূজা ফেলিয়া আপোষ নিষ্পত্তি করিতে যাইতে পারিব না—আর তাহার প্রয়োজনও নাই। মণি বাবুর টাকার বিশেষ প্রয়োজন—অর্থাভাবে তাঁহার মেজাজ ঐরূপ হইয়াছে—আপাততঃ ২০০০৲ টাকা তাঁহাকে পাঠাইয়া দাও, সব গোল মিটিয়া যাইবে। নস্থ বাবু নাকি কাশিমবাজার ফিরিয়া কিছু টাকা পাঠাইয়া দিয়া বিশেষ মিষ্ট বাক্যে মণীন্দ্রচন্দ্রকে তুষ্ট করিয়াছিলেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনারায়ণ

লালগোলার মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মণীন্দ্রচন্দ্রের সেই দুর্দ্দিনের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।—তাঁহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি তিনি নানাভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের

লালগোলার মহারাজ

শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, সি. আই. ই.
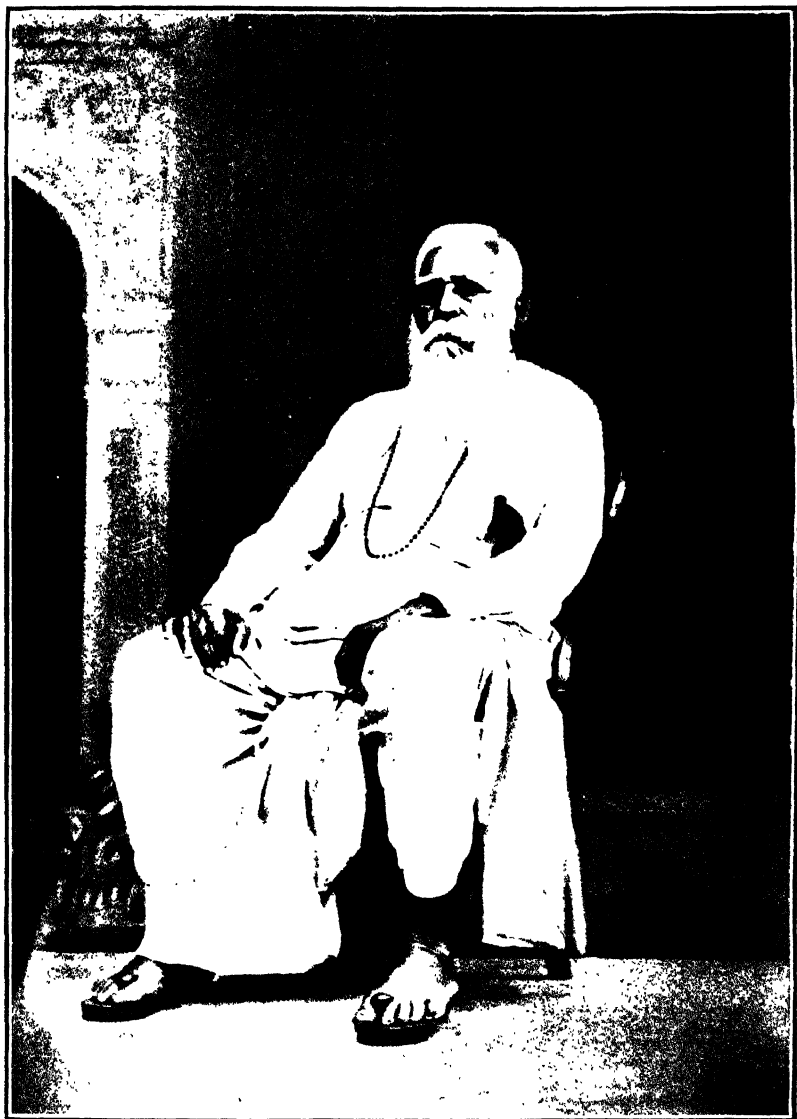
একখানি পত্র এখানে উদ্ধৃত করিলেই মহারাজ ও যোগেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে কিরূপ গভীর সম্পর্ক ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

বহরমপুর,
৩রা কার্ত্তিক, ১৩০১।

সেবকস্য সংখ্যাতীত প্রণামান্তে নিবেদনমিদং—

পরোপকারী বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমুখাৎ আমার বর্ত্তমান অবস্থা অবগত হইয়া ভবদীয় পরহিতরত, দয়াপ্রবণ, পরদুঃখকাতর, সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে আমার বর্ত্তমান কষ্টে ব্যথা অনুভূত হইয়াছে জানিয়া পরম সুখী হইলাম এবং তজ্জন্য আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমার বর্ত্তমান অভাব নিবারণ জন্য অর্থ সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে আমি এত উপকৃত যে, তাহার জন্য মাদৃশ ক্ষুদ্রহৃদয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম। এ উপকারের কথা আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত রহিবে। ইহ জীবনে ইহা ভুলিবার নহে। ভবদীয় মঙ্গলসহ রাজধানীর মঙ্গল লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীদাসস্য

জীবনে দুঃখের পাত্র বুঝি উপছাইয়া পড়িল;—সংসারের জ্বালা, একান্ত প্রত্যাশার স্থান হইতে কেবল নৈরাশ্যের আঘাত, অভাবের তাড়না, অসম্মান ও অবহেলা মণীন্দ্রচন্দ্রকে ক্রমশঃ যেন নিস্তেজ করিয়া ফেলিতে লাগিল। মণীন্দ্রচন্দ্র অতিশয় দুঃখেই লিখিতেছেন "স্বজনের স্নেহ হইতে ত বিধাতা বঞ্চিত করিয়াছেন—আত্মীয়ের স্নেহ হইতে যেন বঞ্চিত না হই।"

শারদীয় পূজা আসিল। কোনও একখানি পত্রে মণীন্দ্রচন্দ্রের তখনকার মনোবেদনা ব্যক্ত দেখিতে পাই,—

"দেখিতে দেখিতে শারদীয় উৎসব আসিয়া পড়িল। মাতা আনন্দময়ীর শুভাগমন উপলক্ষে সমস্ত দেশ যেন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। যাহার বাড়ীতে মা আসিবেন তাহার ত কথাই নাই, যাহার বাড়ীতে মা আসিবেন না তাহার বাড়ীতেও মহা ধুম লাগিয়াছে। গৃহস্থ বাটী পরিষ্কার করিতেছে। সন্তান সন্ততির জন্য নব-বস্ত্রের আয়োজন হইতেছে। আজ সংবৎসরের পর প্রবাসী পিতা পুত্রের মুখ

দেখিবে, জননী অঞ্চলের ধন ফিরিয়া পাইবে, স্ত্রী জীবনসঙ্গীর দর্শন পাইবে। আমার ভাগ্যে আজ আর নূতন আনন্দ নাই। কেবল নিরানন্দের বিভীষিকা চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে।"

—যাঁহার বাড়ীতে উত্তরকালে দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হইত সেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে একদিন আনন্দময়ী এমনি নিরানন্দ সাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন।

দুর্গোৎসব হইয়া গেল—বিজয়ার দিন মণীন্দ্রচন্দ্র একখানি পত্র লিখিতেছেন,—

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩০১।

বিজয়ীর বিজয়োৎসব হয়। দুঃখভরা বঙ্গদেশে বিজয়োৎসব কেন তাহা বুঝিতে পারি না। চিরপরাধীন বঙ্গদেশে বিজয়োৎসব কোথায়? বঙ্গদেশে আনন্দময়ীর শুভাগমন সংবাদই আনন্দদায়ক, কিন্তু * * * আমার মহাকষ্টের জীবনে আর বিজয়োৎসব নাই, বিজয়ার সুখ আর মনে জাগে না। * * * যাহা হউক প্রচলিত প্রথামত সাদর আলিঙ্গনবদ্ধ বিজয়ার নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

জীবন-মালঞ্চ

তব জীবনের মালঞ্চ ভরি' ফুল
ফুটায়ে তুলিলে সৌরভে সমাকুল,
দলে দলে তা'র স্বর্গ-সুষমা ঢালা
অতুল্য শোভা নয়নানন্দ আলা।

(১)

দান প্রবৃত্তির উদারতা

মহারাজ যে সময় তাঁহার মাতামহী রাণী হরসুন্দরীর ত্যাগ-পত্র দ্বারা কাশিমবাজার এষ্টেটের দখলীকার হন, সে সময় তিনি যে চুক্তিপত্র সহি করিয়াছিলেন, তাহাতে মাতামহীকে মাসিক দশহাজার টাকা করিয়া মাসহারা দিবার কথা ছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে উক্ত টাকার ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স নিজে দিয়া মাতামহীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে দশ হাজার টাকা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মাতামহী এই টাকার অধিক যে খরচ করিতেন না, তাহা তাঁহার হিসাবদৃষ্টে পরে জানা গিয়াছিল। তাঁহার জীবিতকালে যে টাকা তহবিলে মজুদ ছিল তৎসমুদয়ই ন্যায়তঃ মহারাজের প্রাপ্য হয়। রাণী হরসুন্দরীর মৃত্যুসংবাদ যখন মহারাজের নিকট পৌঁছায় তখন তিনি সপরিবারে নৌকাযোগে ৺নবদ্বীপ ধামে যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে এ-সংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং হরেন্দ্রবাবু-প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ৺কাশীধাম যাত্রা করিলেন। কাশীতে তিনি রাণী হরসুন্দরীর বাটীতে উঠিলেন, গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে কাঙ্গালী বিদায় করিয়া, পরে তিনি হিসাবপত্র দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সে-সময় মহারাজেরই আশ্রিত ২৪ পরগণার উকীল গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু মহাশয় কাশীধামে ছিলেন; তিনি রাণী হরসুন্দরীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সমুদয় অবস্থা

জানাইলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে আসিয়া বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া গেলেন। মহারাজ কাশীধাম পৌঁছিলে, হরেন্দ্রবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মহারাজের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া ঘরের তালা চাবি খুলিয়া দিবার অনুরোধ করিলে তিনি তালা চাবি খুলিয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিয়া ৺গোপীকৃষ্ণ বাবু ও হরেন্দ্রবাবু রাণী হরসুন্দরীর জমা খরচ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। খাতাপত্রে নানা-প্রকার অযথা খরচ ও ভিত্তিহীন দানের উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ায় তহবিলে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা মজুত থাকা বিবেচিত হইল। এই টাকার কোন প্রকার দানপত্র না থাকায় উক্ত পরিমাণ টাকা রাণী হরসুন্দরীর ভিক্ষাপুত্র মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের নিকট আদায় হইতে পারে এই আশঙ্কায় মহারাজ বাহাদুর যে সময় আহারের জন্য অন্দরে যান, সে সময় মাধব বাবুর পরিবারবর্গ মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তথাকার সমুদয় তৈজস পত্র ও নগদ টাকা প্রার্থনা করেন। মহারাজকে ইতিপূর্ব্বে যাঁহাদের স্বার্থের জন্য মাতামহীকে নয় লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল, তাঁহাদেরই অনুরোধে মাত্র এক লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ মহারাজের নামে তাঁহারা লিখিয়া দিলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সেই কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইয়া রাণী হরসুন্দরীর শ্রাদ্ধে কাঙ্গালী-বিদায় করিয়া দিলেন।

(২)

কাশিমবাজার রাজবাটীর তলস্থ জমির জমিদার গোপালকৃষ্ণ রায়ের বাড়ী কাশিমবাজারে। মহারাণী স্বর্ণময়ী ঐ জমির স্বত্ব কিনিবার জন্য গোপাল বাবুকে এক লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু গোপাল বাবু সে সময় তাহাতে অস্বীকৃত হন। পরে মহারাজের আমলে গোপাল বাবু যখন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন তখন অতি অল্প দামে ঐ তলস্থ জমি তিনি তাঁহার নিকট বিক্রয় করেন। পরে গোপাল বাবুর অবস্থা

অত্যন্ত শোচনীয় জানিতে পারিয়া মহারাজ তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে মাসিক ১০০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দিতেন।

পরদুঃখকাতরতা

'রাজগদী' লাভ করিবার পর মহারাজ দৈনিক প্রত্যূষে কাশিম-বাজারের রাস্তায় পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। সঙ্গে থাকিত মুকুন্দ চোপদার এবং দুই একজন কর্ম্মচারী। বহু অভাবগ্রস্ত লোক এই সময় মহারাজের সঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে দেখা করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইত। মহারাজও প্রাণ খুলিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিতেন এবং তাহাদের অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেন। সন ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে একবার কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ঐ সময়ে কাশিমবাজার রথতলার দক্ষিণদিকস্থ বাগ্‌দি পাড়ায় একটী লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়। সে লোকটি রাজসরকারে দপ্তরীর কাজ করিত, তাহার নাম কেশব। তাহার বৃহৎ পরিবার, অনেক নাবালক পোষ্য। সামান্য বেতনভোগী কেশবের অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছিল না শুনিয়া মহাপ্রাণ মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি খাগড়া বাজারের ঐ সময়কার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ আর, সি, পালকে আনাইয়া নিজব্যয়ে কেশবের চিকিৎসা করাইয়া তাহার জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন।

শিক্ষাপ্রার্থীর প্রতি অনুকম্পা

সৈদাবাদ রাজবাটীতে বসিয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট তাঁহার বাল্য ও যৌবনকালের কথা নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। রাজকার্য্যের জের চলিত প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কারণ সৈদাবাদ রাজবাটী সহরের

মধ্যে অবস্থিত বলিয়া মহারাজ তথায় থাকাকালীন লোকসমাগম হইত একটু বেশী। গল্প করিতে করিতে, নিজের জীবনের নানা কথা বলিতে বলিতে কোনও কোনও দিন রাত্রি গভীর হইয়া যাইত। বাঙ্গলা দেশের শিক্ষা-বিস্তারের কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বলিলেন—"কিছুই করিতে পারিলাম না;—শিক্ষাবিস্তার না হইলে এ পরাধীন দেশের দুঃখ ঘুচিবে না;—সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্য দিলাম, নিজের প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। যাহা কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে শিক্ষা-প্রার্থীর অবহেলা ও অবিবেচনা আমাকে অনেক স্থলে নিরাশ করিয়াছে।—দেশের mentality (মনোভাব) এখন সহজলভ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে বেশী। গান্ধীজি ও দেশবন্ধুর আদর্শে বিলাসিতা অনেকটা কমিয়াছে বটে কিন্তু বিদেশী ভাবের মূলচ্ছেদ হইল কৈ? স্বরাজ যদি হাতে তুলিয়াই দেয়—রক্ষা করিবে কে? বৈদেশিক শিক্ষা শেষ করিয়া যাহারা দেশে ফিরিয়া আসিল, তাহাদের মধ্যে অনেকের সাহেবিয়ানা দেখিয়া লজ্জা করে। কোথায় যেন কি একটা গলদ আমাদের আছে—।" আমি বলিলাম—"পরাধীনতা—দীর্ঘকাল পরবশ্যতায় আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে"—সহাস্য উত্তর আসিল—"তোমরা আজ কাল ঐ এক দিক দিয়াই বিচার কর,—পরাধীন জাতি জাপান চোখের সাম্‌নে কি অদ্ভুত কাণ্ডটা করিয়া বসিল—উদাহরণ ত সম্মুখে। আসল কথা—আত্মোন্নতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা চাই। জাতিকে বড় করিতে হইলে নিজে আগে বড় হইতে হয়—সে দৃষ্টান্ত আমরা ত আমাদের দেশেও পাইতেছি। আমার সন্দেহ হয় শিক্ষাপ্রার্থীর শিক্ষা-দানে আমার যতটা ব্যাকুলতা, শিক্ষালাভের জন্য তাহার ততটা আগ্রহ ও ব্যাকুলতা নাই। তবুও দুঃখ রহিয়া গেল, মনের মত করিয়া একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতে পারিলাম না। ছেলেরা সাহায্যের জন্য আসে, এখন আর সে অবস্থা আমার নাই।—সাহায্য করিতে পারি না—প্রাণ ফাটিয়া যায়। দানের অক্ষমতায় সময় সময় নিজের উপর যে

ক্ষোভ আসে, বিরক্তি হয় তাহারই ফলে প্রার্থীকে রূঢ় প্রত্যাখানে ফিরাইয়া দিই, কিন্তু কি যে আমার ব্যথা তাহা সেই অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন! যাক্—আমার দিন ত ফুরাইয়া আসিল!" বুঝিলাম আজ জীবনী-লেখার উপাদান সংগ্রহ হইবে না, মহারাজ এখন অন্য এক জগতে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু সেদিন সাগরসদৃশ হৃদয়ের সুগভীর স্পর্শ অনুভব করিলাম। হরি হরি বলিয়া মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্দরে যাইবার আগে একবার তিনি হাত মুখ ধুইতে উত্তরের 'বাথরুমে' যাইতেন—পথে সিঁড়ির ধারে একটী ছাত্র দাঁড়াইয়া আছে, হাতে একখানা কাগজ। মহারাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?—রাত্রি ১২টা বেজে গিয়েছে!" ছাত্রটি উত্তর করিল "মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম—আমাকে ঢুক্‌তে দেয় নাই।" মহারাজ বলিলেন—"আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে লোক ফিরে যায় বা ঘরে ঢুক্‌তে পায় না—এ আমি আজ প্রথম শুন্‌ছি।" মহারাজের ক্রোধ-উত্তপ্ত কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল; চোপ্‌দারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আমার দুঃসময় পড়েছে বলে' তোরা কি আমাকে এমনি করে অপমান করবি?"—ছাত্রটিকে সঙ্গে লইয়া তিনি আবার অফিস-কামরায় প্রবেশ করিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। দ্বিপ্রহর রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দানশৌণ্ড মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ক্ষণকাল যেন ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ছাত্রটির প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া মহারাজ স্মিতহাস্যে ধীরে ধীরে বলিলেন—"এ অভাব—এ দুঃখের কি শেষ আছে?"

দীনের কুটীরে মহারাজ

সন ১৩১১ সালের বৈশাখ মাসে একদিন মহারাজ ল্যাণ্ডো গাড়ী করিয়া বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বহরমপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের রাস্তা ঘুরিয়া তাঁহার গাড়ী বাঞ্জেটিয়া নামক স্থান দিয়া

যখন উত্তর মুখে অগ্রসর হইতেছিল সেই সময়ে ভীষণ ঝড় উঠিল। অনেক পূর্ব্বেই পশ্চিমে মেঘ দেখা দিয়াছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হওয়ায় মহারাজ তাড়াতাড়ি ঘোড়া হাঁকাইতে বলিলেন। কিন্তু গাড়ী অধিক দূর যাইতে না যাইতেই ভীষণ বেগে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঐ স্থানে অনেকগুলি বেলদারের বাস ছিল। ইহারা ইঁট ভাঙ্গিয়া সুরকী কুটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ইহাদের বেলদার বলে। ইহারা হিন্দু, পশ্চিমদেশীয়। ঐ সময় উপায় না দেখিয়া মহারাজ সেই বেলাদার পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেলদার-গণ মহানন্দে মহারাজের ন্যায় অতিথিকে আশ্রয় দান পূর্ব্বক ধন্য হইল। ঝড় বৃষ্টির সময় মহারাজ তাহাদের যত্নে বিশেষ তৃপ্ত ও আনন্দ বোধ করিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া মহারাজ বিপদে আশ্রয়দাতা বেলদারগণকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

দরিদ্রবন্ধু মহারাজ

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অফিস হইতে বেলা ৪টার সময় মহারাজ কাশিম-বাজার ফিরিয়া আসিতেছেন। মহারাজের আদেশে সেদিন তাঁহার ড্রাইভার মোটর গাড়ী সারগাছির রাস্তা দিয়া না চালাইয়া খাগড়া বাজারের মধ্যে দিয়া চালাইয়া আসিতে লাগিল।

মোটর তেলকলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময় কতকগুলি মজুর ঐ মোটর খানিকে ভাড়া-খাটা "বাস্" মনে করিয়া বালির ঘাট যাইবার আশায় ড্রাইভারকে গাড়ী থামাইতে বলিল। এই ঘটনা মহারাজ স্বচক্ষে দেখিলেন। ড্রাইভার তাহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু দরিদ্রবন্ধু মহারাজ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ড্রাইভারকে মোটর থামাইতে বলিলেন। অগত্যা ড্রাইভার মোটর থামাইয়া মহারাজের আদেশে ঐ মজুরদিগকে মোটরে উঠাইয়া লইল

এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটর ছাড়িয়া দিল। মজুরেরা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারে নাই। গাড়ীতে উঠিয়া প্রথমেই পোষাকপরা চোপদারকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই মহারাজের দিকে তাকাইয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তাহারা যে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সঙ্গে যে কোদাল এবং ঝাঁকা ছিল সেইগুলি লইয়া তাহারা বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহারা গাড়ীতে বসিতে সাহস করিতেছিল না। এ দিকে গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে—নামিবারও উপায় নাই সুতরাং ভয়ে বিস্ময়ে মজুরেরা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মহারাজ তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া হাসিমুখে তাহাদিগকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন এবং বসিতে বলিলেন। তাহারা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বসিতে সাহস করিল না। পরে মোটর রাজবাটীর নিকটে কুর্জ্জন চেরিটেবল্ ডিস্পেন্সারির সম্মুখে আসিলে মহারাজের আদেশে ড্রাইভার মোটর থামাইল। মহারাজ মজুরগণকে ঐ স্থানে নামিয়া যাইতে বলিলেন কারণ, পশ্চাতেই বালির ঘাটের "বাস্" আসিতেছিল। মহারাজ ঐ "বাসে" কুলিদিগকে বালির ঘাট যাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। তাহারা যে মহারাজের প্রতি কি ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং অপরাধের ক্ষমা চাহিবে তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হৃদয়ের অব্যক্ত কৃতজ্ঞতা লইয়া তাহারা অপরাধীর মত মাত্র একটি 'সেলাম' দিয়া মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইল।

কথার মানুষ মহারাজ

কাঞ্চনতলার প্রসিদ্ধ জমিদার ভগবতী বাবু মহারাজের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। রাজত্ব লাভের পূর্ব্বে মণীন্দ্রবাবু একবার কাঞ্চন তলায় গিয়া উক্ত ভগবতী বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঐ স্থানে ব্রহ্মানন্দ

আচার্য্য নামক জনৈক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বাস করিতেন। মহারাজের হস্তরেখা দর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনি নিশ্চয়ই অমুক সময়ের মধ্যে রাজা হবেন।" তদুত্তরে মহারাজ বলেন—"আপনার গণনা যদি সত্য হয় তবে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করিব।" রাজ্যলাভের তিন বৎসর পরে ঐ কথা মণীন্দ্রচন্দ্রের মনে পড়ায়, ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যকে তিনি মোটা রকমের অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

সহজ জীবনের মাধুর্য্য

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী, ধন্য নদী কঙ্কণা"—বলিয়া যে একটা চল্‌তি কথা আছে, নদীয়া জেলার সেই বিরলবাস উৎসন্নপ্রায় শিবনিবাস গ্রামখানির উত্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম—চন্দননগর। শিবনিবাস এককালে নদীয়া-মহারাজের সাময়িক আবাসস্থল ছিল—এখনও এখানে বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্ন ভিত্তি এবং বিরাট বিগ্রহ রাম, সীতা ও শিবের মন্দির আছে। দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় কামাখ্যা নাগ মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি এই চন্দননগরে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা পলিটেক্‌নিক্ স্কুলের আদর্শে 'রাধাদামোদর ইন্‌ষ্টিটিউসন' নাম দিয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। একে পলিটেক্‌নিক স্কুল তাহাতে আবার ঐতিহাসিক স্থান—অনুরোধ মাত্রেই মহারাজ তাহার বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার সম্মতি দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বদিনে সেখানে আমরা উপস্থিত হইলাম—পর দিন মহারাজের পৌঁছিবার কথা। ট্রেণে সারারাত্রি জাগিয়া প্রাতে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে নামিয়া একখানি অর্দ্ধভগ্ন মোটর গাড়ীতে ধূলিধূসরিত মণীন্দ্রচন্দ্র বেলা বারটার সময় চন্দননগর বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন—চারিদিকের জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহারাজের মুখের উপরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তির চিহ্ন নাই—লেশমাত্র বিরক্তি হইয়াছে এমনও

বোধ হইল না ;—হাসিমুখে মোটর হইতে নামিয়া সমবেত লোকদিগকে মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন—সকলে অবাক্ হইয়া গেল। অতি সাধারণ পরিচ্ছদ—হাতের লাঠিটার মূল্য দেড় টাকার বেশী হইবে না,—আর জুতাটা? একটুও জরির কাজ নাই—এ তবে কেমনধারা মহারাজ? আমাদের সামান্য জমিদার বাবু যে উহা অপেক্ষা দামী জুতা পায়ে দেয়!—আর দেখিয়াছ,—পাতলা আদ্ধির পাঞ্জাবীটার নীচে কি একটা গেঞ্জিও পরা যাইত না!—এ যেন আমাদেরই আত্মীয় স্বজন—ভিন্ গাঁয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছে!—জনতার মনের ভাব যেন এইরূপ!

বিপুল সংবর্দ্ধনার সহিত—সভার অধিবেশন হইয়া গেল। রাত্রে মহারাজের ফিরিবার কথা ;—মহারাজের সঙ্গে ছিলেন আমাদের স্কুল-শিক্ষক, মহারাজের উকীল স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। মহারাজ আমাকেও সঙ্গে আসিতে বলিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, চারিদিকে মেঘ জমিয়া উঠিতেছে।—একখানি ছোট নৌকায় কম্বলের উপর মহারাজ শয়ন করিলেন, কিছুতেই বিছানা পত্র বিছাইতে দিলেন না, আমি ও ধর্ম্মদাস বাবু বসিয়া রহিলাম। ছোট ডিঙ্গী নৌকা কঙ্কণা নদীর উপর দিয়া সর্ সর্ করিয়া বাহিয়া চলিয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে মাজদিয়ার ঘাট হইতে পদব্রজে ই, বি, রেলের মাজদিয়া ষ্টেশনে আমরা উপস্থিত হইলাম। ওয়েটিং রুমের ইজি চেয়ারে ছারপোকা, ট্রেণ আসিতে প্রায় দুই ঘণ্টা দেরী,—একখানি বেঞ্চী টানিয়া মহারাজ তাহাতেই শুইয়া পড়িলেন—পাশ ফিরিলেই কিন্তু পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।—আমি নিকটে জাগিয়া বসিয়া থাকিলাম।

রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিয়া কাশিমবাজার যাইতে হইবে—ট্রেণ থামিতে না থামিতে মহারাজ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। যাঁহার উপর মহারাজের তত্ত্বাবধানের ভার, সেই ধর্ম্মদাস বাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত—মহারাজ তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিতে

ছুটিলেন।—ধর্ম্মদাস বাবুর যাহা কর্ত্তব্য মহারাজ তাহা করিলেন বলিয়া ধর্ম্মদাস বাবু লজ্জিত ;—মহারাজ কিন্তু ইহাতে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন না শুধু স্মিত হাস্যে বলিলেন—"গাড়ী বদল করতে হবে যে, কলকাতা যেতে গেলে ঘুমান চলে।—চলুন চলুন, ও প্লাটফর্‌মে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

একটি দিনের স্মৃতি

কুম্ভমেলায় যাইবার বৎসর,—তখন শীতকাল। মহারাজের মুখের বামদিকে 'প্যারালিসিসের' মত হইয়াছে। কলিকাতার বাড়ীতে দক্ষিণ দিকে তাঁহার নিজের অফিস ঘরে বসিয়া আছেন— সময়টা ঠিক তখন অপরাহ্ন। অফিসের কাজ কর্ম্ম করিতেছেন—বেহারা আগুনের সেদ করিয়া দিতেছে। সুপ্রভাত বাবু নকল বহিতে চিঠি নকল করিতেছেন। আমি মহারাজের সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি। মহারাজ খুব গম্ভীর—আমি যাইবার পূর্ব্বে যেন খুব একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কথায় কথায় মহারাজ নিজেই বলিয়া ফেলিলেন—"বহুদিনের বহু মূল্যবান আঙটিটি আজ গেল।" "গেল?" "গেলই ত, এই তুমি আসবার ঘণ্টাখানেক আগে—ক্যাশবাক্স খুলে * * কে টাকা দিলাম—এই ছোট চৌকো ফাঁকটিতে আঙ্‌টিটা থাকে—জানে না কে? কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটিতে টেবিলে পড়েছে বা কোনও রকমে ঠাঁইনড়া হয়েছে—আর রক্ষা নাই।—হরি বোল! হরিবোল!"—"আঙ্‌টিটার দাম কত হ'বে?" "কয়েক হাজার টাকা, একখানা পাথরের দামই হবে পঁচিশ হাজার টাকা। টাকা ত গেলই—তার সঙ্গে অনেক দিনের অনেকখানি দুঃখের স্মৃতিও মুছে গেল।" বলিয়া মহারাজ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। মনে ভাবিলাম, যে লইয়াছে তাহার আখেরের ভাবনা আর ভাবিতে হইবে না। সকলেই চুপ করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছে—অতি প্রয়োজনে দু'একটি কথা হইতেছে মাত্র।

ক্যাশব্যাক্সে চাবি দিয়া 'বাথরুমে' যাইবার জন্য মহারাজ উঠিলেন—আমি উঠিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন—"বস—আমি আস্‌ছি।"

একলা বসিয়াই আছি,—সুপ্রভাত বাবু ধূমপানের সুযোগ পাইয়া কক্ষান্তরে গিয়াছেন। বেহারা গেল সেদ দেওয়ার আগুন বদলাইতে।

বসিয়া বসিয়া আঙ্টীর কথাই ভাবিতেছি,—আর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছি,—মনের দুরাশা এই টেবিলের উপরে বা নীচেয়,—ওই চেয়ারের পাশে যদি বা হিরার আঙ্টীটা জ্বলিয়া উঠে—তাহা হইলে সেটি সানন্দে মহারাজের হাতে তুলিয়া দিয়া কৃতার্থ হই। মনে মনে হাসি পাইল—অসম্ভবের প্রতি লোভ ও অনায়াসে মহারাজকে তুষ্ট করিবার ইচ্ছাতে লজ্জিত হইলাম।

পাথরের টেবিলের ঠিক নীচে হঠাৎ কি যেন চক্ চক্ করিয়া উঠিল।—না, না, ও অপরাহ্ন বেলার রৌদ্র—সার্শির আবরণ ভেদ করিয়া ক্ষীণ রেখায় টেবিলের নীচে পড়িয়াছে। আবার দৃষ্টি দিতেই জৌলসটা যেন চোখ ঝলসাইয়া দিল—কম্পিত হাতখানি বাড়াইয়া দিতেই হাতে ঠেকিল আঙ্টী—একটা অসম্ভব উত্তেজনার আতিশয্যে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম—মহারাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব এই আশায় অধীর হইয়া পড়িলাম।

হরি হরি বলিতে বলিতে মহারাজ চেয়ারে আসিয়া বসিলেন—আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন,—আমি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজের হাতে আঙ্টিটি দিলাম ;—বিপুল বিস্ময়ে মহারাজের চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—"এ কি হে ?—কোথায় পেলে ?" টেবিলের নীচে পেয়েছি—বলিয়া আমি আনুপূর্ব্বিক সব কথা বলিলাম। খুব পরিশ্রান্তভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া মহারাজ ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে না এলে এ আঙ্টি আমি পেতাম না। হরি বোল! হরি বোল।"

চোখে মুখে তখন মহারাজের যে আনন্দের ভাবটি ফুটিয়া উঠিল

তাহা অবর্ণনীয়, আমার আঙুটি ফেরৎ দিবার মূল্য তাহাতেই যেন শতগুণে আদায় হইয়া গেল।

স্নেহপ্রবণ প্রভু

মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের 'হরকু' নামক একটি প্রিয় খানসামা ছিল। হরকু বিশ্বাসী ভৃত্য। মহারাজ রাজত্ব পাইবার ঠিক পরেই তাঁহার পরিবারবর্গ যখন কিছুদিনের জন্য কলিকাতাপ্রবাসী ছিলেন সেই সময় মহারাজকুমারের সঙ্গে হরকুও কলিকাতায় অবস্থান করিত। কলিকাতা বাসকালে হরকু কোনও অপরাধে মহারাজের ভগ্নীপতি শান্তিরাম বাবু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়, ইহার ফলে অপরাধী হরকু অভিমান করিয়া কলিকাতার বাটী হইতে চলিয়া যায়। কাশিমবাজার হইতে মহারাজ এই সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার কর্ম্মচারী যতীন্দ্রনাথ দত্তকে যে পত্র লেখেন, সেই পত্র পড়িলে তিনি যে নিজের ভৃত্যগণের প্রতি কতখানি স্নেহপ্রবণ ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র পত্র হইতে আমাদের আলোচ্য অংশ উদ্ধৃত হইল।

প্রিয় যতীন্দ্রনাথ,

* * * শ্রীযুক্ত শান্তিরাম বাবুর নিকট হরকুকে ক্ষমা চাহিতে বলিবে এবং শান্তিরাম বাবুকে বলিবে তিনি যেন হরকুকে ক্ষমা করেন এবং সেজদিদিকে বলিবে তিনিও যেন হরকুকে ক্ষমা করেন। চাকর পুত্রস্বরূপ, তাহাদের অপরাধ লইয়া সংসার করা চলে না। * * *

বলাবাহুল্য মহারাজের পত্র পাওয়ার পরে পুনরায় হরকুকে কাজে বাহাল করা হইয়াছিল।

কোমলে-কঠোরে

মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র বি-এ, পড়ার জন্য কলিকাতায় থাকিতেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং স্বনামধন্য হুইলার সাহেব তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। মহারাজকুমার অনেকদিন কাশিমবাজার যান

নাই। প্রিয়তম পুত্রকে দেখিবার জন্য মহারাজের মন ব্যকুল হইল। নূতন গৃহশিক্ষকদ্বয়ের সংস্পর্শে আসিয়া পুত্রের কতদূর উন্নতি হইল এবং পুত্র কলিকাতায় কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন এই সব জানিবার জন্য মনে কৌতূহল উপস্থিত হওয়ায় মহারাজ কলিকাতায় যাওয়া স্থির করিয়া একদিন তথাকার প্রধান কর্ম্মচারীকে পত্র লিখিয়া যথাসময়ে কলিকাতা রওনা হইলেন।

সেবার কলিকাতা যাত্রাকালে মহারাজের সঙ্গীয় কর্ম্মচারী ছিলেন সূর্য্যকান্ত আচার্য্য। তখনও রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ লাইন হয় নাই। আজিমগঞ্জ হইতে ট্রেণে চাপিয়া মহারাজ মনের আনন্দে কলিকাতায় চলিলেন। ট্রেণ যতই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল প্রবাসী পুত্রের মুখ মনে করিয়া মহারাজ ততই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দুই পার্শ্বের ট্রেণের চলমান দৃশ্যপটের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে পুত্রমুখের কল্পনা-মাধুর্য্য মহারাজের মনে এক স্বপ্নজাল বুনিয়া যাইতে লাগিল। মহারাজ নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া সেই স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যথাসময়ে ট্রেণ হাওড়ায় পৌঁছিল। পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা এষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ ল্যাণ্ডো গাড়ী লইয়া যথারীতি ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া মহারাজ দেখিলেন প্লাটফর্ম্মে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যোগীন বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। মহারাজের ব্যাকুল চক্ষু সেই প্লাটফর্ম্মের ভীড়ের মধ্যে তাঁহার প্রিয় পুত্র মহিমচন্দ্রকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার তৃষিত মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। যোগীন বাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহিম কেমন আছে?" উত্তরে মহারাজকুমার কুশলে আছেন জানিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু ক্ষুণ্ন মনে গাড়ীর উপরে উঠিয়া বসিলেন। হেড্ কোচম্যান হোসেনিকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন—'হোসেনি কই?' উত্তরে যোগীন বাবু বলিলেন—'তাঁহাকে মহারাজকুমার 'সস্‌পেণ্ড' করেছেন।'

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—অপরাধ ?

যোগীন্দ্র বাবু হোসেনির অপরাধ ব্যক্ত করিলে মহারাজ গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। মহারাজকে লইয়া যথাসময়ে ল্যাণ্ডো গাড়ী কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডস্থিত প্রাসাদের গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ গাড়ী হইতে নামিয়া বরাবর প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক বিশ্রামার্থ একটি ঢালা সতরঞ্চের উপরের বিছানায় গিয়া বসিলেন। যোগীন বাবু সূর্য্যকান্ত বাবুকে বলিলেন—'বসুন আপনারা, বিশ্রাম করা যাক্।'

মহারাজের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে ঢালা ফরাসের উপরে সূর্য্য বাবু ও যোগীন বাবু বসিয়া আছেন। দুই একটী করিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে কর্ম্মচারী, চাকর, দ্বারবান এবং পাচক ব্রাহ্মণদল মহারাজকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া গেল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত প্রিয়পুত্র মহিমচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া মহারাজ মনে মনে খুবই বেদনা অনুভব করিলেন এবং মহিমচন্দ্রকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার জন্য যোগীন বাবুকে দিয়া খবর পাঠাইলেন। মহিমচন্দ্র কি একটি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া পিতৃদর্শনে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, যোগীন বাবু তাঁহাকে ডাকিতে যাইবার পূর্ব্বেই তিনি আসিয়া পিতৃপদে প্রণত হইলেন।

বিনয়ী পুত্র পিতাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকার কিছুক্ষণ পরে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া পিতা মণীন্দ্রচন্দ্র বলিলেন —'কিহে, তোমার কর্ত্তব্য শেষ হ'য়ে গিয়েছে ?

মহারাজকুমার পিতার এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাজ। চুপ ক'রে রইলে যে, উত্তর দাও।

মহিম। আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

মহারাজ। বুঝতে পারলে না, আশ্চর্য্য বটে! আমার সঙ্গে যে ইংলিস ডিপার্টমেণ্টের সূর্য্য বাবু এসেছেন এবং তোমারি সম্মুখে বসে

আছেন তাঁর দিকে কি তোমার নজর পড়লো না? তিনি আমার বিশিষ্ট কর্ম্মচারী এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁকে প্রণাম করাটা কি তোমার কর্ত্তব্য বলে মনে হ'ল না?—না তিনি কর্ম্মচারী বলে তাঁকে প্রণাম করতে লজ্জা বোধ হ'ল? যদি তাই হয় তবে বুঝতে হ'বে এখনও পর্য্যন্ত তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে নি। আর ব্রাহ্মণকে চাকর ভেবে প্রণাম না করার দম্ভ যদি তোমার এসে থাকে তবে আমি বল্‌বো যে কাশিম বাজারের মহারাজকুমার হ'বার যোগ্যতা এখনও তোমার আসে নি। বড়ই দুঃখের কথা যে, তুমি যাতে সত্যকারের মনুষ্যত্ব লাভ কর্ত্তে পার তার জন্যে আমি বাঙ্গলাদেশের দুটী শ্রেষ্ঠ বিদ্বানকে তোমার গৃহ-শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করেছি। রামেন্দ্রসুন্দর আর হুইলারের মত পণ্ডিত ভারতের গৌরব। বিভিন্ন জাতীয় দুইটী আদর্শের চিন্তাধারা এবং শিক্ষা-সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে তুমি মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে, এই ভেবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি এবং তোমার সম্বন্ধে ভবিষ্যতের কতই না সুখস্বপ্ন দেখছি। এই দুইটী মনীষীর কাছে শিক্ষা গ্রহণের কি এই পরিণাম? এমন দু'টী শিক্ষকের শিক্ষা এবং চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়েও জীবন গড়ে উঠার প্রথম স্তরেই যখন তোমার লৌকিক জগতের জ্ঞান ও দৃষ্টি এত সঙ্কীর্ণ তখন তোমার সম্বন্ধে আমি কি আশা করব?"

এই বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহারাজ আবার বলিলেন—"দেখ, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বড়ই আদরের পাত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শিক্ষার জন্য বিদেশে রাখিয়া পিতা মাতার প্রাণ যে কিরূপ ছট্‌ফট্‌ করে তা পুত্রেরও কিছু বোঝা উচিত। তোমাকে অনেকদিন না দেখে প্রাণ ব্যাকুল হওয়াতে তোমাকে একবার দেখার জন্যই আজ আমার কলিকাতায় আসা। তুমি অনেক বড় হয়েছ এবং বি-এ, পড়ছ। তোমার এটা ভেবে দেখা উচিত যে, তোমার পিতা শত শত মাইল দূর থেকে তোমাকে দেখবার জন্য মনে কতখানি ব্যাকুলতা নিয়ে কলিকাতায় আসছেন। আমি আস্‌ছি শুনে আমাকে দেখবার

জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল হয় নি নতুবা তুমি কি যোগীন বাবুর সঙ্গে ষ্টেশনে থাক্‌তে পারতে না? কোথায় আমি হাওড়ায় পৌঁছে বহু দিন পরে প্রথমেই পুত্রমুখ দর্শন কর্ব্বো, তা' না, দেখলাম শুধু যোগীন বাবু ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। আমি মনে বড় আঘাত পেয়েছি। ষ্টেশন থেকেই আমি ব্যথিত মনে বাগান বাড়ীতে এলাম, এখানে এসে আরো আশ্চর্য্য হলাম! কোথায় আমি বাগান বাড়ীতে পৌঁছানো মাত্র তুমি এসে সব আগে আমার সম্মুখে দাঁড়াবে তা' না দেখছি, আমার চাকর বাকরদের দেখাশুনা যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন তুমি এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালে। যা'ক এ সব কথা। তার পর শুনলাম তুমি নাকি হোসেনিকে 'সসপেণ্ড' করেছ?

মহিমচন্দ্র মাথা নত করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ।

মহারাজ—কি অপরাধে?

হোসেনী মদ খাইয়া পড়িয়া থাকার দরুণ মহারাজকুমার দুই দিন সময় মত গাড়ী পান নাই, সেজন্য তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে এবং বাগান বাড়ীতে সে মাতলামি করিয়াছে,—ইত্যাদি কারণে হোসেনীকে তিনি সস্‌পেণ্ড করিয়াছেন শুনিয়া মহারাজ বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, এক দিন মদ খেয়ে মাতলামি করা এবং উপযুক্ত সময়ে দুই দিন গাড়ী না পাওয়ার দরুণ যদি তোমার মন অধৈর্য্য হয়ে উঠে, তবে ভবিষ্যতে এই সংসারে অজস্র বড় বড় ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে নিজের মন স্থির করে চল্‌বে কি করে? চাকর বাকরদের একটু ধৃষ্টতায় চঞ্চল হয়ে যদি তার শাস্তি বিধানের জন্য সঙ্গে সঙ্গে মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তবে ভবিষ্যতে এই এষ্টেট্‌ চালাবে কি করে? সহিস কোচম্যানের মনুষ্যত্ব কতখানি থাকে? ওদের নির্ব্বুদ্ধিতাই যে বেশী। তবু ওদেরকে নিয়েই আমাদের চল্‌তে হবে। তা'র দোষ হয়ে থাকে, তাকে কয়েক টাকা জরিমানা করলেই হ'ত। আজ আট দিন লোকটিকে সস্‌পেণ্ড করেছ, সে অতি দরিদ্র, তার অনেকগুলি পোষ্য, সুতরাং এই আট দিন তার

যে কি অবস্থায় সংসার চল্‌ছে, এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল। তুমি রাজার ছেলে হয়ে দিব্যি রাজভোগ খাচ্ছ এবং ল্যাণ্ডোতে চড়ে মজা করে বেড়াচ্ছ, আর তোমার এক মিনিটের ক্রোধের খেয়ালে এক অতি দরিদ্র পুরাণো চাকর এবং তা'র বৃহৎ পরিবার যে কি কষ্টে এই কয়দিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ল সে বিষয় তুমি একবারও চিন্তা করে দেখলে না! এই হৃদয় নিয়ে তুমি ভবিষ্যতে যে কি করে এষ্টেট চালাবে আমি কেবলই তাই ভাবছি। আরো তোমার ভাবা উচিত যে, এই আটদিন এক বিপন্ন পরিবারের দীর্ঘনিঃশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে তোমার চারিদিকে অমঙ্গলের সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘজীবী হতে গেলে মানুষের মনে কষ্ট দিতে নেই, এইটী সর্ব্বদা মনে রেখো। যাক্, যা' হ'বার হয়েছে, ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করো না। আর এখনি হোসেনীকে ডাকিয়ে মিষ্টি কথায় তাকে তার দোষ বুঝিয়ে দিয়ে কাজে লাগাও। মহিম, চাকরবাকরদের বশ কর্ত্তে হয় ভালবাসা দিয়ে।" —এই বলিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ হোসেনীকে ডাকাইয়া মহারাজকুমারের দ্বারাই তাহাকে আবার কাজে বাহাল করিয়া দিলেন।

অপরাধী কর্ম্মচারীর প্রতি করুণা

মহারাজের সেরেস্তার জনৈক কর্ম্মচারী—শ্রীপূর্ণানন্দ রায় নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ঃ—

বিগত সন ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আমি কাশিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের সঙ্গে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য ৺পুরীধাম গিয়াছিলাম, সেখানে গিয়া আমাকে একটী গুরুতর দায়িত্বের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল—তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ মহারাজ বাহাদুরের অসীম করুণার কথা বলিতেছি। আমি একদিন সকাল বেলা অফিসের সময়ে কাজ করিতেছি, এমন সময় পিয়ন আসিয়া মহারাজ বাহাদুরকে একখানি 'ইনসিওর' দিল, মহারাজ বাহাদুর সেই সময় বারাণ্ডায় বসিয়া তেল মাখিতেছিলেন, তিনি পিওনের নিকট হইতে 'ইনসিওর' সহি

করিয়া আমাকে ডাকিয়া সেখানি আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "দুপুর বেলায় অফিসের সময় আমাকে দিও।" আমি মহারাজের হাত হইতে কভারখানি লইয়া দেখিলাম যে ইহাতে মহারাজ বাহাদুরের "এলাউন্স" ২৫০০০৲ টাকার প্রথমার্দ্ধ নোট ম্যানেজার সাহেব পাঠাইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমি পাশে ঐ কভারখানি ফেলিয়া রাখিয়া কাজ করিতে লাগিলাম, আমার কাজ শেষ হওয়ার পর আমি যখন উঠিয়া যাই, সেই সময় ঐ কভারখানি আমি বাক্সের মধ্যে তুলিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মহারাজ বাহাদুর তেল মাখা শেষ করিয়া হঠাৎ কি মনে করিয়া অফিসের কামরার দিকে যাইয়া দেখেন ফরাসের উপর সেই ইন্‌সিওরের কভারখানি পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সেই কভারখানি তুলিয়া নিজে রাখিয়া দিয়াছিলেন, পুনরায় অফিসের সময় যখন আমরা সকলে অফিসের কাজ করিতে বসিলাম, সেই সময় তিনি আমাকে সেই কভারখানি দিতে বলিলেন, আমি আমার বাক্স খুলিয়া দেখি, আমার বাক্সের মধ্যে সেখানি নাই। আমি খুবই চিন্তায় পড়িলাম, চুপ করিয়া বোকারমত বসিয়া আছি, ইহা দেখিয়া মহারাজ বাহাদুর আমাকে বলিলেন, "কিহে বসে আছ কেন? ইন্‌সিওর দাও" আমি তখন বলিলাম, "হুজুর, বাক্সের মধ্যে ইন্‌সিওর রাখিয়াছিলাম কিন্তু এখন আমি ইন্‌সিওর পাইতেছি না। অথচ বাক্স যেমন তালা দেওয়া ছিল, তেমন অবস্থাতেই আছে।" তিনি আমার সমস্ত কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাহারা কে ছিল?" আমি তখন পাহারাওয়ালার নাম বলিলাম, তিনি তাহাকে বলিলেন, "বাক্স হতে টাকা কে নিল?" সেও হুজুরের কথা শুনিয়া অবাক্! তাহার পর আমাকে মহারাজ নানারূপ ভয় দেখাইতে লাগিলেন—কিছুক্ষণ পরে আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া মহারাজ বাহাদুর স্থির থাকিতে না পারিয়া আমাকে বলিলেন, "বাবা, তোমার মত এত অসাবধান কর্ম্মচারী নিয়ে আমার বিদেশে আসাই অন্যায় হইয়াছে। তুমি যে ইন্‌সিওরখানি উঠিয়া যাইবার সময় ফরাসের উপর ফেলিয়া গিয়াছিলে আমি তাহা তুলিয়া রাখিয়াছি। তুমি এত অসাবধান কেন? তোমার এই অসাবধানতার জন্য ৫৲ টাকা fine করিলাম।" আমি তখন বুঝিলাম মহারাজ বাহাদুর আমার উপর অত্যন্ত রাগিয়াছেন। আমি তখন আর কোন কথাই বলিলাম না। তাহার পর তিনিও আর আমাকে কোন কথা বলেন নাই। জরিমানাও মাফ হইয়া গেল। ভগবান আমাকে সে যাত্রা উদ্ধার করিলেন। যদি অন্য কোন মনিব হইত তাহা হইলে তিনি বোধ হয় আমাকে

জেলে দিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকুরী হইতে ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দিতেন। কিন্তু মহারাজ কিছুই করিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন, "সর্ব্বদা সাবধান হইয়া কাজ করিবে।" মহারাজ বাহাদুরের এই প্রকার দয়ার জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলাম।

আশ্রিতবৎসল মহারাজ

সন ১৩১৪ সালে পূর্ণচন্দ্র দাস নামক মহারাজের জনৈক কর্ম্মচারী কোনও ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া রাজা আশুতোষ নাথের এক পশ্চিমা দারোয়ানকে প্রহার করেন। ঘটনায় দারোয়ানই দোষী। কিন্তু সে আত্মদোষ গোপনপূর্ব্বক পূর্ণদাসের নামে আপন প্রভুর রাজ-সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকটে নালিস করে। প্রধান কর্ম্মচারী এই ঘটনাটী রাজা আশুতোষকে জানান। রাজা নিতান্ত সদাশিব ব্যক্তি ছিলেন, তিনি এই বিষয়টী উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু রাজমাতা রাণী আর্ণাকালী তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন, একজন সামান্য প্রতিবেশীর হাতে তাঁহার দারোয়ান এই ভাবে লাঞ্ছিত হওয়ায় তিনি ইহাতে নিজেরই অপমান হইয়াছে মনে করিয়া পূর্ণচন্দ্র দাস যাহাতে 'সায়েস্তা' হন তাহার প্রতিকার কল্পে রাণী আর্ণাকালী দেবী পূর্ণ দাসের মনিব মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে এই বিষয়টী নিজ কর্ম্মচারীর দ্বারা জ্ঞাত করাইলেন এবং পূর্ণ দাসকে চাকুরী হইতে 'বরখাস্ত' করিয়া শাস্তি দিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ এই ঘটনা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং পূর্ণ দাসকে বিশেষ ভাবে তিরস্কার করিলেন বটে, কিন্তু রাণী আর্ণা-কালীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীটীকে 'বরখাস্ত' করিলেন না। কারণ মহারাজ মনে মনে বুঝিলেন, দারোয়ানের দোষের জন্যই তাহাকে পূর্ণ দাস মারিয়াছেন, এবং সে আঘাতও দুই একটী চড় চাপড় ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরে দারোয়ানই ঘটনাটিকে রূপান্তরিত করিয়া আত্মদোষ গোপনপূর্ব্বক নিজের মনিবের নিকট পূর্ণ দাসের বিরুদ্ধে

লাগাইয়াছে। সুতরাং এই সামান্য ঘটনার জন্য পূর্ণ দাসকে 'বরখাস্ত' করিলে অন্যায় করা হইবে এবং নিজের দরিদ্র কর্ম্মচারীর প্রতি অবিচার করা হইবে। ইহাই মহারাজ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। মহারাজ উক্ত কর্ম্মচারীকে কোনও শাস্তি প্রদান না করায় রাণী আর্ণাকালী মহোদয়ার সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘ কালের জন্য মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এই মনোমালিন্যের ফলে মহারাজ মনে মনে বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেন তথাপি অপর ধনী ব্যক্তির আভিজাত্য রক্ষার জন্য তিনি নিজের দরিদ্র কর্ম্মচারীটীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন নাই। এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য মনোমালিন্য ঘটিয়া দুই রাজ সংসারে সামাজিক দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই দলাদলির বিষে মহারাজ বহু দিন জর্জ্জরিত ছিলেন, তথাপি তিনি পূর্ণ দাসকে ত্যাগ করেন নাই। আশ্রিতকে রক্ষা করা তাহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল।

ছদ্মবেশে কার্য্য-পরিদর্শন

মহারাণী স্বর্ণময়ীর আমলে রাজবাড়ীতে শ্রীশ্রীরাসযাত্রা একটী মহা ধূমধামের পর্ব্ব ছিল। এই উপলক্ষে রাজবাটীর সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানকে ঘিরিয়া মাথার উপর বিস্তৃত চন্দ্রাতপ খাটাইয়া বিচিত্র সজ্জায় সেই বিরাট মণ্ডপ সজ্জিত করা হইত। নানাবিধ পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পিগণের দ্বারা বিচিত্র মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া এক একটী বিভিন্ন দৃশ্যে রাস-মণ্ডপটিকে রঙ্গমঞ্চের রূপ দেওয়া হইত। এই মহোৎসবের সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষগণ পনর দিন ব্যাপী একটী বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান করিতেন। রাসোৎসব এবং তৎসংযুক্ত মেলা দেখিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইত। যাত্রীগণের চিত্ত-বিনোদন জন্য উক্ত উৎসব ও মেলার সঙ্গে দৈনিক অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত পুতুল নাচের ব্যবস্থা হইত। মণীন্দ্রচন্দ্র রাজগদী লাভ

করিয়া রাসযাত্রা মহোৎসবের উক্ত অনুষ্ঠানগুলিকে নূতনরূপ দিয়া অধিকতর দ্রষ্টব্য করিয়া তুলিলেন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ অস্থায়ী বস্ত্রমণ্ডপকে উঠাইয়া দিয়া তিনি উক্ত রাসযাত্রা পর্ব্বের উৎসব এবং মেলার স্থানকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বদিকে একটী চক্‌মিলানো বিশাল একতলা বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। উক্ত বিশাল ইমারতের মধ্যে রাসযাত্রা-পর্ব্বের সমস্ত উৎসব নির্ব্বাহ হওয়ায় নানাবিধ দৈব দুর্য্যোগ হইতে যাত্রীদল, মৃত্তিকাশিল্প এবং মেলা নিরাপদ হইল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শৃঙ্খলায় কার্য্য চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ ঐ মেলাটী বহু জনাকীর্ণ হইয়া পড়ায় সময় সময় দুশ্চরিত্র নরনারীর সমাগম হওয়াতে মহারাজ চিন্তিত হইলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে কোনও গ্লানিকর ঘটনা ঘটিতে না পারে সেজন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন।

কি প্রকারে মেলার শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে তাহা ছদ্মবেশে পরিদর্শন করিবার কৌতূহল মহারাজের মাঝে মাঝে হইত। এ সম্বন্ধে একটি গল্প মহারাজের বিখ্যাত চোপদার মুকুন্দের নিকট আমরা শুনিয়াছি। একবার রাসের মেলা খুব জনাকীর্ণ। রাত্রি ৮টা। রাস-মণ্ডপে তখন পুতুল নাচ হইতেছে। মেলার স্থান হইতে সহস্র সহস্র নরনারীর কণ্ঠরোল রাজবাটীতে পর্য্যন্ত শোনা যাইতেছিল। সে দিন সন্ধ্যাকাল হইতে মেলাক্ষেত্রে নানাবিধ গোলমাল এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতেছিল। মেলার শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার দিকে প্রহরিগণের বোধ হয় সেদিন সতর্কদৃষ্টি ছিল না। মহারাজ রাজবাটীতে নিজের খাস কামরার বারান্দায় পাদচারণ করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁহার দেহরক্ষী এবং সান্ত্রীগণের নিকট হইতে কখন দূরে সরিয়া গেলেন। চোপদার মহারাজের সঙ্গ লইতে গেলে মহারাজ ইসারায় তাহাকে নিষেধ করিলে, চোপদার আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। সকলে দেখিল; মহারাজ তাঁহার পুত্র শ্রীশচন্দ্রের কামরার পূর্ব্বদিকের খোলা ছাদে রেলিং

ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ স্থানটীর ঠিক নীচেই রাসবাড়ী এবং মেলার স্থান। ঐ স্থান হইতে মেলার সমস্তই দেখা যাইত। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ রেলিং ছাড়িয়া সিঁড়ির সম্মুখে আসিলেন—তার পর হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মহারাজ অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার পর চোপদার এবং ভৃত্যেরা কৌতূহল বশতঃ মহারাজের সন্ধান লইবার জন্য অগ্রসর হইয়া যখন দেখিল সেখানে মহারাজ নাই, তখন তাহারা নীচে নামিয়া বরাবর সদর দেউড়ীতে গিয়া প্রহরীর নিকটে জানিল—এইমাত্র তিনি একাকী রাসবাড়ীর মেলার দিকে চলিয়া গেলেন। মহারাজের প্রকৃতি সকলেই জানিত, দেউড়ী হইতে কোনও সিপাহী বা কর্ম্মচারী মহারাজের পশ্চাদনুসরণ করিতে সাহস করিল না। ভৃত্য, প্রহরী, চোপদার প্রভৃতি সকলেই একত্রে কৌতূহল লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। এদিকে মহারাজ নিতান্ত সামান্য পরিচ্ছদে রাজবাটী হইতে একাকী বাহির হইয়া গিয়া মেলার ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। মহারাজ জানিতেন যে, তাঁহাকে সর্ব্বদা দেহরক্ষী কর্ত্তৃক চোপদারের সহিত পরিবেষ্টিত দেখিয়া সাধারণের দৃষ্টি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাকে হঠাৎ এই ভীড়ের মধ্যে একাকী সাধারণ বেশে ভ্রমণ করিতে দেখিলে কেহই তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিবে না এবং লক্ষ্য করিলেও অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিবে না। ফলে তাহাই ঘটিল। ভীড়ের মধ্যে সামান্য বেশধারী মহারাজের প্রতি কেহই দৃকপাতও করিল না। এইরূপ ভাবে মহারাজ সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া মেলাক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া রাসমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মহারাজের দিকে যে সকল পরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টি অতর্কিতে পতিত হইল তাহারা ঐ অবস্থায় মহারাজকে দেখিয়া হঠাৎ বিস্ময়ে ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইল এবং সরিয়া যাইতে লাগিল। জনৈক কর্ম্মচারী ভীড়ের মধ্যে মহারাজকে

সপার্ষদ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

ঐ ভাবে দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"হুজুর একি, আপনি একা?" —মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"চুপ্।" এবং তাড়াতাড়ি সেস্থান হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। সেই কর্ম্মচারীও মহারাজকে আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। প্রহরিগণের মধ্যেও কেহ কেহ মহারাজকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, কিন্তু ভয়ে কেহ তাঁহার দিকে তাকাইতে সাহস করিল না। এই ভাবে মহারাজ তাঁহার গুপ্ত ভ্রমণ শেষ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রাজবাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর দিন এই কথা কাণে কাণে সকলের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং তাহার পর হইতে রাসের মেলার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল আর কোন দিন কোন গোলমাল হইল না।

কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণা

আজীবন প্রতিপালিত মণীন্দ্রচন্দ্রের কোনও একজন নিকট আত্মীয় তাঁহাকে কি একটা অসৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়া পত্র লিখেন, তাহারই উত্তরে তিনি লিখিতেছেন—

কার্ত্তিক, ১৩০১

পত্রাভাসে বুঝিতেছি এবং পূর্ব্বেও বুঝিয়াছি যে তুমি সাংসারিক জ্ঞান যথেষ্ট লাভ করিয়াছ, আমাদের অপেক্ষা তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি অধিক জাগিয়াছে, এই কারণে আমাকে পত্রদ্বারা উপদেশ দিয়াছ। মঙ্গলময় বিধাতা যদি আমাকে এইরূপ সৌভাগ্যবান করিতেন যে, তোমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে উপদেশ দিবার উপযুক্ত হইতে, তাহা হইলে আজ আমার যে কত আনন্দ হইত তাহা প্রকাশ করিবার নহে। কিন্তু ভগবান তাহা করেন নাই। * * * তুমি মহা অজ্ঞানী, যে কার্য্য কর্ত্তব্য নহে এবং যাহা আমার দ্বারা হইতে পারে না তাহার জন্য আমাকে কোন্ সাহসে লিখিয়াছ? এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তোমার অন্তরে স্থান পাইল? তুমি এতটা স্পর্দ্ধাবান হইয়াছ যে আমাকে দস্যু, পরস্বাপহারী হইতে বল! ধিক্ তোমার মনুষ্যধর্ম্মকে! ধিক তোমার হিতাহিত জ্ঞানকে! * * * তোমার এ নীচ প্রবৃত্তি কেন? পরধনে লোভ কেন? সংসারী হইয়া কায়িক

পরিশ্রমে বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনাদি করিয়া পরিবার প্রতিপালন, পরোপকার, ব্রতানুষ্ঠান করিয়া পরম কারুণিক ভগবানের প্রীতি সম্পাদন কর ইহাই আমার ইচ্ছা, ইহাই আমার উপদেশ।

স্নেহ-অধীর পিতা

তখন বর্ষাকাল,—মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্রের কাছে দিন কতকের জন্য কাশিমবাজার আছি। সকালে চা খাইয়া বসিবার ঘরে আসিয়া মহারাজকুমার এবং আমি খবরের কাগজ পড়িতেছি। মহারাজকুমার বলিলেন—"বাবা মাথরুণে তিলিজাতি সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন—এই সকালেই যাবেন।"—মহারাজের নিয়ম ছিল—কোনও স্থানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শ্রীশচন্দ্রকে নিকটে ডাকিতেন—কিছু বলিবার থাকিলে বলিতেন—শ্রীশচন্দ্র এবং রাজবাটীর অন্য সকলে প্রণাম ও নমস্কার করিলে মহারাজ—দুর্গা শ্রীহরি বলিয়া যাত্রা করিতেন।

হঠাৎ মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল—মহারাজের মোটর দেউড়ি পার হইয়া চলিয়া গেল। শ্রীশচন্দ্র যেন চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"বাবার মোটর চলে গেল? সে কি?—আমাকেত ডাক্‌লেন না?" এ ব্যতিক্রমে আমিও বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম—নানাপ্রকার গবেষণা হইতে লাগিল কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে আমরা আসিতে পারিলাম না। এক ঘণ্টার মধ্যেই রাধার ঘাট হইতে মহারাজের ড্রাইভার শম্ভুবাবু কাশিমবাজার রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজকুমারকে বলিলেন—"মহারাজ বাহাদুর আপনাকে ডেকেছেন—তিনি ঘাট পার হয়ে ষ্টেশনে গিয়েছেন, ট্রেণের দেরী আছে, আপনার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন—কি নাকি ভুল হয়ে গেছে।" শ্রীশচন্দ্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন—আমরা দুইজনেই মহারাজের খাস সেরেস্তার অন্যতম

প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া রাধার ঘাট পর্য্যন্ত মোটরে গিয়া গঙ্গার ওপার হইতে একখানি ভাড়া গাড়ী করিয়া খাগ্‌ড়া ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ওয়েটিং রুমের সম্মুখেই একখানি চেয়ার পাতিয়া মহারাজ বসিয়া আছেন। মুখখানি অসম্ভব রকম গম্ভীর—চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রমেই কি তিনি এমন অশান্তিবোধ করিতেছেন?—শ্রীশচন্দ্রকে দেখিয়াই মুখখানি হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তিনি শ্রীশচন্দ্রকে লইয়া ওয়েটিং রুমের মধ্যে চলিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে যখন বাহিরে আসিলেন,—দেখিলাম মেঘ কাটিয়া গিয়াছে—মহারাজ ট্রেণে উঠিলেন, আমরাও উৎফুল্ল মনে কাশিমবাজার রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

তুচ্ছের সম্মান

সেদিন সন্ধ্যার সময় কাজের ভীড় অনেকটা কম—মহারাজের অফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি ছোট বড় খামে সেদিনের যতগুলি চিঠি আসিয়াছিল, সবগুলি যথাস্থানে ফাইলবন্দী করার পর সেই খাম-গুলিকে লইয়া মহারাজ নিজে ছুরি দিয়া কাটিয়া সাদা অংশ একদিকে জড় করিয়া রাখিতেছেন—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই বলিলেন—'বাজে স্লিপের কাজ এ'তে বেশ চলে হে। দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে এই দেখ কেমন প্যাড হয়েছে।"—একখানি প্যাড আমার দিকে আগাইয়া দিলেন।

বিদ্যানুরাগ

(১)

"শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটে জানিবে এবার পাতঞ্জল পরীক্ষায় কোন পুস্তকের কতদুর পরীক্ষা দিতে হইবে। পটল ডাঙ্গার ভূদেব চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে কৈলাস সিংহের প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল্য কত? ছাপা কেমন? কাহার কাহার টীকা আছে? ইত্যাদি সংবাদ জানিয়া লিখিবে।"

"শুদ্ধিদীপিকা" গরাণহাটা ষ্ট্রীট্, ৩০নং বাটীতে অমৃতলাল দত্তের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য পাঁচ টাকা।"

'শব্দকল্পদ্রুম' ও ইহার ভাষাতত্ত্ব দেখিয়া "অম্লবেতস" কাহাকে বলে আমাকে জানাইবে।"

কয়েকখানি পত্র হইতে উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে মহারাজের বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়।

(২)

জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের সহিত কলিকাতানিবাসী ৺রামলাল মল্লিক মহাশয়ের কন্যার বিবাহ হয়। বিবাহকালে বধূরাণী বালিকা ছিলেন। এই বালিকা বয়স হইতেই বালিকা বধূকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য মহারাজ চেষ্টিত হইলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বৈবাহিক মল্লিক মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার কতখানি আগ্রহ ছিল। পত্র হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"* * * শ্রীমতী বধূমাতার শিক্ষার জন্য একজন ভাল শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা বিশেষ আবশ্যক। তাঁহার শিক্ষার বিষয়ে আপনি মনোযোগী হইবেন। বাল্যকালই শিক্ষার সময়। এই সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনোপযোগী শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত না করিলেই ভাল হয়। একজন ব্রাহ্মিকা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা আমার ইচ্ছা। ভাল শিক্ষয়িত্রী না পাইলে অগত্যা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবেন। শিক্ষা প্রথম হইতেই উচ্চ শিক্ষিত স্ত্রীলোকের দ্বারা হওয়াই আবশ্যক। এই কারণে গ্র্যাজুয়েট কিংবা অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বাল্যকাল ভিন্ন স্ত্রীলোকের শিক্ষার আর সময় নাই। এই ভাবিয়া এখন হইতে সময় নষ্ট না করিয়া প্রতিদিন ৪।৫ ঘণ্টাকাল যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। * * *"

পুস্তক-প্রীতি

মণীন্দ্রচন্দ্রের ভাগিনেয় রাজেন্দ্রবাবুকে দিয়া সন ১৩০১ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতার বাড়ী হইতে খোলা নৌকা করিয়া বিস্তর জিনিষপত্র বহরমপুর পাঠান হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে নৌকা যাত্রা করিবার অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং একাদিক্রমে ২২ দিন জলে ভিজিয়া ৩রা শ্রাবণ বহরমপুর আসিয়া নৌকা পৌঁছাইল। ৭০টি বালিশের একটিও ব্যবহারোপযোগী ছিল না। তিনটি সতরঞ্চ, তিনটি গদি, সাতটী লেপ এবং ছয় সাত শত টাকার পুস্তক জলে ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যায়। মণীন্দ্রচন্দ্র লিখিতেছেন—

"শ্রীমান রাজেন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতায় এই সমস্ত দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকগুলি জলের ভিতর ২২ দিন ছিল। ছয় সাত শত টাকার পুস্তক নষ্ট হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া ও ভাবিয়া আমাতে আর আমি নাই। আমার দুরবস্থায় আমি কি এত ক্ষতি সহ্য করিতে পারি? বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কেবল রাজেন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতায় এইরূপ ফলভোগ করিতে হইল। বর্ষাকালে শিশুও বোধ হয় ভিজিবার ভয়ে ছাতা না লইয়া বাহির হয় না। কিন্তু তোমরা অনাবৃত নৌকায় আমার যথাসর্ব্বস্ব বোঝাই করিয়া দিলে! যতী, আমার সর্ব্বস্বধন পুস্তকগুলি নষ্ট হইল। নৌকা হইতে পুস্তক তুলিবার সময় জল হইতে ছাঁকিয়া তুলিতে হইল। আর অধিক লিখিতে পারিতেছি না, বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ

সন ১৬৯৫ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে, ৭, নবীন সরকারের লেন নেবুবাগানের চারুচন্দ্র ঘোষ লিখিত "বিভা" পুস্তকখানি পাইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র চারুবাবুকে লিখিতেছেন—

"বিভা" চক্ষে দেখিয়াছি কিন্তু ঘটনাচক্রে বিভাকে অদ্যাবধি আদর করিতে পারি নাই। আমাদের কাঙ্গালিনী মাতৃভাষা বিভাকে পাইয়া নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা এখনও বিশেষ যত্নের সহিত দেখিবার

অবকাশ পাই নাই। আপনারা মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে যত্নবান আছেন জানিয়া পরম সুখী হইলাম। জগদীশ্বর আপনাদিগের মহান্ উদ্দেশ্যের যথোপযোগী পুরস্কার প্রদান করুন।"

সূক্ষ্ম আইন-জ্ঞান

৩৭৪নং আপার চিৎপুর রোডস্থিত জোড়াসাঁকো রাজবাড়ীতে মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতা পুত্রাদিসহ থাকিতে পারিবেন, রাজাবাহাদুর হরিনাথ এইরূপ ভাবে উইল করিয়া যান।—রাণী হরসুন্দরী কাশীবাস করিতে গেলেন—মহারাণী স্বর্ণময়ী সেই অজুহাতে উক্ত বাড়ী দখল করিতে ইচ্ছুক হইয়া সন ১২৯৫ সালের ২৯শে ভাদ্র, মণীন্দ্রচন্দ্রের যাবতীয় জিনিসপত্র উক্ত রাজবাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র রাণী হরসুন্দরীকে এ বিষয় একটা বিহিত করিতে যেমন অনুরোধ করিলেন অন্যদিকে তেমনি আদালতে যে ভাবে জবাব দিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া নিজ কর্ম্মচারী রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই মর্ম্মে লিখিয়া জানাইলেন,—

(ক) মহারাণী স্বর্ণময়ীকে ৶কাশীধামে বাসের ইচ্ছা জানাইয়াছেন বলিয়া রাণী হরসুন্দরী যে আর কখনও কলিকাতায় আসিবেন না, ইহা বলা যায় না, এবং ছয় বৎসর ৶কাশীধাম বাস করিতেছেন বলিয়া আর কখনও তিনি যে কলিকাতায় আসিবেন না, এমন কথাও কেহ বলিতে পারে না। আর রাণী হরসুন্দরীর আমলা যে কলিকাতায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন তাহা নানা কারণে সমীচীন।

(খ) স্বর্গীয় রাজা হরিনাথের উইলের মর্ম্ম এই :—"The said daughter (গোবিন্দসুন্দরী) with her family shall live with my family."

(গ) ১৮৪১ খ্রীঃ ১লা মার্চ্চ তারিখের হাইকোর্টের ডিক্রী দ্বারা মাষ্টার উইলিয়ম প্যাট্রিক গ্র্যাণ্ট সাহেবের উপর এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হয়—

"That some suitable house belonging to the Estate of the said late Raja Harinath Roy Bahadur ought to be set apart and appropriated for the residence of the said Srimaty Ranee Shusharmoyee Dasi and Sreemati Rani Harasundari Dasi and Sreemati Gobinda Sundari Dasi, the daughter of the said Raja Harinath Roy deceased, respectively."

(ঘ) উক্ত মাষ্টার উইলিয়ম প্যাট্রিক ১৮৪২ খ্রীঃ ৩রা মার্চ্চ তারিখে মাসহারা এবং বাটীর সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন।

(ঙ) ১৮৫৯ খ্রীঃ ২০শে জুনের ডিক্রী দ্বারা জোড়াসাঁকোর রাজ-বাটীর মেরামতি খরচ "রাণী হরসুন্দরী ও সুসারময়ীর রেসিডেন্স ফণ্ড" হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে গোবিন্দসুন্দরী তাঁহার মাতার গৃহে থাকিবেন এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

উদারতা

পুরীর মন্দিরে কীর্ত্তন হইতেছে—সেই কীর্ত্তনের আসরে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র উপবিষ্ট। এক বৃদ্ধা কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন, তাঁহার পরিধানে জীর্ণ মলিন বাস। তিনি মহারাজের নিকট আসিয়া পড়িলে মহারাজের পার্শ্বচরেরা বৃদ্ধাকে তথা হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া মহারাজ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নিজে একটু সরিয়া যাইয়া বৃদ্ধার বসিবার স্থান করিয়া দিয়া বলিলেন—মা, তুমি এইখানে বস। কাটোয়া ষ্টেশনে এক ভিখারিণীর পুঁটুলি বহিয়া, তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার কথাও অনেকে অবগত আছেন।

স্পষ্টবাদিতা

ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন শুনিয়া জনৈক বাল্যবন্ধু সাহায্য চাহিয়া মহারাজকে পত্র দিলেন কিন্তু তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রের পূর্ব্বাবস্থায় কোনও খোঁজ খবর লন নাই।—তাঁহার স্বার্থপ্রণোদিত পত্রে মণীন্দ্রচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া লিখিতেছেন—

৩০শে আশ্বিন, ১৩০১।

"আপনার পত্র পাঠে আমি একটী কারণে বিশেষ দুঃখিত হইলাম যে, আপনি লোকমুখে আমার অবস্থা উন্নত হইয়াছে জানিয়া আমার নিকট উপকার প্রত্যাশায় আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, নতুবা আমার কথা আপনার মনেও পড়ে নাই। অথবা যদি পড়িয়া থাকে গরীব বলিয়া মনে রাখেন নাই। সুখে দুঃখে যে বন্ধু সেই প্রকৃত বন্ধু। আমি বাল্যকাল হইতে আপনাদিগকে আমার বন্ধুস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছি * * * মানুষ কর্ম্মস্রোতে কখন কাহারও নিকটে কখনও বা দূরে অবস্থিত থাকে, কিন্তু তাহার মন কখনও দূরবর্ত্তী হয় না।"

ভাবুকতা ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা

সন ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস।—অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকা। মহারাজ তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারী রামদাস মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া একদিন তাঁহার দ্বিতল কামরার ছাদের উপরে বেড়াইতেছিলেন। ছাদের উপরে একখানি ক্ষুদ্র ত্রিতল ঘর, ঐ ঘরের পশ্চিম দিকের উন্মুক্ত ছাদে আসিয়া দুইজনে দাঁড়াইলেন। উচ্চ প্রাসাদের দ্বিতল ছাদের উপর হইতে কাশিমবাজারের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। মাথার উপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ। পশ্চিমে সুদূর আম্রবনের মাথার উপর দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। আম্রবনের শ্যাম সৌন্দর্য্য রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর হইতে মহারাজের চক্ষে এক স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করিল। মহারাজ বিভোর হইয়া সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রামদাস বাবুকে বলিলেন—

"রামদাসবাবু, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া কাশিমবাজারের উন্নতি সাধন করিব এই ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে বলবতী হইয়াছে। কাশিমবাজারের উন্নতি শব্দের অর্থ কাশিমবাজারকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করা। তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে কাশিমবাজারের আমের বাগানগুলি কাটিয়া ফেলা দরকার। কিন্তু আজ যদি সমস্ত বাগান কাটিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে ইহার শ্যামশোভা থাকিল কই? আচ্ছা, আমের বাগানগুলিকে বজায় রাখিয়া কাশিমবাজারকে স্বাস্থ্যকর করা যায় না?"

রামদাস বাবু খাঁটি বস্তুজগতের সাধারণ মানুষ। তাঁহার ভাবরাজ্য বলিয়া কিছু ছিল না। তিনি থতমত খাইয়া কি যে উত্তর দিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না; কেবল বলিলেন "মহারাজ, আগে স্বাস্থ্য তারপর সৌন্দর্য্য। স্বাস্থ্যই যদি না থাকিল তবে এ সৌন্দর্য্য ভোগ করিবে কে?" ভাবুক মহারাজ রামদাস বাবুর এই কথাটীর বিশেষ মূল্য উপলব্ধি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—"রামদাস বাবু, আপনি আমাকে খুব জ্ঞান দিলেন, একথাটি আমি ভুলিব না। তথাপি এই শ্যামশোভা নষ্ট করিতে আমার কষ্ট বোধ হয়।" এই কথোপকথন হইতে মহারাজের ভাবুকতা ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজবাটীর পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের বহুদূর বিস্তৃত বাগিচাগুলির মধ্যে কতক মহারাজের এবং অন্যান্যগুলি বিভিন্ন স্বত্বাধিকারিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। যে বাগিচা অপরের অধিকারভুক্ত, সেই বাগিচাগুলি উপযুক্ত মূল্যে তাঁহাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া বৃক্ষাদি কাটিয়া তিনি তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন এই ইচ্ছা ছিল। সেই সকল বাগান যদি উপযুক্ত মূল্যে স্বত্বাধিকারিগণ মহারাজকে কাশিমবাজারের উন্নতি কল্পে বিক্রয় করিতেন, তবে সেই সব বাগান এবং নিজের বাগানগুলি কাটিয়া মহারাজ নিশ্চয়ই কাশিমবাজারের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিতেন। অপর পক্ষের চেষ্টার অভাবে তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

কর্ত্তব্যপরায়ণতা

পাবনায় যিনি মহারাজের মোক্তার ছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইবার পর মহারাজের একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত বন্ধু জনৈক ব্যক্তিকে ঐ পদে বাহাল করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখেন। কিন্তু মৃত মোক্তার মহাশয়ের পত্নী নাবালক পুত্র লইয়া বিব্রত হইয়া পড়ায় তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে স্বামীর পদে বাহাল করিবার জন্য মহারাজকে একখানি দরখাস্ত করেন। মৃত মোক্তার মহাশয়ের আত্মীয়টি মোক্তার মহাশয়ের পত্নীকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি মোক্তার হইলে তাঁহার নিকট হইতে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়া যাইবে ইহা মনে করিয়া মোক্তার-পত্নী তাঁহার স্বামীর পদে তাঁহাকে বাহাল করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র মোক্তার পত্নীর দরখাস্তে সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার উপকার করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং স্বীয় বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া দরিদ্র মোক্তার-পত্নীর অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

কর্ত্তব্য-সম্পাদনে কঠোরতা

কলিকাতার বিখ্যাত পোষাকবিক্রেতা Allex Brault নামক একটী বিলাতী দোকান হইতে পোষাকের একখানি বিল কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে আসিয়াছিল। ঐ সময় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহারাজের ইংলিস ডিপার্টমেণ্টে কাজ করিতেন। তিনি তাঁহার অফিস হইতে বিলখানি হাতে করিয়া বিলের লিখিত বিষয়গুলির বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য দ্বিপ্রহরে মহারাজের খাস কামরায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্য বাবু মহারাজকে তাঁহার বক্তব্য জানাইলে—মহারাজ

বিলখানি একবার হাতে করিয়া বিলের লিখিত কয়েকটী নূতন পোষাকের নাম দেখিয়া সূর্য্য বাবুকে হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন, এই বিলের লিখিত একটী পোষাকেরও আমি নাম জানিনা। আমি সারা জীবন লংক্লথের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়াই কাটাইয়াছি, এখনো তাই কাটাই। এসব বাবুয়ানীর আমি ধার ধারি না। এই বিলের একটী পোষাকেরও যখন আমি নাম জানি না, তখন এগুলির জন্য যে আমি Brault কোম্পানীকে বরাত দিই নাই এটা নিশ্চয়। সুতরাং আমার কাছে আপনার এই বিল লইয়া আশা বৃথা। তার চেয়ে বরং বড় মহারাজ-কুমার কিংবা রাজজামাতার কাছে যান, আর বরাতও নিশ্চয় তাঁহারাই দিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের কাছে গিয়াই আপনার এই বিলের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।"

মহারাজের খাস কামরার অনতিদূরেই বড় মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের কামরা। স্নানাহারের পর মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া তিনি বিশ্রামার্থে চোখ বুজিয়া খাটে শুইয়াছিলেন। সূর্য্য বাবু নিঃশব্দে মনিব-পুত্রের কামরায় প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং মহিমচন্দ্রের চক্ষু মুদ্রিত থাকায় তাঁহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিলেন। মহিমচন্দ্র এ সকল কিছুই জানিতে পারিলেন না। সূর্য্য বাবু ফিরিয়া গিয়া মহারাজের নিকটে দাঁড়াইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ম'শায়, বিলের মীমাংসা হ'ল ?" সূর্য্যবাবু বিনীতভাবে বলিলেন—"আমি বড় মহারাজকুমারের কাছে গিয়েছিলাম, দেখলাম তিনি ঘুমুচ্ছেন। কাজেই এখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল না।"

মহারাজ দিবানিদ্রার ঘোর বিরোধী সুতরাং এই কথা শুনিবামাত্র তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"কি ? ঘুমুচ্ছে ? বলেন কি মশায় ! বেলা ১১টার সময় ঘুমুচ্ছে ! আপনি স্বচক্ষে দেখলেন ?

সূর্য্য। হাঁ হুজুর।

মহা। কি সর্ব্বনাশ ! আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, যা'কে

একদিন বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে নাম্‌তে হ'বে, তার এই বয়সেই এতখানি আলস্য! যৌবনের প্রারম্ভেই তার আহারান্তে দিবানিদ্রা! সে দিবানিদ্রা দিচ্ছে আর আপনি ফিরে এলেন?

সূর্য্য। হুজুর, আমি চাকর মাত্র। চাকর হয়ে তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত করা—একি আমার পক্ষে শোভা পায়?

মহারাজ এই কথা শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—আমি আপনাকে আদেশ দিচ্ছি, এখনি গিয়ে মহারাজকুমারের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁকে তুলুন।

সূর্য্য। ক্ষমা করুন হুজুর, চাকরের দ্বারা এ কাজ হতে পারে না।

মহা। চাকর?—কার চাকর? আপনি মহারাজ কাশিমবাজারের কর্ম্মচারী না তাঁর কর্ম্মচারী?

সূর্য্য। আমি মহারাজের কর্ম্মচারী।

মহা। যদি তাই হয় তবে এখনি আমারই আদেশ আপনার পালন করা কর্ত্তব্য।

সূর্য্য বাবু নিরুপায় হইয়া বলিলেন—যে আজ্ঞা।

মহা। তবে দাঁড়িয়ে রইলেন যে? যান—এখনি যান।

বলা বাহুল্য সূর্য্য বাবুর পা সরিতেছিল না।

মহারাজ সূর্য্য বাবুর দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের আসন হইতে উঠিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—"চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। এই বলিয়া উত্তেজিতভাবে কামরার বাহিরে গিয়া মহিমচন্দ্রের ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সূর্য্য বাবুকে দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"যান, ভিতরে যান, আমার আদেশ পালন করুন।"

নিরুপায় সূর্য্য বাবু মহারাজের আদেশে মন্ত্রচালিতের ন্যায় মহিমচন্দ্রের কামরার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তখন মহারাজ বাহিরে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"কাশিমবাজারের ম হারাজকুমার অলস যুবকের মত যদি দিবানিদ্রা দিয়ে সময় কাটাতে

চান তবে সে দিবানিদ্রা দেওয়া কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে চলবে না, তিনি আমার চোখের সম্মুখ থেকে সরে কলিকাতার বাড়ীতে গিয়ে দিবানিদ্রা দিন।"

বলাবাহুল্য মহারাজের সেই দৃঢ়কণ্ঠের আদেশে নিরুপায় সূর্য্যবাবু মহারাজকুমারের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি সেই অপ্রিয় উক্তিগুলি নির্ব্বাকভাবে শ্রবণ করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহারাজকুমার নিদ্রা যান নাই, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন মাত্র। মহারাজ ইতিমধ্যে সাম্য ভাব ধারণ পূর্ব্বক নিজের কামরায় ফিরিয়া গেলেন।

সূর্য্য বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে মাথাটী নত করিয়া মহারাজকুমারের শয্যাপার্শ্বে বিল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহিমচন্দ্র তাঁহাকে অভয় দিয়া মিষ্ট বাক্যে হাসি মুখে বলিলেন, "সূর্য্যবাবু, আপনার ত কোন দোষ নাই, আপনি বাবার হুকুম তামিল করেছেন মাত্র। সুতরাং এ জন্য আপনি কিছুমাত্র মনক্ষুণ্ণ বা লজ্জিত হবেন না।"

বিনয়-নম্রতা

বিনয় ও নিরহঙ্কার এই দুইটি বৈষ্ণবজনোচিত গুণের পরাকাষ্ঠা আমরা বাল্য জীবন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মণীন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই।

কত লোকে কত আশঙ্কাই না মণীন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে করিয়াছিল। মণীন্দ্র বাবু মহারাজ হইয়া না জানি কিরূপ অহঙ্কারী হইবেন,—বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া হয় ত বা বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হইয়া চিরাচরিত প্রথায় ভোগের জীবন যাপন করিবেন। কিন্তু এই অমূলক আশঙ্কা ঘুচিতে বেশী দিন বিলম্ব ঘটিল না। অতুল ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত হইল বটে কিন্তু বসনে-ভূষণে, ভাবে-ধারণায় আলাপে-আচরণে তিনি অতীত দিনের

সেই অনাড়ম্বর অমায়িক ভদ্রলোক মণীন্দ্র বাবুই থাকিলেন ;—খেতাবে ও সম্মানে তিনি মহারাজ হইলেন বটে কিন্তু চরিত্রে ও চাল-চলনে একজন আদর্শ ভদ্রলোক ছাড়া আর কোনও বিশেষণই তাঁহাকে দেওয়া গেল না।

মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্রকে বহুজনের বহু চাটু বাক্য, বহু রকমের স্তুতি ও স্তব গান শুনিতে হইল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনও পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইল না। জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে এই প্রকার প্রশংসাবাদ পূর্ণ পত্র পাইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দিতেছেন—

"* * * আপনার পত্রে আমার গুণবর্ণনা কেন? নির্গুণের কি গুণ আছে? মঙ্গলময় ভগবান আমার হস্তে খাজাঞ্চী স্বরূপ যে অর্থ দিয়াছেন? তাহা খরচ করিতেছি। সেই খরচের জন্য আবার আমি দায়ী। আমি বুঝিতে পারিতেছিনা সেই অর্থ আমি বৈধরূপে খরচ করিতেছি কি না? দয়াময়ের কৃপায় এই সংসারে আসিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে কৃতকার্য্য হইয়া জীবনলীলা যেদিন শেষ করিতে পারিব সেই দিন জানিব যে, স্বীয় কার্য্য শেষ করিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র অপরাধের কার্য্য করিতেছি। হৃদয় সর্ব্বক্ষণই আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ রহিয়াছে। অহং জ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাকে কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। শ্রীহরির মোহনমূর্ত্তি ক্ষণ কালের জন্য চিন্তা করিতে পারিতেছি না। * * * এরূপ অবস্থায় এই নগণ্য নরাধমের প্রশংসা আপনার এই পত্রে কেন? আমার দোষগুলি দেখাইয়া আমার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথ দেখাইবার চেষ্টা করুন। আমি যাহাতে কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সংসারমুক্ত হইতে পারি তাহার উপদেশ দিন।"

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র "নীচু" হইয়া যে কত "উঁচু" হইয়া গিয়াছেন—তাহা বাঙ্গলা দেশে অবিদিত নাই। কোনও দিন ছোট বড় কেহ তাঁহাকে তাঁহার আগে অভিবাদন জানাইতে পারে নাই। নবাগতকে দেখিবা মাত্র মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দুই হাত আগেই, ঊর্দ্ধে উঠিত। কতবার চেষ্টা করিয়াও আগে তাঁহাকে কখনও অভিবাদন জানাইতে পারি নাই।

এক দিনের ঘটনা এখনও আমার চোখের সম্মুখে জাগিয়া আছে। সেবার বিজয়ার দিন আমি কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে আছি—মহারাজের খাস কামরার সম্মুখে বিজয়ার অভিবাদন—প্রণাম, নমস্কার ও আলিঙ্গনের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখি মহারাজ কাশিমবাজারের জনৈক ব্রাহ্মণবালকের পায়ের ধূলা লইবার জন্য মাথা নত করিয়া হাত বাড়াইতেছেন—বালক ত সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া যাইবেই—মহারাজও ছাড়িবেন না। আমি বলিলাম—"নিতান্ত বালক যে!" মহারাজ স্মিত হাস্যে বলিলেন—"তা হোক—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান।"

—ইহার পরে আর কোনও প্রতিবাদ চলিল না। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

তুমি সিংহাসনের মানের মাণিক
বিলিয়ে দিলে জনে জনে,
মাটি নিয়ে করলে খেলা
ধূলায় ধূসর কাঙাল সনে।

পরের ব্যথায় পড়লে গলে'
ভাসলে দুখীর অশ্রুজলে,
দু'হাতে তাই বিলিয়ে দিলে
মণিমালার সকল ধনে।

রাজাভরণ ধূলায় রাখি'
গেরুয়া বাসে অঙ্গ ঢাকি'
সকল পূজার আগের পূজা
দীনের পূজা জীবনপণে।

ধরার মানুষ তারই পূজায়
জীবন দিয়ে জীবন যে পায়,
অমর সেত তা'র মহিমার
আসন পাতা সবার মনে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

ক্ষমাশীলতা

(১)

রাজসিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে কাশিমবাজারে এমন একটি সম্প্রদায় ছিল, যাহারা সর্ব্বদা মণীন্দ্রচন্দ্রের অনিষ্টসাধনের জন্য চেষ্টিত থাকিত। মণীন্দ্রবাবু যাহাতে মহারাজ না হইতে পারেন সেজন্য বড় বড় ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত থাকিত। এই সব হীন ষড়যন্ত্রীকারীদের কেন্দ্রস্থ পুরুষ ছিলেন রাজ এষ্টেটের উচ্চপদস্থ জনৈক সহকারী কর্ম্মচারী। মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষী রায় বাহাদুর শ্রীনাথপালকে ইনিই সর্ব্বদা কুপরামর্শে উত্তেজিত করিতেন। মণীন্দ্রচন্দ্র রাজ্য লাভ করিয়াই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করিলেন। ঐ দলের মধ্যে এমন কয়েকটী লোক ছিল যাহারা মহারাজের জীবননাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল—ইহাদের মধ্যে অনেকেই রাজ-এষ্টেটের কর্ম্মচারী। তাহারা ভাবিয়াছিল মণীন্দ্রচন্দ্র রাজ্যলাভ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন কিন্তু তিনি তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করিয়া স্বীয় মহত্ত্বগুণে রাজকার্য্যে বাহাল রাখিয়া দিলেন।

(২)

মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রধান সভাপণ্ডিত ৺রমাপতি তর্কভূষণ মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের কাশিমবাজার রাজগদী লাভ করিবার পক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে কয়জন প্রধানতঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। মহারাণী মণীন্দ্রচন্দ্রকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য দত্তকপুত্র গ্রহণের উদ্যোগ করিলে রমাপতি তর্কভূষণই প্রকাশ্যভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র সেই জন্য তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে একবার মহারাজ উপস্থিত হইলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের জনৈক ভট্রির ছাত্র ছিল, তাঁহার নাম রাধিকাচরণ বরাট, তিনি ছিলেন কাশিমবাজারের

মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র

স্বভাব-কবি,—কবিশেখর কালিদাস রায়ের আদি গুরু। উক্ত রাধিকাচরণ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্য কবিতায় একটি অভিনন্দন লিখিয়া মহারাজকে উপহার দিলেন। কোনও বিশেষ কারণে উক্ত রাধিকাচরণের পিতা রাজবাটীর নিকাশনবীশ ভৈরবচন্দ্র বরাটের প্রতি মহারাজ ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন, রাধিকাচরণের কবিতা পাঠে তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার পিতার প্রতি মহারাজের সকল অসন্তোষ দূর হইয়া গেল এবং রাজকাছারীতে ভৈরববাবুর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তিনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "বরাট ম'শায়, আপনার ছেলে চরণ তো খুব সুন্দর কবিতা লেখে, এই দেখুন আমাকে সে একটী কবিতা উপহার দিয়েছে। ছোকরা স্বভাবকবি।" একমাত্র রাধিকাচরণের এই কবিতার গুণে ভৈরবচন্দ্র বরাটের সমস্ত অপরাধ মহারাজ ভুলিয়া গেলেন। বরাট মহাশয় তো অবাক্। আমরা জানি ভৈরববাবু যে অপরাধ করিয়া ছিলেন তাহা ক্ষমার অযোগ্য।

(৩)

মহারাজের পিতৃভূমি মাথরুণ গ্রামে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী একটি দল ছিল। ঐ দলের মধ্যে তথাকার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ গোস্বামীই ছিলেন প্রধান। অচ্যুতানন্দ গোস্বামী এবং তাঁহার সহকারি-গণ কর্ত্তৃক মহারাজ তাঁহার "বাবু" অবস্থায় বহুবার ভৎর্সিত, অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ এবং অভিশাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিহিংসার বশীভূত হইয়া মহারাজ তাঁহাদের সহিত কোন দিন কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই বরং তিনি এই শত্রুদলের সহিত যে কিরূপ উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নের একখানি পত্র হইতে বেশ বুঝা যায়,—

পরমপূজনীয়

শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ গোস্বামী মহাশয়

শ্রীচরণেষু।

মাথরুণ, কৈচর, বর্দ্ধমান।

কাশিমবাজার রাজবাটী

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৪।

সেবকস্য সংখ্যাতীত প্রণামানন্তর নিবেদনমিদং

* * * কখনও ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া কাহারও সহিত অসদ্ব্যবহার করি নাই। * * * কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে আমি আপনাদের নিগ্রহভাজন হইয়াছি। এমন কি লাঞ্ছিত, অপমানিত, ভৎর্সিত এবং অভিশপ্তও হইয়াছি। * * * আমি আপনাদের সঙ্গে কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করি নাই এই জ্ঞান আপনাদের হইলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। * * * অধিক আর কি লিখিব, জন্মান্তরীণ মহাদুষ্কৃতির ফলভোগে আপনাদের নিগ্রহভাজন হইয়াছি। আমাকে আপনাদের নিগ্রহভাজন না করিলে পরম আনন্দ এবং সুখ লাভ করিব। * * *।"

বলা বাহুল্য গোস্বামী মহাশয়কে রাজ্যলাভ করিবার পরে মহারাজ কাশিমবাজার রাজবাটীতে অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া যথেষ্ট আদর-যত্ন করিয়াছিলেন।

(৪)

কাশিমবাজার রাজবাটীর সহিত অল্পাধিক পরিচিত প্রত্যেকেই পরাণ খানসামাকে চিনিত বা জানিত। বর্ত্তমান সৈদাবাদ রাজবাটীর বিপুল অট্টালিকা যে জমিতে অবস্থিত—সেইখানে ছিল পরাণের পাঁউরুটীর দোকান, ঐ জমি মহারাণী স্বর্ণময়ী খরিদ করিয়া লন। তদানীন্তন খাজাঞ্চী বাবুকে ধরিয়া পরাণ রাজবাড়ীতে বাহাল হয়, নিজের 'চৌকশ' বুদ্ধিতে সে অনতিবিলম্বে রাজীবলোচনের ভাগিনেয় পরবর্ত্তী ম্যানেজার নস্থু বাবুর চাকর পদে উন্নীত হয়। পরাণের খাতির

ষোল আনা বৃদ্ধি পায়, রায়বাহাতুর শ্রীনাথ পালের সময়।—তখনকার দিনে, "পেয়ারের চাকর" হইবার মত অনেক গুণ পরাণের ছিল। সেই পরাণের কথাই বলিতেছি।—

রায়বাহাতুরের মৃত্যুর পর পরাণ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের খাস কামরায় খানসামার কাজ করিত।

সন্ধ্যা বেলায় সৈদাবাদ রাজবাড়ীতে পরাণ খানসামা মহারাজকে ঔষধ ঢালিয়া দিতেছে। সেখানে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই মুখে এই ঘটনাটি শুনিয়াছি। মহারাজ যখন তারণ মণ্ডলের দরুণ খাগ্ড়ার বাড়ীতে 'মণীন্দ্র বাবু' অবস্থায় বাস করিতেছিলেন—তখনকার দিনের কথা হইতেছিল। পরাণ ঔষধের পাত্র হাতে করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই মহারাজ বলিলেন—"আর ইনিই কি কম মহাপুরুষ? তখনকার দিনে আমার জীবনের উপর এঁর দরদও নেহাৎ কম ছিল না।"—ঔষধপাত্র নিঃশেষ করিয়া মহারাজ হাসিয়া হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"উদ্বেগ ও অশান্তিতে তখন কোনও দিনই রাত্রে আমার ভাল ক'রে ঘুম হ'ত না। সে দিন অল্প অল্প জ্যোৎস্না ছিল—রাত্রি আন্দাজ তু'টো—শোবার ঘরের নীচে অনেকক্ষণ ধরে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। বিছানা থেকে উঠে দেখি, শাদা লম্বা জামা গায়ে একটি লোক—মাটি খুঁড়্ছে। প্রথম ভেবেছিলাম সিঁদেল চোর—কিন্তু চোর মাটিতে কেন সিঁদ কাটবে? তাই কোনও কথা না বলে দাঁড়িয়ে দেখ্তে লাগ্লাম—কয়েক জায়গা খুঁড়ে সে যেন কি পুঁতে রাখ্লে, এক জায়গায় পুঁতে যখন অন্য জায়গা খুঁড়তে যাচ্ছে তখন জ্যোৎস্নার আলোয় এই মূর্ত্তিমানকে আর চিন্তে বাকী থাকল না—" এই বলিয়া পরাণ খানসামার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন—"সকালে উঠে মাটি সরিয়ে দেখি,—একটা মাটির ছোট হাঁড়ির মধ্যে "তুক তাক্"—এটা ওটা সেটা।" পরাণ অপ্রতিভ হইয়া

বলিল—"হুজুর যে কি বলেন!"—মহারাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তা ত বটেই গো—তোমার ওই পেটেণ্ট জিনের লম্বা কোর্ট কি কারো ভুল হ'বার যো আছে?"

যে পরাণ এক দিন এইরূপ দুরভিসন্ধি ও চক্রান্তে লিপ্ত ছিল, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিজের চাকর করিয়া রাখিতে, তাহার হাতে ঔষধ পানীয় গ্রহণ করিতে কখনও কোনও দিন মহারাজ সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। এইরূপ কত যে দৃষ্টান্ত আছে তাহার আর শেষ নাই। চরিত্রের এত বড় শক্তি—ক্ষমাশীলতা দ্বারা তিনি তাঁহার পরম শত্রুকেও অনায়াসে জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

(৫)

কোনও একটি মাহাল হইতে নায়েব কিংবা তপশীলদার আসিয়াছেন—জাতিতে ব্রাহ্মণ,—প্রৌঢ়াবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছেন।—অভিযোগ গুরুতর—তিনি নাকি সরকারী তহবিল হইতে টাকা ভাঙ্গিয়াছেন। বহু তাগিদ সত্ত্বেও হিসাব নিকাশ করিতেছেন না।--রাজধানীতে উপস্থিত হইতে মহারাজ তলপ করিয়াছেন—কাজেই স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া উপায় ছিল না।

সকাল বেলা—চিরাচরিত প্রথা অনুসারে মহারাজ তখন চিঠিপত্র পড়িতেছিলেন,—এমন সময় উক্ত ভদ্রলোকটি অতি নম্রভাবে মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।—"কি ম'শায়, কখন আসা হ'ল? ভাল ত?"—"আজ্ঞে হাঁ"—মহারাজের কুশল?—"মহারাজকে কুশলে থাকতে দেন কই আপনারা"? ভদ্র লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দিলেন—

"মহারাজ ভুল শুনেছেন—কয়েক বৎসর ধরে মাহালে আদায়পত্র নাই"—মহারাজ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—"মিথ্যা কথাটা আর বলবেন না—যা' করেছেন—আপনাকে জেলে দিতে হয়।"

"হুজুর আমি নির্দ্দোষ"—কথায় কথায় মহারাজ বিশেষ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন—খুব তীব্র ভৎ'সনা করিয়া তিনি অন্য কাজে মনোনিবেশ করিলেন। ভদ্র লোকটি বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কখন যে উঠিয়া গিয়াছেন—মহারাজ তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ১১টার পর স্নান করিতে উঠিয়াই মহারাজ হরকরা ডাকিয়া বাবুটি কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন – কেহই কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না।

—মহারাজ ক্রোধান্বিত হইয়া হরকরা চোপদার প্রভৃতিকে ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্মণ অভুক্ত অবস্থায় আমার বাড়ী থেকে চলে গেলেন—এই দুপুর বেলা—কেও দেখ্‌লে না? তোরা মানুষ না কি?" একজন নিম্ন কণ্ঠে বলিল—"বাবুটি ত কেরাণীখানায় উঠেছেন —অনুমতি হয় ত সেখানে দেখে আসি।"—"যাও না হে—এর আবার অনুমতি কি?"—হরকরা বাবুটিকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। মহারাজ বলিলেন—"স্নানাহার করুন—তার পর ও বেলা অন্য সব কথা হবে।"

তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণের দুই বেলা ভূরি ভোজন চলিতেছে—কাজের মধ্যে দুই বেলা মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণ মহারাজের সম্মুখে অতি বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকা।

—মহারাজ পার্শ্বস্থিত কর্ম্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এ-ত বড় মজার লোক হে,—দোষটা যেন আমিই করেছি।—দোষ করেছেন—তা' স্বীকার করুন—আর এমন গর্হিত কাজ করবেন না, তার প্রতিশ্রুতি দিন"—ইত্যাদি।—দোষী আসিয়া সকল দোষ স্বীকার করিয়া মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক—ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। যথাসময়ে সে কথা নায়েব মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে "করিৎ-কর্ম্মা" নায়েব মহাশয়ের বিলম্ব হইল না। অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া যেন মহারাজ নিজেই রক্ষা পাইলেন।

(৬)

দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি মাতামহী রাণী হরসুন্দরীর বিশেষ কোনও মমতা ছিল না বলিয়াই, বোধ হয়। রাজা হরিনাথের মৃত্যুর পর চিরদিন উদাসীন ভাবে কাশীবাস করার ফলে তাঁহার স্নেহের আকর্ষণও ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

শুনিতে পাওয়া যায়, একবার কাশীতে মাতামহীর সহিত দেখা করিতে গিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র আঙ্‌টীর জন্য একখানি মূল্যবান্ পাথর চাহিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তোমাদেরি ত সব থাকিবে ইত্যাদি স্তোকবাক্যে তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রকে ভুলাইয়া দিয়াছিলেন।

জীবন-স্বত্বের দাবী—তাহাও বহু মূল্যে মণীন্দ্রচন্দ্রকে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। না-দাবী দলিল যে প্রকার প্রভূত অর্থের বিনিময়ে মণীন্দ্রচন্দ্রকে মাতামহীর নিকট হইতে লইতে হইয়াছিল তাহাতে দৌহিত্রের প্রতি তাঁহার কোনও মমতাই প্রকাশ পায় না।

কিন্তু তাঁহার প্রতি মণীন্দ্রচন্দ্রের ক্ষোভ কথায় বা কাজে কোনও দিন প্রকাশ পায় নাই। যে বৎসর গোষ্ঠাষ্টমীর সময় মহারাজকুমার কীর্ত্তিচন্দ্র মারা যান, তৎপরবর্ত্তী বৎসর ঠিক সেই সময় রাজ-ধানীতে উপস্থিত থাকা কষ্টকর হইবে মনে করিয়া মহারাজ বৈষ্ণব-দিগের পাট দর্শন করিবার জন্য সপরিবারে নৌকাযোগে নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহা সন ১৩১১ সালের কার্ত্তিক মাসের ঘটনা।—কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে নৌকার উপরই রাজধানী হইতে প্রেরিত পত্রে হরসুন্দরীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ফিরাইয়া মহারাজ কাশিমবাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুই এক দিনের মধ্যেই মহারাজ কাশী যাত্রা করিলেন; ফিরিয়া আসিয়া শ্রাদ্ধাদির বিপুল আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। যিনি জীবিত শত্রু ও উৎপীড়কের উপর কখনও কোনও প্রতিশোধ লন

নাই—তিনি যে মৃতের প্রতি প্রতিশোধ লইবেন ইহা ধারণাও করা যায় না। মাতুলানী ও মাতামহীর নির্ম্মম ব্যবহারের মহামানবোচিত প্রতিশোধই তিনি লইয়াছিলেন। সন ১৩১১ সালের পৌষ মাসে রাণী হরসুন্দরীর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। সে সময় অশীতিপর বৃদ্ধও বলিয়াছিল, এমন ধূম ধামের শ্রাদ্ধ ইতিপূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। উপযুক্ত মূল্যে হাতী, ঘোড়া, নৌকা, বড় বড় চাঁদীর কলসী ও বাসন এবং অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়; অসংখ্য লোককে এক মাস ব্যাপী অন্নদান; বহু দিবস ব্যাপী হরিনাম-সংকীর্ত্তন; রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির বিভিন্ন সমাজভুক্ত সহস্রাধিক তিলি জাতীয় রাজা, রাজকুমার, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থগণের সম্মিলন; এই উপলক্ষে দেশ ও সমাজহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠান—এ যুগে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য এক হাজার প্রস্ত নূতন লেপ তোষক চাদর ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। বাঙ্গলা, বিহার, কাশী ও দাক্ষিণাত্যের তৎসাময়িক খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বহু দূরাগত দিক্‌পালসদৃশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সম্মিলনে শ্রাদ্ধ-বাসর এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। দেশপূজ্য স্বর্গগত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের উপর পণ্ডিতগণের বিদায় ও তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইয়াছিল। মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রম, অমায়িক আপ্যায়ন ও শিষ্টাচারে, উদার-হৃদয় বৈকুণ্ঠনাথ ও পরম হিতৈষী বিষ্ণুচরণ সেন-প্রভৃতি মহারাজের উপযুক্ত বন্ধুগণের সহায়তায়, ভৃত্য ও অমাত্যবর্গের সহযোগিতায় এই বিরাট শ্রাদ্ধ ক্রিয়াটি সৌষ্ঠবের সহিত সুসম্পন্ন হইল। এই বিরাট কার্য্য উপলক্ষে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র একাদিক্রমে নয় রাত্রি নয় দিন বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করিয়াছিলেন। ক্বচিৎ দুই দশ মিনিটের জন্য বাহির কামরায় যে কোনও একটি বালিশে মাথা দিয়া শুধু দুই একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতেন, আবার তৎক্ষণাৎ কর্ম্মান্তরে

ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেন। এই শ্রাদ্ধে তখনকার সুলভ বাজার-দরের দিনেও প্রায় চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

বন্ধু-প্রীতি

(১)

মহারাজের বন্ধুগণের মধ্যে বাগ্‌বাজারের প্রসিদ্ধ বসুবংশীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। মহারাজের বাল্য কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়কাল দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে একত্রে কাটিয়াছিল। মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার আসিবার পরে তাঁহার প্রিয় বন্ধু দেবেন্দ্রবাবুর লোভনীয় সঙ্গ ত্যাগ করিতে না পারায় তাঁহাকে কলিকাতা হইতে কাশিমবাজার লইয়া আসিয়া বরাবর নিকটে রাখেন এবং তাঁহাকে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেন। দেবেন্দ্রবাবু সাহিত্য-সেবক, সাহিত্যের মধুচক্র রচনা করিতে পারিলে তাঁহাকে কাশিমবাজারে ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে—'উপাসনা' পত্রিকা প্রকাশের ইহাও একটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল। অন্যতম বাল্যবন্ধু ললিতবাবুকেও মহারাজ চিফ্‌ সেক্রেটারীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ললিতবাবুর বাসা ছিল সৈদাবাদে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু মহারাজের বিশেষ প্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কাশিমবাজার রাজবাটীর পার্শ্বে বাসা দেওয়া হইয়াছিল।

মহারাজ সন ১৩০৪ হইতে ১২ সাল পর্য্যন্ত দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে একত্রে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গাভাব মহারাজ সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পদব্রজে বেড়াইতেন, ঐ সময় জমিদারি বা ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়া এই সংসারের উর্দ্ধ রাজ্যে তাঁহার মন অবস্থিতি করিত। প্রাতর্ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রবাবু নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া যাইতেন এবং মহারাজ কাজকর্ম্মে মগ্ন হইতেন। প্রত্যেক দিন দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণ এবং বিশ্রম্ভালাপ তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল।

মাথরুণ থাকার সময়—দেবেন্দ্রবাবু (ব্যাঙ বাবু) মহারাজের সঙ্গে অনেকবার মাথরুণ যাওয়া আসা করিয়াছিলেন। একবার ট্রেণের সময় হইয়া আসিয়াছে—দুই বন্ধু আহারে বসিয়াছেন—ভাতটা খুবই গরম, দেবেন্দ্রবাবু বসিয়া আছেন দেখিয়া মণীন্দ্রবাবু বলিলেন—"কি হে, ব্যাঙ, বসে যে?—সময় যে হয়ে এল।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন—'কি করব ভাই, এত গরম ভাত, খাই কি করে?' মণীন্দ্রচন্দ্র স্মিতহাস্যে বাটী হইতে ঘি ঢালিয়া—গরম ভাত ভাঙ্গিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া দিয়া সস্নেহে বলিলেন "নাও, খাও এবার, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।" দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি তাঁহার যে কতখানি আন্তরিক আকর্ষণ ছিল তাহা নিম্নের পত্র দুইখানি হইতেও বুঝিতে পারা যায়;—

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬।

ভাই দেবেন,

আমি আশৈশব দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাই যন্ত্রণা সহ্য হয়। বিশেষতঃ আমি সকল কার্য্যেই সর্ব্বদুঃখহারী ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া মনকে সান্ত্বনা দেই; তাহাতেই আমি মধ্যে মধ্যে মনকে প্রফুল্ল রাখিতে সমর্থ হই এবং এ দেহ সেই কারণেই রক্ষা পাইয়াছে। ভাই দেবেন, আমার এরূপ অবস্থায় আমার একমাত্র সান্ত্বনা শৈশব বন্ধুর পত্র; তোমার সংবাদ না পাইলে আমার যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে, সে ক্ষমতাও আমার নাই। তোমার পত্র এবং সংবাদ অভাবে আমি বড়ই কষ্ট পাইয়াছি, মনে হইয়াছে আমার সুখ আশা বুঝি ফুরাইয়াছে। আমার শৈশব বান্ধব বুঝি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। ভাই, তুমি যে অবস্থায় থাক, মধ্যে মধ্যে একখানি পোষ্টকার্ডে সংবাদ পাঠাইও। অবকাশ না থাকিলে অবকাশ করিয়া লইও। এ সম্বন্ধে অধিক আর কি লিখিব। যদি অন্তর্য্যামী হও, তবে আমার অন্তরের কথা জানিতে পারিবে।

৪ঠা আষাঢ়, ১২৯৭।

ভাই ব্যাঙ,

অকস্মাৎ তোমার নিকট হইতে একখানি বিষাদমাখা "পোষ্টকার্ড" পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাহাকে শয়নে স্বপনে জাগরণে মনে পড়ে তাহাকে কি কখনও ভুলা যায়। যখন চিন্তামগ্ন হইয়া হৃদয় অন্বেষণ করা যায়, তখন যে মূর্ত্তিকে হৃদয়-মধ্যে প্রতিনিয়ত অবিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, সে মূর্ত্তি কি ইহজন্মে হৃদয় পট হইতে অদৃশ্য হইতে পারে? স্মৃতি যাহাকে স্বীয় কক্ষে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে সে মূর্ত্তি কি কখনো ভুলা যায়? যাহার অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা, সৌহার্দ্য মনে সর্ব্বক্ষণ জাগিয়া আছে, সে কি কখনো অন্তরের বাহির হইতে পারে! ভাই, তোমার মনের ভাব কেন ওরূপ হইল জানিতে পারিতেছি না, মন বড়ই ব্যথিত হইতেছে—শীঘ্রই সবিশেষ লিখিয়া সুখী করিবে।

(২)

কোন্নগরের বিহারী লাল বসু মহারাজের বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকুঞ্জ বিহারী বসু মহারাজের বাল্যবন্ধুগণের মধ্যে অন্যতম। যৌবনে অর্থোপার্জ্জনের আশায় তিনি হায়দ্রাবাদ থাকিতেন। তাহার পর ত্রিশ বৎসর কাল মহারাজের সঙ্গে তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় না। ত্রিশ বৎসর পরে সন ১৩২৬ সালে তিনি যখন বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসেন তখন বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র রাজসিংহাসনে বসিয়া যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছেন। দেশে ফিরিয়াই বাল্যবন্ধু মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্য নিকুঞ্জবাবুর মন ব্যাকুল হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজারে চলিয়া আসিলেন। ভোরের ট্রেণে কাশিমবাজার ষ্টেশনে নামিয়া তিনি যখন রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন, মহারাজ তখনও অন্দর হইতে বাহিরে আসেন নাই। নিকুঞ্জবাবু কামরার বারান্দায় উঠিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় মহারাজ অন্দর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই নিকুঞ্জবাবুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি যে এই ভোরের টেণে হঠাৎ দূর প্রবাস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন তাহা মহারাজের জানা ছিল না। এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে ত্রিশবৎসর পরে বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলেও মহারাজ সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে চিনিলেন এবং তাড়াতাড়ি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "কিহে নিকুঞ্জ নাকি?" নিকুঞ্জবাবু—"হ্যাঁ"—এই কথা বলিয়া মহারাজকে নমস্কার করিবামাত্র মহারাজ তাঁহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, ছেলেবেলার সঙ্গী তুমি, আজ ত্রিশবৎসর পরে আমাদের দেখা। আবার যে দু'জনার দেখা হ'ল, এজন্য আগে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। ছেলেবেলার সঙ্গীকে আবার নমস্কার কি হে? তুমি তো আচ্ছা লোক দেখছি? যাক্, এখন ব্যাপার কি? আস্‌চো কোত্থেকে বল দেখি? হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরলে কবে? একখানি চিঠিও কি লিখতে নেই? কাশিমবাজার আসবে জানলে ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতাম। এত কষ্ট করে আসতে হয়? তুমি যে দেখছি আমার চেয়েও চুল পাকিয়ে ফেলেছ হে?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহারাজের উচ্ছ্বসিত আনন্দপূর্ণ বাক্যগুলি নিকুঞ্জ বাবুকে প্রথমেই মুগ্ধ করিয়া দিল। মণীন্দ্রচন্দ্র এখন রাজ্যেশ্বর এবং বাল্যসঙ্গী হইলেও নিকুঞ্জ বাবু দরিদ্র। সুতরাং রাজ্যেশ্বর হইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র যে পুরাতন স্মৃতির মাধুর্য্যে আবিষ্ট হইয়া দরিদ্র বাল্যসঙ্গীকে হঠাৎ এইরূপ ভাবে অভিনন্দিত করিবেন ইহা নিকুঞ্জ বাবু স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি মুগ্ধ হৃদয়ে বলিলেন—"ত্রিশ বৎসর পরে হঠাৎ প্রথম দৃষ্টিতেই আমাকে চিন্‌লেন কি ক'রে?" মহারাজ বল্লেন—"বিশ বৎসর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বজীবনে গাঁথা হয়ে আছে। যদি পুরাণো বন্ধুদের চিন্‌তেই না পারলাম তবে আর ভালবাসার দাম কি? তুমি এখনো আমাকে আপনি বলছ, আশ্চর্য্য বটে! আমি সেই মণি—বুঝলে?" নিকুঞ্জ বাবু তো অবাক্।

(৩)

মহারাজের বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীযুক্ত ধনদা বাবুকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে মহারাজের অকৃত্রিম বন্ধু-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীহরি

সাবেক Kasimbazar Rajbari.

The *191*

১লা শ্রাবণ, সন ১৩২৪ সাল

প্রিয়তম ধনদাচরণ,

তোমার ১৩ই শ্রাবণের ও ১২ই জুলাইয়ের পত্র পাইয়া পরম আনন্দ ও সুখ লাভ করিয়াছি। তোমার পত্র পাওয়ার পূর্ব্বে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, তজ্জন্য কলিকাতায় গিয়া, তুমি বাড়ীতে নাই জানিয়া তোমার অনুসন্ধান লইয়াছিলাম।

ভাই, তুমি যাহা মনে করিয়াছ আমি তাহা হই নাই। অর্থ বা [illegible]

(৪)

বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার দরিদ্র বন্ধুগণের কথা ভুলিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে পুরাতন বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিতেন এবং তাঁহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া আনন্দ বোধ করিতেন।

সন ১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের কথা। সে-বার কাশিমবাজারে আমের ছড়াছড়ি। আমের দেশের মহারাজ আজ তাঁহার পুরাতন বন্ধুদিগকে আম খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে কাশিমবাজার-বহরমপুর মিলিয়া ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রায় সাত শত ভদ্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ রাজবাটীতে আহারে বসিলেন। মহারাজের বন্ধুগণের জন্য পৃথক্ একটী লাইন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কর্ম্মচারিগণ নিপুণ হস্তে পরিবেশন করিতে ছিলেন, সেই সঙ্গে মহারাজ স্বয়ং ঘুরিয়া ফিরিয়া নিমন্ত্রিতগণকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। একটি ভদ্রলোক বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম গিরিজামোহন মৈত্র। গিরিজা বাবুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মহারাজ উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"কিহে গিরিজা যে? তুমি হঠাৎ কোত্থেকে? সহর থেকে আজ তুমি ৭।৮ বছর নিরুদ্দেশ। ব্যাপার কি? তুমি নিরুদ্দেশ বলে তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি। যাক্ তুমি যে এসেছ এই ঢের।" তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মহারাজ তাঁহার বাবু অবস্থায় যখন বহরমপুরের বাসায় থাকিতেন, সেই সময় গিরিজা বাবু কর্ম্মসূত্রে খাগড়ায় ছিলেন এবং কিছুদিন মণীন্দ্র বাবুর সঙ্গে পাশা খেলা করিয়া বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। এই পুরাতন সঙ্গীটীকে বহুকাল পরে হঠাৎ দেখিয়া মহারাজ এত আনন্দিত হইলেন যে, নিজের রাজমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া বহু ভদ্রলোকের মধ্যে গিরিজা বাবুর কাছে মেঝের উপরে নগ্নগাত্রে বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে 'এটা খাও

ওটা খাও' বলিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সেদিন তথায় মহারাজের যতগুলি নিমন্ত্রিত বন্ধু ছিলেন, সকলের মধ্যে গিরিজা বাবুর মলিন পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হইল তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। গিরিজা বাবুকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার দুঃখ নিবারণ কল্পে মহারাজ ২০০৲ টাকা সাহায্য করিলেন। এই ঘটনার পরে উক্ত গিরিজা বাবুকে আরও অনেকবার আসিয়া মহারাজের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বের পাশা খেলার সঙ্গীর সহিত একজন ঐশ্বর্য্যশালী মহারাজের এরূপ উদার ব্যবহার দেখিলে কে না মুগ্ধ হইবে?

(৫)

সৈদাবাদ রাজবাটীতে অবস্থান কালে মহারাজ একদিন বৈকালে জুড়ি গাড়ীতে বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। গাড়ীখানি খাগ্‌ড়ার বাজারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এমন সময় তিনি দেখিলেন, রাস্তার মধ্যে তাঁহার এক পুরাতন সঙ্গী লণ্ঠন হাতে করিয়া উত্তর মুখে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জালিম কোচম্যানকে মহারাজ গাড়ী থামাইতে বলিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোককে ডাকিয়া বলিলেন—"কিহে অযোধ্যা বাবু নাকি? হঠাৎ মহারাজ এইভাবে গাড়ী থামাইয়া স্নেহ সম্ভাষণ করায় অযোধ্যা বাবু থতমত খাইয়া গেলেন।

অযোধ্যা বাবু সহরের বাঙ্গলানবীশ হাতুড়ে ডাক্তার। সে আমলে পাকা পাশা-খেলোয়াড় বলিয়া সহরে তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল, সেই সূত্র উপলক্ষ্য করিয়া মহারাজের সঙ্গে কয়েক বৎসর তাঁহার সখ্য ঘটিয়াছিল। মহারাজ হইবার পরে উক্ত অযোধ্যা বাবুর সঙ্গে মহারাজের আর দুই বৎসর কাল সাক্ষাৎ হয় নাই। দীর্ঘ কাল পরে অযোধ্যা বাবুকে দেখিয়া আত্মভোলা মহারাজ তাঁহার সঙ্গে আলাপের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে রেস্ কোর্সে বেড়াইতে চলিলেন। বেচারী

অযোধ্যা বাবু তাঁহার ময়লা কাপড় জামা লইয়া মহারাজের পার্শ্বে অতি সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া থাকিলেন এবং লণ্ঠনটী লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অযোধ্যা বাবুর এই সঙ্কোচ চতুর মহারাজের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি নানাবিধ প্রীতিবাক্যে অযোধ্যা বাবুকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন এবং মাঠ হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে সৈদাবাদ রাজবাড়ীতে নামাইয়া উত্তমরূপে জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন। পরে অযোধ্যা বাবুর সাংসারিক স্বচ্ছলতার জন্য তিনি প্রায়ই অর্থ সাহায্য করিতেন। মহারাজের রাজ্যলাভের ছয় সাত বৎসর পরেই অযোধ্যা বাবু মারা যান।

(৬)

মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাজ হইবার কিছুদিন পরেই কাশিমবাজার মাইনর স্কুলে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। তখন বেলা তিনটা, হঠাৎ অন্যান্য শিক্ষকগণ রাস্তার দিকে তাকাইয়া—'মহারাজ আস্ছেন —মহারাজ আস্ছেন' এই কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে রব উঠিল—'দাঁড়াও দাঁড়াও।' হেড্ মাষ্টার দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য আর হেড্ পণ্ডিত ইহাঁরা দুইজনে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইলেন। হঠাৎ দেখা গেল মহারাজ আসিয়া স্কুলের বারান্দায় উঠিলেন এবং শিক্ষকদ্বয়কে অভ্যর্থনার অবকাশ না দিয়াই স্বয়ং হেড্ মাষ্টারের হাত ধরিয়া স্কুল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অন্যান্য শিক্ষকগণের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কহিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মহারাজ প্রত্যেক ক্লাশে ঘুরিয়া ছাত্রগণের সঙ্গে স্নেহ-সম্ভাষণপূর্ব্বক উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। হেড্ মাষ্টারের হাত ধরিয়া মহারাজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করায় সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মহারাজের মত একজন মহামান্য ব্যক্তি হঠাৎ এই রৌদ্রে স্কুলে আসিয়া দুর্গানাথবাবুর ন্যায় দরিদ্র হেড্ মাষ্টারকে যে আদরপূর্ব্বক

হাত ধরিয়া কথা বলিতেছেন, এই দৃশ্য দেখিয়া সকলের মন কৌতূহল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দুর্গাবাবুর হাত ধরিয়া স্কুল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন—"কি হে দুর্গাবাবু, আমাকে চিন্‌তে পারো ?" এত বড় একজন মহারাজ তিনি কিনা দুর্গাবাবুর ন্যায় একজন সামান্য বেতনভোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কি হে আমাকে চিন্‌তে পারো ?" দুর্গাবাবু থতমত খাইয়া কি যেন বলিতে গেলেন। পরে শুনা গেল হেড্‌মাষ্টার দুর্গাবাবু নাকি বহুপূর্ব্বে মহারাজের 'বাবু' অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে একত্রে সঙ্গীরূপে কয়েক বৎসর কাটাইয়াছিলেন। সেই পুরাতন দরিদ্র সঙ্গীর প্রতি তাই আজ রাজ্যেশ্বরের এই প্রীতিসম্বোধন। স্কুলের নিকটে মহারাজের আত্মীয় জানকীনাথ দে মহাশয়ের বাড়ী ছিল। তাঁহারই বাটীতে মহারাজ সেদিন বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মাইনর স্কুলটী নিকটে থাকায় স্কুল পরিদর্শনের জন্য এবং পুরাতন সঙ্গীকে দেখিবার কৌতূহল হওয়ায় মহারাজ এইরূপভাবে হঠাৎ স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(৭)

হাইকোর্টের খ্যাতনামা জজ স্বনামধন্য ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় মহারাজের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। মহারাজ তাঁহার একখানি পত্রে "চিরসুহৃদ্‌" বলিয়া সারদাবাবুকে অভিহিত করিয়াছেন দেখিতে পাই। মহারাজ তাঁহার রাজকার্য্যপদ্ধতির সংস্কার করিবার জন্য তাঁহাকে কাশিমবাজার আহ্বান করিয়া আনেন। তিনি আসিয়া কতকগুলি বিষয় পরিবর্ত্তন ও ব্যয়সংকোচ করিতে মহারাজকে উপদেশ দেন। কিন্তু ব্যয়সংকোচের কথা মণীন্দ্রচন্দ্র চিন্তা করিতেও পারিতেন না। তিনি বলিলেন—"অর্থের জন্য বড় কষ্ট পাইয়াছি—এখন অর্থের সদ্ব্যয় করিব —তাহাতে যাহা হয় হইবে।" এই জন্যই বোধ হয় তিনি ভবিষ্যৎ চিন্তা

করিতেন না। আর এককথা—মহারাজ তাঁহার দীর্ঘ জীবনে—শিশু কাল হইতেই—মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভগ্নী, ভগ্নীপতি, পুত্র, জামাতা, ভাগিনেয় প্রভৃতি আত্মীয়গণের বিয়োগজনিত দুঃখ শোক এতই পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইবার জন্য তত্ত্বকথা শুনাইবার কোনও দরকার হয় নাই। তিনি অনিত্যতা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন—এবং সেইজন্য অর্জ্জুনের কথাটা তাহার সম্পর্কে খাটে—

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥

অন্ধজনে দয়া

কলিকাতা, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট,—শীতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইতেছে।—একটি দরিদ্র রাতকাণা পথ দেখিতে না পাইয়া কেবল কাঁদিতেছে। কতজন আসা যাওয়া করিতেছে—কেহই সেদিকে লক্ষ্য করিতেছে না—কেহ কেহ আবার ঠাট্টা বিদ্রুপও করিতেছে। মণীন্দ্রচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ সেই পথ দিয়া আসিতেছিলেন —রাতকানার কাতরোক্তিতে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া জানিতে পারিলেন যে, সে লোকটি রাত্রে দেখিতে পায় না। মণীন্দ্রচন্দ্র বলিলেন —"আহা! ব্যাঙ, লোকটির বড় কষ্ট, চল ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।" দয়ার সাগর মণীন্দ্রচন্দ্র রাতকাণার হাত ধরিয়া বহুদূরে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

বৃহৎ কর্ম্ম সম্পাদন ব্যাপারে মানুষের পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প থাকে। প্রকৃতিগত দয়া না থাকিলেও অনেকে বাঁধাধরা পথে মতি স্থির করিয়া দয়ার সুবৃহৎ কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যেখানে দয়া, মমতা, সহানুভূতি বা সাহায্যের প্রয়োজন, সেখানে প্রাণ কাঁদিলে, অন্তর সাড়া দিলে তবে দয়া মমতা বা সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি

আসে। মণীন্দ্রচন্দ্র ছিলেন প্রকৃতিতে দয়ালু, তাই দয়া তাঁহার অন্তর-প্রকৃতি হইতে স্বতঃই প্রবাহিত হইত।

বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রতি অনুরাগ

মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাণী স্বর্ণময়ীর দ্বারা বার বার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া যখন দুঃখের জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সেই জীবনের নিত্যসহচর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই বহুবিধ বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। এই চারুবাবুই বহরমপুরে মণীন্দ্রচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিস্তৃত চক্রান্ত-জালের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন—রাজবাটীর সকল চেষ্টা ও অর্থব্যয় বিফল করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্য তিনিই বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি মণীন্দ্রচন্দ্রের মনোভাব যে কি প্রকার ছিল, তাহা নিম্নে মুদ্রিত পত্রাংশ হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। মণীন্দ্রচন্দ্রেরই কার্য্যব্যপদেশে চারুবাবুকে হঠাৎ মাথরুণ যাইতে হয় এবং কিছুদিন সেখানে থাকিবারও প্রয়োজন ঘটে। তত্রাচ তাঁহার প্রতি অত্যধিক প্রীতি ও মমতা থাকায় হঠাৎ চলিয়া আসিয়া হয়ত মণীন্দ্রচন্দ্রকে পীড়া দিয়াছেন মনে করিয়া চারুচন্দ্র তাঁহাকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহারই উত্তর হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত করা হইল,—

২২শে বৈশাখ, ১৩০০।

গত কল্য আপনার ১৭ই বৈশাখের স্নেহ প্রীতি এবং ভালবাসাপূর্ণ আশীর্ব্বাদী পত্র পাইয়া বড়ই সুখ লাভ করিলাম। মনে হইতে লাগিল—ভগবান্ ভালবাসা এবং মায়া কেন সৃষ্টি করিলেন। আমাদের এই মায়াময় দেহে সকল ভাবই আছে। এই একাদশবর্ষ কাল যাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতাম, বিশেষতঃ যিনি এই এক বর্ষকাল আমার সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া কত কষ্ট পাইয়াছেন, তাঁহাকে বিদায় দিতে কি আমার হৃদয় কখন পারিত? কখনই পারিত না। কিন্তু ঘটনা স্রোতে অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সেই সময়ে আমাকে বিষয়ান্তরে

ব্যাপৃত রাখিয়াছিল বলিয়া আমি আপনাকে বিদায় দিতে পারিয়াছিলাম। বিদায় দিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিশেষতঃ—যখন ঝড় বৃষ্টি দেখা দিয়াছিল—সেইকাল পর্য্যন্ত মনে যে কত কষ্ট হইয়াছিল তাহা লেখনী দ্বারা জানাইতে অক্ষম। আপনি আমার মনোমধ্যে নিয়ত জাগরূক রহিয়াছেন কেবল কার্য্যান্তরে দূরে আছেন এই কথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছি।

যিনি প্রবল শত্রুগণবেষ্টিত স্থানে নিজ সাহসে ভর করিয়া এবং ভগবানের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আমাকে লইয়া আসিয়া এই এক বৎসরকাল রক্ষা করিলেন এবং আজ আমাকে নিরাপদ জানিয়া তবে ছাড়িয়া যাইতে সাহসী হইলেন, তিনি যে আমার নিকট অপরাধী হইতে পারেন তাহা আমার ধারণাতীত। আপনার এই অপরাধের শাস্তি এই যে, আমাকে যেন চিরদিন এইরূপ ভাল বাসেন এবং আমার উপকার করেন। এক্ষণে যাহাতে নিরাপদে এখানে থাকিয়া অভীষ্ট সাধন করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করুন।

অনাড়ম্বর জীবন

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যখন 'মণিবাবু' ছিলেন—তখন হইতেই তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। Plain living and high thinking—এই ছিল মণিবাবুর জীবনের বৈশিষ্ট্য। পত্রে লিখিত নিম্নের কয়েকটি জিনিষের ফর্দ্দ হইতে সে কথা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়—

[যতীন মণ্ডলকে লিখিত পত্র—৬ই আশ্বিন। ১২৯৬]

মহিমের ও কীর্ত্তির জুতার মাপ পাঠাইয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে জুতার মূল্য যাহা লাগিবে তাহা লইয়া জুতা খরিদ করিয়া দিবে। ১ গজ ভাল অয়েলক্লথ ক্রয় করিয়া দিবে। আর বালির কাগজ ১ রিম ও ডাকের কাগজ ১ প্যাক তাঁহার মারফত বা বামাপদের মারফত পাঠাইবে।

[গোষ্ঠবিহারী নন্দীকে লিখিত পত্র—১৮ই পৌষ। ১২৯৬]

শ্রীমান মহিমচন্দ্রের জন্য মোজা এক জোড়া আনিবেন। ওখানে যদি —থাকেন তবে তাঁহাকে বলিবেন, আমি ৺কাশীধামে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায়

টিকিট লইবার জন্য যে পাচ টাকা দিয়াছিলাম, ঐ পাচ টাকা এখন পাওয়া যাইবে কি না।

আমার বুট জুতা ১ জোড়া	চিনে সিন্দুর ১ থান
তাস ১ ডজন	কাষ্ঠের ছড়ি
বাদামের তৈল ১ শিশি	গোলাপজল ১ বোতল
পাথুরিয়া চুণ	চারু পণ্ডিতের বরাতি সটীক
	বিষ্ণুপুরাণ, বাল্মীকি রামায়ণ।

[রাজেন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে লিখিত পত্র—৩০শে চৈত্র। ১২৯৬]

* * শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্য একটি জামা মূল্য ৷৷৵০। ৸০আনা। সটীক বাল্মীকি রামায়ণ ১ খানি বঙ্গবাসী অফিস হইতে ক্রয় করিয়া আনিবে। আমার বড় বৈঠকটি আনিবে। ভবতারিণীর জন্য একটি টীনের তোরঙ্গ আনিবে। একখানি ৵০। ৵১০ দামের চন্দনপীড়া আনিবে।

[........১০ই আশ্বিন। ১২৯৮]

* * উনুনের জন্য গোষ্ঠবাবুকে ১৮টা সিক (লোহার) আনিতে বলিবে। কেরোসিন অয়েল ল্যাম্ফ ২টা, চিম্‌নী চারিটী [সাদা] বৈঠকখানার জন্য ল্যাম্প ১টা, শ্যামাদান ১টা মায় ফনাস।

[.........১২ই আশ্বিন ১২৯৮]

* * শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্য ২টা জামা এবং ২৪ ইঃ ছাতা ১টা। গোস্বামী দাদার (অচ্যুতানন্দ) জন্য গেঞ্জি ফ্রকের একটা গোলাপী অথবা অন্য কোন রঙ্গের ভাল জামা মূল্য ১৸০ আনার মধ্যে আনিতে হইবে। বালির কাগজ ৪ রিম, ময়ূরের কলম ২ ডজন, শ্লেট পেন্সিল ২ বাক্স। উডেন পেন্সিল ২ ডজন আনিতে হইবে।

এই ত গেল—মণীন্দ্রচন্দ্র যখন সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট মাসহারার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন তখনকার কথা। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া মহারাজ কখনও পোষাক পরিচ্ছদ বা বিলাস-আড়ম্বরের প্রশ্রয় দেন নাই। কাশিমবাজারের মহারাজ সামান্য সাদাসিধে একখানি

ধুতি, গরম কালে সাদা একটি পাঞ্জাবী এবং উড়ুনি—শীতকালে একটা গলাবন্ধ কালো কোট, তাহার উপর সাধারণ একখানি শাল, সাধারণ এক জোড়া জুতা যাহা মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্রলোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাই ব্যবহার করিতেন।

ভোগের জীবনের প্রতি তাঁহার কোনও দিনই লোভ ছিল না। আড়ম্বর করিয়া, ঘটা করিয়া ঐশ্বর্য্যের চটক দেখাইবার বিন্দুমাত্র দুর্ম্মতি তাঁহার কোনও দিন হয় নাই। তিনি রাজা হইয়াও ছেঁড়া পাঞ্জাবী রিপু করিয়া ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। একদিন প্রধান খানসামা পরাণ—শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে মহারাজের নিত্য ব্যবহার্য্য গামছাখানি দেখাইয়া বলিয়াছিল—"আজ হুজুর গামছাখানি বদলাতে বল্‌লেন।" গামছাখানিতে অন্যূন দশ বারটি বড় বড় ছিদ্র ছিল। মূল্যবান সুবাসিত তৈল, সুগন্ধি আতর, এসেন্স, সাবান তিনি ব্যবহার করিতেন না—কাহাকে ব্যবহার করিতে দেখিলে, প্রকাশ্য ভাবে তাহার নিন্দাই করিতেন।

একবার গ্রীষ্মকালে লাট-প্রাসাদে বড় লাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ-কারের সময় নির্দ্দিষ্ট হয় দ্বিপ্রহর বেলায়। লাটপ্রাসাদে যাইতেছেন বলিয়া—চৌরঙ্গীর কোনও বিখ্যাত দোকান হইতে একটি সুন্দর সিল্কের ছাতা মহারাজের জন্য আনা হইল। পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া মোটরে উঠিবার সময় চোপদারের হাতে মহারাজ সেই ছাতাটি দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছাতা কে আনলে ম'শায়?" সবাই প্রমাদ গণিল। মহারাজ গাড়ীতে উঠিলেন না, রাগ করিয়া বারান্দার গোল টেবিলের কাছে বসিয়া পড়িলেন। নির্দ্ধারিত সাক্ষাতের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায় যায়—সকলেই বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। মোটর গাড়ী করিয়া গিয়া হ্যারিসন রোডের কোনও ছাতার দোকান হইতে একটি সাদাসিধে ছাতা আনাইয়া দিতে হইল। চৌরঙ্গীর দোকানে ছাতা ফেরৎ দেওয়া

হইতেছে জানিয়া মহারাজ দুর্গা শ্রীহরি বলিয়া লাট-প্রাসাদে যাত্রা করিলেন।

সংযমী মণীন্দ্রচন্দ্র

যে সকল ইন্দ্রিয় অসংযত হইলে সমাজে অসংখ্য অনর্থপাত হইয়া থাকে, মণীন্দ্রচন্দ্রের সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযমের অদ্ভুত শক্তি ছিল। কৈশোরে ও যৌবনে তাঁহাকে বহুদিন ধরিয়া কাশী ও লক্ষ্ণৌ সহরে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য অভিভাবকহীন হইয়া নানা প্রকার বিরুদ্ধ স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যে কয়েকজন লোক বিশেষভাবে চরিত্রহীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও একজন জীবিত আছেন। অসৎ সঙ্গে থাকিয়া মণীন্দ্রচন্দ্রের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিত কি না একথা তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, মণীন্দ্রচন্দ্র অসাধারণ সংযমী ছিলেন বলিয়াই সমস্ত অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার এইরূপ সংযত চরিত্রের বিষয় আমরা তাঁহার কলিকাতার বন্ধুগণের মধ্যে চারি পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারিয়াছি। পঙ্কের মধ্যে থাকিয়াও তিনি তাহার ক্লেদ গ্লানি কদাপি গায়ে লাগিতে দেন নাই। বহরমপুরে মণীন্দ্রচন্দ্র বহুদিন বাস করিয়া-ছিলেন, বহরমপুরনিবাসী তাঁহার বহু সহচরের নিকটও তাঁহার সেই অসীম সংযমের কথা—সেই শত প্রলোভনের ভিতর হইতে ব্যূহভেদ-কারী যোদ্ধার ন্যায় শত্রুকে পরাভূত করিয়া সতেজে বাহির হইয়া আসার কথাই শুনিয়াছি।

এই প্রকার সংযমের সঙ্গে তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ত্বকের সংযমও যথেষ্ট ছিল। কত জিনিষ তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই, কত লোকের কত শত কুপরামর্শ তিনি শুনিয়াও শুনেন নাই। ভোগের বস্তু তাঁহাকে এক দিনের জন্যও আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান যুগের বড় মানুষের অর্থাৎ ধনিগণের ত কথাই নাই, তাঁহাদের দেখাদেখি গরীবেরও চির অতৃপ্ত জিহ্বা বিশ্বের অনন্ত ভক্ষ্য অভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে ব্যাকুল। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র রসনার অন্যতম বৃত্তি ভোজন-সুখ-লালসারও অধীন ছিলেন না।

দুই একটা ফলফুলারি হয়ত মহারাজের প্রিয় ছিল ; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে তাহা যে কোনও মূল্যে ক্রয় করিয়া খাইতেই হইবে এমন কোনও কথা ছিল না।

একবার কলিকাতার বাড়ীতে অতিরিক্ত মূল্যে একটা পেঁপে কিনিয়া তাঁহার প্রিয় বলিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি মূল্যের পরিমাণ শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"এত বেশী দামে—এ ফল কিনে কাহারও খাওয়া উচিত নয়। এ জিনিষ কি আর কখনও পাওয়া যাবে না ? এ কাজ আর করো না।"

ভগবানে নির্ভরতা

মহারাজকে কেহ কোনও দিন জপ তপ বা আহ্নিক করিতে দেখে নাই। নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে তিনি নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিয়া ভগবানকে ডাকিতেন না।—তাঁহার মত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, নৈতিক জীবনে সমুন্নত মানুষ কোনও দিন যে শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া সকাল সন্ধ্যা সাধন-ভজন করিল না ইহা আপাতভাবে বিস্ময়কর মনে হইলেও তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মযোগের সহিত পরিচয় লাভ করিলে আর সে বিস্ময় থাকে না। তিনি বলিতেন—দিবারাত্রি যিনি অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছেন, আমার নিত্যকর্ম্মে যিনি ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিতে আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিব কি ? তাঁহাকে যে আমি সর্ব্বক্ষণই ডাকিতেছি। শ্রীমান জটিলামোহন সারকেল মহারাজের প্রাইভেট সেরেস্তায় কর্ম্ম

করিতেন—তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি—এক দিবস পুরীর বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে সেরেস্তার কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে মহারাজ ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন ধ্যানস্থ হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে যখন তিনি স্বজ্ঞানে ফিরিয়া আসিলেন—মুখের উপর তখন কেমন যেন একটি পরিবর্ত্তনের ভাব। মহারাজের শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—"এরূপ অসুস্থতা মাঝে মাঝে হইলে বাঁচি।" আজীবন তিনি ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ছিলেন। কাজেই সাধারণ লোকের মত তাঁহার জপ তপ করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি যে ভগবানে নির্ভর করিয়া আজীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার লিখিত—নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশগুলি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় ;—

(১)

ভগবানই আমার ভরসা এবং আশ্রয়। তাঁহার উপর আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। ঘটনাস্রোতে যাহা ঘটে তাহাকে বাধা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বটে কিন্তু কার্য্য-গতিকে তাহা ঘটিয়া উঠে না। একটি ইংরাজী প্রবাদ বাক্য আছে, এবং আমাদের বৈষ্ণব কবিও লিখিয়াছেন—"আত্ম ইচ্ছায় নর কোটী বাঞ্ছা করে, ঈশ্বরের যেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে।" তব এ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। সর্ব্বদা সকল কার্য্যে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

(২)

৺ ছোট ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনধাম প্রাপ্তির সংবাদে মর্ম্মে বড়ই আঘাত পাইয়াছি। কিন্তু দুঃখ বা শোক করিয়া কোনও ফল নাই। ভগবানের ইচ্ছা নিবারণ করিতে মনুষ্যের কোনও শক্তি কার্য্যকরী হয় না সুতরাং তাহার জন্য দুঃখ করা বৃথা। মরণ মনুষ্যের প্রকৃতি, জীবন-ধারণ বিকৃতি মাত্র। মনুষ্য যে কয়েক মুহূর্ত্ত এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন লইয়া জগতে অবস্থিতি করে, সেই কয়েক

মুহূর্ত্তই তাহার পরম লাভ। অতএব এই সংসারকে আপনারাও মায়াময় জানিয়া তাঁহার জন্য শোক, দুঃখ করিবেন না। পরম মঙ্গলময়ের বিধানানুসারে পার্থিব সকলকেই অগ্র পশ্চাৎ এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইবে!

(৩)

দাদা, সত্যসত্যই বিপদভঞ্জন পরমদয়াল দীনবন্ধু হরিই আমার একমাত্র সহায়। তাঁহার কৃপা না থাকিলে আমি সত্যসত্যই এতদিন জীবিত থাকিতে পারিতাম না। নিজেকে নিরুপায় ভাবিয়া আমি সর্ব্বক্ষণই যাঁহার আশ্রয় লইয়া আছি তাঁহার ইচ্ছায় যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। আমি তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই নিরাশ্রয় স্থানে বাস করিতেছি। দাদা, জানি না সত্য কি মিথ্যা, আমাকে অনেক প্রকারে ভীত হইতে হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় আমি কোনও বিপদে কখনও ভয় করি নাই। সকল বিপদই আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

পরিশিষ্ট

['উপাসনা'র মণীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা ও অন্যান্য সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত এবং বিভিন্ন স্থান হইতে সঙ্কলিত ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে সংগৃহীত বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে মুদ্রিত করা হইল।]

“তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম,
রাজ্য ল’য়ে রবে রাজ্যহীন।”

—রবীন্দ্রনাথ

“আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, উহা সমস্তই পরের জন্য এবং ইহার জন্য আমি ভগবানের নিযুক্ত একজন কর্ম্মচারী মাত্র।”

—মণীন্দ্রচন্দ্র—২০।৬।১১

শান্তিনিকেতন

পরলোকগত উদারচরিত্র মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যথেষ্ট সুযোগ ঘটে নি। লোকহিতব্রতে তাঁর অকুণ্ঠিত দাক্ষিণ্যের সংবাদ সকলেই জানে, আমিও জানি। প্রত্যক্ষভাবে আমি তার একটি পরিচয় পেয়েছি। শান্তিনিকেতন আশ্রমের পণ্ডিত হরিচরণ বিদ্যারত্ন দীর্ঘকাল একান্ত অধ্যবসায়ে বাংলা অভিধান সংকলনে প্রবৃত্ত। এই কার্যে যাতে তিনি নিশ্চিন্তমনে যথোচিত সময় দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে মহারাজ তাঁকে দশ বৎসর যাবৎ মাসিক অর্থসাহায্য করে এসেছেন। এই কার্যের মূল্য তিনি বুঝেছিলেন এবং এর মূল্য দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। লক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি পেয়েছিলেন, — সেই প্রসাদ অজস্র বিতরণ করবার দুর্লভ শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর সেই ভোগাসক্তিবিমুখ ভগবৎপরায়ণ নিরভিমান মহাশয়তা বাঙালীর গৌরবের কারণরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মহারাজ—মহারাজ—মহারাজ কোথা কোন ঘরে ?
এধার ওধার ঘুরি' দ্বাররক্ষী রহে নিরুত্তরে !
—তাইতো কোথায় রাজা—কেহ তাহা জানেনাক ঠিক—
শতেক সেবকবৃন্দে ভরা তবু হেরি চতুর্দ্দিক !
বহুক্ষণ বসি' বসি' ফিরিবার করিতেছি মন,
হেনকালে নম্রপদে ভদ্রবেশী বৃদ্ধ একজন
শুধালেন সবিনয়ে কাছে আসি' করি' নমস্কার,
কোথা হ'তে আগমন, প্রয়োজন কিবা আপনার ?
কহিলাম, বসে' আছি মহারাজে ভেটিবার তরে
দেড়ঘণ্টা এইখানে,—কোথা তিনি কেহ নাহি জানে !
উত্তরিলা মৃদুহাসি' করযোড়ে, চাহি' মুখপানে,
দোষ কারো নাই বড়, অপরাধ ক্ষমিবেন মনে,—
ওধারে ছিলাম আমি সেবাব্যস্ত বৈষ্ণবভোজনে ;
অপরাহ্ণ অতিক্রান্ত, বেলা প্রায় সাড়ে চার বাজে,
স্নানাহার সারি' ঠিক পাঁচটায় বাহিরিব কাজে—
দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-সভা—আমাকে যে যাইতেই হবে,
আজিকে সেখানে মোরে সভাপতি করেছেন সবে ;
সংক্ষেপে বলেন যদি, আপনার কি করিতে পারি ?
নিতান্ত বিস্ময় মানি, তাড়াতাড়ি কথা নিনু সারি'।

এই সে রাজ-রাজেন্দ্র মহারাজ—এই বেশভূষা,
এই হাতে মুক্ত হয় কোটি টাকা দানের মঞ্জুষা !
এ সৌজন্য এ বিনয় অতি সাধারণ কোনো লোকে
হেরিলে বিস্ময়মুগ্ধ হ'য়ে লোক চেয়ে থাকে চোখে !

পরিশিষ্ট

বিশ্বজিৎ দানযজ্ঞে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া হাসিমুখে
রাজেন্দ্র দাঁড়া'ল আজি মুখামুখি দেবেন্দ্রসম্মুখে!
মর্ত্তের দারিদ্র্যক্লিষ্ট লক্ষ গৃহে উঠে হাহাকার—
ছাপায়ে উঠিল স্বর্গে মানবের বিজয়-ঝঙ্কার।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

"যদি আজীবন নিষ্কলঙ্কজীবন থাকিতে পার, তবে জীবনের শেষে বলিয়া যাইও আমি নিষ্কলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করিলাম। আমি আশা করি আমার আত্মীয় স্বজন এইরূপ নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিবে। যাহারা নিষ্কলঙ্ক জীবন বলিয়া আড়ম্বর করে তাহাদিগের জীবন নিষ্কলঙ্ক নহে।"

—মণীন্দ্রচন্দ্র—মাঘ, ১৩০২

মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে বাঙ্গালার দানবীর—নব্য বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দাতা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু বাঙ্গালীর পক্ষে অকালমৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার দিকে দিকে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছে, তাহা অকালমৃত্যু ব্যতীত অন্য কারণে সম্ভব হয় না। তাঁহার মৃত্যু বাঙ্গালার কাছে অকালমৃত্যু বলিয়াই বিবেচিত হইবে; কেন না, সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার স্থান অধিকার করা ত পরের কথা, তাঁহার আসনসন্নিকটে উপনীত হইবারও কেহ নাই। বাঙ্গালা যে দিক্‌পাল হারাইয়াছে, তাঁহার স্থান বুঝি চিরদিনই শূন্য থাকিয়া যাইবে। কেন না, তিনি দেশের সকল সৎকার্য্যে, উন্নতিকর কার্য্যে দানের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন অভিনব তেমনি অতুলনীয়। তিনি দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই; তিনি যখন মাতামহের সম্পত্তি লাভ করেন, তখন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ৩২ বৎসরকাল তিনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধনিগণের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তিনি চিরদিনই দরিদ্র; কেন না, তিনি কখন দান-কুণ্ঠ ছিলেন না। তাঁহার আয় যত অধিকই কেন হউক না, তাঁহার দান তাহাকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় তাঁহার সম্পত্তির অপেক্ষা বহুগুণে বিস্তৃত ছিল।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক যখন গত ৩২ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উপকরণ পরীক্ষা করিবেন, তখন তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রের বিরাটত্বে অভিভূত হইয়া পড়িবেন; তিনি দেখিবেন, এই দীর্ঘকাল মধ্যে বাঙ্গালার এমন কোন লোক-হিতকর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্য প্রদত্ত হয় নাই। কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি অর্থনীতিক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, কি কর্ম্মের ক্ষেত্রে তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বত্র সপ্রকাশ ছিল। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রেই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, যেমন অসার কাষ্ঠখণ্ডে মূর্ত্তি ক্ষোদিত করা যায় না, তেমনি অশিক্ষিত সমাজে কোনরূপ উন্নতি স্থায়ী হয় না—হইতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, তাঁহার দানের পরিমাণ ১ কোটী টাকা এবং দানের জন্য প্রসিদ্ধ পার্শী সম্প্রদায়ের কেহই একক এত টাকা দান করেন নাই। কিন্তু

পরিশিষ্ট

যাঁহারা মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন—বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে শিক্ষাবিস্তার কল্পেই তিনি ন্যূনাধিক কোটী টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। যেমন বাঙ্গালার বাহিরে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে, তেমনি বাঙ্গালায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরে তিনি ২ লক্ষ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র কয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশজন্য তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিনি বহরমপুরে একটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও ১ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ তাঁহার অপর কীর্ত্তি। উহার জন্য কখন কখন তাঁহাকে বৎসরে ৫০ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে। কলেজ-স্কুলটির নির্ম্মাণকল্পেই তিনি প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। নানাস্থানে তিনি মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সে সকলের ব্যয়ভার বহন করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শতাধিক ছাত্রকে বাস ও আহার দিয়া প্রতিপালন করিতেন এবং তাহাদিগের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। বহু ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ্য পুস্তকের ও পরীক্ষার ফীর জন্য অর্থ পাইত। আবার তিনি ইথোরায় খনির কাজ শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং রাঁচীতে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যখন শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার এই সকল কার্য্য স্মরণ করা যায়, তখন মনে হয় তিনি ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষাবিস্তারের সহায় হয়েন নাই—পরন্তু স্বয়ং একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান ছিলেন। গোমুখীর মুখ হইতে জাহ্নবীর ধারা প্রবাহিত হইয়া যেমন সমগ্র দেশকে উর্ব্বর ও পবিত্র করে, তাঁহার দয়া হইতে প্রবাহিত সাহায্যধারা তেমনই সমগ্র বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্য করিত। কোন দেশে—কোনকালে এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই অসাধারণ কীর্ত্তির সম্মুখে ইতিহাস যেন স্তম্ভিত—শ্রদ্ধায় অবনত—নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়ায়। সমগ্র জগতে এই কীর্ত্তির তুলনা মিলে না।

দেশের লোককে শিক্ষিত করা যেমন মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল, দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করিয়া দেশের লোককে দারিদ্র্য সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করাও তেমনই তাঁহার ঈপ্সিত ছিল। সে জন্য তিনি যথেষ্ট ক্ষতি অকাতরে সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু শিক্ষার্থীকে বিলাতে, জাপানে, মার্কিনে, জার্ম্মানীতে পাঠাইয়া শিল্প-কৌশল অবগত করাইয়াছিলেন। বেঙ্গল পটারিজ, রাজগাঁ পাথরের

কারখানা, চায়না ক্লের কারখানা, বহরমপুর ট্যাণ্ডারী, তেলের কল, দেশলাইয়ের কল এসব তাঁহারই উদ্যোগে ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি দেশের কল্যাণ সাধনজন্য ন্যস্ত বলিয়া বিবেচনা না করিতেন, তবে কখনই তাঁহার দ্বারা এই সব কার্য্য সম্পাদন সম্ভব হইত না। কেন না, বিষয়ীর দিক হইতে দেখিলে তাঁহার দান ও ত্যাগ যে মহত্বের পরিচায়ক তাহার অনুশীলন দেবোচিত হইলেও সংসারী মানবের পক্ষে সমীচীন নহে। একবার তিনি তাঁহার কোন ধনী বন্ধুর সহিত দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বন্ধুকে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অবহিত হইতে অনুরোধ করিলে বন্ধু যখন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় লোকসানের সম্ভাবনার উল্লেখ করিলেন, মহারাজ তখন বলিলেন, "আমিও ত অনেক লোকসান দিয়াছি; কিন্তু সেই জন্য যদি আমরা অগ্রণী না হই, তবে দেশে কিরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে—অন্য লোক কিরূপে সাহস পাইবে?" অর্থাৎ অভিজ্ঞতালাভের জন্য যে ব্যয় অনিবার্য্য, তাহা ধনীরাই বহন করিবেন। তিনি দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল ছিলেন বলিয়াই কলিকাতায় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রথম যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে তাহার উদ্বোধন করিবার কার্য্যে বৃত করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির। পরিষদ যখন স্থাপিত হয়, তখন শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের গৃহে তাহার আশ্রয় মিলিয়াছিল। তাহার পর ব্যক্তিবিশেষের গৃহে এইরূপ প্রতিষ্ঠান না থাকাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করা হয় ভাড়া বাড়ীতে,—শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থানে পরিষদকে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার গৃহ নির্ম্মাণের কল্পনা হয়। যখন আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্যরসিক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোবিদ শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় প্রভৃতি তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত তখন চারুচন্দ্র ঘোষ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে পরিষদের পক্ষ হইতে কয়জন কাশিমবাজারে গমন করেন। তাঁহাদিগের প্রস্তাব শুনিয়াই মহারাজ সানন্দে পরিষদ মন্দিরের জন্য আবশ্যক জমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। পরিষদে মণীন্দ্রচন্দ্রের দান ইহাতেই শেষ হয় নাই। ইহার পর যখন পরিষদের প্রসারবৃদ্ধি হয়, তখনও রমেশভবনের জন্য তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট

আজিকে যে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, মণীন্দ্রচন্দ্রই তাহার স্রষ্টা। তিনিই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বৎসর বৎসর বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগকে এক কেন্দ্রে সম্মিলিত করিবার কল্পনাকে মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। পরবর্ত্তী কয়টি অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং একবার অধিবেশনে হোতার কাজও করিয়াছিলেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের রাজনীতিক কার্য্যের কথা বিস্মৃত হইলে বাঙ্গালার ললাটে কৃতঘ্নতার অনপনেয় কলঙ্কচিহ্ন চিহ্নিত হইবে। সকল দেশের—বিশেষ বিজিত দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের মূল মন্ত্র—"আগে চল, আগে চল ভাই।" যে কংগ্রেস আজ স্বাধীনতাই আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে সেই কংগ্রেস কি উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলেই এই কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। সেই জন্যই ম্যাটসিনীর শিষ্য সুরেন্দ্রনাথও শেষে তরুণদের নিকট অগ্রগামী নহেন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে নেতৃত্বের আসন দানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথের রচিত বেদীর উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। তেমনই বাঙ্গালার সঙ্কট সময়ে মণীন্দ্রচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালার রাজনীতিক উন্নতির ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তখন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ আত্মপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। লর্ড কার্জ্জনের বিধানে বাঙ্গালীর জনমতের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইবে। একদিকে গুণ্ডার লাঠি ও বন্দুকবেয়নেটে শক্তিশালী রাজপুরুষদিগের জিদ, আর একদিকে অহিংস অসহযোগে দৃঢ়সঙ্কল্প বাঙ্গালার জনগণ। বাঙ্গালার জনমত যে পরাভব জানে না, লর্ড কার্জ্জন হইতে সার ব্যামফাইল্ড ফুলার পর্য্যন্ত শাসকরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই তখন রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা পুঞ্জীভূত মেঘমধ্যে রাজরোষ বজ্রদ্যোতক বিদ্যুতের মত দেখা দিতেছে। বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা করিল—বঙ্গভঙ্গ নাকচ করিবে। সে যুদ্ধের প্রথম তূর্য্যনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দ্বারা। সে যেন পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি। যে সভায় বিলাতীপণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে সভায় তিনিই সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গালীর জয়রথ তাঁহার সারথ্যে কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আজ আর

বলিয়া দিতে হইবে না। যিনি স্বয়ং সরকারের উপাধিধারী, যিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী—তিনি তাঁহার এই কার্য্যের দ্বারা যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কি স্বদেশপ্রেমের উৎস ব্যতীত আর কোথাও উদ্গত হইতে দেখা যায়?

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি সমভাবে দেশের লোকের অধিকারসঙ্কোচক বিধির প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ভাবে রৌলট আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমি কখন বিস্মৃত হইব না। সে দিনের দৃশ্য ভুলিবার নহে। লর্ড চেমসফোর্ড সেই দিনই আইন পাশ করিবেন! পূর্ব্বাহ্নে একবার, অপরাহ্নে আর একবার এবং সন্ধ্যায় তৃতীয় বার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে; তাহার পর দিল্লীর শীতে রাত্রির অধিবেশন। জয়লাভ অসম্ভব বুঝিয়া বীরযোদ্ধা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আর শেষ অধিবেশনে আসিলেন না। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মণীন্দ্রচন্দ্র রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত থাকিয়া আইনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া—বাঙ্গালীর প্রতিনিধির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। দেশপ্রীতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সেরূপ দৃষ্টান্ত কয়জন দেখাইতে পারেন?

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করায় সরকার দশ বৎসর মণীন্দ্র চন্দ্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু তিনি ভীত হয়েন নাই। দেশের লোকের কল্যাণের জন্য তিনি আপনি ঋণ করিয়াও দান করিয়াছিলেন। যাঁহারা আজ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে প্রজাপক্ষ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতেছেন তাঁহারা যদি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া প্রজাকে জমা হস্তান্তর করিবার প্রস্তাবের আলোচনা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, স্বয়ং জমীদার হইয়াও প্রজাকে সে অধিকার প্রদান করিবার ও জমীদারের সেলামী সঙ্কোচ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার বহু দিন পরে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে প্রায় তাঁহার মতই গৃহীত হইয়াছে। দেশের লোকের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সরকার-পক্ষ গ্রহণ করিলে তিনি ৭০ বৎসর বয়সে কেবল "মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই" থাকিতেন না। পরন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক উপাধির ভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইত।

মণীন্দ্রচন্দ্রের ধর্ম্মমত অসাধারণ উদার ছিল। তিনি যে মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, সেই মাতামহের বংশ বৈষ্ণবমতাবলম্বী। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব মতের প্রচারকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি

জানিতেন—"অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর।" তাঁহার কাছে শুনিয়াছি, তাঁহার মাতামহবংশ এমন গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন যে, শৈব বা শাক্তমত সহ্য করিতে পারিতেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃন্দাবন যাত্রাকালে আদেশ দিয়াছিলেন, নৌকার প্রহরীরা দূর হইতে কাশীর "বেণীমাধবের ধ্বজা" দেখিতে পাইলেই যেন তাঁহার কক্ষের পর্দ্দা ফেলিয়া দেয়—তিনি কাশী দেখিবেন না। আর মহারাজ কলিকাতায় বৌদ্ধদিগের বিহার নির্ম্মাণজন্য ভূমিখণ্ড দান করিয়াছিলেন।

তবে তিনি স্বয়ং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্য তিনি সযত্নে সম্পন্ন করিতেন এবং হিন্দুর আচার ও ব্যবহারের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। সেই জন্যই তিনি বিদেশী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্ট ব্যবস্থাপক সভার আইনের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। সে জন্য যে মুষ্টিমেয় লোক তাঁহাকে সঙ্কীর্ণতার অপবাদ দিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যের স্বরূপ দেখিতে পায় নাই। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারই অর্থে বহু বাঙ্গালী যুবক দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প শিখিবার জন্য বিলাতে, জার্ম্মাণীতে, জাপানে গিয়াছিল। তাঁহার সাহায্যে কোন বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞ বিদেশে সঙ্গীতচর্চ্চার জন্যও গমন করিয়াছিলেন। অনেকে হয়ত জানেন না, এ দেশে যেমন ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রভৃতি তাঁহার অর্থসাহায্যে সাহিত্যিক কার্য্য করিয়াছিলেন, বিদেশে তেমনই ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল তাঁহারই অর্থসাহায্যে গবেষণা করিয়াছিলেন। এ দেশে সমাজপতিরাই লোকমত লইয়া সমাজসংস্কার করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সেই মতাবলম্বী ছিলেন। সেও তাঁহার জাতীয়তার পরিচায়ক। তিনি জানিতেন, জাতি যখন শিক্ষিত হয়, তখন আবশ্যক সংস্কার স্বতঃই সংসাধিত হয়। তিনি জাতিকে শিক্ষিত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; সে জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা কেবল বঙ্গদেশে—কেবল ভারতবর্ষে কেন—যে কোন দেশে বিরল। শিক্ষা যাহাতে জাতীয় ভাবধারার বিরোধী না হয়, সেই জন্য তিনি জাতীয় পরিষদের পুষ্টিকল্পে দান করিয়াছিলেন; আর সেই জন্যই তিনি স্বয়ং ছাত্রদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তিনি যে তাঁহার সম্পত্তি ন্যাসরূপে ব্যবহার করিতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার আড়ম্বরহীন, বিলাসবর্জ্জিত জীবনযাত্রা-রীতিতেই তাহা

বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জন্য এত অল্প ব্যয় করিতেন এবং তাঁহার পরের জন্য ব্যয়ের তুলনায় তাহা কিরূপ নগণ্য তাহা বিবেচনা করিলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয় এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

মানুষের—বিশেষ তাঁহার স্বদেশবাসীর সেবাই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। সে সেবা তিনি কিরূপ নিষ্ঠা সহকারে—কিরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে—কিরূপ আনন্দে করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ তাঁহার অভাব তাঁহার দেশবাসীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। তিনি দেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে কিরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি দেশের দারিদ্র্যে ব্যথিত হইয়া কিরূপে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন সে কথাও বলিয়াছি। তিনি দেশবাসীর রাজনীতিক অধিকার বিস্তারে কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন, তাহাও দেখাইয়াছি। তিনি কিরূপে দয়ার প্রভাবে বিষয়-বুদ্ধি ভাসাইয়া দিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দেশের ব্যথিত—পীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখেও তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। বহরমপুরের জলের কলের বিস্তার সাধন করিয়া সুপেয় বারি প্রদানজন্য তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; তিনি বহরমপুরে চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যখন লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে নানাদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল; তিনি বহরমপুরে একটি হাঁসপাতাল পরিচালিত করিতেন; তিনি নানাস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন; তিনি কলিকাতায় বেলগেছিয়ার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ দান করিয়াছিলেন; জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদও তাঁহার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয় নাই। এ সকলই তাঁহার জনসেবার নিদর্শন।

বাঙ্গালা যে জনহিতকর অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে দানের জন্য ভারতের প্রদেশ-সমূহের মধ্যে অগ্রণী ছিল, সে কেবল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জন্য। তিনি একাধারে সমুদ্রের উদারতা ও দধীচির ত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি এদেশে দানের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার দান কোন সম্প্রদায়ে, কোন স্থানে, কোন অনুষ্ঠানে বদ্ধ ছিল না—তাহার উদারতাই তাহার বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই জন্যই বাঙ্গালী পরিণত বয়সে তাঁহার তিরোভাবকেও অকাল মৃত্যু বলিয়া মনে করিতেছে এবং করিতে থাকিবে।

পরিশিষ্ট

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মত বহুগুণশালী বাঙ্গালীর অভাব যে কখন বাঙ্গালার সামাজিক জীবনে পূর্ণ হইবে, এমন আশা করা যায় না। কেননা সেরূপ গুণসংযোগ সচরাচর হয় না।

আজ তিনি আর নাই। যিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল বঙ্গদেশে বিপন্নের আশ্রয় ও সকল সৎকার্য্যের সহায় ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার গৌরবগিরির স্বর্ণচূড়ারূপে চিরদিন বাঙ্গালীর স্মৃতিতে বিরাজিত থাকিবেন। তাঁহার দান-পুণ্য-প্রবাহিণী ধারায় অবগাহন করিয়া বাঙ্গালী আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিবে এবং যতদিন যাইবে কীর্ত্তি উদায়াস্ত-অরুণ-রাগ-রঞ্জিত হিমাচলশৃঙ্গের মত বাঙ্গালীকে মহত্ত্বের স্বরূপ দেখাইয়া মনুষ্যত্বের দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করিবার আদর্শে আকৃষ্ট করিবে।

আজ তাঁহার জন্য শোকার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহার সম্বন্ধীয় এই আলোচনা শেষ করিবার সময়ে মনে হইতেছে—

মহত্ত্ব গোমুখী মুখে করি' প্রবাহিত—
দয়ার পাবনী ধারা; করি' প্রতিষ্ঠিত—
দানের আদর্শ নব; লভিলে আশ্রয়,
পূর্ণব্রত, অমরায়—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

"অজ্ঞতাই দাসত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার শোষণ-নীতির সহায়।"
—মণীন্দ্রচন্দ্র

মহামানব

নিভে গেছে চিতার আগুন!
অন্তরে স্মৃতির চিতা জ্বলিতেছে আরো চতুর্গুণ;
সহস্র শিখায় কাঁপে দিশা
জীবনের অর্ঘ্য নিয়ে চলে' গেল দীর্ঘ মহা নিশা!
কত দিন কত বর্ষ ধরে'
অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার ভরে
নরনারী রচিয়াছে মর্ম্মতলে যা'র সিংহাসন
দেহ-অবসানে তা'র শ্মশানে কি হয় নির্ব্বাসন?
মৃত্যুতে অমর প্রাণ পরিপূর্ণ জীবনের বলে
কীর্ত্তির বিজয়-মাল্য দেশমাতা দিল যা'র গলে,
তাহার বিয়োগ-দুখে সাত কোটি বাঙ্গালী কাঁদিছে
অনন্ত দুর্য্যোগ-রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে পিছে;—
বিপর্য্যয়ে কে দিবে আশ্রয়?
দুঃখ-সিন্ধু উথলিছে, কল্লোলিত উৎসন্নের ভয়!

নাই নাই, নাই মহারাজ,
পরম তীর্থের যাত্রী, সাঙ্গ ধরণীর রাজকাজ।
একান্ত যে আপনার জন
তাহারে হৃদয়ে রাখি—নাহি তার কোনও আয়োজন!
সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষার কথা,
অন্তরের যত ব্যথা
নিঃশেষে উজাড় করি তারই কাছে অকপট প্রেমে।
দীনের সকল কর্ম্মে সিংহাসন হ'তে নেমে
মহারাজ আসিয়াছে গায়ে মাখি' ধরণীর ধূলি
বিপন্নে তুলিয়া বুকে করিয়াছে নিত্য কোলাকুলি,

পরিশিষ্ট

তুচ্ছ করি' মণিহার মহামূল্য কিরীট-ভূষণ !
রাজা তুমি, তোমার আসন
প্রাসাদে ছিল না কভু,—ছিল পাতা হৃদয়-কমলে,
আজি তাই নয়নের জলে
মনে পড়ে নর-দেবতায়,
হৃদয়-বিজয়ী বীর, পুণ্যশ্লোক প্রেম-মহিমায় !

হে বৈষ্ণব-চূড়ামণি,
চৈতন্যের ভক্তাধীন, হরিপ্রেম-মরকত-খনি
অফুরন্ত ছিল যে তোমার,
'নাম সত্য কাম মিথ্যা' জেনেছিলে সাধনার সার ;
তৃণ সম ছিলে নত, তরু সম সহিষ্ণু কঠিন,
তাই ছিল চরণে বিলীন
সংসারের তুচ্ছ অর্থ, সম্পদের মিথ্যা প্রলোভন ;
চরিত্রের যাহা কিছু সুন্দর শোভন
তোমার জীবন মাঝে পুষ্প সম বিকশিয়া উঠি'
সার্থক পূজার অর্ঘ্যে ইষ্টপদে পড়িয়াছে লুটি',—
সেবার গৌরবে পুণ্য, প্রেম-চন্দনের গন্ধে ভোর,
দিনান্তের সন্ধ্যামণি—কৃষ্ণচন্দ্র-প্রতীক্ষা-বিভোর !

সমদুঃখী ছিলে বাঙ্গালীর,
দুর্দ্দশার মুক্তিপণে মনপ্রাণ একান্ত অধীর ;
দেশের কলঙ্ক-কথা, দাস-জীবনের অপমান
আপন মাথায় ল'য়ে একদিন হ'লে আগুয়ান
তুচ্ছ করি' রাজরোষ, অবহেলি' নিষেধের বাণী ;
মুমূর্ষু জাতির প্রাণে সেইদিন দিয়েছিলে আনি'

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মাথা তুলে দাঁড়াবার বল,
বিফল হইয়া গেল পুরুষেরে বাঁধার কৌশল।
ধর্ম্মযুদ্ধে ছিলে যুধিষ্ঠির,
ধ্রুবতারা সম স্থির
সত্যপথে আদর্শ তোমার
সহস্র ঝঞ্ঝার মাঝে চলিয়াছ তেজে দুর্নিবার,
স্ফীতবক্ষ সমুন্নত ভালে;
আপন সাধনামগ্ন কভু লোকলোচন আড়ালে
অর্জ্জন করিয়া সিদ্ধি সাধনায় নির্ব্বিকল্প প্রাণ;
দান-যজ্ঞে যাজ্ঞিক প্রধান
জ্বালাইলে হোমানল অনির্ব্বাণ আহিতাগ্নি সম,
শম দম
দয়া দান দাক্ষিণ্যের ভার
হাসিমুখে তুলে নিলে দুই হাতে স্কন্ধে আপনার।

হে মহান্ সুধী,
ব্যগ্র বাহু বলে তুমি অন্বেষিয়া জ্ঞানের অম্বুধি
রেখে গেছ স্তরে স্তরে
বাণীর মন্দির ভরে'
আঁধারে লুকান মণি-মাণিক্যের ছিন্ন ভিন্ন হার,
আলোক তাহার
উজলিছে বেদীতল, জ্যোতিস্নাত তোমার মহিমা,
গুণের গৌরবে ঋদ্ধ, সহজাত তোমার গরিমা।

হে হৃদয়ী, সাধু, সদাশয়,
দুর্দ্দিনের বন্ধু ছিলে দুর্দ্দশার পরম আশ্রয়;
আশ্রিতে পেলেছ তুমি আপনারে বিনিময় করি'
বিনয়ে অঞ্জলি ভরি'

পরিশিষ্ট

যা' দিয়েছ প্রার্থিজনে, মূল্য তার জানে সর্ব্বজন,
অর্থেরে অনর্থ জানি পরমার্থে আত্মসমর্পণ—
এই ছিল আদর্শ তোমার,
স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস তা'র
লেখা রবে চিরকাল বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে।
দাতাকর্ণ, তোমার ভবনে
অন্নপূর্ণা নিজ হাতে করেছেন অন্নজল দান,
বুভুক্ষু এ দেশের সম্মান
দায়রূপে করিলে গ্রহণ
দাতাকল্পতরু রাজা, প্রজা তব নর-নারায়ণ।

এ সংসার-রণক্ষেত্র-মাঝে
একাকী দাঁড়ায়ে তুমি যুঝিয়াছ শ্রেষ্ঠ বীরসাজে।
বিপদে কাঁপেনি বুক, নিষ্ফলতা দেয় নাই লাজ,
শক্তি ছিল তাই মহারাজ,
যত তুচ্ছ নিন্দা গ্লানি হায়
তোমার মধুর হাস্যে স্তুতি হ'য়ে লুটিয়াছে পায়।
ধৈর্য্যে ছিলে পাষাণসমান
মাথা পেতে নিয়ে গে'ছ বিধাতার নির্ম্মম বিধান।
দুর্য্যোগের রাত্রি অন্ধকার,
ধারা বৃষ্টি নেমে এল, ঝঞ্ঝা এল পশ্চাতে তাহার;
পুত্রশোক-বজ্রাঘাত বার বার নিলে বুক পেতে;
অনিত্য সংসার-পথে যেতে
নিত্য ব্যথা পেয়েছ অপার,
সকলি সহিয়া গে'ছ, কর্ম্মে শুধু রাখি' অধিকার।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মানুষের সত্যপথে আজীবন চলিয়াছ তুমি,
জননী জনম-ভূমি
গরবিণী গৌরবে তোমার
আজি শুধু স্মৃতিবুকে দুর্ভাগ্য গণিছে আপনার।
মর্ত্ত্য হ'তে এ বিদায়, মৃত্যু নহে—অমৃতের দান,
মন্দার-মালিকা হাতে দেবকন্যা করে স্তবগান
স্বর্গের তোরণ দ্বারে; দেবকল্প হে মহারাজন্,
অন্তরের নিত্যপূজা স্বর্গ হ'তে করিও গ্রহণ।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

"আমাদের দেশে যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা শঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া কি আমরা নির্জ্জীব হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? আমাদের দেশ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল যুবকদিগের মধ্যে উন্নতির ইচ্ছা আছে, শিক্ষা ও অর্থের অভাবে তাহারা সে উন্নতির পথে যাইতে পারিতেছে না। স্কুল কলেজের শিক্ষার সহিত সাধারণতঃ আমাদের শিক্ষা শেষ হইল, আমরা এই জ্ঞান লইয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করি এবং নিজ মতামত প্রকাশ করি, ইহাতে উন্নতির আশা কোথায়?" —মণীন্দ্রচন্দ্র

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

দুর্ভাগ্য এই বাঙ্গলা দেশের আর দুর্ভাগ্য এই বাঙ্গালী জাতির। লাঞ্ছিত পদদলিত, হৃতসর্ব্বস্ব বাঙ্গলার মসীকৃষ্ণ রজনীর একমাত্র দীপ-শিখা আজ চির-নির্ব্বাপিত। বাঙ্গলার আশার সূর্য্য আজ চির অস্তমিত ;—যাহার সৌর কিরণ-সম্পাতে বাঙ্গালীর আশার বক্ষ সমুদ্ভাসিত থাকিত, যে স্পর্শমণির সংস্পর্শে দরিদ্রের দারিদ্র্য-দুঃখ সুখ-সুবর্ণে পরিণত হইত, যাহার উদার দানশীল হস্ত দরিদ্রের দুঃখ মোচনে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে উন্মুক্ত থাকিত, যাহার ধর্ম্ম-ছত্র-ছায়ার তলে সনাতন ধর্ম্মের কত শত প্রতিষ্ঠান আশ্রয় পাইত, আর্ত্ত দরিদ্রের নারায়ণরূপী বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়া সেই পুণ্যশ্লোক নরপতি বাঙ্গলার হরিশ্চন্দ্র অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবচূড়ামণি রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্রকে বক্ষে পাইয়া বঙ্গজননী প্রকৃত রাজমাতার গৌরবে গৌরবান্বিতা ছিলেন, আজ সেই রাজ্যেশ্বর পুত্রকে হারাইয়া তিনি দীনহীনা কাঙ্গালিনী। ভারতের শিক্ষা-গগনের ধ্রুবতারা, দেশের শিল্প-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, যাঁহার সঞ্জীবনী দানশীল করস্পর্শে বাঙ্গলা তথা ভারতে কতশত শিল্প কলা নব নব কলেবরে নূতন জীবন পাইয়া দেশের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে, যে নরশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন নরপতির দান-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গলার "বসু-বিজ্ঞান-মন্দির" স্থাবর জঙ্গম হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণ স্পন্দনের এক অখণ্ড সূত্রের আবিষ্কার করিয়া জড় চৈতন্যের ভেদাভেদ মোচন পূর্ব্বক বিজ্ঞানের মহিমময়ী বাণী প্রচার করিয়া জগতকে শুনাইয়া বলিতেছে—"প্রাণ আছে যার বুঝেছে সে জগত জোড়া একই প্রাণ", যাঁহার কীর্ত্তি-গাথায় বাঙ্গলার আকাশ বাতাস মুখরিত, সেই রাজর্ষির নশ্বর দেহ আমরা বাহ্যিক চক্ষে আর দেখিতে পাইব না সত্য কিন্তু মানবের পার্থিব চক্ষের অন্তরালে যে মনশ্চক্ষু রহিয়াছে তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মহারাজকে অন্তরাল করিতে পারিবে না। সাহিত্যে, সমাজে, শিক্ষা এবং শিল্পে তাঁহার দানের স্পর্শে যে স্পন্দনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তো কখনই যাইবার নহে। আগে স্পন্দন পরে রূপ, আলোকের দ্রুত তরঙ্গ স্পন্দন আগে পরে তার রূপের প্রত্যক্ষ, রাজর্ষি স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যে স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার প্রতি নরনারীর হৃদয়ে প্রতিনিয়তই তার তরঙ্গ উঠিবে। মহারাজের

সৌম্যমূর্ত্তি অবিনশ্বর হইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সেদিন টাউন হলে বাঙ্গালী পরলোকগত মহারাজের উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আসিয়াছে তাহা একান্ত প্রাণেরই অর্ঘ্য, তাহা ছাড়া হতভাগ্য দরিদ্র জাতির দিবার সম্বল আর কি আছে!

বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির নিকট স্বর্গীয় মহারাজের স্মৃতির জন্য তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি বা অনুরূপ বাহ্যিক অনুষ্ঠান আবশ্যক হইবে না, কেন না জাতির অন্তরে যে মূর্ত্তি জাগরূক আছে, কোন মুহূর্ত্তেই সে মূর্ত্তিকে বাঙ্গালী স্মৃতির অন্তরাল করিতে পারিবে না। দেবতার মত অন্তরের আসনে যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহার বাহ্যিক স্মৃতি-প্রতিষ্ঠান থাকুক বা নাই থাকুক একই কথা, কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জন্য একান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালী যে মহারাজকে ভুলিতে পারে না, খাওয়া পরা যদি তার ভোলা সম্ভবপর হয় তবে হয়তো ভুলিতে পারে নচেৎ যাহাদের অন্নের প্রতি গ্রাসের সঙ্গে, শিক্ষার প্রতি অক্ষরের সঙ্গে স্বর্গীয় মহারাজের স্মৃতি বিজড়িত সে জাতি কেমন করিয়া সেই অনাথ ও আশ্রিতপ্রতিপালক, অদ্বিতীয় দানবীর, সারল্যের অবতার, ধর্ম্মপালক, প্রজারঞ্জক রাজর্ষি স্বর্গীয় মহারাজকে ভুলিতে পারে?

আমি তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিতে বসি নাই, তবে তাঁহার সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য পাইয়া সেই দেবতুল্য নরপতির মধুর চরিত্রের যে একটু পরিচয় পাইয়াছি তাহাই বলিবার প্রয়াস পাইব মাত্র, অধিক বলিতে ভয় হয়, পাছে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির লেখনীস্পর্শে সেই মহাপুরুষের মহান আদর্শ চরিত্রের পরিচয় সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট না হইয়া উঠে।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "মহারাজার বিরাট দানের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বহরমপুর না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার দানের পরিমাণ সম্যক্‌ জানিতে পারি নাই, তিনি কোটি টাকার উপর শুধু শিক্ষার জন্যই দান করিয়াছেন, এত বড় দান কোন পার্শীও করেন নাই।" আমরা জানি শুধু শিক্ষা নহে এমন কোন কার্য্য নাই, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য কাব্য ললিত কলা প্রভৃতি বাঙ্গলা দেশে এমন কোন বিষয় নাই যাহা স্বর্গীয় মহারাজের দানের গৌরব হইতে বঞ্চিত। যাঁহার বাৎসরিক প্রায় সার্দ্ধ কোটি টাকা, পরিমিত আয়ের সম্পত্তি হইতে দান করিতে করিতে দেড় কোটি টাকার অধিকও দান করিতে হয় তাঁহার দানের পরিমাণ কত কোটি! শিক্ষা এবং শিল্পের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল যাহার জন্য তিনি সর্ব্বস্বই দান

করিয়াছেন। শিল্প শিক্ষা যে কেবলমাত্র কতকগুলি বিস্তালয় স্থাপন করিলেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, তাহা তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জন্তই তিনি কোন প্রকার লাভ লোকসানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শিল্প বাণিজ্য যাহাতে প্রসার লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নানা প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহ কারবার টাটা আয়রণ এবং ষ্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় The Iron King of India স্যর জেমসেদজী টাটার পুত্র স্যর দোরাবজী টাটা মহারাজের সহিত কথোপকথন কালে বলিয়াছিলেন "এ দেশ তো দূরের কথা পৃথিবীর কোন দেশে একজন ব্যক্তি এত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।" মহারাজ বলিয়াছিলেন "কিন্তু কৃতকার্য্য হলো না তো একটাও"। উত্তরে স্যর দোরাব টাটা বলিয়াছিলেন,"অকৃতকার্য্য একটাও হয় নাই মহারাজ, প্রত্যেক বৃহৎ কার্য্যেরই প্রথমে একটা experiment আবশ্যক কিন্তু আপনার ন্যায় দানবীর আর কে আছে যে এই great experiment কর্ত্তে সাহসী হবে, এ দেশে যতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহার সমস্তই আপনার এই অসামান্য experimentএর ফল।" যখনই মহারাজের সহিত কথোপকথনের সুযোগ পাইয়াছি তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষার প্রসার এবং শিল্পের উন্নতি কিসে হয় তাহারই আলোচনা শুনিয়াছি। আমি একজন রসায়নবিদ্, তাই আমার সহিত কথাবার্ত্তায় সকল সময়েই জিজ্ঞাসা করিতেন, দেশে ছোট রাসায়নিক কারবারের প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা এবং তাহাতে ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে কি না, এই সব প্রশ্নই তিনি আমাকে করিতেন।

মহারাজের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির একটা উদাহরণ এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা মহারাজার দেশবাসী, তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার বহুবারই হইয়াছে, কিন্তু সে আজ বহুদিনের কথা তখন আমার বয়স ১৩ কিম্বা ১৪ হইবে। আমরা কয়েকজন বালক বাড়ীতে কিছু না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। রাজবাড়ীতে যাত্রা গান হইতেছে দেখিয়া শুনিতে বসিয়া গেলাম, পকেটে পয়সা কড়ি বিশেষ ছিল না, যা' দু চারি আনা ছিল তাহাও সেই ভীষণ জনতায় কে উঠাইয়া লইয়াছে, যাত্রা না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত তাহা আর টের পাই নাই। গান ভাঙ্গিলে সেই ভীষণ ভিড় ঠেলিয়া আসিতে এমন ভাবে পা মচকাইয়া গেল যে, সেইখানেই বসিয়া

পড়িলাম। রাজবাড়ীর সম্মুখেই এক স্থানে বসিয়া যন্ত্রণায় কাঁদিতেছি। তখন সবে মাত্র প্রাতঃকাল হইয়াছে এমন সময় মহারাজ আমার কাছ দিয়া যাইতেছিলেন; আমাকে ক্রন্দনরত দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার অবস্থা যখনই জানিলেন, তখনই একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, ইহাকে আহারাদি করাইয়া বাড়ী পর্য্যন্ত টিকিট কিনিয়া খুব সাবধানে যেন ষ্টীমারে উঠাইয়া দেওয়া হয়। তারপর আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "দুষ্টু ছেলে, শক্তিপুর থেকে এখানে গান শুনতে এসেছ, তুমি পড় তো? আচ্ছা যাও, তারপর তোমাদের হেড্ মাষ্টারকে আমি বলে পাঠাচ্ছি" আমি মনে মনে ভাবিলাম তবেই তো হয়েছে, একেই তো স্কুলে মার না খেয়ে দিন যায় না, তার উপর মহারাজ যদি হেড্ মাষ্টারকে বলে দেন তবে তো পিঠের চামড়া আর থাক্‌বে না; কিন্তু সেই তিরস্কারের মধ্যে যে কি মধুর স্নেহ লুক্কায়িত ছিল তাহা জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই।

তারপর প্রায় ২৫ বৎসর পরে মহারাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ ঘটে শাঁটুই গ্রামে আমার পূজ্যপাদ মেসো মহাশয় শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চট্টরাজ মহাশয়ের ভবনে মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষে। সেখানে আমার মাসতুতো দাদা শ্রীযুক্ত অমর নাথ চট্টরাজ মহারাজের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিতেই তিনি বলিলেন "ও আপনারই না কাশিমবাজারে গান শুনতে গিয়ে পা মচ্‌কে গিয়েছিল?" আমি তো অবাক হইয়া গেলাম, বলিলাম "হাঁ মহারাজ, কিন্তু সে তো আজ ২৫ বৎসরের কথা।" ভাবিলাম কি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি। তারপর হইতে বহুবারই মহারাজের সহিত শিল্প-বাণিজ্যসম্বন্ধে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের রেশমের কারবার চিরপ্রসিদ্ধ ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এ সম্বন্ধে মহারাজ আমায় একদিন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রেশমের সূতা ব্লিচ করিয়া রং করা যায় কি না। আমি বলিলাম, ইহা যে বিশেষ কঠিন তাহা নহে, তবে আমার সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। তাহাতে তিনি বলিলেন "ইহাতে অভিজ্ঞতার আর এমন কি প্রয়োজন? কিছু experiment দিয়া দেখুন না?" অনেক বুঝাইয়া তবে নিরস্ত করিলাম। কিছু দিন পরে আবার একদিন ডাক পড়িল, সে আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া হাজির হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলেন, দেশে কোন রাসায়নিক কারবারের প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না এবং লাক্ষা হইতে গালা ও রং প্রস্তুত এবং ঐ সব শিল্প ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া

সম্ভব কি না? এবার আর শুধু জিজ্ঞাসা নহে, একটা এষ্টিমেট পর্য্যন্ত করিবার আদেশ হইল, কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করিয়া গেলাম, খসড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার কয়েকদিন পর পুনরায় ডাক পড়িল। অল্প মূলধনে এই সব ব্যবসায়ের পরিণামসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার পর ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম, তাহাতে বলিলেন "আর কিছু না হোক কয়েকটা ছেলের শিক্ষাও তো হবে, না হয় আরও কয়েক হাজার টাকাই আমার যাবে।" ভাবিলাম অদ্ভুত এই কর্ম্মযোগীর কর্ম্মের স্পৃহা, এ অবস্থাতেও experiment দিতে কুণ্ঠিত নহেন। দেশের উন্নতি এবং দশের শিক্ষাই ছিল তাঁহার ধ্যান এবং জ্ঞান। সম্পত্তির আয়ের বিপুল অর্থের তিনি যেন রক্ষক মাত্র; সম্রাট্ নাসিরুদ্দিনের পর বাঙ্গলায় ছিলেন এই রাজর্ষি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র।

আর একদিন সন্ধ্যার পর মহারাজের কলিকাতার বাসভবনে এই ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিক্ষার বিষয় লইয়াই আলোচনা হইতেছে। সেদিন আর কোন লোকের ভিড় ছিল না, উপস্থিতের মধ্যে আমি ও বেলডাঙ্গা নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুখেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজা, দেশে যে একটা শিল্পকারবার কৃতকার্য্য হচ্ছে না এর কারণ কি?" মহারাজ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়া বসিলাম "কারণ খুব সোজা......অসাধুতা আর অনভিজ্ঞতা।" মহারাজ বলিলেন "ও দুটোর কোনটাই মূল কারণ নহে, প্রধান কারণ হচ্ছে প্রাণহীনতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব", তারপরই বলিলেন "লোকে আমাকে খুব বোকা মনে করে, কিন্তু বোকা আমি নই, যারা এত টাকা পেয়েও কিছু গড়ে' তুলতে পাল্লে না, তারাই বোকা।" কথাটা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহার আর কোন ভুল নাই।

এইবার তাঁহার সারল্যের একটু পরিচয় দিয়া আজিকার মত শেষ করিব। একবার মহারাজের নিকট কোন একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য সাক্ষাৎ মানসে কাশিমবাজার গিয়াছিলাম, তখন তিনি কাছারি করিতেছিলেন—ভুলিয়াই গেলাম যে, অর্দ্ধ বাঙ্গলার অধীশ্বরের নিকট বসিয়া কথা কহিতেছি—বলিয়া ফেলিলাম "মহারাজ, আপনি একটু আসবেন। আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে।" তিনি তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে আসিলেন। আমি কথা শেষ করিয়া চলিয়া গেলাম, পরে খেয়াল হইল এ করিলাম কি! আবদার করিতে করিতে স্পর্দ্ধার চরম সীমায় উঠিয়াছি!

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মহারাজকে অনুরোধ করিলাম উঠিয়া আসিতে! তিনি স্মিতমুখে ঐ আবদার শুনিলেন! ইহা কি মানুষে সম্ভবে! প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের বহুদেশ ঘুরিয়া ছোট বড় অসংখ্য নরনারীর সঙ্গে মিশিয়া আসিলাম; দেশী বিদেশী অনেক রাজা এবং রাজতুল্য ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গে মিশিলাম কিন্তু এ চরিত্র তো কোথাও দেখিলাম না। একি দেবতাতেও সম্ভব হইতে পারে?......এইখানেই মনে হইল মানুষ দেবতা অপেক্ষাও বড়......যা কিছু মহৎ তাহা মানুষেই সম্ভবে। ......কল্পনার দেবতা মানবের কল্পনাতেই থাকুন, প্রত্যক্ষ দেবতা দেখিয়াছি; মানুষেরই মধ্যে সে মানুষ ঐ চিরসুন্দর রাজর্ষি স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র।

শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

"মৌলিক চিন্তার অধিকারী হওয়া একান্ত দরকার। বর্তমান সময়ে যুবকবর্গ যেরূপ ভাবে শিক্ষিত হইতেছেন তাহাতে জাতীয় জীবন গঠিত হয় না এবং জাতির স্বাধীনতা পাওয়াও তাহাতে সুকঠিন। সেজন্য আমাদের প্রয়োজন গঠনমূলক কার্য্য।"

—মণীন্দ্রচন্দ্র

মহারাজ

একথা জানিতে তুমি, দীন বাংলার মহারাজ!
বাঙ্গালীর দুঃখ দূর,—বিধিরও অসাধ্য সেই কাজ।
শুধু তার দৈন্যের বেদনা
তব দানে লজ্জা পা'ক,—এই ছিল তোমার সাধনা।
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
যে দেশে মানুষে নিত্য করিতেছে মনুষ্যত্বহীন,
সেথা তব ভাণ্ডারের ধন
অর্ব্বুদ মুমূর্ষু দেহে রক্ষিতে জীবন
পারে কতক্ষণ?—
এ কথাও বুঝিতে রাজন্
তবু ভেবেছিলে,—
ভিক্ষুকের যদি লজ্জা হয়,—তুমি তাই সর্ব্বস্ব সঁপিলে।
যদি কোন দিন
ভিক্ষাহীন
সন্ধ্যামুখে ফিরিতে কুটীরে
তিমিরের তীরে
অকস্মাৎ ফিরে পায় জ্ঞান,—
দাতার দানে বা প্রত্যাখ্যানে, আত্মার সমান অপমান;
যদি শির তুলি' পূর্ণ আশে
সহসা সে
থমকি' জীবন-তটে চেয়ে দ্যাখে উন্মুক্ত আকাশে;
যদি পদতলে
কঠিন মৃত্তিকামাত্র ভর করি' দলে দলে দলে
রাত্রে পথ চলে;—
তবে
যা হবার হবে,—

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

থাকে থাক্, যায় যাক্ চলি'
লক্ষ্মীর বঞ্চনাময় সুসঞ্চিত কাঞ্চনের থলি,
হয় হস্তী পদাতি পুত্তলি ;
থাকে থাক্, যায় যাক্ যদি,—
ঋণ-স্রোতে ভেসে যাক্ ভাগ্যস্রোতে ভেসে আসা গদি !
শুধু থাক্,
শুধু থাক্,—
অক্ষম দেশের 'পরে আত্মীয় আত্মার অভিমান,—
পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিচারে দান !
তোমার বুকের লজ্জা বাঙ্গালীর মর্ম্মে বিঁধে থাক্ ;—
যা'র ঘরে ঘরে
নিষ্কর্ম্ম দরিদ্র পিতা ভিক্ষা সার করে
অপত্যের অন্নমুষ্টিতরে ;
যাহার সন্তান
ভিক্ষাভিন্ন নারে রক্ষিবারে জননীর কটির সম্মান ;
শিক্ষকেরা যা'র শিক্ষালয়ে
বিলায় ধিক্কৃত শিক্ষা ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে ,
গ্রামে গ্রামে নদী তীরে তীরে,
মন্দিরে মন্দিরে
কায়ক্লিষ্ট পূজারীর সাথ
বার বার নিগৃহীত বিগ্রহ মেলিয়া আছে হাত ;
যাহার অঙ্গনে
মুঞ্জরিত তুলসীর বনে
পথ্যাভাবে রোগমুক্ত পিতৃ-শব পচে,
ভিক্ষা এনে পুত্র চিতা রচে
যার ধর্ম্মনীতি,
কাব্য প্রেমগীতি,
রাজ-ভয়-ভীত রাজনীতি,—
ভিক্ষাবৃত্তি কাঙালের হীন অর্থপ্রীতি !

পরিশিষ্ট

নিজেরে নিঃশেষ করি দানে দানে তার
ঘরে ঘরে বুকে বুকে জাগাবে ধিকার,
এই আশা ছিল ত তোমার।

হায় মহারাজ!
তোমারে হারায়ে যা'রা ঘরে পরে' কাঁদিতেছে আজ,
তাদের ত লাগেনি এ লাজ!
তারা আজও ফিরে চায় দাতা!
দেশের দশের কাজে চায় তারা, হায়রে বিধাতা,
খোলা থাক্ খাতা!
তারা বুঝিল না,—তব দান
দেশের মুক্তির পথে নব অবদান,—
বহিছে কি বাণী!
'দান শুধু দানই,
দাতারে দরিদ্র করে, দরিদ্রে সে করে না মহৎ,
আত্মা-জয়-যাত্রিকের নয় নয় ভিক্ষা নয় পথ।'

জানিতে জানিতে মহারাজ,
যে কাজ করিতে চেয়েছিলে মানুষের অসাধ্য সে কাজ।
তখন এসেছে শেষ ডাক,
দেখি মোরা হইয়া নির্ব্বাক,—
সংক্ষুব্ধ-সমুদ্রলীন পক্ষহীন জাগিতেছ বিরাট মৈনাক!
তবু প্রাণপণ,
অন্তরে জপিছ তব পণ,—
নিজের সর্ব্বস্ব যায় যাক্,
শুধু থাক্,—
সন্ধ্যার রক্তিমাকাশে চক্ষের সম্মুখে জেগে থাক্,—
আঁধার দেশের দৈন্য উত্তুঙ্গ অচল,
দানের আলোকদীপ্ত কলঙ্ক-কজ্জল
সে লাজমহল!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

জন-সেবক মণীন্দ্রচন্দ্র

কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার অতুল বৈভব এবং অনুপম চরিত্রে উদ্ভাসিত স্বচ্ছ হৃদয় দিয়া যে জীবন দশের ও দেশের সেবায় আহুতি দিয়াছেন তাহার পুণ্যময় কাহিনী এ অধঃপতিত জাতির নিকট অমূল্য সম্পদ। সে সুদীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত কাহিনী কীর্ত্তন করিবার এ অবসর নহে। তাঁহার তিরোভাবে দেশ আজ কি রত্ন হারাইয়াছে, বিপ্লব-বাত্যায়-ক্ষুব্ধ সমাজ তাহা পলে পলে উপলব্ধি করিবে। তাঁহার শুভ্র ও পবিত্র জীবনের আদর্শ অবশ্যই দেশের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ করিবে। আপামর সাধারণের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া, পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া যে মহাপ্রাণতার নিদর্শন তিনি দেশবাসীকে দিয়া গেলেন, বংশপরম্পরায় দেশবাসী সে পুণ্যস্মৃতি তর্পণ করিয়া সার্থক হইবে।

আশৈশব তাঁহার স্নেহ-সংস্পর্শে থাকিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেবোপম চরিত্রে সেবাপরায়ণতার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিবার নহে। তিনি তাঁহার অতুল ধনভাণ্ডার পরের সেবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতেন—ব্যক্তি-গত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দশের কল্যাণকামনায় তাঁহার বিপুল ধনরাশি ব্যয় করিয়া তৃপ্তি পাইতেন। বৎসরে বৎসরে পূজা ও উৎসবাদির যে বহুল অনুষ্ঠান তিনি তাঁহার কাশিমবাজার রাজধানীতে সম্পন্ন করিতেন, ভোগলালসায় অধিকৃত বাংলার কোন ধনিগৃহে সেরূপ অনুষ্ঠান দেখি নাই। বাড়ীর প্রত্যেক ক্রিয়া কর্ম্মের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের তিনি স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বাবধান করিতেন—কর্ম্মচারিবৃন্দের উপর ভার ন্যস্ত করিয়া নির্লিপ্ত থাকিতেন না। লোকসংবর্দ্ধনা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের আহারাদি সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্বস্তি বোধ করিতেন না, এমন কি চাকরদের স্বয়ং দাঁড়াইয়া না খাওয়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না এবং সকলের খাওয়ান শেষ করিয়া পরে তিনি খাইতেন। এমন অনেক দিন হইয়াছে, লোক খাওয়ান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজে খাওয়ার সময় পান নাই এবং অভুক্ত অবস্থায় সারাদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পরকে খাওয়াইয়া তিনি অপার আনন্দ পাইতেন। সেই আনন্দ তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিত। আমরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। মনে পড়ে, এক দিন লোক খাওয়ান সমাপন করিয়া

এবং নিজে আহারাদি শেষ করিয়া তাঁহার কামরায় বসিয়া আছেন। আমি তখন সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন—চাকরদের খাওয়ানর সময় আমি ত অমুক চাকরকে খাইতে দেখি নাই। সম্মুখস্থ কর্ম্মচারীকে বলিলেন দেখ দেখি, সে কোথায় এবং তাহার খাওয়া হইল কি না। এমন করিয়া সকল হৃদয় দিয়া সেবা করিবার যে ব্যাকুলতা, তাহা সামান্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। প্রতি বৎসর তিনি ৺অন্নপূর্ণা পূজায় তিন দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র কাঙালী বিদায় করিতেন। বিদায়ের সমস্ত কার্য্য নিজে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিদায় শেষ না হইত ততক্ষণ সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন না। কোন কোন বৎসর এত অধিক কাঙালী হইয়াছে যে, বৈকাল হইতে বিদায় আরম্ভ হইয়া সারা রাত্রি বিদায় চলিয়াছে; তিনি অবিচলিত ভাবে সেখানে উপস্থিত রহিয়া বিদায় কার্য্য শেষ করিয়া তবে সে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার গোটা জীবনটাই যেন সেবাধর্ম্মে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় আমরা দেখিয়াছি তিনি নিজেকে খর্ব্ব করিয়া পরের সেবায় জীবন বিলাইয়াছেন। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল হাস্যময় মূর্ত্তিখানি এ জীবনে ভুলিবার নহে। ক্রোধে তাঁহাকে কখন অভিভূত হইতে দেখি নাই। কর্ম্মচারী বা চাকরদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষণপরেই আবার নিজেকে সংবরণ করিতেন। ক্রোধ কখনও তাঁহার উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্র-মুকুট কত বিচিত্র বর্ণের মণি-মুক্তায় খচিত ছিল—ক্ষমাই তাহার মধ্যে উজ্জ্বলতম শ্রেষ্ঠরত্ন। এই ক্ষমাই তাঁহার চরিত্রে মহনীয়তা ও কোমলতা প্রদান করিয়াছিল সত্য কিন্তু জীবনের উত্তর কালে ইহাই তাঁহাকে অশেষ দুঃখ ও কষ্টে বিপন্ন করিয়াছিল তথাপি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ক্ষমাই তাঁহার ভূষণ ছিল। তাঁহার নিকট প্রতারকের প্রতারণা অজ্ঞাত ছিল না কিন্তু তিনি ক্ষমার দ্বারা সকলকে জয় করিবেন এই বিশ্বাসে প্রতারক বিশ্বাসঘাতককে আশ্রয়চ্যুত করিতেন না। তিনি বলিতেন আমার নিকট হইতে যাইলে ইহারা খাইবে কি? তাঁহার কোমল হৃদয় কাহাকেও আঘাত করিতে জানিত না এবং প্রতিহিংসাও তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই। তিনি হাসি মুখে নিন্দা ও অপমান সহ্য করিতেন এবং নিন্দুক ও অপমানকারীর সহিত একযোগে কাজ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। শত্রুকেও আলিঙ্গন দিতে কখনও দ্বিধা বোধ করিতেন না। প্রেমের দ্বারা সকলকে তিনি বাঁধিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার সকল কর্ম্মে সহিষ্ণুতা, সরলতা এবং দীনভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিত। তিনি নিজেকে তৃণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে করিতেন এবং যে অমানী তাহাকেও মানদানে পূজা করিতে ব্যগ্র হইতেন—একথা যে তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই জানে।

দেশসেবা তাঁহার সাধনার ধন ছিল। সারা জীবন ধরিয়া তিনি কায়মনে মাতৃপূজার উপকরণ আহরণ করিয়াছেন—পূজামন্দিরের তোরণ দ্বার পত্র পুষ্পে শোভিত করিয়াছেন এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণ বিচিত্র আলিপনায় অঙ্কিত করিয়াছেন। জাতীয় জীবনের জাগরণের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, দেশের প্রকৃত কল্যাণের কথা যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া ভাবেন তাঁহারা বলিবেন এ ভক্ত সেবকের আহৃত উপকরণ মাতৃপূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান। মাতৃপূজায় তিনি দেশবাসীকে যাহা দিয়া গেলেন, দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া পূজা সমাপনে কৃতসঙ্কল্প হউক। দেশের কল্যাণ-কথায় তিনি শতমুখ হইয়া উঠিতেন। প্রাণের আবেগে কত Scheme এবং কত Project-এর কথা বলিতেন। তাঁহার চিন্তার ধারার সহিত বর্ত্তমান যুগের তরুণ সম্প্রদায়ের চিন্তার ধারা সর্ব্বদা এক খাতে বহে নাই সত্য। তিনি তরুণ সম্প্রদায়ের চিন্তা ও কর্ম্মের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। বলিতেন তোমাদের হালফ্যাসানে নাটুকে স্বাদেশিকতা বুঝি না। কথাটা তিনি বড় ক্ষোভেই বলিয়াছিলেন। তিনি যাহা দেশের হিত বলিয়া বুঝিতেন তাহা বলিতেন এবং অকপটভাবে তাহা করিতেন। কথায় ও কাজে অসামঞ্জস্য কোনখানে ছিল না। তিনি কপটতাকে নির্ম্মমভাবে পরিহার করিতেন। বর্ত্তমানে দেশের যুব-সম্প্রদায়েরা ভাবের উচ্ছল ধারায় বিভোর হইয়া বুঝিত না যে, তিনি দেশকে কত ভালবাসিতেন এবং দেশের জন্য কতখানি করিয়াছেন—তাহা বুঝিলে ক্ষণেকের জন্যও তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে অনভিলাষী হইবার চিন্তা কদাপি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। দেশের হিতকল্পে অনুষ্ঠিত বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের সম্ভার লইয়া সর্ব্বদাই দীন সেবকের ন্যায় তিনি নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার যে এই ত্যাগ—এ ত্যাগে উন্মাদনা ছিল না; তাঁহার যে দেশ-সেবা সে সেবায় জয়ঢক্কা ছিল না, তাই তাঁহার দেশ-সেবা ও দেশের জন্য আত্মনিবেদন যুবক-সম্প্রদায়ের চিত্ত স্পর্শ করে নাই। কিরূপ নিগূঢ় ভাবে তিনি দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন, দেশের নানা হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার

পরিশিষ্ট

প্রাণের কিরূপ সংযোগ ছিল, যুবজনেরা তাঁহার তিরোভাবে দিনে দিনে তাহা বুঝিবে এবং তাঁহার লোক-সেবার আদর্শ কি তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করিবে। দেশের যুবকেরা তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী। তাহাদের কল্যাণকল্পে, তাহাদের শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ শুভসাধনে, আর্থিক দুর্দ্দশা মোচনে তিনি যাহা করিয়া গেলেন, তাহা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইবে না। দেশের যুবকদের প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার ব্যাকুলতা এই মহাপুরুষ অতি নিবিড় ভাবে অনুভব করিতেন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়া বহরমপুর কলেজের ছাত্রবৃন্দেরা এই ছাত্রবৎসল মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন "আমরা মহাত্মাজীর আদেশে গভর্ণমেন্ট সংশ্লিষ্ট কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি আপনি আপনার কলেজকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া আমাদের সৎশিক্ষার ব্যবস্থা করুন।" এ কথার উত্তরে ছাত্রদিগকে তিনি হাসিমুখে বলিলেন "তোমরা মানুষ হও, ইহা আমি চাই। তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যাহা চাহিবে অবশ্যই তাহা তোমরা পাইবে। আমি জানিতে চাই তোমরা সকলে একযোগে ও একমতে চলিতে প্রস্তুত কি না। তোমরা যদি প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে আমি তোমাদের এই কলেজকেই আদর্শ শিক্ষালয়ে পরিণত করিব – কিন্তু মনে রাখিও হুজুগে মাতিলে চলিবে না।" দেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতি গভীর ও ব্যাপক ভাবে দৃষ্ট হইত।

আত্মীয় পরিজন বেষ্টিত হইয়া থাকিতে তিনি ভালবাসিতেন। প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়াও তিনি তাঁহার দরিদ্র স্বজনগণকে ভুলেন নাই। বাড়ীর সকল ক্রিয়া কর্ম্মে তাহাদিগকে দেশ হইতে যত্ন সহকারে রাজধানীতে আনিতেন, যথাযোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিজেই ব্যাপৃত থাকিতেন। এ জন্ম কাহারও উপর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। এত স্বজন-বাৎসল্য ত আর কোথাও দেখি নাই, ভগবান তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন সকলের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া নিজে সেবাইতরূপে দীনভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

মহারাজের পবিত্র চরিত্র আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সমাদৃত। তাঁহার সংযম-দৃঢ় ধর্ম্ম-প্রাণের আদর্শ দেশবাসীর চিত্তকে কি স্পর্শ করিবে না?

শ্রীপ্রতিভারঞ্জন রায়

"আমাদের মহারাজা"

'হরিষথৈকঃ পুরুষোত্তমস্মৃতঃ' তেমনি মহারাজ বলিতে আমরা বুঝি আমাদের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। আমাদের এই দশের পূজ্য, দেশের পূজ্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র এমনি করিয়া যে বাঙ্গলা মায়ের মর্ম্মস্থান খালি করিয়া যাইবেন তাহা কেহই ভাবে নাই। আর সব অপ্রত্যাশিত অঘটনের মত ইহাও ঘটিল। ভগবানের ডাক আসিল, আজন্ম অক্লান্ত কর্ম্মবীর নিয়োগকর্ত্তার আহ্বানে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার বয়সই বেশী হইয়াছিল মাত্র; বয়োধর্ম্মে কেশ পাকিতে হয় তাই পাকিয়াছিল; কিন্তু দেহের শক্তি, অন্তরের উদ্যম, উৎসাহ, এখনো এত বিস্ময়কর মাত্রায় ছিল যে, আধুনিক বহিস্তরুণ অন্তর্বৃদ্ধ বহু যুবকও তাঁহার শ্রমশক্তি, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও কর্ম্মোদ্যমের কাছে হার মানিয়া লজ্জা স্বীকার করিত।

সম্মুখে কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে পীড়িত বা ক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য হইলেও মহারাজের দেহমনে অমিত বলের সঞ্চার হইত। শুভেচ্ছু আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের শত বাধা সত্ত্বেও তিনি কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হইতেন না।

এ সব কর্ত্তব্যের সংখ্যা ও গুরুত্ব-লঘুত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হইত না। তাঁহার কাছে কোনো কর্ত্তব্যেরই ছোট বড়, কাজের বা অকাজের এরূপ ভেদ ছিলনা। সহরের ছোট স্কুলের ছোট্ট-ছোট্ট পড়ুয়া ছেলেরা সভা করিয়া বা সরস্বতী পূজা করিয়া মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিলেন অমনি পিতামহতুল্য প্রসন্নবদন প্রিয়তম শিশুবৎসল মহারাজ সব কাজ ফেলিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষায় উপস্থিত! সহরের ক্ষুদ্রতম পল্লীতে তাঁহারই কোন দীনতম কর্ম্মচারীর বাড়ীতে বিবাহাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত মহারাজ যথাকালে আশীর্ব্বাদপূর্ণ হৃদয় লইয়া উপস্থিত! বহরমপুরের বা দূরবর্ত্তী মফঃস্বলের ছাত্রগণ একটা কিছু উৎসব লাগাইয়া মহারাজকে ডাকিল, অমনি ছাত্রবৎসল মহারাজ ঠিক সময়ে হাজির! রৌদ্র, জল, বিপদ আপদ, ব্যাধি বিরক্তি, কিছুতেই কোন দিন মহারাজ ছাত্রদের আহ্বান অবহেলা করেন নাই!

অসাধারণ ছিল তাঁর সহ্যগুণ ও ক্ষমাগুণ! কতবার কত ব্যাপারে তাঁহারই অর্থে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ তাঁহার অবমাননা করিয়াছে; কিন্তু সদানন্দ শিবতুল্য

পরিশিষ্ট

প্রসন্নহৃদয় মহারাজ তাহা পর মুহূর্ত্তেই ভুলিয়া তাঁহাদেরই আহ্বানে ছুটিয়াছেন, তাঁহাদের কল্যাণকামনায় দেহ মন অর্পণ করিয়াছেন !!

বহরমপুরের সমাজ-জীবনে তিনি সৌরজগৎকেন্দ্রস্থ সূর্য্যেরই মত ছিলেন। যেমন কানু বিনা কোনো গীত হইত না, তেমনি মহারাজ বিনা বহরমপুর সমাজ-জীবনে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানই হইত না। সর্ব্বকর্ম্মের দায়িত্ব ও পরিচালনভার মহারাজের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বহরমপুরের অধিবাসীরা ছেলে যেমন পিতৃরূপ পর্ব্বতের আড়ালে পড়িয়া থাকে তেমনি নিরুদ্বেগে পড়িয়া থাকিতেন। অথচ অক্লান্ত কর্ম্মবীর মহারাজের ওষ্ঠাধরের কোণেও কোন বিরক্তি বা অনিচ্ছার রেখাপাত দেখা দিত না।

আজ বহরমপুরের অধিবাসীবৃন্দ পিতৃহীন বলিলে কি অত্যুক্তি হয় ?

কর্ম্মযোগীর প্রধান লক্ষণ নিষ্কামচিত্ততা; এমন নিষ্কামচিত্ততা কোন ধনী জমিদার যে দেখাইয়াছেন তাহা মনেই হয় না। আহারে বিহারে, বসনে ভূষণে, এরূপ মিতব্যয়ী সংযমী পুরুষ লক্ষ্মীর বরপুত্রদের মধ্যে বিরল। আজ প্রায় ৪০ বছরের অভিজ্ঞতায় কখন তাঁহাকে আদ্দির পাঞ্জাবী ও চাদর ও মোজাহীন পা ছাড়া অন্য কোন রূপ বেশভূষা শীত গ্রীষ্ম ভেদে পরিতে দেখি নাই।— আহার শুনিয়াছি দুবেলা দু'মুঠা ভাত ও দুধ; চরিত্রশুদ্ধিতে তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমান্ কাম-বিজয়ী মহাদেব, ধনী বিলাসী জমীদারকুলে এ গুণ লক্ষে একজনে দেখা যায়।

এ তো গেল মহারাজের বাহিরের পরিচয়। অন্তরের পরিচয় তাঁর বিপুল দান ধ্যানে দেদীপ্যমান। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর অতুল বিভবের উত্তরাধিকারী কি ভগবান্ ঠিকই বাছিয়া নিয়োগ করিয়াছিলেন! মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র মাতুলাদির গঠিত যশঃ-প্রাসাদের কোন ক্ষুন্নতাই ঘটান নাই বরং সে প্রাসাদের শীর্ষভাগে এক অতি উচ্চ স্বর্ণচূড়া তুলিয়া তাহাতে বংশের গৌরব পতাকা উড়াইয়া গেলেন! দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান না করিয়া, পাত্রাপাত্র ভেদ না করিয়া, অর্থের মাপ ও মাত্রা বিচার না করিয়া এমন করিয়া, আত্মভোলা হইয়া পরার্থে নিজ অর্থ দুহাতে ছড়াইয়া দেওয়ার এমন আশ্চর্য্যজনক দৃষ্টান্ত কখনো দেখি নাই।

এরূপ মরিয়া হইয়া নিজেকে প্রায় নিঃসম্বল করিয়া দান করাকে সংসারী বিজ্ঞেরা হয়তো কত না বিদ্রূপ বচনে সমালোচনা করিয়াছেন! কিন্তু এরূপ

দানের ও দানশক্তির আসল বিচারক যিনি তিনি উহার আদর বুঝিয়াছেন! হিসাব করিয়া আত্মত্যাগ, পরোপকার, ও দান করার পাটোয়ারী বুদ্ধি হইতে ভগবান মহারাজকে বাঁচাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন তিনি উপলক্ষ্য মাত্র, আসল ঐশ্বর্য্যময়ের নিয়োজিত তিনি দানকর্ত্তা মাত্র; অর্থ কোথা হইতে আসিবে সেই অর্থবানই তা ভাবিবেন!

আমরা মানুষকেই দেখি! মানুষের কাজ কর্ম্ম মানুষেরই ঘাড়ে চাপাইয়া তার দোষ গুণ সমালোচনা করি! কিন্তু মানুষের পিছনে ভগবানকে দেখি না! অসংখ্য সদ্‌গুণের অসীম ভাণ্ডাররূপে সর্ব্বদা লোকলোচনের অন্তরালে আছেন এই বিশ্বশক্তি, বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর; মানুষ,—বিশেষ গুণশক্তিযুক্ত মানুষ এই ভগবানেরই তৎ তৎ গুণের প্রতীক মাত্র বা গীতার ভাষায় বিভূতিরূপ।

আমাদের মহারাজ ছিলেন ভগবানের মূর্ত্তিমান্ দয়া। লাঞ্ছিত, অবহেলিত হইয়া এই ভাগ্যবান পুরুষ ভাগ্যোদয়ের পূর্ব্বে এক সময়ে সাধারণ মানুষের মতই বহরমপুর সহরে সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় বাস করিতেন! এবং এই রাজবাটীতেই সাধারণ নিমন্ত্রিতের মত সাধারণ পংক্তিতে বসিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া আসিতেন! তারপর যখন মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেহত্যাগ হয় তখন এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া কি সে ভীষণ ষড়যন্ত্র ও সংগ্রাম! ভগবান অন্তরাল হইতে মৃদু হাসিয়া সমস্ত ষড়যন্ত্র ফুৎকারে ছিন্ন করিয়া আপনার নির্ব্বাচিত পাত্রকে আনিয়া এ গদীতে বসাইলেন! দেশ অচিরে বুঝিল রামের অযোধ্যায় রামেরই আবির্ভাব হইল!

এরূপ ক্ষেত্রে অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইলে মাথা ঘুরিয়া যায়, মালিক দিনে তারা দেখে! কিন্তু আমাদের মহারাজ নামেই ঐশ্বর্য্যবান মহারাজ হইলেন; ব্যবহারে, বিনয়ে, শিষ্টাচারে, স্বজন-বাৎসল্যে, আহারে বিহারে, তিনি সেই সাধু সজ্জন মিষ্টভাষী সুহৃদ্ বন্ধু 'মণীন্দ্র বাবুই' ছিলেন! পরিবর্ত্তন কেবল হইল সৎপ্রবৃত্তির স্ফুরণে! দীন মণীন্দ্র বাবু হইলেন দীনবন্ধু মহারাজ! কাশিমবাজারের গদীতে ঈশ্বরকৃপাধিষ্ঠিত না হইলে কে ভাবিতে পারিত ইহাঁর নীরব হৃদয়ে গোপনে লুকানো ছিল এরূপ দুর্দ্দম দেশপ্রীতি!

কিরূপ দেশপ্রীতি? রাষ্ট্রনৈতিক দেশ-নায়কের দেশপ্রীতি হইতে ইহা বস্তুতে ভিন্ন নহে, ভিন্ন শুধু প্রকাশভঙ্গীতে!

পরিশিষ্ট

দেশের উপকার সাধিত হয় কায়, মন, বাক্য ও অর্থে। মহারাজের উদারতম মন স্বদেশের হিতজন্ম অর্থের সদ্ব্যবহারে বদ্ধপরিকর ছিল! কত রকমে, কত দিকে, কত ভঙ্গীতে কত না বিবিধ অনুষ্ঠানে তিনি দেশার্থে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু দুর্ভাগা দেশের দুঃখ এই যে, এই সাধু ধনী মহারাজের প্রদত্ত অপরিমিত অর্থের সঙ্গে অন্য অন্য সাধু বুদ্ধিজীবী কর্ম্মীর যদি সহায়তা ঘটিত তবে কি সুবর্ণ ফলই না এই বিপুল অর্থব্যয় হইতে হইত!

মহারাজ দিয়া গিয়াছেন, ঠকিয়াছেন, আবার দিয়াছেন; সেই ঠকের সঙ্গেই সাহচর্য্য চাহিয়াছেন, কিন্তু হায় ভাগ্যহীন দেশ! আজ দেশ বুঝিবে এবং দেশের সেই ঠক প্রবঞ্চকরা বুঝিবে ঠকিল কে!!

এ দেশের যে কি অভাব, কি অভাব পূর্ণ হইলে দশজন সুখে থাকিবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন! সব দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠদান জ্ঞানদান, বিদ্যাদান! নানা ধরণের দানরত্নে তাঁহার গৌরবমুকুট রচিত; কিন্তু এ মুকুটের মধ্যমণি 'বিদ্যাদান'।

এই বিদ্যাদানের জন্য তাঁহার জীবনব্যাপী মোট অর্থ ব্যয় কোটী মুদ্রায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে যখনি বলিয়াছে জানাইয়াছে, অমুক স্থানে বিদ্যাস্থান নাই, অমনি মহারাজের মুক্ত হস্ত তদুদ্দেশ্যে অর্থদানে উদ্যত!! কত যে দূরদেশাগত দীনদরিদ্র ছাত্র গোপনে অর্থ সাহায্য পাইত তাহার ইয়ত্তা নাই!

তিনি যেমন নিষ্কাম অন্তরে দেশের ও দশের সেবা করিয়াছেন; সেই দশ জনের দুজনও যদি কথঞ্চিৎ নিষ্কামভাবেও তাঁহার সেবার প্রতিদান দিত, তাহা হইলে তাঁহাকে শেষ বয়সে অর্থানুকূল্যের অভাব বোধ করিতে হইত না! এইরূপে একজন নিঃস্বার্থপ্রাণ ঐশ্বর্য্যপতির স্বর্গলাভ দেশের পক্ষে যে কত দুর্ভাগ্য তা দেশ বুঝিবে, যখন দেখিবে ইহার অভাব যুগান্তেও পূর্ণ হইবে না! অর্থ তো অনেকের আছে! মহারাজের অপেক্ষা অর্থশালী হয়তো আরো আছেন, কিন্তু এত বড় উদার দেবদুর্ল্লভ হৃদয় লাভ সহজে তো আর হয় না! মহারাজাতে এতগুলি মহৎ গুণ একীভূত হইয়াছিল এমনি ভাবে যে, এমন সংযোগ সহজে দেখা যায় না, অতুল ঐশ্বর্য্য অথচ ঐশ্বর্য্যে অনভিমান; ভোগশক্তি ও সুযোগ অথচ ভোগে অনিচ্ছা; উচ্চ পদমর্য্যাদা অথচ বিনয়; দেশসেবার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এবং সেবা করিবার যোগ্য শক্তি ও অর্থ ও প্রবৃত্তি!! গীতায় যে আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্মীর গুণবর্ণন আছে মহারাজের প্রতি তাহা

প্রযোজ্য ; এই সব গুণগুলি প্রায়ই একত্র সমাবিষ্ট কোন পুরুষে দেখা যায় না ; কিন্তু গ্রহগণের অপূর্ব্ব সমাবেশফলে এই সব গুণ আমাদের মহারাজের মধ্যে একীভূত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিয়া সোনায় সোহাগার মতই কাজ করিয়াছে।

এই অপূর্ব্ব গুণসমাবেশ ও সংযোগের ফলেই মহারাজ চরিত্র গীতোক্ত আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর লক্ষণযুক্ত হইয়াছে।

মহারাজের যতগুলি গুণ সব গুলিরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক কাহিনীই অনেকে জানেন ; সেই কাহিনী গুলিই একত্র করিলে একটী সুখপাঠ্য শিক্ষণীয় গ্রন্থ হয়। এ কার্য্য তাঁহার জীবনচরিত-লেখক ভুলিবেন না।

আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতির নিকট ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক নমস্কার করিয়া বিদায় লইতেছি।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁহার সুযোগ্য একমাত্র বংশধর মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র আজীবন মহামহিমময় স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুণ্য পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ নিজেকেই যোগ্য পিতার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, গরিষ্ঠ ও জীবন্ত "স্মৃতিস্তম্ভরূপে" বাঙ্গালা দেশের পুণ্য বক্ষে জাগাইয়া রাখুন ! পুত্রের ভিতর দিয়াই পিতা অমর হউন !

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

"সহবাস-আইন পাশ হইয়া গেল। ভারতবাসী নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহার পরীক্ষার জন্য ক্রমে ক্রমে এক একটি অশাস্ত্রীয় প্রথা আইনবদ্ধ করিয়া ভারতবাসীর নির্ব্বীর্য্যতার পরীক্ষা লইবেন।"—মণীন্দ্রচন্দ্র। ১২৯৭—২১শে চৈত্র।

রাজর্ষি-প্রয়াণ

পূর্ণ করি' নিজ হাতে সারদার অকালবোধন,
বিশ্বমাতৃকার পূজা হে রাজর্ষি, করি' সমাপন—
বিজয়ার মহোৎসব ইহজন্মে করি শেষবার,
তব প্রিয় কর্ম্মরণে কর্ম্মযোগী নামিলে আবার
শেষ রণ-রঙ্গ তরে। অন্ধকার হয়ে আসে পথ,
ভগ্ন দেহ—তবু তব অবিরাম ছুটে কর্ম্মরথ।

অনন্ত নিয়তি-পথে দিনমণি গেল অস্তাচলে,
চাঁদ উঠিল না আর, তবু তব কর্ম্মরথ চলে।
আবার কাঁদিনু মোরা—কর্ম্মরথে ভগ্ন দেহ মন,
সম্মুখে আঁধার রাত্রি কক্ষে তব ফির গো রাজন!
কর্ম্মের বিজয়-মাল্য শোভিতেছে দেখি তব গলে,
সায়াহ্নের রাজসূর্য্য, ফিরে এস বিশ্রাম-অচলে।
তবু তুমি শুনিলে না, হাসিল সে নিয়তি দুর্ব্বার,
অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত!—চারিদিকে উঠে হাহাকার।

শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদে ভরে গেল রাজপুরাঙ্গন,
জীবনের পথযাত্রা নিজে কি করিলে সমাপন?
কারো মানা শুনিলেনা, নিয়তির একি হায় খেলা,
কর্ম্মের অমৃত আজি ভগ্ন দেহে বিষ উগারিলা।
মণীন্দ্রের শয্যা এযে শরশয্যা জাগে আজি মনে,
বাংলার ভীষ্মদেব পড়েছেন আজি রণাঙ্গনে।
সাহিত্য-প্রাঙ্গণে আজি স্বাগত হে সহস্র ফাল্গুনি,
কে আজি করিবে পূজা বাংলার ভীষ্ম-নৃপমণি!

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মানবের দুঃখ তাঁর শর সম বিঁধে বক্ষে আজ,
নিখিল মানব-দুঃখে শর-শয্যা নিল মহারাজ।
আপনার সব সুখ নিঃস্ব করি' দেশ-অশ্রুজলে,
নিজে নীলকণ্ঠ তিনি এ বিশ্বের বিষ ধরি' গলে।
ওরে ভ্রান্ত, রোগ জরা মৃত্যুশয্যা বাহিরে সে জাগে,
আত্মার অমৃত-শয্যা আনন্দের আজি ফুল-বাগে।
সারা জীবনের কর্ম্মে হোমশিখা জাগে চিত্ত ঘিরে,
বন্দনা-সঙ্গীত উঠে অলকনন্দার দুই তীরে।

হে রাজেন্দ্র, নাহি দুঃখ, নাহি রোগ নাহি মৃত্যুভয়,
নহ তুমি বদ্ধ জীব, নহ দেহ, তুমি যে দুর্জ্জয়,
অনন্ত চিন্ময় শক্তি, খণ্ড রূপে বিশ্বে কর লীলা,
লীলা ফুরায়েছে তব তাই আজি ছিন্ন করি' দিলা—
মর্ত্ত্যের এ দেহ-যন্ত্র। চলিয়াছ নিজ দিব্য ধাম,
মোরা ভ্রান্ত মৃত্যু ভাবি' তোমা লাগি কাঁদি অবিরাম।
নমো নমো, হে রাজর্ষি, বাংলার মানব-প্রধান,
পড়ে র'ল রামরাজ্য, রামচন্দ্র করিল প্রয়াণ!

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—————

"হৃদয়ে দেবত্ববিকাশের প্রতিকূল সমস্ত প্রভাব হইতেই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।"—মণীন্দ্রচন্দ্র। ১৩২৪—বৈশাখ।

সৰ্ব্বত্যাগী মণীন্দ্রচন্দ্র

প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে, তখন বহরমপুর কলেজে বি, এ, ক্লাসে পড়ি। একদিন অপরাহ্নে কলেজ হইতে বাটি প্রত্যাগমন কালে, এখন ষ্ট্যাণ্ড রোডের যে স্থানে বহরমপুর মধ্যবঙ্গবিদ্যালয় অবস্থিত, তাহার নিকটে আমার সমবয়স্ক এক যুবক, পরে জানিলাম রাজেন—আমাকে আসিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার মাতুল মহাশয় আমাকে ডাকিতেছেন। যুবককে অনুসরণ করিয়া পরলোকগত ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের বাটীর নিকটস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে গেলে, এক সুশ্রী সৌম্য মূর্ত্তি আসিয়া স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল মুখে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার পরিবারস্থ কয়েকটি বালককে পরদিন কলেজ যাইবার পথে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ যৎসামান্য, কিন্তু যে ভাবে, যে মধুর সলজ্জ বিনয়ের সহিত অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, বোধ করি অনুরোধ কঠিন হইলেও তাহা প্রত্যাখ্যানের উপায় থাকিত না। কাশীমবাজারের ভাবী অধীশ্বর, বাঙ্গালার গৌরব-রবি, মণীন্দ্রচন্দ্রের সহিত ঐ ভাড়াটিয়া বাটীতে এইরূপে আমার প্রথম পরিচয় স্থাপিত হইল।

তাহার পর, তাঁহার রাজ্যলাভের পূর্ব্বে কয়েকবৎসর ধরিয়া নানা কার্য্যে ও নানা উপলক্ষে সেই পরিচয় উত্তরোত্তর গাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। বহরমপুরের সেনবংশীয় জমিদারবাবুগণের সহিত তাঁহার অতিশয় হৃদ্যতা ছিল, তিনি যখন জানিলেন যে আমি তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, তখন তিনি অধিকতর স্নেহে আমাকে টানিয়া লইলেন।

ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার যে সকল সদ্‌গুণ চরমস্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, ঐ সময়েও কিন্তু তাহার কোনটীরই একান্ত অভাব দেখিতে পাই নাই। অসীম সহিষ্ণুতা, অসাধারণ চিত্তসংযম, মনের গভীর ঔদার্য্য, মধুর আলাপন, দুঃস্থের সাহায্য, ধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি প্রভৃতি সকল গুণেরই তিনি তখনও অধিকারী ছিলেন, রাজ্যপ্রাপ্তির সহিত এগুলি লাভ করেন নাই। পরিবারের মধ্যে তিনি তাঁহাকে দিয়াই যে মহান্ আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, সে আদর্শ পরিবারের অন্যান্য সকলেই অনুকরণ ও অনুসরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, ফলে নন্দী পরিবারের ভিতরে

সর্ব্বদাই একটা সুন্দর প্রীতিভাব বিরাজ করিত। ঐ সময়েই বহরমপুর ওয়ার্ড হইতে মিউনিসিপালিটির কমিশনার হইবার প্রার্থী হওয়ায় তাঁহার জনসেবার্থে আত্মনিয়োগের স্পৃহার পরিচয়ও সকলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য প্রার্থী হইয়া তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন এবং সফলকাম হইয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের অবসান মনে করেন নাই, বহরমপুর ওয়ার্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন।

তাঁহার স্বভাবের মাধুর্য্যগুণে রাজা হইবার পূর্ব্বে জনসাধারণের অন্তরে তিনি কতখানি স্থান অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, ১৩০৪ সালে তাঁহার রাজ্যলাভ করিয়া কলিকাতা হইতে আজিমগঞ্জের পথে ষ্টীমারে আসিয়া ৺হরিবাবুর বাঁধা ঘাটে অবতরণের সময় সেই বিরাট জনতার বিপুল আনন্দোল্লাস। অগণিত লোক-সমুদ্রের মধ্যে উত্থিত সঘন জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল, সহস্র সহস্র শুভাকাঙ্ক্ষী প্রবীণের আশীর্ব্বাদ, সহস্র সহস্র অকপট বন্ধুর স্নেহালিঙ্গন, সহস্র সহস্র বয়ঃকনিষ্ঠের নমস্কার লাভ করিয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ঘাটে উঠিলেন এবং সেই বিরাট জনতা সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ বন্ধুবর বিষ্ণুচরণ সেন জমিদার মহাশয়ের সুপরিচিত বাগান বাটীতে উঠিয়া অসামান্য বন্ধু প্রীতির পরিচয় দিয়া, তথা নিজেকে সাধারণের নিকট প্রিয় হইতে প্রিয়তর করিয়া, তবে মহাসমারোহে মিছিল যোগে কাশীমবাজার রাজবাটীতে গিয়া রাজতক্তে উপবেশন করিলেন।

সেই বৎসরই বড়দিনের ছুটীর সময় কাশীমবাজারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে নানাকথার সহিত ইহাও বলিয়াছিলাম যে, বিদেশে চাক্‌রী মনঃপূত হইতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "ও চাক্‌রী আর করিতে হইবে না—আপনি এখানে আসিয়া আমাকে সাহায্য করুন।" গভর্ণমেণ্টের চাক্‌রী ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

তাহার পর হইতে এযাবৎ, এই সুদীর্ঘ ৩৩।৩৪ বৎসর কাল প্রতিদিন যে দেশবরেণ্য মহাপুরুষের, যে দানবীর ও কর্ম্মবীরের অতি সান্নিধ্যে তাঁহার সহচর, অনুচর ও পার্শ্বচররূপে—জীবন যাপন করিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছি, যে স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিয়া সতত নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি—আজ তিনি নাই! হায়রে! কাশীমবাজারে নাই, সৈদাবাদে নাই, কলিকাতার হর্ম্ম্যে নাই, স্বর্গাদপি গরীয়সী

বঙ্গভূমে, অথবা এই বিস্তীর্ণ ধরাধামের কোথাও নাই, খুঁজিয়া পাই না। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন, পশ্চাতে শত-সহস্র-লক্ষাধিক কীর্ত্তিস্তম্ভ শাশ্বতকালের নিমিত্ত প্রোথিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হতভাগ্য দেশ যখন তাঁহাকে আরও—আরও বেশী করিয়া পাইবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কত কথাই না আজ মনে পড়িতেছে, এক এক করিয়া প্রতিদিনের কত ঘটনা—কত সুখ দুঃখ বিজড়িত স্মৃতি মনের প্রতি কোণে কোণে ভাসিয়া উঠিতেছে—লিখিয়া কত জানাইব? প্রতিদিনই ত তাঁহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রতিদিনই তাঁহার অমিয়মাখা চরিত্রের নব নব বিকাশ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছি—লিখিয়া কি তাহা জানান যায়?

রাজ্যলাভের কিছুকাল পরেই মহারাজ যখন প্রথম মফঃস্বল পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বনগাঁওয়ে তাঁবু করিলেন, তখন সেই রাত্রিতে তাঁহারই তাঁবুর ভিতর বহরমপুরের স্বনামধন্য ডাক্তার ৺ব্রজেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় ও আমি শয়ন করিয়া ছিলাম। আমার ও ব্রজেন্দ্রবাবুর উভয়েরই নিদ্রাকালে উচ্চ নাসিকা-ধ্বনি হইত। গভীর রাত্রিতে বাহিরে যাইবার প্রয়োজনে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম মহারাজ দুই হাত গণ্ডদেশে স্থাপন করিয়া চুপ করিয়া শয্যার উপরে বসিয়া আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "দুই পাশের এত শব্দে কি ঘুম আসে?" লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া আমি প্রস্তাব করিলাম, আর কোন তাঁবুতে গিয়া ঘুমাই; কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগরণের ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া সেই পরম সহিষ্ণু পুরুষ কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আর এক দিনের ঘটনা বলি;—মহারাজের পছন্দসই একটী নবক্রীত বহুমূল্য পরিচ্ছদের ভিতরে সীতানাথ নামক তাঁহার জনৈক খানসামা কি ভাবিয়া একটী ফুললতেলের বোতল রাখিয়া দেয়, এবং পরে দৈবক্রমে ঐ বোতল ভাঙ্গিয়া গেলে পরিচ্ছদটা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সক্রোধে আমি কহিলাম, "লোকটাকে এই মুহূর্ত্তে বিদায় করে দেওয়া উচিত", শুনিয়া দয়ার অবতার মণীন্দ্রচন্দ্র ধীরে ধীরে কহিলেন, "তাইত, বিদায় দিলে যাবে কোথায়, খাবে কি?" আর একদিন, তাঁহার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময় তাঁহার ফরাসখানার দারোগা তারক বাবু আসিয়া অভিযোগ করিলেন, "দেখুন, বড় ঝাড় তাঁহার বৃদ্ধ ফরাস ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।" শুনিয়া বিচারক মহারাজ কহিলেন, "দেখুন, আগে খোঁজ নিন, যদি তার অসাবধানতার জন্য ঝাড় ভেঙ্গে থাকে, তবে তার শাস্তি পাওয়া

উচিত, নইলে পৃথিবীতে কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়, আপনিও চিরকাল থাকবেন না, আমিও চিরকাল থাক্‌ব না, একটা ঝাড় যদি গিয়ে থাকে, কি আর কর্ব্ব ?” এই রকম ঘটনা কতশত ঘটিয়াছে, তাঁহার দেবোপম চরিত্রের কত দিক কত ঘটনায় যে স্ফুরণ হইয়াছে, লিখিয়া তাহার কত শেষ করিব ?

বহরমপুরের জনসাধারণ কোন বিষয়ে অত্যন্ত অভাব বোধ করিতেছে, এ কথাটা শুনিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না ; ইহা তাঁহার পক্ষে চিরদিন অসহনীয় ছিল। তাঁহার প্রাণপ্রিয় বহরমপুরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা ব্যয়ে জলের কল স্থাপন করিয়া দিলেন, বহরমপুরের বালকদিগের শিক্ষালাভের জন্য এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা দিয়া কলেজিয়েট স্কুলের সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি বহরমপুর কলেজে প্রতি বৎসর বহু হাজার টাকা দান করিতেন, বহরমপুরের বালিকাদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত মহাকালী পাঠশালার যাবতীয় ব্যয়ভার নিজস্কন্ধে বহন করিতেন, করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, সৈদাবাদ লর্ড হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় বহু ব্যয়ে স্থাপিত করিলেন, খাগড়ায় লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর স্কুলের নূতন বাটী প্রস্তুতকালে প্রভূত অর্থ-সাহায্য করিলেন, বহরমপুর আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাণরক্ষাকল্পে মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য করিতে লাগিলেন, এইরূপ আরও কতশত—কত আর বলিব ? কিন্তু বহরমপুরের কথা স্বতন্ত্র, বাঙ্গালাদেশের কয়টা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সাহঙ্কারে বলিতে পারে যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্য ব্যতীত আজও বাঁচিয়া আছে ? বৃহত্তর বঙ্গেরই বা কোন্ অংশ দর্পভরে বলিতে পারে যে, অভাবে এই দানবীরের নাম একবারও স্মরণ করে নাই ? মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, শিক্ষার জন্য তিনি এক কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু আমি জানি, প্রকাশ্যে ও গোপনে এই দানের পরিমাণ দুই কোটীর বড় বেশী ন্যূন নহে।

উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষা ব্যতীত যে এই অধঃপতিত জাতির পুনরভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পন্থা নাই, এই মহাসত্যটা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা জীবনে নিমেষের জন্য বিস্মৃত হন নাই। তাই সমগ্র দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রসারের জন্য সেই অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের এই অসামান্য দান, এত প্রচেষ্টা, এত উৎকণ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণস্পর্শী সখেদোক্তি—“বাঙ্গালার ইতিহাস নাই” যেন মূর্ত্ত হইয়া তাঁহার কর্ণে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিধ্বনি করিয়া যাইত, লজ্জায় তিনি অধোবদন

হইতেন। তাঁহার ও তাঁহার জাতির—হিন্দুমুসলমান-সংগঠিত বাঙ্গালী জাতির এই লজ্জা অপনোদনের জন্য তিনি বহুব্যয়ে প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, প্রাচীন চিত্রাবলী প্রভৃতি ইতিহাসের উপকরণগুলি দেশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেন এবং তাহার কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সদ্ব্যবহারের আশায় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলনের পুণ্যোৎসব তাঁহারই যত্নে কাশিম বাজারে তাঁহারই প্রাঙ্গণে তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই পরমোৎসব যাহাতে প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানে সমাধা হয়, যাহাতে বাঙ্গালার সারস্বত কুঞ্জের একনিষ্ঠ সাধকগণ বৎসরে বৎসরে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন, তাহার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়া বঙ্গবাসীমাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পবিত্র মন্দির, সেও ত বঙ্গভাষার একান্ত অনুরক্ত সেবক মণীন্দ্রচন্দ্রেরই প্রদত্ত ভূমিতে দণ্ডায়মান, তাঁহারই অর্থে পুষ্ট। নিজের জ্ঞানপিপাসাও তাঁহার বড় একটা কম ছিল না, তাঁহার পারিবারিক বিরাট গ্রন্থাগার হইতে অবসর পাইলেই তিনি পুস্তক বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তক লইয়া অধ্যয়ন করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন।

কিন্তু দানই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। দেখিয়াছি দান করিয়া তিনি একটা তৃপ্তি পাইতেন একটা আনন্দ উপভোগ করিতেন। সে তৃপ্তির সে আনন্দের স্বরূপ বুঝাইবার সাধ্য নাই, কিন্তু তাহার একটা পরিস্ফুট ছায়া যখন চোখে মুখে ভাসিয়া উঠিত, তখন বুঝিতাম এ আনন্দে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই, এ এক শুভ্র আনন্দ, অনাবিল, অপার্থিব আনন্দ, যাহা যিনি হিসাব করিয়া দান করেন না, বিচার করিয়া দান করেন না, যে দাতা দানের সময় জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, বয়স প্রভৃতির কোন প্রশ্নই উত্থাপন করেন না—তিনি ভিন্ন সংসারে অপর কাহারও উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। প্রার্থী, অথচ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দ্বারে প্রত্যাখ্যাত এরূপ লোক আছে কিনা জানি না, থাকিলেও অতি বিরল।

কাঙ্গালী ভোজন করাইতে তাঁহার যে কি অপরিসীম আগ্রহ ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। মনে পড়ে, ১৩০৭ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র মহিমচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে কাঙ্গালী ভোজনের সময় তাঁহার স্বহস্তে সংখ্যাতীত কাঙ্গালিগণকে পরিবেশনের কথা; ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বেলার পর বেলা পরিবেশন করিয়া যাইতেছেন—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, কার্পণ্য নাই,—দেখিয়া বিদেশাগত

নিমন্ত্রিত ধনী সম্প্রদায় অতীব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। মনে পড়ে, ১৩১১ সালে তাঁহার মাতামহী রাণী হরসুন্দরীর দানসাগর শ্রাদ্ধে ন্যূনাধিক ষাট হাজার কাঙ্গালীর সমাবেশের কথা; মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, নদীয়া, মালদহ, রাজসাহী, প্রভৃতি দূরদেশ হইতে কাতারে কাতারে কাঙ্গালী আসিতেই লাগিল, এবং আসিয়া প্রত্যেকে একটাকা নগদ, একখানি কাপড়, একসের চাউল, এক সরা চিড়ে মুড়কী, চারিখানা লুচি ও চারিটী বিভিন্ন প্রকারের সন্দেশ প্রাপ্ত হইয়া আর্ত্তের বন্ধুর জয়গান করিতে লাগিল; সেবারে ভিড় এতই হইয়াছিল যে, ক্ষীণ ক্লিষ্ট পাঁচজন কাঙ্গালী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং আটজন গর্ভবতী রমণীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যায়। এই বিরাট ক্রিয়া উপলক্ষে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় দেওয়ার ভার ছিল স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের উপর, এবং পূর্ণ-বিদায়ের পরিমাণ ছিল এক শত এক টাকা।

ধর্ম্মে তাঁহার কিরূপ অশেষ ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল, তাহাও আজ নূতন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে কালক্রমে যে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছিল তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত সেই পরম ভাগবত আজীবন আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং অন্ততঃ কতকাংশে যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর বৈষ্ণব সম্মিলনীর উৎসব তাঁহার ভবনে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। মনে পড়ে, উৎসবান্তে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীবিগ্রহ লইয়া তাঁহার বাটী হইতে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া প্রখর আতপদগ্ধ পথে ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ নগ্নপদে, অনাবৃতমস্তকে, কত আগ্রহে, কত উৎসাহে, কেমন করিয়া সমগ্র বহরমপুর সহর পরিক্রম করিয়া আসিতেন। তদ্ব্যতীত, খড়দহ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থে বৈষ্ণব সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব ক্রিয়াও তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে সম্পন্ন করিতেন।

"অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ" এই প্রবাদ বাক্য মহারাজের সম্বন্ধে ব্যর্থ—শতধা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। সফল যে কথাটা হইয়াছিল, তাহা "রাজর্ষি"। জন্মান্তরের সুকৃতি যদি তাঁহার রাজার ঐশ্বর্য্য, বৈভব ও প্রতিষ্ঠার বিধান করিয়াছিল, ঋষির চরিত্রবল, ঋষির সহিষ্ণুতা, ঋষির শম, দম ও তিতিক্ষা—এগুলি আগে বিধান করিয়াছিল। অহমিকা রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্রের মনকে স্পর্শও করিতে পারে নাই—তাহার ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে নাই। তাই, নিতান্ত নগণ্য পর্ণকুটীর-

বাসীও তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিবার স্পর্দ্ধা রাখিত, কারণ সে জানে, সেই নিরহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তির নিকট প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা নাই ; নিতান্ত নিঃস্বও তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া বহুক্ষণ নিঃসঙ্কোচে আলাপন করিবার সাহস রাখিত, কারণ সে জানে, সেই শুভ্রাসনে অকিঞ্চন বলিয়া তাচ্ছিল্যের কোনও সম্ভাবনা নাই।

এখানে একটা কথা বলিব, তাঁহার উপাধিগুলি প্রাপ্তির কথা। এই রহস্যময়ী ধরণীর যত রহস্য আছে, 'উপাধি' নামক রহস্যটি বুঝিতে পারি না ; কেন না যাঁহারা তাহার জন্য লালায়িত, তাঁহাদের অনেকের নিকট স্পর্শভয়ে পলায়ন করে, আর যাঁহারা তাহাকে সর্ব্বদা পরিহার করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের অনেকেরই কণ্ঠে আসিয়া দিনে দিনে আলিঙ্গন করে। কারণ যাহাই থাক, মহারাজ এই আলিঙ্গনের তীব্র জ্বালায় জ্বলিতে কদাপি কামনা করেন নাই, অথচ তাঁহার গুণমুগ্ধ সরকার বাহাদুর এবং ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ও জনসাধারণ তাঁহার উপর স্নেহের অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে এই আলিঙ্গনে বদ্ধ হইতে বারে বারে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাঁহারা মহারাজের ভিতরকার প্রকৃত মানুষটাকে সম্যক চিনিতে পারেন নাই, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য, কিন্তু আজ তাঁহারাও জানিয়া রাখিতে পারেন, অন্তিম শয্যায় যখন মৃত্যু-কালিমা তাঁহার চোখে মুখে বুকে ঘনাইয়া আসিতেছিল, যখন তাঁহার পার্থিব কণ্ঠ চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তখনও তিনি তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্রকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "অযথা নামের জন্য অর্থব্যয় করিও না।"

যাহাই হউক, খৃষ্টীয় ১৮৯৮ সালের ৩০শে মে তারিখে (বাং ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫) তিনি "মহারাজ" খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অসীম গুণবত্তার উত্তরোত্তর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে, মহামান্য ভারত-সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে, ৩রা জুন তারিখে, সরকার তাঁহার প্রতি অত্যুচ্চ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহাকে "কে, সি, আই, ই" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপাধি মহারাজের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে, কি মহারাজের আশ্রয় পাইয়া তাহারই মর্য্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে, সে বিচার আজ নাই করিলাম, কিন্তু বিদেশী সরকারও ত তাঁহার গুণের তারিফ্ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশান্ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এবং পুনরায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গল-কাউন্সিলের মেম্বর (সদস্য) ছিলেন ;

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গদেশ ও আসাম বিভাগ হইতে মনোনীত সদস্যরূপে ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ পুনরায় তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়া মেম্বররূপে কাউন্সিল অব্ ষ্টেট এ প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এই যাবতীয় সময়েই তিনি "অনারেবল্ মহারাজ" বলিয়া অভিহিত হইতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "অনারারী ফেলো" নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট বিপুল ঋণের কথঞ্চিৎমাত্র পরিশোধ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, বঙ্গাব্দ ১৩১৫ সালে বৈষ্ণব গোস্বামী প্রভুগণ প্রদত্ত "শ্রীগৌড়রাজর্ষি" ও ১৩১৬ সালে প্রদত্ত "ধর্ম্মরাজ" উপাধি, ১৩১৭ সালে কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তি প্রদায়িনী সভা কর্ত্তৃক প্রদত্ত "ভক্তিসাগর" উপাধি, ১৩২০ সালে নবদ্বীপ বুধমণ্ডলী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত "বিদ্যারঞ্জন" উপাধি, ১৩২২ সালে কাশীস্থ ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলকর্ত্তৃক অর্পিত "ভারত-ধর্ম্মভূষণ" উপাধি ও ১৩২৬ সালে পুরী বেদ-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত "দান কল্পতরু" উপাধি—তাঁহার অপরাপর উপাধির মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই শাপভ্রষ্ট দেবতাকে অনেকানেক মর্ম্মান্তিক শোক তাপও ভোগ করিতে হইয়াছে। উপর্য্যুপরি প্রাণ-প্রতিম দুই পুত্রের অকালমৃত্যু ও দুই কন্যার বালবৈধব্যে তাঁহার স্নেহাতুর পিতৃহৃদয়ে হাহাকারের সর্ব্বগ্রাসী আগুণ শত-জিহ্বায় প্রতিবারেই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অথচ, পরমাশ্চর্য্যের বিষয়, সেই আত্মস্থ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সংযমের বন্যা ডাকিয়া প্রতিবারেই তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উপরন্তু, আরও আশ্চর্য্য এই, পরিবারের অন্যান্য সকলকেও শোকের প্রথম আতিশয্যের সময়েও নিজের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। ১৩১০ সালে মধ্যম-কুমার কীর্ত্তিচন্দ্রের দেহাবসান ঘটে, তাঁহার মুখাগ্নি হইতে যাবতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতা স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া তাঁহার অসীম চিত্ত-সংযমের পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৩১৩ সালে যখন তিনি সপরিবারে, ৪০০।৪৫০ পরিবার সহ ব্রজপরিক্রমা করিতেছিলেন, তখন শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতে জ্যেষ্ঠকুমার মহিমচন্দ্র ভীষণ টাইফয়েড্ রোগে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তখনও মহারাজের মনের অদ্ভুত দৃঢ়তা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। প্রথমা কন্যা অতি অল্প বয়সে এবং দ্বিতীয়া কন্যা বিবাহের ৮ মাস পরে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়েন, আনন্দের

পরিশিষ্ট

প্রতিমা বালিকা কন্যাদ্বয়ের উপর বিধাতার এই নির্ম্মম অভিসম্পাতের জন্য মহারাজের পুঞ্জীভূত ব্যথা-ক্লিষ্ট অন্তর প্রতিনিয়তই তপ্ত-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, অন্দরে যাইবার পূর্ব্বে বুক তাঁহার দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিত—পা চলিত না, দেহ অবসন্ন হইয়া আসিত—আর যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করিতেন বক্ষের সেই গুরু কম্পন অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিত—কিন্তু এজন্য কখনও তিনি আত্মহারা হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই, কন্যাদিগের দুর্দ্দশার জন্য তাঁহার নিজ-কৃত কোনও অজানা পাপই দায়ী—এই বিশ্বাসে মঙ্গলময়ের বিধানের বিরুদ্ধেও কখন অভিযোগ প্রকাশ করেন নাই।

গত আশ্বিন মাস হইতে তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বার জ্বর ভোগান্তে আমাদের নিকট গল্প করেন, "দেখুন, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, আমার দাদা (৺উপেন্দ্র বাবু) হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলেন, আমি বল্লাম, 'দাদা, এ রাজ্য তোমার, তুমি নাও, আমার এ ভাল লাগে না'—দাদা হেসে উত্তর দিলেন, 'না তুমিই ভোগ কর'।" মৃতজনের সহিত স্বপ্নে সাক্ষাৎকার ও এবংবিধ কথোপকথনের কথা শুনিয়া উপস্থিত আমাদের সকলেরই মনে স্বতঃই কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। কিন্তু তখনও বুঝি নাই—ভাবি নাই—ভাবিতে পারি নাই যে, সংসারে উদাসীন, রাজ্যভোগে বীতস্পৃহ এই যোগীন্দ্র এইভাবে তাঁহার অন্তিমের আভাস দিয়া এত শীঘ্রই তাঁহার অগ্রজের, পুত্রদ্বয়ের ও জামাতৃদ্বয়ের সহিত পরলোকে চিরমিলনাকাঙ্ক্ষায় মহাপ্রয়াণ করিবেন।

তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ সাধ অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার আদরিণী পৌত্রীটীকে বিবাহ দিয়া যাইতে পারিলেন না। ইদানীং তাঁহার কথা-বার্ত্তায় মনে হইত আগামী মাঘ ফাল্গুনের মধ্যেই, পৌত্রীটীকে সৎপাত্রস্থা করিতে পারিলেই তিনি যেন আন্তরিক সুখী হন।

* * ৺কাশীমিত্রের ঘাটে সেই পরমহিতৈষী, পরমবন্ধু, পরমাত্মীয়ের শান্ত সুন্দর দেহটা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে—ভাবিতে পারি না—কিন্তু গিয়াছে, ভস্মে সেই নশ্বর দেহটার সত্য সত্যই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। * * * ইহলোকে সেই মহিমময় আত্মা মানবজাতির প্রতি যে অফুরন্ত শুভেচ্ছা প্রতিক্ষণে জ্ঞাপন করিত, তাহা দেশে দেশে, যুগে যুগে প্রতি মানবের অন্তরে অন্তরে নিবিড় হইয়া উঠুক।

——— শ্রীনৃত্যগোপাল সরকার

মণীন্দ্র-প্রয়াণে

দানবীর, এতদিনে নিঃশেষে করিলে তোমার নিজেরে দান।
মৃত্যুরে দিলে অঞ্জলি ভরি' তোমার অমৃত প্রাণ।

অমৃত-লোকের যাত্রী তোমরা পথ ভু'লে আস, তাই
তোমাদেরে ছুঁয়ে মৃত্যু অমর, আজিও সে মরে নাই।
স্বর্গলোকের ইঙ্গিত—আস ছল ক'রে ধরাতল,
তোমাদেরে চাহি' ফোটে ধরণীতে ধেয়ানের শতদল।
রৌদ্র-মলিন নয়নে বুলাও স্বপন-লোকের মায়া,
তৃষিত আর্ত্ত ধরায় ঘনাও সজল মেঘের ছায়া।

ইন্দ্রকান্তমণি ছিলে তুমি শ্যাম ধরণীর বুকে,
সুন্দরতর লোকের আভাস এনেছিলে চোখে মুখে।
ঐশ্বর্য্যের বুকে ব'সে বলেছিলে, শিব! বৈরাগী!
বিভব রতন ইঙ্গিত শুধু ত্যাগের মহিমা লাগি।
ইন্দ্র, কুবের, লক্ষ্মী, আশীষ ঢেলেছিল যত শিরে
দু'হাত ভরিয়া ক্ষুধিত মানবে দিলে তাহা ফিরে ফিরে।
যে ঐশ্বর্য্য লয়ে এসেছিলে, তাহারি গর্ব্ব লয়ে
করেছ প্রয়াণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ, উঁচু শিরে নির্ভয়ে!
তব দান-ভারে টলমল ধরা চাহে বিহ্বল আঁখি,
অঞ্জলি পূরি দিয়া মহাদান, বক্ষেরে দিলে ফাঁকি!

নজ্‌রুল ইস্‌লাম

———

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

আজ সারা বাঙ্গালা দেশ যাঁহার জন্য শোকে মুহ্যমান, যাঁহার অভাবে আজ বাঙ্গালার বহু ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে সেই দেশহিতৈষী, আত্মত্যাগী, প্রিয়দর্শন, বিদ্যোৎসাহী, দীনপ্রতিপালক কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গত ২৫শে কার্ত্তিক রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতাস্থ প্রাসাদে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য! বঙ্গ জননী যেমন সন্তান হারাইতেছেন তেমনটি আর পাইতেছেন না। স্যর আশুতোষের ন্যায় নির্ভীক তেজস্বী বিচারপতি, স্যর রাসবিহারীর ন্যায় ব্যবহারাজীব, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ন্যায় স্বদেশসেবক দেশবন্ধু বঙ্গ জননীর ক্রোড়ে এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। তাই ভয় হয়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় দানশীল প্রজাবৎসল জমিদার বোধ হয় বাঙ্গালায় আর জন্মিবে না, বাঙ্গালা আজ যাহা হারাইল তাহা আর পাইবে না।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বাল্যকালে শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু এই সময় তিনি কঠিন শিরোরোগে আক্রান্ত হয়েন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে বাল্যকালেই লেখা পড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়েন। সুস্থ হইলে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভে বঞ্চিত হইয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইলেও পুত্র শ্রীশচন্দ্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন তখন মহারাজের সকল ক্ষোভ দূরীভূত হয়। পিতা পুত্রের নিকট পরাজিত হইয়া আনন্দিত হন—সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ, পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র দীর্ঘ ২২বৎসরকাল কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর মাথরুণ গমন করেন এবং ১০ বৎসর ধরিয়া তথায় বাস করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর বিশাল ঐশ্বর্য্যের তিনিই ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে মাথরুণ ত্যাগ করিয়া কাশিমবাজারে যাইবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজারে যাইলে কাশিমবাজারে স্থান পাওয়া ত দূরের কথা, বিপক্ষ পক্ষের প্রবল ষড়যন্ত্রে তিনি প্রথমে বহরমপুর সহরে একটি ভাড়া বাড়ী পর্য্যন্ত পান নাই। পরে বহু কষ্টে বহরমপুরের জমিদার সেন বাবুদের চেষ্টায় তিনি একটী বাড়ী ভাড়া পান।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

১৩০৪ সালের ভাদ্রমাসে মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হইলে মণীন্দ্রচন্দ্র বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হ'ন। ইহার কিছুদিন পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার মণীন্দ্রচন্দ্রকে "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র দানে স্বর্ণময়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। যৌবনে সুদীর্ঘ ১০ বৎসর কাল মাথরুণে অবস্থান করিয়া দীন দরিদ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার অবসর পাইয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র দারিদ্র্যের কি জ্বালা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি দেশের ও দশের হিতের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে দান করিয়া অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, অর্থ অনর্থের মূল নহে।

তাঁহার অর্থে কত বিদ্যালয় যে প্রতিষ্ঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি পিতা নবীনচন্দ্রের নামে মাথরুণে নবীনচন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, মাতা গোবিন্দসুন্দরীর নামে কলিকাতায় গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ, সহধর্ম্মিণী মহারাণী কাশীশ্বরীর নামে যবগ্রামে কাশীশ্বরী ইনষ্টিটিউশান, পরলোকগত পুত্র মহিমচন্দ্রের নামে শক্তিপুরে মহিমচন্দ্র ইনষ্টিটিউশান, কীর্ত্তিচন্দ্রের নামে কীর্ত্তিচন্দ্র ইনষ্টিটিউশান, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্রের নামে এথোরায় শ্রীশচন্দ্র ইনষ্টিটিউশান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাঁচী ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের সকল ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের জন্য তিনি বার্ষিক অন্যূন ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন।

বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া আজকাল বিশেষ কিছু হইতেছে না দেখিয়া মহারাজ বাহাদুর কারিগরী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতায় এক পলিটেকনিক্ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর বহু ছাত্র নানাভাবে কারিগরী শিক্ষা লাভ করিতেছে।

বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায় যাহাতে কেবলমাত্র কেরাণীতে পরিণত না হয় সেদিকে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক হইতে উন্নত না হইলে কোন দেশ কখনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাই তিনি ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বহু ছাত্রকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে পাঠাইতেন।

পরিশিষ্ট

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে শ্রীপাট খড়দহ, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানে বিরাট বৈষ্ণব সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। আমরা খড়দহ বৈষ্ণব সম্মিলনীতে গিয়া মহারাজ বাহাদুরকে স্বয়ং ঝাঁটা লইয়া আহারের স্থান পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছি এবং অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছি—এ লোক মানুষ না দেবতা ?

বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সদা-সর্ব্বদা সামান্য গৃহস্থের ন্যায় সাধারণ বেশভূষা পরিধান করিয়া থাকিতেন। একদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল লেফটেন্যান্ট বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানের কার্য্যোপলক্ষে মহারাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মহারাজ তখন একটী ছেঁড়া সেলাই করা কামিজ পরিয়া বাহিরে বসিয়াছিলেন। তিনি বিজয় বাবুকে লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

কার্য্য সমাপনের পর বিজয় বাবু চলিয়া যাইলে আমি মহারাজ বাহাদুরকে সেলাই করা শার্ট বদলাইয়া অন্য একটি ভাল শার্ট ব্যবহার করিতে বলিলাম। মহারাজ বাহাদুর উত্তরে বলিলেন—তোমরা আজকাল বাবুগিরি শিখিয়াছ, সেলাই করা শার্ট পরিতে তোমাদের লজ্জাবোধ হয় ; আমার ইহাতে—বলিয়াই মহারাজ বাহাদুর থামিলেন। উত্তর শুনিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত হইল।

মহারাজ বাহাদুরের সহিত একবার পুরীধাম হইতে ভুবনেশ্বরে আসিয়াছিলাম। সে প্রায় তিন বৎসরের কথা। সে সময় একদিন তাঁহার সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কীয় আলোচনা হইতেছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, মাড়োয়ারীরা আমাদের বাঙ্গালা দেশের টাকা লুট করিতেছে, তাহারা আমাদের সব ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে দখল করিতেছে আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। উত্তরে মহারাজ বাহাদুর বলিয়াছিলেন—তোমরা এমন **uncharitable remark** কর কেন ? মাড়োয়ারীদের সহিত তোমাদের কতখানি প্রভেদ তাহা কি দেখিতে পাওনা ? যতদিন তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি বিলাসিতার জন্য ব্যয় করিবে ততদিন অপরে তোমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবেই। তোমাদের মাসিক আয় পাঁচ শত টাকা হইলেই আর মোটর গাড়ী ছাড়া তোমাদের চলে না, আর ঐ

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মাড়োয়ারীরা লক্ষপতি হইলেও দীনবেশে নাগরা জুতা পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এইখানেই তোমাদের সহিত তাহাদের প্রভেদ।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কিরূপ সরল ও অমায়িক ছিলেন সে সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে আজ একটী গল্প বলিব। সে প্রায় ১০ বৎসরের কথা। মহারাজ ট্রেণে যাইতেছিলেন। ট্রেণ বোলপুর ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে একে একে সকল যাত্রী ট্রেণে উঠিল। এক বৃদ্ধা একটী ভারী বোঝা লইয়া ট্রেণে উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ভারী বোঝা নিজে তুলিতে না পারিয়া বহু লোককে সে বোঝা তুলিয়া দিবার জন্য কাকুতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু কে তাহার কথায় কর্ণপাত করে? ট্রেণ ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই। মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র তাঁহার কামরা হইতে উহা লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া নিজে বৃদ্ধার বোঝা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। তখন সকলে অবাক!

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যে কেবল তাঁহার বিশাল সম্পত্তিই পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি পরের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। গত পূর্ব্ব বৎসর হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভযোগে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র হরিদ্বার গমন করিয়াছিলেন। লেখকেরও সেবার হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বার দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তথায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবার সময় মহারাজ বাহাদুর এক বৃদ্ধাকে গঙ্গার প্রবল স্রোতে পড়িয়া যাইতে দেখিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তখন নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে উদ্ধার করিলেন। ঐ বৃদ্ধ বয়সে নিজের কথা ভুলিয়া বিপন্নের প্রাণরক্ষার প্রবৃত্তি একমাত্র মণীন্দ্রচন্দ্রেই সম্ভব ছিল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সহিত সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, আজ তিনি যে আর ইহলোকে নাই তাহা বিশ্বাস করিতে যেন প্রবৃত্তি হইতেছে না। তিনি মরিয়া অমর হইয়াছেন।

সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে যারে সেবে সর্ব্বজন।

শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী

রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্র

যাবার মত ক'রে—শুধু যাবার জন্তই যা' চলে যায় তা'কে ধরে রাখবার সামর্থ্য কারো নেই,—আরো যে একবার মানুষের সকল শক্তিকে তুচ্ছ ক'রে, নশ্বরত্বের বন্ধন মোচন করে, ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তমের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয়,—সে আর এ মর জগতের ভিতর পূর্ব্বরূপ নিয়ে ফিরে আসে না; এত বড় সত্য আর কিছুতেই প্রকট হয়ে ওঠে না এ ঠিক,—কিন্তু যাদের যায়?

সারা বাংলার বুক জুড়ে তাই না আজ হারাণোর ব্যথা বেজে উঠেছে। যে রাজর্ষি অপরিসীম ত্যাগের আদর্শে হিন্দুরাজ গৌরবকে ধন্য করে তুলেছিলেন,—যাঁর অতুলনীয় ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি বহু অপরাধে অপরাধীর উপরও কখন আরক্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়নি'—যাঁর কাছে লক্ষাধিপতি হতে সাধারণ নাগরিকগণ এমন কি ইতর সম্প্রদায় পর্য্যন্ত সমান অমায়িক ব্যবহারে পরিতৃপ্তি লাভ ক'রতো,—তাঁকে আমরা সহজ সরল আড়ম্বরশূন্য মানুষের বেশে কত কাছেই না পেয়েছিলাম!

আমাদের বোঝবার শক্তির পরিমাণ বড় অল্প! সমীরণ পরম স্নেহে আমাদের সমস্ত গ্লানি দূর করেন,—আমরা ভাবি আমাদের ওটা নিত্যকার মস্ত একটা পাওনার দাবী! স্নেহের সম্মান ত আমরা দিতে চাইনে—কিন্তু বুঝি কখন? যখন হারায়,—তাই আজ আমাদের চোখে জল আসচে।

মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মহানুভব মহারাজের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—অতীত তাঁর যা কিছু, তা' আমার কাছে সুস্পষ্ট নয়।

কিন্তু বর্ত্তমান দুই বৎসরের ভিতর প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজের বিষয় যতটুকু জেনেছি,—তার ফলে বর্ত্তমান জগতে তাঁর মত সদ্‌গুণবিভূষিত আর কোন রাজোপাধিধারী আছেন বলে ধারণা হয় না এবং ভবিষ্যৎ কালে হবার সম্ভাবনা আছে কিনা, তা'ও অনিশ্চিতের গর্ভে নিহিত।

প্রথম যখন তাঁকে দেখলাম—সেদিন তাঁর স্বভাবসুন্দর কোমল স্নেহময় ভাব-মাধুর্য্যের দ্বারা, মনে এমন কোন একটা শঙ্কিত অনুভব দাঁড়াতে পারে নি—যে তিনি একজন দণ্ডধারী মহারাজা! ঠিক যেন আমাদেরই ঘরের মানুষ আপনজনেরই মত! সকল অন্তর নীরবে অসীম শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

আধুনিক সভ্যতার কায়দা কানুনে অশিক্ষিতা আমি, কিন্তু কোন ক্রটীই যেন তিনি মনে নিলেন না। প্রথম ছু'চারটী কথার পর পরম স্নেহের সঙ্গে শুধু বললেন—"তোমার বাবার সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয় মা! তখন বোধ হয় তোমরা জন্মাওনি।"

তারপর প্রসঙ্গ হ'তে প্রসঙ্গান্তরে এসে যখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রসঙ্গে এসে উপস্থিত হওয়া গেল, সে সময়ে যেন একটু ম্রিয়মাণ ভাবেই বললেন, "শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা! কিন্তু ঠিক আমার মনঃপূতভাবে হচ্ছে না! হচ্ছে বটে!"

সামান্য কথাটির অন্তরাল দিয়ে মহারাজের নিজস্ব ধারণার যে ভাবটী প্রকাশ হয়ে পড়ল, তার ভিতর দিয়ে পরিস্কাররূপে উপলব্ধি করতে কোন বাধা আস্‌ল না যে, স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিটা তাঁর কোন জায়গা স্পর্শ করেছে,—অথচ ঠিক ভাবের মত, মনের মত, হিন্দু আদর্শের উপযোগিরূপে দেখতে পাচ্ছেন না বলেই ব্যথিত। শিক্ষায় যদি জ্ঞানের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারিতা আসে এই জন্য ক্ষুব্ধ চিন্তিত,—উপরন্তু অশিক্ষার দ্বারাও যে যথেষ্ট অনিষ্টের ফল প্রসব সম্ভব, সে বিষয়েও তাঁর চিন্তাশীল চিত্ত নিস্তব্ধ ছিল না। অম্লান আদর্শের ভিত্তির উপরে, তার অভ্যন্তরস্থিত পথের সহায়তায় নারীর অজ্ঞতা দূর হোক, জ্ঞানের অধিকারিণীরূপে সে বিশ্বের বুকে দাঁড়াক, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। নারীর যে মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্ত্তি; তাকে উপেক্ষা করে নয়, অবহেলায় নয়।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শবাদী মহারাজ আদর্শকে যেমন নিজের স্বর্ণ মুকুটের পার্শ্বে স্থান দিয়েছিলেন, তেমনি সর্ব্বত্রই তিনি আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতেন; আদর্শের ব্যতিক্রম, এ চিন্তাও ছিল তাঁর বেদনাদায়ক।

মানুষ তার জীবনে এক রকম আদর্শকে বহন করে নিয়ে যেতে ক্লান্তি বোধ করে,—কিন্তু তাঁর আশ্চর্য্য কৃতিত্ব যে বিভিন্নমুখী বহু আদর্শকে প্রসন্ন হাসিমুখে তিনি বহন করে গিয়েছেন। দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা থেকেই আমরা মানব অন্তরের পরিচয় লাভ করি,—একটী দিনের কথা মনে পড়ে—সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা!

তদুপলক্ষে মহানুভব মহারাজের অন্তরের একটী সুন্দরতম দিকের গভীরতা জানিতে পারা যায়—লোক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ভাণ্ডারে সেদিন অজস্র জিনিষের আড়ম্বর, সেই সঙ্গে লুঠের আড়ম্বরও ঠিক বন্যাস্রোতের ন্যায় আরম্ভ হয়েছিল,—

নিমন্ত্রিত এবং অতিরিক্ত লোকে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ! অথচ সুব্যবস্থার কোন উপায় ছিল না,—তাই লক্ষ্য করে মহারাজের প্রতিপালিত ও আত্মীয় কয়টি যুবক এই বিশৃঙ্খলতাকে শৃঙ্খলায় আনবার আকাঙ্ক্ষায়,—মহারাজের অজ্ঞাতসারেই একটী ভলেন্টিয়ার দল গড়ে বসল। ফলে অনেকে সতর্ক হয়ে গেল—অনেকে ধরা পড়ে যেতে লাগল,—সুচতুর ভলেন্টিয়ার দলের কার্য্যকুশলতায় দেউড়ীর কাছে বিস্তর জিনিষ স্তূপীকৃত হয়ে উঠলো। কিন্তু গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে একটী মাত্র লোক, সে ওই রকমভাবে ধরা পড়ার পর মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়ে নানাভাবে আক্ষেপ প্রকাশ করায় মহারাজের দয়ার চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠলো। তিনি ছেলেদের ডাক দিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শোনবার পর গম্ভীর মুখে তিরস্কারের সুরে বলিলেন —"কই, আমি ত এমন কাজ করিতে অনুমতি দিইনি—তবে এমন কাজ তোমরা কেন করতে গেলে, যাও, দেউড়ী ছেড়ে দাওগে।"

ভলেন্টিয়াররা খুঁজে পেলে না, খারাপ কাজটা তারা কি করেছে,—কেবল নিঃশব্দে দেউড়ী ছেড়ে দিয়ে গেল।

বাইরের চোখ দিয়ে যদি মহামান্য মহারাজের বিচার করিতে যাওয়া যায়, সাধারণ হিসেবীর মত একাজ যে তাঁর হয়নি, তা অস্বীকার করিবার উপায় নেই। কিন্তু পরে যখন আবার এই অভিমানী ছেলের দলকে ডেকে তিনি সমান স্নেহেই বল্লেন—"বকতে তোমাদেরই হবে জান, তোমরা যে আমার আত্মীয়। আর ওই যে ব্যক্তি খাবার নিয়ে যাচ্ছে, ওর কি এখানে খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে? ওর বাড়ীতে ছেলে মেয়ে যে আছে সে দিকটাও তো ভাবতে হয়,—বুঝবে তখন, যখন তোমরা নিজেরা ছেলে-মেয়ের বাপ হবে।"

যেন একটী দয়ার হিমাচল! কত উচ্চ স্তরের মানসিক দৃষ্টি হলে, তবে মানুষ পরের মনের ব্যথা নিজের বুকে অনুভব করে? অনুভূতির সঙ্গে তার অপরাধ মার্জ্জনা করে—এম্‌নি নয় উপরন্তু নিজের ক্ষতি স্বীকার করে। একি শুধু একটী দিন! লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর জীবনের প্রত্যেক দিনটী যে পরিপূর্ণ।

আর অন্য দিনের ঘটনা,—সেদিন মহারাজ এই কাশীম বাজারের বানকের বাগান পরিদর্শনে এসেছিলেন,—বাগানে শাক-সব্জী জন্মায়, কিন্তু রাজসংসারে তার কতটুকু যায় বলা যায় না, বাগানটী যেন সাধারণের সম্পত্তি। তাই লক্ষ্য করে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন—যে, "আমি এখানে দু' বৎসর এসেছি, কিন্তু

বাগানটী দেখে মনে করতে পারিনে, এটী মহারাজের বাগান কি এটা সাধারণের সম্পত্তি!"

উত্তরে মহারাজ সহাস্ত মুখে বল্লেন, "জিনিষ জন্মায় মানুষে খায়, এতো আনন্দের কথা, এতেও একটা তৃপ্তি আছে যে মানুষে খাচ্চে,—কিন্তু এই যে হনুমানগুলো কিছু রাখতে দিচ্ছে না এইটেই হচ্ছে দুঃখের কারণ।"

এর উপর আর কি বলবার আছে? দিতে পারলেন না বলে যিনি দুঃখিত, মানুষের মঙ্গলেই যাঁর আনন্দ, লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে তাঁর বরপুত্র হয়েও যিনি ভোগে উদাসীন অবস্থায় বিচরণ করেছেন, কর্ত্তব্য ও কর্ম্মের আশ্রয়ে যিনি নিজের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত রূপে চালিয়ে এসেছেন, তাঁকেতো প্রকাশ করবার কোন কিছু নেই, তিনি আত্মজ্যোতিতেই যে চিরদিন স্বপ্রকাশ ছিলেন!

জীবনের একটী মাত্র দিনও তিনি আলস্যে অতিবাহিত করতেন না—প্রতিদিন প্রভাতে উষা প্রকাশের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করে কর্ম্ম গ্রহণ করতেন, অন্যূন রাত্রি এগারটার পূর্ব্বে বিশ্রাম গ্রহণের অবসর গ্রহণ করাও কোনদিন প্রয়োজন বোধ করেন নি। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে যখন মৃদু মৃদু জ্বরের সঙ্গে মৃত্যু নীরবে ধীরে ধীরে তাঁকে অদৃশ্য পথের দিকে আকর্ষণ করছে, তখনো অপরিমিত উৎসাহে তিনি হাসিমুখে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করে চলেছেন,—বাগান পরিদর্শন, প্রতিবেশীর দৈনিক কুশল জিজ্ঞাসা, এষ্টেটের হিসাব নিকাশ পর্য্যবেক্ষণ, কেবল মাত্র কি নিজের! অধিকন্তু পরিচিত বন্ধুবর্গের অনেকের এষ্টেটের ট্রাষ্টী ছিলেন তিনি, এবং এই সমস্ত দায়িত্বযুক্ত কর্ম্ম তিনি স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন ক'রে তৃপ্তিবোধ করতেন।

মাত্র এইখানেই কি শেষ! প্রত্যেক উৎসব ব্যাপারে অসীম সৌজন্যের সঙ্গে নিমন্ত্রিতদের আহারস্থানে নিজে উপস্থিত থাকতেন। অবশেষে সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়ানর পর তবে তিনি অবসর গ্রহণ করতেন! অগণ্য লোকের পরিতুষ্টি এ কি সহজ কথা!

গত বৎসর পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এই কর্ম্মবীর মহারাজের ধৈর্য্যপূর্ণ কর্ম্মোদ্যম যার দৃষ্টিতে পড়েছে, সে-ই বিস্ময়াভিভূত না হয়ে থাকতে পারে নি। সাধারণ লোকদের খাওয়ান অথবা ব্রাহ্মণভোজন ত অন্য কথা, ইতর, নিম্নশ্রেণী দরিদ্রদের পর্য্যন্ত খাওয়ার ব্যাপার শেষ না হলে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। কেউ

অনুরোধ জানালে বলতেন—"দরিদ্র-নারায়ণের সেবা যে এখনো শেষ হয়নি!" সন্ধ্যা সে সময়ে আসন্ন হয়েই এসে দেখা দিত।

তাঁকে হারিয়ে বাংলা কাঁদবে এতো নতুন কথা নয়! বাংলা তাঁর কাছে যে পরিমাণে লাভ করেছে সে তুলনায় এ কান্না কত সামান্য। বাংলাকে গঠনের জন্য তাঁর বিপুল উদ্যম, শিক্ষা বিভাগের দিকে দৃষ্টি করলেই সে কথা বিশেষ ভাবে বোঝা যায়। নানা প্রতিষ্ঠানে নানা রকম ভাবে তিনি সাহায্য করে গিয়েছেন, অজস্র ঋণজালে জড়িত হয়েও তাঁর দানের হাত কোন দিন কম করতে পারেননি। সর্ব্বসাধারণকে উন্নত করবার কি গভীর প্রচেষ্টা, নিজে সর্ব্বস্বান্ত হবার উদ্যোগী তবু নিবৃত্তিহীন।

স্বর্ণমুকুট-মণ্ডিত দেহের অন্তরালে বাংলা যে মহান্ আত্মার স্পর্শ অনুভব করে এসেছে, সে আত্মত্যাগের সৌন্দর্য্যে মহীয়ান্—আদর্শ হিন্দুর প্রতিপালন-নিষ্ঠায় স্বজন বাৎসল্যে অদ্বিতীয়, ক্ষমার অপরূপ চরিত্রে নির্ম্মল ভাস্করের মতই উজ্জ্বল! স্নেহে কুসুমোপম কোমলতাপূর্ণ, শোকে অপরিসীম স্থৈর্য্যশীল—সহিষ্ণুতায় হিমাচলের মতই প্রশান্ত!

এমন জিনিষ হারিয়ে চোখের জল বন্ধ থাকে কার? তবু এই কান্নার অন্তরালে তাঁর আদর্শ দেখে আমাদের শেখবারও যে অনেক কিছু আছে, একথা ভুললে চলবে না।

শ্রীমতী নৃসিংহদাসী দেবী

"আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সংগঠিত হয়। তাঁহার মনের ভাব তিনিই অবগত আছেন। আমরা কেবল খাটিয়া খালাস।"

মণীন্দ্রচন্দ্র—২৫শে অগ্রহায়ণ—১২৯৯।

মণীন্দ্র-বিয়োগ

শূন্য মণি-মঞ্জুষা হায়, 'মণীন্দ্র'-কৌস্তুভ
হ'য়ল মরণ কাল্-সাগরে হঠাৎ দিয়ে ডুব,
হুর পরীরা চক্রবালে
ভারত হ'তে সোণার থালে
যাচ্ছে ল'য়ে সেই সে 'মণি' তাইরে হিরণ ছবি
ফুটছে নভে, ভাবছি মোরা উঠছে বুঝি রবি !

কাঁদ্‌ছে ভারত, বঙ্গবাসী ভাস্‌ছে নয়ন-নীরে
ডুক্‌রে ওঠে বনের পাখী গঙ্গানদীর তীরে,
নীহার ছলে বৃক্ষ হ'তে
অশ্রু ঝরে কানন পথে
পাগ্‌লা ঝোরার ঝরণা সম সকল আঁখির পাতে
অঝোর ঝরণ অশ্রু ধারা ঝ'র্‌ছে দিবস রাতে !

লুপ্ত হ'ল "বদান্যতা" আজকে ভারত মাঝ
দীন দুখিনী কেমন ক'রে বাঁচ্‌বে মহারাজ !
হে দধীচি স্বর্গগত
প্রণাম তোমায় লক্ষশত
জানাই আমি, অশ্রু-ফুলে পূর্ণ করি' সাজি
পাঠাই তব চরণ তলে গ্রহণ করো আজি ।

পরিশিষ্ট

অর্ঘ্য তুমি চিন্‌বে আমার, নেবেই সুনিশ্চয়
স্নেহের বাণী বল্‌তে যারে তার যে স্নেহের জয়।
কূল কিনারা নাইক' দুখের
রত্নহারা ভারত বুকের
কিন্তু আজো "শ্রী" আছে তার, তোমার স্মৃতি ল'য়ে
পেয়েছি আজ' 'মণি'র 'মণি' তোমায় হারা হ'য়ে।

হয়ত মোরা ভুলেই কাঁদি, তোমার মতই জ্যোতি
ছড়িয়ে যাবে, এখন হ'তে, শুক্তি-হৃদের মোতি,
তারেই মোরা বরণ করি'
কাঁদব না আর তোমায় স্মরি!
বিশ্বহৃদি-কমল ফুটে তোমার চরণ তলে,
মধুর স্মৃতি-সৌরভে দুখ্‌ রইব মোরা ভুলে।

কাদের নওয়াজ

স্বর্গীয় মহারাজ প্রায়ই বলিতেন,—
"হৃদয়ের রক্ত দিয়ে কর উপকার
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদান তার।"

হরিদ্বারের পথে

রাত্রি ১১টার সময় মহারাজকুমার টেলিফোন করিলেন—"তুমি মহারাজের সঙ্গে হরিদ্বার যেতে পারবে? তিনি জটিলা ও বেণীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন—তুমিও যদি সঙ্গে যাও অনেক বিষয় আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব। তোমার কোন ভয় নেই, হেমন্তদাও (হেমন্তদাও আজ এই সংসারে নাই, হরিদ্বার যাত্রার সঙ্গী, বয়সে বড় হ'লেও আহারে বিহারে সঙ্গী স্নেহময় হেমন্তদা, আজ নাই!) সঙ্গে যাবেন। বাবার ইচ্ছা তুমি সঙ্গে যাও।"

মাস দু'য়েক হ'ল বহরমপুর থেকে চলে এসেছি, Nervous অসুখ নিয়ে মনের কোনে একটু দ্বিধাও জাগল—নিজের অসুস্থতা, পাছে বা আর সকলকে বিব্রত করি, কিন্তু "মহারাজের ইচ্ছা"—তার বাড়া ত আর কথা নাই! তা'ছাড়া সুদূর প্রবাস যাত্রার প্রলোভনটাও কম নয়। তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম "প্রস্তুত—কাল সকালে মহারাজার সহিত দেখা করব।"

সকালে মহারাজের সহিত দেখা করতে যেতেই—হাসিমুখে তিনি বললেন,—"কি গো প্রস্তুত?"—আমি বললাম, 'হ্যাঁ'—মহারাজ বললেন—"হ্যাঁ নয়—তা' হলে প্রস্তুত হয়ে এখানে ৩টার সময় এসো।"

তিনটায় এসে গাড়ী 'রিজার্ভ' করার জন্য ই, আই, আর, অফিসে আমি, গৌর আর সুরেশ বাবু ছুটলাম, কার্য্য সিদ্ধি হ'ল—হাওড়া এসে পৌঁছান গেল, গাড়ী ছাড়ার প্রায় এক ঘণ্টা আগে। দেখলাম—হেমন্তদা জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকপরে মহারাজ এসে গাড়ীতে উঠলেন—সঙ্গে মহারাজ-কুমার। যতক্ষণ গাড়ী না ছাড়ল—মহারাজকুমারকে কাছে বসিয়ে অনেক কথা-বার্ত্তা হ'ল, আমরা তখন প্ল্যাটফরমে পায়চারী করছি। গাড়ী ছাড়ার সময় হ'ল—মহারাজকে প্রণাম করে শ্রীশচন্দ্র নেমে এলেন। দূর তীর্থপথযাত্রী মহারাজের মুখের উপর সেদিন যে স্নেহ-শ্যামল মধুর ছায়া এসে পড়েছিল, তা যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। এই তাঁর পুত্র, একমাত্র পুত্র—বিদায়কালীন স্নেহাশীর্ব্বাদ করে কর্ম্ম-কঠোর পিতার সুদৃঢ় মুখমণ্ডলেও সেদিন স্নেহকাতরতার অর্দ্ধস্পষ্ট ছায়া দেখে মুগ্ধ মন কেবলি একটা অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠছিল।

পরিশিষ্ট

ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হওয়ার পরই—মহারাজের সে ভাব কেটে গেল, আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন মথুরা ইত্যাদির গল্প আরম্ভ করলেন। রাত্রি ৯টার সময় সঙ্গের খাবারের ঝুড়ি খুলে পরিতোষ সহকারে আহার করা গেল। আর সে আহারের ব্যবস্থা, প্রত্যেক জিনিসটি খুটিনাটি ভাবে বলে বলে দিলেন মহারাজ নিজে। বিছানা করে যে যার মত শুয়ে পড়া গেল।

সকালে চোখ খোলার আগেই মহারাজ হাত মুখ ধুয়ে বসে আছেন। আমাকে উঠতে দেখেই বল্‌লেন—"সকাল বেলাকার সৌন্দর্য্যের একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য্য আছে—যে সকালে সকালে কখনও উঠল না, সে জীবনের একটা তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত রইল।" কোনও উত্তর দিলাম না—বাহিরে চারিদিকের সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে শুধু বসে রইলাম। কতদিনের কথা, বিস্মৃত কত ঘটনার ছবি ক্রমশঃ আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠতে লাগল।—

এই কাশিমবাজারের মহারাজ! প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর সঙ্গে আমার, কাশিম বাজার রাজবাটিতে, রেশম কুঠীর বড় সাহেব পি, ই, গুর্জ্জু আমাকে সুপারিশ পত্র দিয়ে মহারাজের নিকট পাঠিয়েছিলেন। 'ফ্রি বোর্ডিং' ও 'ফ্রি ষ্টুডেণ্টসিপ'এর জন্য। চিঠিখানি পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে মহারাজ বল্‌লেন—"তাইত হে, বড় দেরীতে এসেচ, সে ব্যাপার যে একমাস আগে হয়ে গেছে।" কোনও কথারই জবাব মুখে এল না। "আচ্ছা তোমার চিঠি থাক্‌ল আমার কাছে, সময় হ'লেই খবর দেব।"

সে খবর পেতে আমার দীর্ঘ দিন লেগেছিল, কারণ আমি জানতে পেরেছিলাম স্বর্গীয় অধ্যাপক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে। জনৈক স্বার্থপর রাজ-কর্ম্মচারী নিজের মনোনীত ছাত্রের জন্য মহারাজকে বলেছিল—আমার অবস্থা খুব স্বচ্ছল, ছোটখাটো জমিদারীও নাকি আছে ইত্যাদি।—

কিন্তু কি জানি মহারাজ সে কথা তেমন বিশ্বাস করেন নি, তিনি আমার বিষয় অনুসন্ধান করে যখন জান্‌তে পারলেন বাস্তবিক আমাকে বিদ্যা দান করা অপাত্রে পড়বে না, তখনই আমার 'ফ্রি বোর্ডিং'এর আদেশ হ'য়ে গেল। আমাকে একখানা দরখাস্ত পর্য্যন্তও করতে হল না। দীর্ঘকাল তাঁরই দানে যা' কিছু শিখেছি, আজ তাঁর সামান্য একটু কাজেও যে লাগবার সৌভাগ্য হ'ল এজন্য সেদিন একটু তৃপ্তি অনুভবও করেছিলাম।

গাড়ী সমানভাবে চল্‌ছে, আমাদের নানা বিষয়ের কথাও চল্‌ছে। মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন—"খাসা অম্বুরী তামাকের গন্ধ আস্‌ছে, পাশের কামরা থেকেই বোধ হয়। বাবুদের 'টেষ্ট' ভাল।" বলাবাহুল্য পাশের কামরাতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমাদেরই লোক।

গাড়ীর দুলানিতে হেমন্তদা ঢুলছেন, মৃদুহাস্যে মহারাজ সেইদিকে চাইছেন আর নিঃশব্দে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন—এ যে রেলগাড়ীতে কতবার হয়েছে তার আর ঠিক নেই। ৪৮ ঘণ্টার উপর রেলগাড়ীতে যাত্রা, যে কয়বার আমরা যা কিছু খেলাম—তার খবরদারী করলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র। খাওয়ার সময় দেখা চাই-ই—এটা দাও ওটা, দাও, কার ভাগে কতটা পড়ল—মায় চাকর বাকর পর্য্যন্ত কে কি খেতে পেল, না পেল সে খোঁজও তিনি ট্রেণে বসেও করতেন। খাওয়া সম্বন্ধে আমার স্বল্পতা এবং বাছগোছের জন্য তিনি মৃদুহাস্যে কতই না অনুযোগ করিতেন। "তোমাদের বয়সে আমরা কি রকম খেতুম জান?—এই বয়সেই বুড়ো হয়ে গেলে—করবে কি হে?" ইত্যাদি।

মথুরায় এসে গাড়ী থামল—তখন বেলা ৯।১০টা হ'বে। মহারাজের "পুলিন-কুঞ্জের" কর্ম্মকর্ত্তাগণ ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। আমরা নামতেই জয়ধ্বনি করে ফুলের মালা গলায় দিয়ে আমাদের মোটরে তুলে দিলেন। প্রথম মোটরে—মাঝে মহারাজ দু'পাশে আমি ও হেমন্তদা। হেমন্তদার সবই দেখলাম পরিচিত, শুনলাম ক'বার তিনি এসেছেন। ষ্টেশন ছাড়িয়েই মহারাজের বৃন্দাবন বর্ণনা আরম্ভ হ'ল। কংসের রাজধানী, কারাগার এমনি কত কি স্থান তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে দেখাতে লাগলেন। দীর্ঘ রেলপথের কষ্ট তাঁকে এতটুকুও কাতর করতে পারেনি। উৎসাহ ও আনন্দের ভাব তাঁর দু'চোখে উছলে উঠ্‌ছে।

একটা বিশেষ কথা বলতে ভুলে গেছি। তীর্থযাত্রা করবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মহারাজের **Facial Paralysis**এর মত হয়। যে অবস্থায় মানুষ চিকিৎসাধীন থেকে বিশ্রাম করে—কর্ম্মবীর মণীন্দ্রচন্দ্র সে সময় আত্মীয় বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে কুম্ভমেলায় স্নানের জন্য তীর্থযাত্রী সেজে বসলেন। তাঁর এই অবস্থায় বিদেশ যাত্রা—তাই মহারাজকুমার ও আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল সঙ্গে একজন ডাক্তার যায়। সেকথা তাঁর কাছে উত্থাপন করতেই তিনি মৃদু হাস্য করেছিলেন মাত্র। তারপর আর কথা কইতে কারো সাহস হয়নি।

পরিশিষ্ট

আশ্চর্য্য এই যে বৃন্দাবনে দু'চার দিন থাকতেই দেখি মুখের সে বিকৃতি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। মনের জোরে মানুষ যে কঠিন রোগকেও জয় করতে পারে এ মহারাজের জীবনে বহুবার দেখা গেছে।--এই মনের জোর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর কমে এসেছিল—একদিন বললেন—"আর সময় এগিয়ে আসছে—দুর্ব্বলতা অনুভব করছি—এ যুদ্ধ আর বোধ হয় বেশী দিন চলবে না"—শুনে আশঙ্কা হয়েছিল—অত্যুঙ্গ পর্ব্বতের গায়েও কালের ছোঁয়াচ লাগে!

বৃন্দাবনে আমরা প্রায় একমাস ছিলাম। এসময় তাঁকে যেন একেবারে অন্তরের কাছে পেয়েছিলাম। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার পরিচয়, অন্যদিকে তাঁর অপরাজেয় চারিত্র্য শক্তির বিকাশ—এ যে না দেখেছে, না অনুভব করেছে তাকে বুঝান কঠিন।

মহারাজের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে বেড়াতে বের হ'তাম।—গাড়ীর কথা শুনলে ক্ষুণ্ণ হ'তেন। "বৃন্দাবনে এসেও গাড়ী চড়ব?" যিনি আপনার সমস্ত মর্য্যাদা—জনারণ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মর্য্যাদা রাখবার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে শুধু নিজেদেরই অপমান করতাম। "আপনার পা টা একটু ফুলো মনে হচ্ছে, হাঁটলে বাড়বে না?"—"তুমি বোঝনা হাঁটলে ওটা সেরে যাবে।"—

বৃন্দাবনে রোজ একবার করে একটা ভাল বাড়ী বাগানসমেত (কুঞ্জ) ভাল জায়গায় খোঁজবার জন্য মহারাজ বের হ'তেন—আমি ও হেমন্তদা প্রায়ই সঙ্গে থাকতাম। পথ চলতে দু'পাঁচ মিনিট অন্তর পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা—প্রত্যেককেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন—"হামারা বহু ভাগ, আপকা দর্শন মিলা"—উত্তরে পথিক বলতেন—মেরা আজ সুপ্রভাত, রাজদর্শন মিলা"—ইত্যাদি।

একদিন মহারাজ যমুনার ধার দিয়ে চলেছেন—সঙ্গে মাত্র একজন সেপাহি ও আমি। আমাকে বললেন—"আবার আসছে বছর আসব—তুমি আসবে ত? না কষ্ট পেয়ে উৎসাহভঙ্গ হয়ে গেছ।"—আমি বললাম "না, আমার আগে একটা আশঙ্কা ছিল—বিদেশে কখনও বের হই নি—কিন্তু আপনার খবরদারী করতে যারা এসেছে, তাদের খবরদারী ত আপনিই করছেন।—আমি ত নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি, আপনার সঙ্গে আমি নির্ভাবনায় সব জায়গায় যেতে পারি। তবে ক'দিন বেশ ছিলেন—কালকে আবার জ্বরভাবটা হ'ল কেন?—তাই ভাবছি।" "কোনও চিন্তার কারণ নেই—ওটা দাঁতের জন্য হয়েছে। তা ছাড়া গোবিন্দজী আছেন।

—মজা কি জান ? আমরা দু'নৌকায় পা দিয়ে মরি ! ভগবানকে ডাক্‌ব—হরি রক্ষা কর। আবার এক নিঃশ্বাসেই ডাক্তার ডেকে নিশ্চিন্ত হতে চাইব। তা আবার কাম্বেল পাশ হলে আজকাল হবে না, এম-বি চাই।"—

কথা কইতে কইতে আমরা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের "প্রেম-মহাবিদ্যালয়ে"র কাছে এসেছি—দেখি অধ্যক্ষ গিদোয়ানী এবং কয়েকজন অধ্যাপক আমাদের দিকেই আস্‌ছেন। মহারাজকে অভিবাদন করে তাঁরা জানালেন—তাঁরা মহারাজের কাছেই যাচ্ছিলেন, তাঁদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে।

মহারাজ স্মিত হাস্যে বল্‌লেন—"সে হবে না, রাস্তার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করব না—আপনাদের আমার কুঞ্জে আজ বৈকালে যেতেই হবে।"—বলেই খুব হা হা করে হাসতে লাগলেন। তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা মহারাজের ক্রীত আর একটী কুঞ্জ দেখতে চলে গেলাম।—

প্রেম-মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন করে—মহারাজ যে appreciationটা লিখে দিয়েছিলেন—সেটা প্রেম-মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দশ লক্ষ ছাপিয়ে বিলি করেছিলেন এবং সেটা ওদিকের প্রত্যেক কাগজে বের হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মঠ পরিদর্শন করে হাসপাতাল বিভাগে কয়েকটা Bed দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু সেটা আর কাজে ঘটেনি।

বৃন্দাবনের সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের সভাপতিত্বে এক পণ্ডিত সভায় তিনি "ভক্তি রত্নাকর" উপাধি পান। বৈষ্ণব দর্শন-শাস্ত্রের গবেষণার জন্য তিনি মাসিক সাহায্য এত দিন যে করে এসেছিলেন, তার বিশেষ ফল হয়েছে দেখলাম। কয়েকজন এ বিষয়ে গবেষণা করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন।

বৃন্দাবনে থাকা কালীন—"পুলিন কুঞ্জে" বহু লোকের সমাগম হ'ত। বাঙ্‌লার বাহিরে মহারাজ যে এত পরিচিত তা' পূর্ব্বে জানতাম না—সে কথা আরো জানলাম হরিদ্বার গিয়ে।

বৃন্দাবনে আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে খেতাম—মহারাজের বৈবাহিক স্বর্গীয় হেমেন্দ্র বাবু ও বন্ধু বিষ্ণু বাবুও প্রত্যহ ওখানে আমাদের সঙ্গে খেতেন। সবাই না বসলে মহারাজ খেতে বসতেন না। একদিন বিষ্ণু বাবু তাঁর কুঞ্জ থেকে আসতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরী করিলেন, মহারাজ সমান বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি আর হেমন্তদা বিরক্তিতে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি মনের ভাব

তরঙ্গময়ী গঙ্গা——হরিদ্বার

× চিহ্নিত স্থানে জলমগ্ন হইয়া মহারাজের প্রাণসংশয় হইয়াছিল।
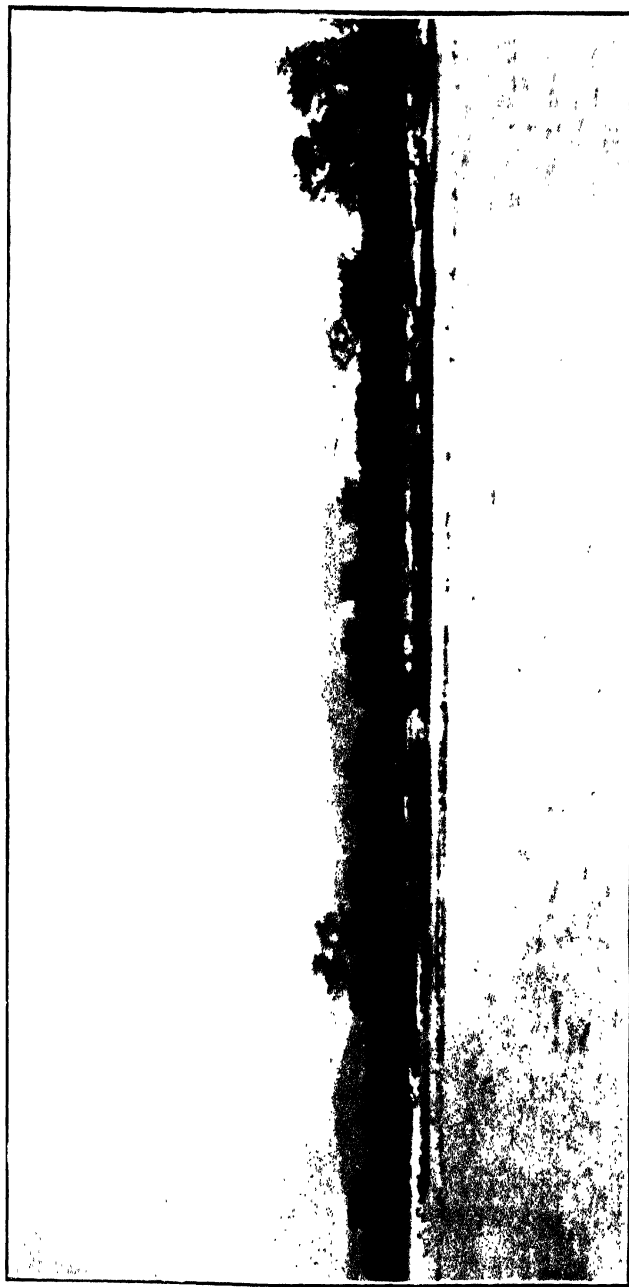
বুঝতে পেরে মহারাজ বল্‌লেন—"জীবনে অনেক কিছুর জন্য সহিষ্ণুতা শিক্ষা করতে হয়—কোনও একটা ঘটনা উপলক্ষ্য মাত্র।" আমি লক্ষ্য করেছি—মাঝে মাঝে তাঁর মুখ দিয়ে এমনিই একটা একটা গূঢ় কথা বের হ'ত।

আমাদের মনের এই বিরক্তি একদিন গভীর লজ্জায় আমাকে চিরদিনের জন্য শিক্ষা দিয়ে গেল। সেদিন স্নান করিতে নেমে দেরী হয়ে গেল। এসে দেখি সেই খাবার সাম্‌নে করে কাশিমবাজারের মহারাজ বসে আছেন। বিষ্ণু বাবু হেমেন্দ্র বাবুরও ক্ষমতা নাই—আগে খেতে বসেন। আমি গিয়ে আসনে বসতেই একটু মৃদু হেসে মহারাজ বললেন—"আচ্ছা, এবার বসা যাক"—আমার দিকে চেয়ে বললেন—"সাবিত্রী বুঝি খুব শীত-কাতুরে?"—আমি রাম গঙ্গা কিছু না বলে—ভাবতে লাগলাম—এমন করে চিরদিন এই মানুষের কাছে থেকেও যাদের মনুষ্যত্ব অর্জ্জন হয় না—তারা সত্যই দুর্ভাগ্য।

মহারাজকুমারের চিঠি প্রায় রোজই আসত—দু'এক দিন দেরী হলে মহারাজ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। বৃন্দাবনে পৌঁছে অবধি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে আমি কাজ করতাম এবং সেই ভাবেই আমাকে পরিচিত করা হ'ত। কোনও চিঠিতে সেক্রেটারী বলে নাম সই করতে ইতস্ততঃ করে যদি জিজ্ঞাসা করতাম—কি নামে চিঠিখানা যাবে?—মহারাজ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিতেন "Private Secretary to the Maharaja, Kasimbazar"—

আমার ফাউনটেন পেনটিতে তিনি প্রত্যহ নাম সই করতেন—আর বল্‌তেন—"তোমার কলমটি বেশ কিন্তু,—কত দাম?—আমার এ জীবনে আর ও সব হ'ল না।"—লজ্জিত হয়েছি বুঝতে পেরে বল্‌তেন—"তবে যে কাল পড়েছে তাতে দোয়াতে কলম ডোবাবার সময় কৈ?—ওতে কাজের সুবিধে অনেক।"

মহারাজকুমারের চিঠি এলে সেখানি আগে খুলে মহারাজকে দিতে হ'ত—সে চিঠি পেতে দেরী একদিন হলে—বল্‌তেন—"ব্যাপার কি বল দেখি, শ্রীশচন্দ্রের চিঠি কৈ?" আর একদিন এমনি দেরী হওয়াতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার কাছে কোনও চিঠি এসেছে?"—আমার কাছে সত্যই সেদিন শ্রীশচন্দ্রের চিঠি এসেছিল। (মহারাজের চিঠিখানি ডেলিভারীর গোলমালে বৈকালে আমরা পেয়েছিলাম) আমি মহা কুণ্ঠায় পড়লাম। আমার কথা কইবার আগেই বল্‌লেন—"সব ভাল আছে তো?" আমি বল্‌লাম 'হাঁ'।—পুত্রের প্রতি সেদিন

তাঁর যে স্নেহসিক্ত বিরক্তির ভাব এসেছিল তা উপভোগ করার জিনিষ—আমার লজ্জিত হ'বার কিছু তাতে ছিল না।

বৃন্দাবন থেকে বর্ষাণ প্রভৃতি স্থান ঘুরে এলাম। সেখানে ব্রাহ্মণদের লাড্ডু খাওয়ান হ'ল। এ নাকি মহারাজ গেলেই তাদের বরাদ্দ ছিল। তাদের খাওয়া দেখে মহারাজের কি আনন্দ। বর্ষাণ পাহাড়ে মহারাজ বিকানীরের একটী প্রাসাদ আছে, সেখানে উঠ্‌বার সময়—মহারাজের কষ্ট হচ্ছে বেশ বুঝতে পারলাম—এমন কি আমার যেন মনে হ'ল তাঁর Heart palpitation হচ্ছে—কিন্তু নিজের রোগের কথা তিনি কখনও প্রকাশ করতেন না—যত কষ্ট হচ্ছে ততই তিনি এক একবার দাঁড়িয়ে এটা ওই, ওটা সেই ইত্যাদি বলে দেবার ফাঁকে নিজেকে সাম্‌লে নিতে লাগ্‌লেন। Palpitation যে সেদিন হয়েছিল তা স্বীকার করেছিলেন আমার কাছে, দশ বার দিন পরে কি একটা কথাপ্রসঙ্গে।

মোটরে চড়ে বস্‌লে—মোটর দ্রুত না চল্‌লে মহারাজ বিরক্ত হতেন। বর্ষাণ থেকে ফেরবার পথে দ্রুতগামী মোটর বাসের সার্শী ভেঙ্গে মহারাজের মাথার ঠিক কাছ দিয়ে আমার পায়ের উপর পড়ে ভেঙ্গে গেল—আমি বল্‌লাম—"ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করেছেন" মহারাজ বল্‌লেন—"ভগবানই ত রক্ষা করেন"—তার পর সারা পথ তিনি একটা কি যেন বিশেষ চিন্তা করতে করতে পুলিনকুঞ্জে ফিরে এলেন। এই দুর্ঘটনার জন্য আমার মনটা ক্ষুণ্ণ হয়েই রইল।

তার পরের দিনই গিরিগোবর্দ্ধন যাওয়ার আয়োজন। ভোরে উঠেই দেখি যে, যে-পাণ্ডাঠাকুরের উপর মোটর ঠিক করার ভার ছিল—মাত্র চারি টাকার কিফায়েৎ দেখিয়ে মহারাজের নিকট বাহাদুরী নেবার লোভে যে বৃহৎ বাস্‌খানি তিনি এনেছেন—তাতে আমার মত দরিদ্রেরও চড়তে আশঙ্কা ও দ্বিধা হতে লাগল।

মহারাজ পাণ্ডাজীর কার্য্যতৎপরতার বহু তারিফ করে আগেই গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেন। আমি পাশেই বসলাম। মহারাজ আদেশ দিলেন—"খুব জোরসে চালাও—দশ বাজে হাম হুঁয়া পৌছানে মাংতা" শুনে ত আমার চক্ষু স্থির! মহারাজ বলেন কি? এই ত বাসখানার অবস্থা—তাতে যদি আবার জোরসে চলে তা হলে ত আর হাড় ক'খানা আস্ত থাক্‌বে না। আমি মহারাজাকে উদ্দেশ করে বল্‌লাম—শুনেছি এদিকের রাস্তা আগের চাইতে ঢের খারাপ হয়েছে—তার উপর বাসখানাও তেমন ভাল নয়—আস্তে আস্তে গেলেই ভাল হয়, কি আর এমন তাড়াতাড়ি?"

পরিশিষ্ট

মহারাজ বিরক্তিই হলেন—বল্‌লেন—"তুমি বড় Nervous! তাহলে মোটর না চড়ে গরুর গাড়ী চড়লেই হয়।" আর কোন কথা হ'ল না—চারিদিকের অসংখ্য রমণীয় দৃশ্য, ময়ূর আর হরিণের দল দেখে সব ভুলে গেলাম। কিন্তু পথের কষ্টে এমনই শরীর খারাপ হয়েছিল যে, গন্তব্য স্থানে পৌঁছে আর আমাকে উঠ্‌তে হল না। শয্যা নিলাম। বিদেশ—ভয়ও করতে লাগল। মহারাজ সাতপুকুরে স্নান করে পুণ্য অর্জ্জন করবেন বলে প্রস্তুত—আমাকে খোঁজ করতেই হেমন্তদা বল্‌লেন "সাবিত্রী নাইবে না—শরীরটা তার ভাল নয়।"

এখানে আমরা মহারাজের কুঞ্জেই এক বেলার জন্য ছিলাম। আহারান্তে আবার মোটরে ওঠা গেল। ফিরবার পথে—মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের সমাধি দেখবার ইচ্ছা আমার বহু পূর্ব্বেই ছিল। রাস্তায় এসে মোটর দাঁড়ালে মহারাজ বল্‌লেন—"তুমি বড় কুমারের সমাধি দেখতে যেতে পারবে?—অনেকখানি হাঁটতে হ'বে কিন্তু।" "পারব" বলেই উঠে দাঁড়ালাম।

দীর্ঘ বনপথ, পাথর আর কাঁকরে ভরা—বাস্ থেকে পথে নেমে অবধি মহারাজের মুখমণ্ডলের উপর শোকের গভীর ছায়া ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। মুখে বার বার হরিধ্বনি করতে লাগলেন। পথিমধ্যে লালাবাবুর সমাধির অবস্থা দেখ্‌লাম অতি শোচনীয়। একদিন অজস্র সম্পদ্ ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করে, যে মহাপুরুষ সন্ন্যাস নিয়ে বিলাস-আগার ছেড়ে, ভগবানকেই আশ্রয় করে সাধনার দুর্গম পথের চিরপথিক সেজে বেরিয়ে পড়েছিলেন—তাঁর শেষ সমাধির দুর্গতি দেখে মনে বাস্তবিকই দুঃখ হ'ল।—

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী ?"

মহিমচন্দ্রের সমাধির কাছে এসে মহারাজ যে ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাতে মনে হল, বৃদ্ধ পিতার বুকে এতদিনকার জমা করা শোকের তুহিনরাশি বুঝিবা আজ সহস্র ধারায় ফেটে গলে পড়ে। অদম্য হৃদয়ের বল,—মহারাজ বারকতক সমাধির দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে বল্‌লেন "চল, যাওয়া যাক্।" অলক্ষ্যে কখন যে আমার দু'চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা জল পড়েছে টেরও পাইনি। বড় কুমারকে দেখিনি—তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিও না; যা' কিছু শুনেছি শ্রীশচন্দ্রের কাছে। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম এ সমবেদনার উৎস কোথায়? কৈশোর কাল থেকে কাশিমবাজার রাজপরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—শ্রীশচন্দ্রের সাহচর্য্যে

সখ্যতায় নিজের মধ্যে এই লোকবিশ্রুত রাজ-পরিবারের প্রতি এমনি একটা আত্মীয়ের ভাব আমার মধ্যে পুষ্ট হয়ে এসেছে, যার জন্য মহিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রেরই দাদা বলে আজ তাঁর সমাধি দেখে সমবেদনায় আমার চোখেও জল!—হায়রে মানুষের মন!—এমনি করেই ত মানুষের সঙ্গে অতি অপরিচয়ের পথে প্রাণের সম্বন্ধ মধুর ও নিবিড় হয়ে ওঠে। চল্‌বার পথে এইটুকুই ত লাভ।

দু'চার দিন পরেই হরিদ্বার রওনা হওয়া গেল।—চারিদিকের যে প্রাকৃতিক শোভা তা' বর্ণনা করবার এখানে অবকাশ নাই।—মহারাজের মধ্যে এই নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল—প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে তৃপ্তিলাভ করবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, এ কথা যখনই তাঁকে গাড়ীর জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে বিস্ময়াপন্ন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌তে দেখেছি তখনই মনে হয়েছে। চোখের সে অনন্ত অন্বেষণের চাহনী, মুখের সে আনন্দ-উজ্জ্বল ভাব দেখে আমারও চোখে পলক পড়ত না। মহারাজ গান গাইতে পারতেন একথা কোথাও শুনিনি—কিন্তু তাঁর মৃদু মধুর গুঞ্জন শব্দে গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এই হরিদ্বারের পথে। এই আত্মভোলা মানুষটিকে দেখবার ও বুঝবার যে কত দিক আছে তাই ভেবে আমার শঙ্কা হয় যে—তাঁর জীবনী লেখবার গুরু দায়িত্ব শ্রীশচন্দ্র আমার উপর দিয়েছেন বটে কিন্তু—তার মর্য্যাদা বুঝি আমি রাখতে পারব না।

হরিদ্বারে নেমে দেখি—ষ্টেশনে সন্ন্যাসীর মেলা—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে সসম্মানে তাঁদের মঠে আগিয়ে নিতে এসেছেন। ওখানকার সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মধ্যে সব চাইতে যাঁদের স্থান উঁচুতে তাঁদেরই দলের বাঙ্গালী সন্ন্যাসী স্বামী ভৈরবানন্দ, পুরোভাগে বহু হাতী, ঘোড়া, আশা সোটা, সজ্জিত যান, বহুমূল্য রাজচ্ছত্র, স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ড ইত্যাদি নিয়ে। যে হাতীটা মহারাজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল, তার গায়ের অলঙ্কারের মূল্য ন্যূনকল্পে এক লক্ষ মুদ্রা! এইভাবে ত মহারাজকে সংবর্দ্ধনা করে সন্ন্যাসীরা নিয়ে গেলেন! দুই পাশে কল্লোলিত জন-সমুদ্র—সে কি জনতা, আমি জীবনে এমন দেখিনি—আর দেখবও না। সবাই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখছে কে এই সামান্য পরিচ্ছদধারী বাঙালী, যাকে সসম্মানে শোভাযাত্রা করে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে নিয়ে চলেছে কৌপীনবস্ত্র সন্ন্যাসীর দল? মনে হল —এদের সঙ্গে এই রাজ-সন্ন্যাসীটির নাড়ীর যোগ আছে। সাধারণ চরিত্র-

পরিশিষ্ট

ওজনের নিক্তিতে মহারাজের চরিত্র ওজন চল্‌তে পারে না। চারিদিকে মহারাজের বিপুল জয়ধ্বনি—মাঝে মাঝে মহারাজের দিকে চেয়ে দেখছিলাম আর গর্ব্বে আনন্দে, সারা বুকটা ভরে উঠছিল—এই ভেবে যে, ইনি আমাদেরই মহারাজ, আমাদেরই একান্ত আপনার জন, পরমাত্মীয় ইনি বাঙ্গালী।

মহারাজের বন্ধু, ষ্টেট কাউন্সিলের একজন হিন্দুস্থানী ধনকুবেরের বাঙ্গলো খানি ভীমগোদায়, ঠিক গঙ্গার উপরই অবস্থিত। সেইখানেই আমাদের থাকবার জায়গা হয়েছিল। অতি মনোরম স্থান! একটি কামিনীগাছ তলায় বেদীর উপর বসেই মহা আরামে মহারাজ বল্‌লেন—"আঃ বাঁচা গেল। হরিদ্বারে একখানা ছোট বাড়ী কিনতে হবে।" সে আশা তাঁর পূর্ণ হ'ল না। দেখেছি—বৃন্দাবনের চাইতেও তিনি হরিদ্বার বেশী পছন্দ করতেন।

আমরা হরিদ্বারে কয়েক ঘণ্টা থাকার পরই যেভাবে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে লাগল, তাতে মনে হ'ল মহারাজরে আগমনবার্ত্তা ইতিমধ্যেই চারিদিকে রটে গেছে। সেই বিপুল জনসমাগম—কে কাকে চেনে, কিন্তু কাশিমবাজারের দানবীরকে দেখবার জন্য প্রত্যহ বিভিন্ন দেশবাসী নরনারীর যে প্রকার সমাগম হ'ত তা'তে মনে হয়েছে যে, তাঁর সৎকার্য্যে দান দেশবিদেশে শ্রুতকীর্ত্তির মত অমর হয়েই থাকবে।

মহারাজের উপর সব চেয়ে ভক্তি বেশী দেখতাম পাঞ্জাবীদের। তাঁকে তারা বলত 'দেবতা'। মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তারা দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে থাকত—মহারাজ কেবলি বলতেন—"আপনারা উপরে উঠে আসুন।" তারা বিনয়ের সঙ্গে প্রতিবাদ করে রাজদর্শন করে চলে যেত।

কুম্ভমেলার ঠিক আগের দিন মহারাজ বললেন,—"চল সাবিত্রী, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে' কাল মিছিল দেখতে হবে, একটা বাড়ীর ছাদ ভাড়া করে আসি।" সঙ্গে চললাম, ব্রহ্মকুণ্ডের চৌমাথা রাস্তার উপর একখানা বাড়ীর ছাদ ভাড়া করার জন্য উঠা গেল। উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আছি—হঠাৎ দেখলাম একজন শিখ-যুবক যাকে বলে 'শালপ্রাংশু মহাভুজ,' হঠাৎ জনসমুদ্রের আবর্ত্তে পড়ে গেল। তখন চারিদিক থেকে যাত্রীর দল ব্রহ্মকুণ্ডের পথে আসছে, তাদের পায়ের তলায় শিখযুবক ভবলীলা সাঙ্গ করে হয়ত বা কুম্ভমেলার অক্ষয় পুণ্য বিনা স্নানেই অর্জ্জন করে স্বর্গস্থ হ'ল কিন্তু এ দৃশ্য দেখে কাল কুম্ভমেলা দেখার বিন্দুমাত্র উৎসাহ অন্ততঃ আমার ত রইল না;—শরীর মন যেন অবসাদ ও উদ্বেগে ভরে উঠল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মহারাজকে সম্বোধন করে বল্‌লাম "মহারাজ, এর পরেও কি আপনি কাল মিছিল দেখতে আসবেন মনে করছেন?" বিষণ্ণ ভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মহারাজ উত্তর দিলেন—"দেখা যাক, কি হয়।"—ছাদ ভাড়া হ'য়ে গেল। সাম্‌নের একটা ছাদে দেখ্‌লাম বন্ধুবর, সদাহাস্যময় উমাপ্রসাদ (স্যর আশুতোষের পুত্র) তাঁর বাড়ীর সকলকে নিয়ে ছাদ ঠিক করতে ব্যস্ত—অল্প কথাবার্ত্তা হ'ল—উমাপ্রসাদ মহারাজকে অভিবাদন করলে—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"স্যর আশুতোষের ছেলে নয়?" আমি বল্‌লাম—'আপনি চেনেন?' "হাঁ আমি ওঁদের সকলকেই চিনি।" বলেই স্যর আশুতোষের বহু গুণের কথা তিনি বলে যেতে লাগলেন। আমি কখনও কোনও লোকের নিন্দাবাদ তাঁর মুখে শুনিনি; যার গুণব্যাখ্যান করার অবকাশ আছে তাঁর গুণ তিনি পঞ্চমুখে গাইতেন কিন্তু যেখানে সে অবকাশ নেই, সেখানে নিন্দা করার দুর্ব্বলতাকেও তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না।

বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে বাসায় ফিরতে আমাদের বেলা ১টা বাজল। ঐদিন সমস্তক্ষণ মহারাজকে বিষণ্ণ দেখলাম, কে জানে তীর্থযাত্রী শিখযুবকের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর প্রাণে ব্যথার সঞ্চার করেছিল কি না।

কুম্ভমেলার দিন। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে চোখ মেলে দেখি কোমরে গাম্‌ছা বাঁধা, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র। "কিহে তুমি যাবে না"?—আমি বল্‌লাম—"কালকের দুর্ঘটনা দেখে আমার মনটা ভাল নেই—আমি আর ভীড়ে যাব না"—মহারাজ একটু হাস্‌লেন মাত্র—কোনও উত্তর দিলেন না—মনে মনে একটু লজ্জাও পেলাম;—এই ৬৮বৎসরের বৃদ্ধ যেখানে হাসিমুখে যেতে প্রস্তুত, সেখানে আমি যুবক হ'য়ে উৎসাহহীন কেন? কিন্তু ভীড় আমার বরদাস্ত হয় না। বাহিরে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াই আর শুনি—অমুক জায়গায় একজন পড়ে মারা গেছে—অমুকের মায়ের দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে—একজন যুবকের Heart fail করেছে—শুন্‌ছিলাম আর মহারাজ সম্বন্ধে একটা অজানিত আশঙ্কায় মনটা অস্থির হয়ে উঠছিল। মাঝখানে একবার হেমন্ত দা এসে খবর দিলেন—মহারাজ অন্নপূর্ণাদের নিয়ে (মহিমচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, জামাতা অমর বাবু ও তাঁহার পিতা মুরলি বাবু ও পরিবারস্থ দু' এক জন হরিদ্বারে মহারাজের অতিথি হ'য়েছিলেন।) যাচ্ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে একটা বিপুল জনস্রোত এল; কোথায় বা চোপদার আর কোথায় বা সিপাহী!—ভীড়ের মধ্যে কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বেলা

পরিশিষ্ট

৪টা—আমাদের কি যে মনের অবস্থা তা প্রকাশ করবার নয়। পল গুণ্‌তে লাগলাম। প্রায় দু' ঘণ্টা পরে খবর আস্‌ল—মহারাজ গঙ্গার পরপার দিয়ে আস্‌ছেন। আমি জটিলা ও বেণী গঙ্গাগর্ভে নেমে গেলাম—ওখানকার গঙ্গার জল আড়াই কি তিন হাত মাত্র গভীর। বেণী ও জটিলা পার হয়ে মহারাজের নিকট গেল। মহারাজের হাতে ছিল একটা ছাতি—সেটা আবার খোলা ছিল—ঘণ্টায় ২৫।৩০ মাইল যার বেগ সেই স্রোতের মধ্যে দিয়ে তিনি হেঁটে আস্‌ছিলেন—পাশে বেণী ও জটিলা আমি এ পারে জলে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মহারাজের পা হড়কে গলা পর্য্যন্ত জল, ছাতার মধ্যে জল ঢুকে মহারাজের দেহকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আর কি!—খুব ক্ষিপ্রহস্তে জটিলা মহারাজকে ধরে ফেল্‌লে।—আকস্মিক বিপদ থেকে মহারাজ রক্ষা পেলেন। ধরাধরি ক'রে বাসায় আনা হল—গরম জলে পা ধুইয়ে তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌লো। সুস্থ হয়ে বার বার ভগবানের নাম করতে লাগলেন, আমরা চারিপাশে দাঁড়িয়ে। রাত্রে তাঁর সামান্য জ্বর হ'ল কিন্তু সে কথা কাউকে জান্‌তে দিলেন না—পরদিন রাত্রে হৃষীকেশ ও লছমনঝোলা যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। হৃষীকেশ থেকে গঙ্গা পার হ'য়ে হাঁটতে হ'ল প্রায় দেড় মাইল, মহারাজ সেই শরীর নিয়ে সমানে হেঁটে চল্‌লেন। লছমনঝোলা দেখা ও সেখানে স্নান করার পর হরিদ্বারের উপকণ্ঠে এসে যখন পৌছান গেল তখন বেলা ২টা! একজন এসে খবর দিল—শিখ মটর ড্রাইভারদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের দাঙ্গা হয়ে গেছে, খুনও নাকি হয়েছে; সেই জন্য মটর আর এগুতে দিচ্ছে না—এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে। আবার হাঁটা সুরু হ'ল—সেও প্রায় দু' মাইল রাস্তা। নিজের পা আর যেন চলছিল না—মনে মনে ভাবছিলাম—মহারাজের কি কষ্ট হয় না?

—সেইদিন রাত্রি থেকে মহারাজের খুব জ্বর হল।—পরদিন মহারাজকুমারকে টেলীগ্রাম করতে চাইলাম—কিছুতেই তা' মহারাজ করতে দিলেন না। বললেন "শুধু তাদের ব্যস্ত করা হ'বে—ক্লান্তিতে জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে।" কিন্তু জ্বর সার্‌ল না ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো।—দেরাদুন, মশুরি যাওয়ার কথা ছিল তা' আর হ'ল না।—এই বিপদের মধ্যে প্রহ্লাদ চাকরের হল কলেরা। গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহারাজকে দেখছিলেন। তিনি প্রহ্লাদকে হাস্‌পাতালে পাঠাতে চাইলেন—মহারাজ কিছুতেই তাতে মত দিলেন না। অবশেষে মহারাজ যখন জ্বরে প্রায় অচৈতন্য—সেই সুযোগ নিয়ে প্রহ্লাদকে হাসপাতালে পাঠান হল;—জ্ঞান হতেই

তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন—ধীরে ধীরে সব কথা বুঝিয়ে বলে—ডাক্তার বাবুর উপরই বেশীর ভাগ দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

প্রায় তিন দিন এইভাবে কাটল।—কি যে মনের উদ্বেগ, কি যে আশঙ্কা, কি যে মনের উৎকণ্ঠার মধ্যে ক'টা দিন কাটাতে হয়েছিল সে কথা আজ ভাবলেও বুক কেঁপে উঠে। মাঝে মাঝে বহুক্ষণ ধরে মহারাজের কাছে বসে থাকতাম—ঘুমুচ্ছেন দেখলে—পাশের ঘরে এসে আমি আর হেমন্তদা মুখোমুখী হয়ে চুপটি করে বসে থাকতাম। কারো মুখে কথা নাই—বেণী সব সময়েই প্রায় আমোদে কাটাত, জটিলার সঙ্গে খুনসুড়ি করত, সেও বিমর্ষভাবে আছে—চাকর বাকর সবাই যেন কেমন একটা অভিভূত অবস্থায় চলাফেরা করছে। তখনও হরিদ্বারে ভীড় যথেষ্ট—পুণ্য সঞ্চয় করে অগণিত পথযাত্রী কেবল গৃহ-সংসারে ফিরতে আরম্ভ করেছে মাত্র—পথে কোলাহলের অন্ত নেই—কিন্তু তারই মধ্যে অবস্থিত আমাদের বাঙ্গলো খানার উপর কে যেন নিস্তব্ধতার যবনিকা টেনে দিয়েছে। তেমনি সেদিন অনুভব করেছিলাম—মহারাজের মহাপ্রস্থানের রাত্রিতে। সারকুলার রোডের সমস্ত বাড়ী-খানা যেন কোন মায়াবিনী নিষ্ঠুরা রাক্ষসী তার বিস্তৃত ডানা দিয়ে অন্ধকার করে রেখেছিল—কথা কইবার প্রবৃত্তি নাই—সে শক্তিও যেন সেদিন ছিল না—ধীরে অতি ধীরে তার যবনিকাজাল গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হ'তে লাগল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের শঙ্কাকুল ক্ষণগুলি যেন আসন্ন বিপদের নিশ্চয়তা জেনে ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে আসছিল; সে যে কি প্রচণ্ড মানসিক যুদ্ধ তা বলে বুঝান যায় না।—সেদিন মহারাজের আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করতে করতে কেবল এই কথাই মনে হচ্ছিল —অন্যের মৃত্যু প্রতীক্ষা করে' যারা জীবন থাকতেও মৃতপ্রায় হয়ে থাকে তাদের যন্ত্রণা বুঝি মৃত্যু যন্ত্রণার চাইতে কম নয়। সেদিন হরিদ্বারে রোগশয্যায় শায়িত মহারাজের কথা বার বার মনে হচ্ছিল—কিন্তু সে দুর্দ্দিনও ত কেটে গিয়েছিল—।

তিন দিন পর একটু সুস্থ হয়েই আমাকে বললেন "শ্রীশচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করে দাও, বাড়ী যাচ্ছি।" বলাবাহুল্য তাঁকে লুকিয়েই তাঁর অসুস্থ সংবাদ আমরা মহারাজকুমারকে আগেই দিয়েছিলাম।

গাড়ী রিসার্ভ করতে গিয়ে দেখি মহাবিভ্রাট। **In order of application —Reserved** গাড়ীর তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুসারে গাড়ী পেতে হ'লে এখনও সাত দিন এখানে পড়ে থাকতে হবে। আর অসুস্থ মহারাজকেই

বা বল্‌ব কি ফিরে গিয়ে। আমি আর হেমন্তদা ছুটাছুটি করতে লাগলাম। প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কাছে সেদিন যতগুলি বিভিন্ন বক্তৃতা আমায় দিতে হয়েছিল—তা'তে বক্তা হবার পক্ষে আমি বেশ আশান্বিত হয়ে পড়েছিলাম।—যাক Special officerএর কাছে গিয়ে শেষ বক্তৃতায় কাজ হ'ল। আমি দৃঢ়ভাবে তাঁকে বল্লাম—

"Then you run the risk of Maharaja's life. You speak so much of him but you cannot utilise your privileged position to help the sick Maharaja at this critical time"—"Run the risk of Maharaja's life? What do you mean?" "I mean what I say."—হেমন্তদা আমার গা টিপছেন। আমি সত্যই তখন রাগে দুঃখে প্রায় কাঁপছি। যাক, রাগে ও রূঢ় কথায় কাজ হ'ল—গাড়ী সেইদিনই বৈকালের দেরাদুন এক্সপ্রেসে 'রিজার্ভ' হয়ে গেল।—একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

মহারাজকে দুধ সাগু খাইয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে মন যেমন আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল, শরীরটা তেমনি যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দীর্ঘ ট্রেণযাত্রার মধ্যে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল —তার কথা আমি কখনও ভুলব না।—কিন্তু সে কথার উল্লেখও আমি আজকে করতে চাই না। বহু অকৃতজ্ঞের অপরাধ, বহু স্বার্থপরের অপকর্ম্মকে তিনি সর্ব্বদা ক্ষমার চক্ষে দেখে গেছেন। তাঁর গত জীবনের সকল পুণ্য কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয়ে আজও কি আমরা আমাদের সৎকর্ম্মের দ্বারা তাঁর ঋণ কিছু পরিমাণে পরিশোধ করবার চেষ্টা করব না?

"Surely the public, for whom 'he' has done so much, will repay in part the great debt of obligation which they owe the champion of their liberties and virtues; or are they dead, cold, stone-hearted and insensible—brutalised by centuries of unremitting bondage?"

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

যাজ্ঞিক

মানুষ একটা গেল—সে মানুষ মানুষের মত,
করুণার প্রতিমূর্ত্তি, অভিমান-শূন্য দানব্রত।
ঘোর অসংযম মাঝে কঠোর সংযমী তাঁরে জানি,
চটুল চড়ুই দলে গরুড় সে অমৃত-সন্ধানী!

সে ছিল যে বনস্পতি—অভ্রভেদী সুবিশালকায়,
সিংহেরে দিয়েছে ছায়া—চঞ্চু বিঁধে কাঠ্ঠোকরায়।
গেয়েছে পাপিয়া শাখে, ঝুলিয়াছে অলস বাদুড়,
কুঠারের শত দাগ সহ শোভে চন্দন সিঁদুর।

কোবিদ প্রেমিক ভক্ত, ভাবের একান্ত অনুরাগী,
সকল কর্ম্মের মাঝে প্রাণ-ধর্ম্ম রহিত যে জাগি'।
বিনয়ী যে অকৃত্রিম, আতিথেয়ে সদা মুক্ত গেহ,
কস্তুরীর অধিকারী রাজমৃগ সুবর্ণের দেহ।

ভেরীর নিনাদ নাই, বাণী তার ছাপেনি দৈনিকে
হিন্দু মুসলমান ছিল চিরদিন সম তাঁর দিকে।
'অহিংস মন্ত্রের' আগে অহিংসার শান্ত উপাসক
'স্বদেশী' সাধনা তাঁর, অন্যের তা হতে পারে সখ।

নামের আকাঙ্ক্ষী তিনি—বলিবে যে নহে মিথ্যাবাদী,
সে নাম যে হরিনাম—তৃপ্তি তাঁর সে নাম আস্বাদি',
প্রাণ তাঁর মহাপ্রাণ, দান তার সঙ্গের দোসর,
উপরে আদর্শ গৃহী! গৈরিকেতে ছোপানো অন্তর।

খেয়ালী বলিবে তাঁরে? বল' তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
খেয়ালীর দেয়ালীতে আজি বঙ্গ সমুজ্জ্বল ভাই!
একান্ত নিকটে পেয়ে দেশ তারে চিনে নাই ঠিক,
বিশ্বজিৎ মহাযজ্ঞে উগ্রতপা সে ছিল যাজ্ঞিক।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্মৃতি-তর্পণ

আজ বহরমপুর (কাশিমবাজার) তাহার মণি-মুকুট হারাইয়াছে। তাহার গর্ব্বের শোভার সম্পদের বলিতে আজ আর কিছুই নাই। যে গৌরবে সে বাংলার শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ সে, সে গৌরবহারা, ধূলায় লুণ্ঠিত। দানে ভারতের অগ্রগণ্য, দেশের সকল শুভ কার্য্যে, সর্ব্ব বৃহত্তর কর্ম্মে সর্ব্বাগ্রগামী, বিদ্যানুরাগী বিক্রমাদিত্য কাশিমবাজারের মহারাজের জন্য সমস্ত বাংলা কাঁদিতেছে, কিন্তু বহরমপুরই জানে আজ তাহার কি গিয়াছে।

এই কাশিমবাজার রাজবাড়ীর সঙ্গে বোধ হয় দেশের বহু ব্যক্তিরই শৈশব-স্মৃতি পর্য্যন্ত জড়িত। যখন ৺মহারাজের মাতুলানী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ৺স্বর্ণময়ীর আমল তখনো এই রাজবাড়ী দেশের দুঃস্থ দরিদ্র অভাবগ্রস্ত হইতে দেশের গৃহস্থ সম্ভ্রান্ত সকল লোকের সহিতই নানা সম্বন্ধে জড়িত ছিল। বহুদূর দূরান্ত হইতে মাতৃপিতৃ কন্যাদায়গ্রস্ত, গৃহহীন দীন দরিদ্র বিদ্যার্থী অপার উৎফুল্ল মুখে চলিতেছে! কোথায় যাইতেছ? কাশিমবাজার রাজবাড়ী! সেখানে গেলেই তাহার অভাব মোচন হইবে, দুঃখ দূর হইবে। এই শীতকালে দীন দরিদ্রেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে কাশিমবাজারাভিমুখে ছুটিতেছে, মহারাণী এই শীতে হাজার হাজার কম্বল বিতরণ করিতেছেন। দুর্ভিক্ষের দিনে ক্ষুধার্ত্ত সেইখানেই অন্নপান পাইবে ইহা নিশ্চয় জানিত। জাতির নানা পর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় বহুদূর দূরান্তবাসী বহরমপুরের লোকের সঙ্গে কোথায় মিলিত হইত? কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে। দেশের বালকেরা সাধ্যানুরূপ বেশে সজ্জিত হইয়া আনন্দ কোলাহল করিতেছে। তাহারা পূজায় ঝুলনে রাসে রাজবাড়ী যাইবে। ৺মহারাণীর ভগিনী-পুত্র রায় বাহাদুর ৺শ্রীনাথ পাল যখন তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন তখন পূজায় প্রায় প্রতি গৃহস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে প্রসাদের নানা ভোজ্য প্রেরিত হইত! রাজবাড়ীর সে প্রসাদ আসাও বালক বালিকাদের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ছিল। তখন দেশের লোকের আকাঙ্ক্ষিত আদরের "মণি বাবু" কদাচিৎ বহরমপুরে আসিতেন। ৺পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিমন্ত্রণে ৺শ্রীনাথ পালের সঙ্গে তাঁহার নিমন্ত্রণে আগমনের কথা স্বপ্নের মতই মনে পড়ে। সেই বেশে সেই ভাবে তিনি মহারাজ হইয়াও সকলের বাড়ীতে চিরদিন গিয়াছেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বর্গগতা হইলেও দেশের লোকের সে কি উদ্বেগ! তখনো রাজা ৺কৃষ্ণনাথের মাতা নবতিবর্ষীয়া রাণী হরসুন্দরী জীবিতা, আইন মতে সম্পত্তি তাঁহাতে অর্শিতেছে! যদি তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সের বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে নিজেই অধিকার চান তাহা হইলে এষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাইবে। আমরা তখন হুগলীতে, পিতাঠাকুর মহাশয়ের সে সময়ের উদ্বেগ এবং অনবরত টেলিগ্রামের আদান প্রদানের কথা এখনো মনে পড়ে। তখনো ত মহারাজ আজিকার দানবীর কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীর বিদ্যোৎসাহী বিক্রমাদিত্য মূর্ত্তিতে দেশের সমক্ষে উদিত হন নাই, তথাপি সকলে সেই প্রিয়দর্শন বিনয়শীল মধুরভাষী মণিবাবুকে এতই ভালবাসিত!

অস্পষ্টভাবেই মনে পড়ে, আমাদের বাহিরের ঘরের বারান্দায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই সাদা থান ধুতী সাদা পাঞ্জাবী ও একখানি মোড়া দেওয়া চাদর কণ্ঠে, হস্তে একগাছি ছড়ি, সেই মণি বাবু বেশেই বসিয়া ৺পিতাঠাকুরের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন। বলিতেছেন, "৺মহারাণী যেমন দান করিয়া গিয়াছেন দেশের লোকের কাছে তাঁহার যেমন নাম, আমার ভয় হইতেছে তাঁহার সে নাম আমি রক্ষা করিতে পারিব কিনা!"

হায় নরশ্রেষ্ঠ! হায় মহানুভব দানবীর! আজ সে নাম যে তুমি কতখানি উজ্জ্বলতর করিয়াছ তাহা বাঙ্গলা দেশই জানে। আজ আর মাত্র সে দান নিজ জেলাতেই আবদ্ধ নাই, এক রূপে নাই, নানা বিষয়ে নানা রূপে আজ তাহা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বহরমপুরের সঙ্গে সম্বন্ধ যে তোমার মাত্র দানে নয়, মহৎ কর্ম্মে নয়! তাহার সঙ্গে যোগ যে হৃদয়ে মর্ম্মে, অস্থি-মজ্জায়! বহরমপুরের কোন্ কাজ মহারাজ! তুমি উপস্থিত না থাকিলে সম্পাদিত হইত? এমন কি বিবাহ উৎসবেও গৃহে গৃহে তুমি নিমন্ত্রিত হইতে এবং সাদরে উপহার পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিতে। দীন দরিদ্রের কুটীরেও যে তুমি পাতা পাতিয়া আহার করিয়াছ, তোমার মধুরালাপে দেশবাসী যে চির মুগ্ধ! রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে দেশবাসী তোমার নিকটে একাসনে বসিয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। সে মূর্ত্তি বহরমপুর আজ কি করিয়া ভুলিবে? এ বজ্রাঘাত সে কিরূপে যে সহ্য করিতেছে সেই জানে।

মহারাজের সম্বন্ধে আজ সারা বাংলা অনেক কথাই কহিবে; তাঁর গুণগান আজ তাঁর শোকাতুর আত্মীয়গণের সঙ্গে একযোগে নিঃশব্দে বহরমপুরের শুনিবারই

কথা, বেশী বলার তার সাধ্য কই! তবু একটী কথা আজ কেবলই মনে পড়িতেছে। তীর্থস্থানে তাঁহার পুণ্য মূর্ত্তি ও সৎকার্য্যের বিষয় অনেকেই বলেন কিন্তু যে বারের তীর্থযাত্রায় তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রকে চিরদিনের জন্য বৃন্দাবনে রাখিয়া আসেন সেই সালে তাঁহার প্রথম তীর্থ যাত্রার কাহিনী সেই যাত্রার এক অনুযাত্রিণীর মুখে যাহা বহুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম তাহারই মধ্যের একটি কথা আজ স্মরণ হইতেছে। অমর কবি ৺মধুসূদন লিখিয়া গিয়াছেন "রাজেন্দ্র সঙ্গমে, দীন যথা যায় দুর তীর্থ দরশনে" তাঁহার এই কথা মহারাজের সেই তীর্থ যাত্রায় যেরূপ মূর্ত্তিমান্ হইয়াছিল এমন আর কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই রাজেন্দ্র-সঙ্গমে তাঁহার আশ্রিত প্রতিপালিত এবং কর্ম্মচারিবৃন্দের মাতা ভগিনী স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ যে কেহ তীর্থে যাইতে চাহিয়াছিলেন তিনিই সাদরে আহূত হইয়াছিলেন। কাশীতে বৃন্দাবনে যাঁহারা সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শিনী ছিলেন তাঁহাদের মুখের সে-সব গল্প যেন এক পুণ্যকাহিনীরই মত, একালে যাহা একেবারেই অসম্ভব। তাহারই মধ্যে সেই পুণ্যশ্লোকের অন্তরে প্রচণ্ড শেলাঘাত, সে কি হৃদয়দ্রাবী ঘটনা!

সেইদিনে যে সময়ে মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র নন্দী গোবর্দ্ধনে বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারই মধ্যে দশমী একাদশী তিথি গত হইয়াছে। দ্বাদশীর প্রাতে মহারাজের কর্ম্মচারীরা সঙ্গের যাত্রিণী বিধবাদের জন্য ফল মূল মিষ্টান্নাদি আনিয়া তাঁহাদের স্নানাদি করিতে অনুরোধ করিতেছেন কিন্তু অনুযাত্রীরাও সেই মহাশোকের অনুভাবে জড়প্রায় স্তব্ধমূর্ত্তি, কেহই নড়িতে চাহিতেছেন না। তখন মহারাজ স্বয়ং তাঁহাদের নিকটে গিয়া জোড়হস্তে বলিলেন "মা, আপনারা আজ বোধ হয় তিনদিন উপবাসিনী, কেননা আমি ত দশমীতেও আপনাদের তেমন খোঁজ লইতে পারি নাই। আমার সর্ব্বনাশের সঙ্গে এও এক সর্ব্বনাশ যোগ হইল দেখিতেছি। আমার দুঃখে আপনারাও জ্ঞানহারা হইয়াছেন, কিন্তু কুমারের আত্মারও যে ইহাতে অমঙ্গল হইবে মা? আপনারা উঠুন, স্নানাহ্নিক করিয়া জল মুখে দেন তবে আমি এখান হইতে যাইব।" সেই মহাশোকের মধ্যেও এই মহানুভবতা সহৃদয়তার এই অমানুষিক শক্তির প্রকাশে সহযাত্রিণীগণ অশ্রু মুছিতে মুছিতে তাঁহার ইচ্ছা পালনে অগ্রসর হইল।

হায় রাজরাজেন্দ্র! বাহিরে তুমি মহারাজ কিন্তু বহু লোকের হৃদয়ের যে রাজাধিরাজ ছিলে। আশ্রিত-বৎসল! তুমি যে শতদোষীকেও ক্ষমা করিয়াছ

কখনো তোমার আশ্রয়চ্যুত কর নাই। অতিরিক্ত হৃদয়বত্তার জন্য তুমি যে নিজের কত ক্ষতি করিয়াছ তাহা দেশবাসী আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করুক। তোমার শ্রাদ্ধ-তিথিতে আজ তাহারা তাহাদের কোন্ বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট শ্রদ্ধা তোমায় নিবেদন করিবে? এ শ্রদ্ধার কি পার আছে? তোমার বিয়োগে যে আজ ঐ মধু শব্দ তাহাদের কর্ণে বিপরীত বস্তু বর্ষণ করিবে। আজ কি বলিয়া তাহারা তোমার স্মৃতির তর্পণ করিবে?

আদর্শ বৈষ্ণবরাজ! আজ তুমি মৃত্যুতেও তোমার মহামানবতার, তোমার বৈষ্ণবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ কর এর চেয়ে আমাদের বলিবার আজ কিছু নাই।

বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হলে তাঁহার যে স্মৃতি-সভা হইয়াছিল তাহাতে ডাক্তার শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র ৺মহারাজের জীবনের সর্ব্বশেষে আরব্ধ শুভকর্ম্ম বহরমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া দেশবাসীকে তাঁহার কর্ম্মের সফলতা সম্পাদন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। দেশবাসীও ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দীর পক্ষেও ইহা তাঁহার পিতৃকৃত্য সম্পাদনের এক অঙ্গ বলিয়াই আমরা মনে করি, কেননা তাঁহার পিতা যে কিরূপ শিক্ষানুরাগী ছিলেন বর্ত্তমান বহরমপুর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের বিপুল অনুষ্ঠান, এ ছাড়া বাংলার প্রায় সর্ব্ববিদ্যাপীঠের সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি ও আনুকূল্যেই তাহার প্রমাণ! সম্পন্ন দেশবাসীদের এবং কুমারের দিকে মহারাজের এই অসম্পূর্ণ কার্য্য নব বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের সাফল্যের আশায় বহরমপুরের জনসাধারণ চাহিয়া রহিল।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

মহাত্মা মণীন্দ্রচন্দ্র

দাতা আম্‌রা ঢের দেখেছি, নাম-চাহেনা-এমন দাতা কই ?
দুএক হাজার দান করে' হায়, সাংবাদিকের শরণ নিয়ে যারা,
নিজেই নিজের ঢাক পিটিয়ে নাম ফাটিয়ে বেজায় আত্মহারা !
বল্‌ছি খাঁটি, আমরা এমন ঘোর তামসিক দাতার সেবক নই !

হায় ভগবান্, আমরা তবু নকল দাতার কাছে নাকাল হই !
ফাল্‌তু দাতা দান করে ঠিক, কিন্তু তাদের উল্টো দানের ধারা ;
স্বজন তাদের পায় না খেতে, চাইলে কাঙাল খায় কি ভীষণ তাড়া !
তাদের দেশে সাত্ত্বিকী দান কর্‌লো কে আর এই মণীন্দ্র বই ?

দানের মতো দান করেছে এই দানবীর হাজার হাজার টাকা !
দেশের দশের মহৎ কাজে ছড়িয়ে গেছে সকল অনুষ্ঠানে !
তাঁহার কাছে সবাই সমান, মুখের কথায় কি করুণা-মাখা !
সবাই তাঁহার দরশ পেতো, পরশ পেতো অন্তরের মাঝখানে !—

চ-বৈ-তু-হির মতন তুমি রওনি ভবে নামেই মহারাজ !
মৃত্যু অন্তে, কীর্ত্তিমন্ত, শান্তিধামে বিরাজ করো আজ !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

"এক মহাপুরুষ বিপক্ষ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াও বলিয়াছিলেন—Strike but hear—প্রহার কর তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ কর। আমারও সেই উক্তি। আমি স্তুতিতে কখনও আত্মবিস্মৃত হই নাই, নিন্দাতেও বিচলিত হইয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইব না। আমার করজোড়ে প্রার্থনা—সাহিত্যকে বিজাতীয় আদর্শে পঙ্কিল করিয়া তুলিও না।"

মণীন্দ্রচন্দ্র—১৩২৪, বৈশাখ।

বিশ্ব-সুহৃদ্ মণীন্দ্রচন্দ্র

মহাপুরুষগণের জীবনই ভগবদ্‌বাক্যের বা শাস্ত্রবাক্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে তিনিই জগতের—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

ভগবানের যিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত তাঁহার জীবনেও এই সকল ভগবদ্‌গুণের ছায়াপাত হইয়াই থাকে। হতভাগ্য বাঙ্গালার অদৃষ্টে গত ২৫শে কার্ত্তিক তারিখে যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছে তাহাতে একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, আমরা মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুতে একজন যথার্থ 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' হারাইয়াছি। মণীন্দ্রচন্দ্র যে বহু লোকের নিবাসঃ অর্থাৎ 'ভোগস্থান' ছিলেন সেটা কিছু বড় কথা নয়, কারণ তিনি ভগবৎকৃপায় বিশাল কাশিমবাজার এষ্টেটের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কি আর্ত্ত কি অর্থার্থী সকলেরই যে তিনি শরণং অর্থাৎ 'রক্ষক' এবং বিশেষভাবে সুহৃদ্-শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইহাই আশ্চর্য্য! এই দেওয়া নেওয়ার সংসারে এই বেচাকেনার হাটে 'প্রত্যুপকার-অনপেক্ষ উপকারী' হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কথা। যথার্থ সুহৃদ হইতে ইচ্ছা করিলেও সংসার তাহা হইতে দেয় না যে। কারণ,—

"উপকার যেন মধুর পাত্র!
হজম করতে জ্বলে যে গাত্র;
তাই সাথে চাই ঝালের চাটনি—
নিন্দে বান্দা কান্না কাটনি।"

(রবীন্দ্রনাথ)।

এই 'ঝালের চাটনির' জ্বালায় অনেক উপকারীকেই শেষ পর্য্যন্ত সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু এই চাঁদের আলো ত' ধূলা উড়াইয়া আচ্ছাদিত রাখা যায় না; সে যে আপনাকে বিলাইতেই দেখা দিয়াছে। আমাদের মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রত্যুপকারানপেক্ষ দয়ার জ্যোৎস্না কখনো কোনো বাধাকে স্বীকার করে নাই। সে আপনার আনন্দের প্রেরণায় দিকে দিকে স্থানে অস্থানে আপনাকে ছড়াইয়াছে। বরঞ্চ বাধা পাইলেই যেন শারদ রাত্রির খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণ মেঘে লাগিয়া আরও মধুরতর উজ্জ্বলতর হইয়াছে। এবং ইহাই আশ্চর্য্য যে-সকল বাধা অনেক মহাপুরুষকে শেষ

বয়সে কতকটা রুক্ষ স্বভাব মানবদ্বেষী অনীশ্বরবাদী করিয়া তুলে সেই সব বাধাই যেন এই মহাপুরুষকে কোমল হইতে কোমলতর ভগবদ্‌ভক্ত মানবসুহৃদ করিয়া তুলিয়াছিল।

স্বর্গগত মহারাজের মহৎগুণাবলি শ্রবণ করিতে গিয়া তাঁহার এই বিশ্বসুহৃদ্ ভাবটিই যে প্রথমে মনে পড়িয়া যায় ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। অনেক সময় আপনাকে স্বীয় গৌরবের দুরধিগম্য উচ্চতা ও এককত্বের মধ্যে তুলিয়া রাখে; কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সমগ্র মহত্ত্বকে সঙ্গে লইয়াই যেন সর্ব্বদা আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত একজন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি যে সকলেরই সুহৃৎ! তিনি যে সকলেরই বন্ধু! তিনি কি করিয়া দূরে থাকিবেন? সুহৃদের হৃদয় যে স্রোতস্বিনী নদীর মত আপনার উচ্চতার শিখর হইতে বিশ্বের সমভূমির দিকে ছুটিবেই। তাই বলিতেছিলাম যে 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' এই মহাবাক্যের যথার্থ অর্থ মহাপুরুষের, মহাকর্ম্মী ভক্তের জীবনে আকার লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের মত মহৎ জীবনই মহাবাক্যের মহাভাষ্য! শত সহস্র টীকা ভাষ্যে যাহা হয় না ইঁহাদের মত সাধু মহাত্মার সহিত এক মুহূর্ত্তের সঙ্গ তাহা করিতে সক্ষম।

প্রকৃত মহত্ত্বের মধ্যে এই একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় যে, তাহার যে কোনো একটা দিক আলোচনা করিতে গেলেই তাহার সকল দিকই এক সঙ্গে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কলমি লতার মত একদিক ধরিয়া টানিতে গেলেই সকল দিকেই টান পড়ে। মহৎ ব্যক্তির প্রত্যেক কর্ম্মেই যেন তাঁহার চরিত্রের সমগ্রের আলোকপাত হয়—তাঁহার একাংশের মধ্যেই যেন পূর্ণ মানুষটীকে পাওয়া যায়। মণীন্দ্রচন্দ্রের এই বিশ্ব-সুহৃদ্ ভাবের মধ্যেই তাঁহার প্রাণের সমগ্র মহিমাই যেন প্রতিভাসিত। তাঁহার ধৈর্য্য, তাঁহার ক্ষমা, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মপ্রবণতা, এককথায় তাঁহার বিশাল মনুষ্যত্বই যেন এই এক সুহৃদ্‌ভাবের মধ্যে দেখিতে পাই।

মণীন্দ্রচন্দ্রের সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি আমি যখনই স্মরণ করিতে চেষ্টা করি তখনি দেখি, তিনি যেন ক্ষুদ্র বৃহৎ তারকাবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় বসিয়া আছেন। একাকী আপনাতে আপনি থাকা যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি যে বন্ধু!—বন্ধু কি বান্ধব ছাড়া থাকিতে পারে? অতি প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অর্থার্থী বিদ্যার্থী কর্ম্মার্থী সর্ব্বপ্রকার প্রার্থিবেষ্টিত থাকাই যেন তাঁহার জীবনের সার্থকতা।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

তাঁহার প্রাণই ছিল যেন মহা বিহঙ্গমের মত তাই বিশ্বাকাশে পক্ষ বিস্তার ছাড়া তাঁহার আনন্দভূমা কোথায়? তাঁহার মহান কর্ম্মজীবনের উপর দিয়া যে সমস্ত সুমহৎ ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া বিশ্বের কর্ম্মের আকাশেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার আত্মজীবনের সমস্ত বেদনাই যেন তাঁহাকে পরের বেদনায় কাতর হইবার জন্য ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। এই যে অসীম ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ সাধনের অপূর্ব্ব ক্ষমতা ইহার জন্ম কোথায়?

ইহার জন্ম সেই বিশ্ব-সুহৃদের হৃদয় কন্দরে। কত বড় হৃদয় যে এই মানুষটীর ছিল তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র হৃদয়ের ধারণার বাহিরে। সেই হৃদয়ের তাড়নায় এই কর্ম্মবীর মানুষটী বাক্যবীর বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ভগবানের মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদরূপে জীবন যাপন করিয়াছেন। আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি ইহাই আমাদের বুঝাইয়াছেন যে মানুষের কর্ম্মেই অধিকার—ফলে অধিকার নাই। বৃক্ষ ফলই দেয়, ভোগ করে অপরে—বাঙ্গলার, তথা ভারতের ধর্ম্মার্থী কর্ম্মার্থীর একান্ত আশ্রয় এই মহান মহীরুহ আজ উন্মুলিত! বাঙ্গলার পক্ষে ইহা শুধু বিপদ নয় একেবারে সর্ব্বনাশ। ক্ষুদ্র দুঃখ অশ্রুপাতেই শেষ হইতে পারে কিন্তু এই সর্ব্বনাশের মধ্যে মহা ভয়ের মধ্যে অশ্রুপাতও যেন ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্রে দানধর্ম্মের বহু স্তুতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়;—বিশেষতঃ কলিযুগে দানেই ধর্ম্মের একমাত্র প্রতিষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা আছে। কিন্তু যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র তাঁহাদের পক্ষে দাতা হওয়া বোধ হয় বিশেষ কষ্টকর নয়। অনাথ আতুরকে দান তাহাদের পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার বংশানুক্রমিক দানশীলতাটী যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন ইহাই তাঁহার পক্ষে বড় কথা নয়। তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্বত্ব তাঁহার আত্মদানে। এই আত্মদান-প্রবৃত্তি তাঁহাকে অক্লান্ত কর্ম্মী করিয়াছিল এবং সেই কারণেই তাঁহার কর্ম্ম বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে নানা প্রতিষ্ঠানের ও নানা কর্ম্মক্ষেত্রের জন্ম দিয়াছিল। লোকশিক্ষা ধর্ম্মরক্ষা প্রভৃতি বাঙ্গলার এমন কোনো সৎকর্ম্মই নাই যাহাতে এই লোক-সুহৃদের সস্নেহ করসম্পাত হয় নাই। দূর হইতে দান করিয়া সরিয়া থাকা এই কর্ম্মবন্ধু মানুষটীর দ্বারা সম্ভবই ছিল না। সকলের সঙ্গে মিশিয়া সমান ভাবে কর্ম্মের গুরুভার ভাগ করিয়া না লইলে অতন্দ্রিত মণীন্দ্রচন্দ্রের মনের ক্ষোভ মিটিত না। আপনাকে দান

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্

মিসেস্ হেষ্টিংসের সমাধি—কাশিমবাজার

করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ দান—মণীন্দ্রচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। সেইজন্য "দানবীর" শব্দটি তাঁহাতেই পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিল। সাহস করিয়া অচেনা অজানা পথে নিজ অর্থ ও সামর্থ্যকে চালিত করিয়া নব নব কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া তিনি বহু বাঙ্গালী নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মী করিয়াছেন, বহু প্রার্থী ভিক্ষুককে স্বাবলম্বী করিয়াছেন। তিনি যে আশ্রয়প্রার্থীকে কর্ম্ম করাইয়া তাহার মানসিক জড়তা হইতে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন ইহাই তাঁহার দানবীরত্বের প্রকৃত নিদর্শন। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী মুক্ত হস্তে দীন দরিদ্রকে অন্ন পানাদি দান করিয়াছিলেন তাই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া কিন্তু এ দানে দীনের দীনতা দরিদ্রের দারিদ্র্য-সমস্যা দূর হয় না। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র অর্থ দানের উপরও আর কিছু দিয়াছিলেন—সেটী আর কিছুই নয়, অমল ধবল কোমল কর্ম্মচঞ্চল প্রাণটী।

এই কোমল চঞ্চল প্রাণের দানেই হয়ত মণীন্দ্রচন্দ্রকে কর্ম্মজগতে স্থানে স্থানে পরাজিত হইতে হইয়াছে, আঘাত পাইতে হইয়াছে; কিন্তু সেই সমস্ত পরাজয়ের কিণাঙ্ক তাঁহার মহান্ হৃদয়েরই জয়ঘোষণা করিতেছে। এই মরণপীড়িত শঠ বঞ্চক কণ্টকাকীর্ণ বিশ্বপথে তাঁহার প্রেমময় হৃদয়ের জয়যাত্রা চিরদিনের জন্য অব্যাহত হইয়া গিয়াছে। প্রীতি ও করুণা ত' চিরদিনই অন্ধ—স্বর্গের আলো, দেবতার জল ত' স্থান কাল পাত্রের বিচার করে না—মণীন্দ্রচন্দ্রের করুণা-কৌমুদী তেমনি স্থান কাল পাত্র বিচারের ঊর্দ্ধেই ছিল, তাই অবাধ ছিল।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহাকে নানাভাবেই পাইয়াছি; কিন্তু ইহাই মণীন্দ্রচন্দ্রের অপূর্ব্বত্ব যে, আমি যেমন তাঁহাকে আপনার জন বলিতে পারি তেমনিভাবে এই বহরমপুর মুর্শিদাবাদের প্রায় সকলেই পারে। শিশুর হাতে খড়ি হওয়ার পর হইতে এখানকার শিশুগণ তাঁহাকে চিনিয়াছিল এবং শিল্প-কলা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার সামাজিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও চেষ্টার মধ্য দিয়া কত না অজস্রভাবে তাঁহাকে আমরা পাইয়াছি। আমাদের সর্ব্বপ্রকার আনন্দ ও বিষাদে, উৎসব ও শোকে তিনি সমভাবেই আপনাকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। এই জেলায় এবং বাঙ্গলায় বহু রাজা মহারাজ দেখা দিয়া 'সাগরলহরিসমানা' কালসাগরে লয় পাইয়াছেন, কিন্তু এত বড় একজন রাজগুণ-ভূষিত মহাপুরুষকে এত কাছে এমন পূর্ণভাবে কেহ কখনো পাইয়াছে কি না সন্দেহ। অতি সামান্য ব্যাপারে অতি সামান্য গৃহেও যে সমগ্র মণীন্দ্রচন্দ্র, বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের বিশাল

কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যেও সেই সমগ্র মণীন্দ্রচন্দ্র। গার্হস্থ্য বা সামাজিক বা জাতীয় সকল কর্ম্মের মধ্যেই এই মানুষটী তাঁহার সমগ্র মনুষ্যত্বটা লইয়া অবতীর্ণ হইতেন। তাঁহার মধ্যে আটপৌরে আর পোষাকী দুইটী মণীন্দ্রচন্দ্র কেহ কখনো দেখে নাই।

তিনি বঙ্গ-শিশুর শিক্ষা দীক্ষার জন্য কি করিয়াছেন বা বাঙ্গলার অন্ন-সমস্যা দূর করিবার জন্য কি করিয়া গিয়াছেন তাহার সুদীর্ঘ তালিকা এখন দিয়া কি হইবে? সে সকল মহান্ চেষ্টা ত' চিরদিনের জন্য বাঙ্গলার ইতিহাসের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহা ত' আছেই, যাহা গিয়াছে তাহাই আজ বৃহৎ হইয়া প্রচণ্ড হইয়া আমাদের সমস্ত প্রাণকে অধিকার করিয়াছে। তীব্র বেদনা যখন মানুষকে আক্রমণ করে তখন ভাণ্ডারে বা তহবিলে কি আছে না আছে তাহার হিসাব করিতে কে বসিবে? যাহা চিরতরে হারাইয়া গেল তাহারই পশ্চাতে যখন সমগ্র প্রাণ ছুটিতেছে তখন হিসাব নিকাশটা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়; আমিও হিসাব বন্ধ রাখিলাম।

কিন্তু মহাপুরুষগণ তাঁহাদের মহৎকর্ম্মের মধ্যেই চিরজীবন লাভ করেন বলিয়াই তাঁহাদের জীবন-কথার আলোচনারও শেষ নাই। তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্ম যেমন যুগে যুগে নানা আকারে আপনাকে ফুটাইয়া তুলে তেমনি তাঁহাদের জীবন-কথাও কালে কালে নব নব ভাবে আলোচিত হইবে। সেই ভবিষ্যৎ আলোচনার উপর ভার দিয়া আজ আমি এই বিশ্ব-সুহৃদ্ মণীন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতির বেদীতলে আমার অশ্রুসজল শ্রদ্ধা-পুষ্প নিবেদন করিলাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

মহাকালের শ্রীমন্দিরে

ছিলে তুমি বাংলা দেশের মাথার পরে চূড়ামণি,
এদেশ আজি হয়েছে তাই হায়রে মণি-হারা ফণী।
ইন্দ্র ছিলে সবাই জানে কাঁদছে তাই আজ ইন্দ্রপাতে,
চন্দ্র ছিলে চিনেছে দেশ তোমার যশের চন্দ্রিকাতে।
নন্দী তুমি নিখিলে আনন্দ দেওয়াই তোমার প্রথা,
বর্ণে বর্ণে নামটি তোমার লভেছিল সার্থকতা।
দ্যুতি তোমার মিশেছে আজ বিষ্ণু-বুকের মণির মাঝে,
একটি কিরণ কেশর তাহার লাখের মাঝেও নূতন রাজে।
তেজটি তোমার বাড়া'ল আজ সুরেশ্বরের ভাস্বরতা,
হৃদয় তোমার শশীর দেহে পাইল অবিনশ্বরতা।
রইলে নিজে সনাতনী স্মৃতির সুরধুনীর তীরে,
বন্দী হ'য়ে নন্দী হ'য়ে মহাকালের শ্রীমন্দিরে।

শ্রীকালিদাস রায়

"দেশকাল পাত্রভেদে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা করিতে হইবে; প্রাচীন গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বড় বড় জানালা বসাও, ক্ষতি নাই; কিন্তু দোহাই তোমাদের, ঠাকুরদালান ভাঙ্গিয়া সেখানে বাবুর্চ্চিখানার প্রতিষ্ঠা করিও না। অর্থোপার্জ্জন কর, গাড়ী জুড়ী হাঁকাও, দেখিয়া আমরা সুখী হইব; কিন্তু বৎসরান্তে একবার মহামায়াকে বাড়ীতে আনিও; দরিদ্র, ইতর ভদ্র প্রতিবেশীদিগকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইও। হিন্দুর বৈশিষ্টা হারাইলে জাতির জাতীয়ত্ব থাকে না। যদি জাতীয়ত্বই নষ্ট হইল, তাহা হইলে রহিল কি?"

মণীন্দ্রচন্দ্র—১৩২৪, বৈশাখ।

মহারাজ-বিয়োগে

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যখন কাশিমবাজার আসিলেন তখন ত্যাগতীর্থে গঙ্গা যমুনার দুই পবিত্র স্রোত মিলিত হইয়া এক তীর্থরাজ্য গঠিত হইয়া উঠিল। বংশানুক্রমিক মহত্বের মহিমায় মণীন্দ্রের বিশাল হৃদয়ের বিপুলতা মিশিয়া উহাকে পুণ্য প্রয়াগে পরিণত করিল।

তিনি রাজা হইয়াছিলেন প্রায় মধ্য বয়সে। কাশিমবাজার-অধিপতি হইবামাত্রই যে এক মন্ত্রশক্তির স্পর্শে অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল, অন্তর উন্নত হইয়া গেল, সদনুষ্ঠানে অর্থবৃষ্টি হইতে লাগিল, প্রার্থীর প্রার্থনা অপূর্ণ রহিল না, ইহা যাহাদের ধারণা, তাহাদের জন্য দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আজিকার মত এই বেদনাময় প্রসঙ্গ ত্যাগ করিব।

যে স্থানে মহারাজের পিতৃভূমি সৌভাগ্যবশতঃ লেখক একরকম সেই স্থানেরই অধিবাসী। সুতরাং এই স্থানের প্রাচীন লোকদিগের নিকট হইতে দুই একটী কথা যাহা শুনিয়াছি তাহাই মাত্র উল্লেখ করিতেছি। মহারাজ যখন মহারাজ হন নাই তখন তিনি তাঁহার পৈতৃক বাসস্থানেই অনেক দিন কাটাইয়াছেন। তখন তিনি এ অঞ্চলে "মণিবাবু" বলিয়াই সমধিক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। সেই সময়ে এদিককার কৃষিপ্রধান বা কৃষিমাত্র-অবলম্বন গ্রাম সমূহে শিক্ষাহীনতার অপরিমেয় অভাব দেখিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বড়ই বেদনা অনুভব করেন এবং অবিলম্বেই একটা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজে তাহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার আয় অতি সামান্য মাত্র; মণিবাবু স্বয়ং মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষককে উৎসাহ দিতেন, কখনও বা নিজেই কিছু কিছু শিক্ষা দিয়া বালক ও শিক্ষকদিগের অশেষ উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণ প্রায়ই স্কুলের পর জলযোগে আপ্যায়িত হইয়া পরিতৃপ্ত হইত। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া আমের সময় আম ও অন্যান্য সুমিষ্ট ফলের সময় সেই সেই ফল এবং লুচি মিষ্টান্নাদি দ্বারা সকলকে পরিতোষের সহিত আহার করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। এইখানে একজন বৃদ্ধের কথা আপনাদিগকে শুনাইতেছি। তিনি বলেন, মাথায় যখন দশ বার সের খৈল লইয়া গ্রামের দোকান হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেন তখন একবার মণিবাবুর দৃষ্টিপথে পড়িলে আর নিস্তার ছিল না। না দেখি না দেখি করিয়া পাশ

কাটাইয়া চলিয়া আসাও অসম্ভব ছিল। ডাক ডাক, বলিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত একজন লোক পাঠাইয়া নিজে পিছনে পিছনে আসিতেন। আসিয়া একেবারে পাকড়াও করিয়া লইয়া যাইতেন। বিনা অপরাধে কিছু তিনি এরূপ পাকড়াও করিতেন না, অপরাধ ছিল, লোক পাওয়া যাইতেছে না, এক বাজি দুই বাজি যাহা হউক তাস খেলিয়া যাইতেই হইবে। বেশ, খেলা করিতে আর আপত্তি কি আছে? বিশেষ মণিবাবু যখন বলিতেছেন। কিন্তু গরুগুলা যে না খাইয়া উপোস করিবে, তাহার কি? তাহার জন্যও চিন্তা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ কাহাকেও দিয়া সেই খৈল পাঠাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে নিশ্চিন্ত করিতেন। এইবার নিরুদ্বিগ্নমনে খেলা আরম্ভ হইত। খেলা-শেষে সেইখানেই স্নান সেইখানেই আহার। এই ব্যাপার ছিল এক প্রকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি বলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকাল বেলায় মাথরুণে এক মস্ত খেলার আড্ডা বসিত। খেলা চলিতে চলিতেই কখন্ বাড়ীর মধ্যে সংবাদ পাঠাইয়া জলযোগের আয়োজন হইয়াছে কেহ জানে না। তারপর রৌদ্রের উত্তাপ কমিয়া আসিলে বন্ধুদিগকে আপনার রুচি ও তৃপ্তি অনুযায়ী, অমুক গাছের আম ও মিষ্টান্ন সহযোগে আকণ্ঠ ভোজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেন এই আমটা কেমন লাগিল? ভাল লাগিল শুনিলে আবার ঠিক সেই গাছের তেমনই আম আরও গোটা কয়েক আনাইয়া ছাড়াইয়া একটি একটী করিয়া ধরিয়া দিয়া খাওয়াইয়া তবে সকলকে মুক্তি দিতেন। এই সকল সমবয়স্ক সঙ্গী, বাল্যবন্ধুদের দুই একজন এখনও দরদর ধারায় অশ্রুজল ফেলিয়া সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিতেছেন।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—বলিব কি, অনেক কথাই যেন ঠিক কাল ঘটিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে। একবার,—দেখ বাবা, রাজার সঙ্গে দেখা করা বড় দরকার হয়েছে। কিন্তু যাই কি করিয়া। আমি পাড়াগাঁয়ের মানুষ, সাদাশিধে ধুতি চাদরই আমার পোষাক। একটা জামা এক জোড়া জুতা লইয়া তাঁহার সহিত কেমন করিয়া দেখা করি। তখন ছিলেন মণিবাবু, খেলার সাথী বাল্যসহচর, আজ তিনি মহারাজ, আর কোথায় এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এই ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বাবা, তোমায় বলিব কি, উপস্থিত হইয়া দেখি গণ্যমান্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোক, উকীল ব্যারিষ্টার জজ প্রভৃতি, বোধ হয় রাজা রাজড়াও কেহ কেহ সেখানে থাকিবেন, সকলে মহারাজকে

ঘিরিয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন সেই মুহূর্ত্তেই ছুটিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বার বার করিয়া সেই ভদ্রলোকদিগকে বলিতে লাগিলেন, ইনি আমার সেই বাল্যকালের বন্ধু, সেই দিনের সহচর, খেলার সাথী। সকলে একসঙ্গে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন—তখন আমার যা মনে হইতে লাগিল। মহারাজ তাঁহাদের সহিত কথা বন্ধ করিয়া পরম আহ্লাদের সহিত আমার সকল খুঁটী নাটী পরিচয় লইতে লাগিলেন। গ্রামের কথা, চাষের কথা, জমি জমার কথা, প্রাণখোলা কত কথাই না বলিলেন। সে কথার আর শেষ হয় না। যেন বহুকালের হারানিধি হাতে পাইয়াছেন। তারপর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের রাজোচিত সম্মান বুঝিবা তাহারও বেশী সম্মান আদর আপ্যায়নে আহ্লাদ বোধ করিতে লাগিলেন! সে সকল কথা আর কি বলিব। তাঁহার বাল্যের সাথী, খেলার সঙ্গী এই কথাগুলি সেই হ্যাট্ কোট পরা, চশমা আটা বাবুদের বার বার বলিয়া যেন গর্ব্বে ফাটিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমাদের সেই যুবাবয়সের কাজগুলি, একসঙ্গে সাঁতার, বাজি রাখিয়া পুকুর পার হইয়া যাওয়া, একসঙ্গে থিয়েটার করা, সকল কথা বলিয়া বলিয়াও যেন কথা ফুয়ায় না। আমি আরও দুই তিন বার তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি, কিন্তু রাজ্যশ্রী যাঁহাকে দুই হাতে করুণা বিলাইয়া দিয়াছেন সেই লক্ষপতির বাল্যসাথীদের প্রতি ব্যবহার চিরদিনই অকপট, চিরদিনই প্রাণ-খোলা দেখিয়াছি। আমার সকল কথা মনে নাই, কিন্তু যখনই মহারাজের সহিত দেখা হইয়াছে তখনই আবার সেই ছেলে বেলার মণিবাবুর কথা মনে হইয়াছে, যেন সেইদিনেই আবার ফিরিয়া গিয়াছি, তেমনি আনন্দে কাটাইতেছি। অতি ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ সাধারণ কথাগুলি স্মরণ করিয়া বলিতে বলিতে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ মণীন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় স্বভাবতঃই করুণ-কোমল ছিল। ঐশ্বর্য্য মাত্র উপলক্ষ স্বরূপ আসিয়া তাঁহার চিরপ্রশস্ত হৃদয়ের অবাধ দানশীলতার সাহায্য করিয়াছে।

শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল

['পরিশিষ্ট' অধ্যায়ের ১ম পৃষ্ঠা হইতে ৮৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত "উপাসনা" মণীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।]

প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সন ১৩১৪ সাল।

ভূমিকা

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালাসাহিত্য যেরূপ দ্রুতবেগে পুষ্টি ও উন্নতিলাভ করিয়াছেন, জগতের আর কোন সাহিত্যের পক্ষে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল বলিতে হইবে। সাহিত্যের এই শ্রীবৃদ্ধি যে কেবল তাহার অনুপম সারবত্তায় সুচিত, তাহা নহে; সাহিত্যসেবীর বিবর্দ্ধমান সংখ্যাও তাহার একটী বলবৎ নিদর্শন। সভ্যজগতে সাহিত্যসেবা ত্রিধারায় বহমানা:—সেই তিনটী ধারা রচনা, অধ্যয়ন ও উৎসাহ দান। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা অঙ্গুলি দ্বারা গণনীয় ছিল; কিন্তু আজি তাহা সহস্র-সান্নিধ্যে সমুপস্থিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাঠকের সংখ্যা সুবিপুল এবং উৎসাহদাতা পরিমিত হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। এই ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্য আজি উদ্দামবেগে ধাবমান হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার আবিলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আক্ষেপ বা নৈরাশ্যের বিষয় নহে।

পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জাতীয় জীবনের ন্যায় জাতীয় সাহিত্যের প্লুত, বিপ্লুত ও মন্বরাদিভাব পরিলক্ষিত হয়; ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সর্ব্বত্রই ইহার প্রকৃতি সমভাবাপন্ন এবং সকল স্থলেই ইহার পরিণতি কালসাপেক্ষ। বাঙ্গালা সাহিত্যের বা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সেই পরিণতি আসন্নপ্রায়, কি সুদূরপরাহত, এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে কালের ইঙ্গিত যে, কালেই সহস্র তূর্য্যদ্বারা নিনাদিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জাতীয় জীবন যেমন শ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া একটী দৃঢ় অবয়ব ধারণ করে, জাতীয় সাহিত্যও সেইরূপ আবিলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জ্জন করিয়া স্বচ্ছ অথচ প্রগাঢ় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যের অবস্থা-পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত সময়ে সময়ে যেমন নাড়ী পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সাহিত্যের অবস্থা কালে কালে পরিদর্শন করা আবশ্যক। এই আবশ্যকতা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়াতেই বিদ্যমান সম্মিলনের উদ্ভব ও অভিব্যক্তি।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

সূচনা

বিগত দশ বৎসর হইতে এই প্রয়োজনবোধ বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীর অন্তঃকরণে অল্পে অল্পে কল্পিত জল্পিত হইতেছিল। মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবে বাঙ্গালার সাহিত্য-সংসারে একটা অনির্ব্বচনীয় অভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই অভাবের আলোচনাকল্পে যত প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা-নিরূপণ তাহার অন্যতম। দেশীয় সংবাদ ও সাময়িক পত্রে এবং সভাস্থলে মধ্যে মধ্যে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও এতদিন পরে তাহা প্রকৃত প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতবর্ষের রাজধানীতে ও বঙ্গের অনেক স্থানে অনেকগুলি সাহিত্যসমিতি আছে। সেই সকল সভাস্থলে অনেক সময় সাহিত্যের সমালোচনা হইলেও তাহা প্রয়োজনানুরূপ বলিয়া প্রতীত হয় না; কারণ সে সকল স্থলে বঙ্গের সমস্ত সাহিত্যসেবীর সমবেত মতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। আবার স্থল বিশেষে তন্ত্রমন্ত্রের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য সেই সকল সমিতির অভিমতও সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বঙ্গের প্রধান অপ্রধান সমুদায় সাহিত্যসেবীকে একস্থানে একত্র সম্মেলিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে পারিলে বোধ হয় প্রকৃত তথ্যের নিরূপণ হইতে পারে; এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া ক্রমে প্রতীত হইলে রাজধানীর কোন কোন সাহিত্যকেন্দ্রে তাহার আলোচনা হইতে লাগিল। ক্রমে বৃটিশ ভারতের রাজধানী ত্যাগ করিয়া প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদের বিশ্রুত-ক্ষেত্রে তাহার প্রথম অঙ্কুরোদ্গমের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু পোষণোপযোগী আনুকূল্যের অভাবে উষরভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় উদ্যোগকর্ত্তাদের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। নবীন সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কোমল হৃদয়তন্ত্রীতে ভারতীয় যে "সুধা"-নিস্যন্দি ঝঙ্কার জাগিয়াছিল, তাহার বিলয় হইতে না হইতেই বঙ্গের অপর প্রান্তে বরিশালের বক্ষে অন্য যুবক সাহিত্যিক ও ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর উদার প্রাণ তাহার প্রতিধ্বনিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণের একটী সম্মিলন-সাধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদনুসারে ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে উক্ত নগরে বঙ্গের প্রাদেশিক সম্মিলনের সহিত সখ্যসূত্র বন্ধনে বঙ্গের প্রথম সাহিত্যসম্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাদেশিক সম্মিলনের বোধন

হইতে না হইতেই বিসর্জ্জন হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন-সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে সাহিত্যসেবিগণের আশাভরসা সহসা অগাধ জলে নিপতিত হইলে কয়েক মাস তাহার দগ্ধস্মৃতির প্রীণন ও পরিতর্পণে অবসিত হয়। অবশেষে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং কাশিমবাজারের স্বনামধন্য সাহিত্যসেবক শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অনুপম উৎসাহ সেই অতল-নিহিত আশাতরণী উদ্ধৃত হইয়া তিতীর্ষু সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে হর্ষোদয় সাধন করিল। কিন্তু দারুণ দৈব দুর্ব্বিপাকে উৎপৎস্যমান সাহিত্যসম্মিলনের প্রাণস্বরূপ মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র অকস্মাৎ ইহলোক হইতে অন্তরিত হওয়াতে বিড়ম্বিত সাহিত্যসম্মিলনের অধিবাসনচেষ্টা দ্বিতীয়বার কোরকে দলিত হইল। কিন্তু ধন্য মণীন্দ্রচন্দ্রের অদম্য অধ্যবসায় ও কঠোর কর্ত্তব্য-জ্ঞান। পুত্রশোকের দীপ্ত দাবাগ্নি যেন গলদশ্রু দ্বারা দমিত রাখিয়া কয়েক মাস পরেই মহিমচন্দ্রের শোক-স্মৃতি-তমিস্রা-বিজড়িত স্বীয় প্রাসাদেই তিনি সেই সঙ্কল্পিত সাহিত্যসম্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

নামকরণ।—অধিবেশনের অধিবাস-বাসরে সমিতির নামকরণ লইয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে অল্পবিস্তর বাদপ্রতিবাদ হইয়া অবশেষে সকলের ঐকমত্যে ইহার নাম "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন" নির্দ্দিষ্ট হইল। অতঃপর এই নামেই ইহা সর্ব্বত্র পরিচিত হইবে।

উদ্দেশ্য।—সাহিত্য সম্মিলন অরিষ্টশয্যায় শয়ান থাকিলেও বিদগ্ধ স্মৃতির প্রতিপ্রীণনের ঔৎসুক্যে সুদীর্ঘ প্রস্তাবমালা গলদেশে ধারণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। দুইদিনে সর্ব্বসমেত একাদশটী প্রস্তাবের উত্থাপন ও সমর্থন হয়। তৎসমুদায়ের সার সঙ্কলিত হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত হইতে পারে :—ভাষা-সংস্কার, ইতিহাস-সংকলন, ভৌগলিক তত্ত্বসংগ্রহ, দর্শনবিজ্ঞানাদি বিষয়ে গ্রন্থসঙ্কলন ও স্বারস্বত ভবন-প্রতিষ্ঠা। সভায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা ও পঠিত প্রবন্ধে অতি প্রয়োজনীয় উক্ত পঞ্চবিধ বিষয়ের উপযুক্ত সমালোচনা হইলে তৎসমুদায়ের পর্য্যাপ্ত প্রচার নিমিত্ত বঙ্গের জেলায় জেলায় সমস্ত সাহিত্য-সমিতিকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব হয়।* এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে এবং অনুরোধের উপযুক্ত সম্মাননা হইলে কালে সুফল-লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

* দ্বিতীয় দিবসে সাহিত্যসম্মিলনের এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, "এই সারস্বত-ভবনে নিম্নোক্তরূপ দ্রব্যজাত সংগৃহীত হউক এবং পুরাবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের মাসিক উপদেশ প্রদত্ত হউক।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

নিয়মাবলী।—কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্যিক, সামাজিক বা রাজনীতিক যে কোন সভাসমিতির শৈশব-দোলায় কতকগুলি নিয়মের বজ্রবন্ধনী নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই প্রাজ্ঞবুদ্ধিরই অনুসরণ পূর্ব্বক বিশেষ কোন নিয়মের সৃষ্টি করা হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অন্নপ্রাশন সংস্কার সম্পাদিত হইলে চূড়াকরণকালে তাহার ভবিষ্য জীবনের অনাময় নিমিত্ত উপযুক্ত বিধিব্যবস্থার আস্থাপন করা যাইবে। দ্বিতীয় সংবৎসরে সম্মিলনীর যাহাতে পুনরধিবেশন হয়, সভাস্থলে তাহারই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন সার্ব্বজনীন সভা। উচ্চ নীচ সকল সাহিত্যসেবীর ইহাতে সমানাধিকার। বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় তত্তৎস্থানীয় সমর্থ সাহিত্যানুরাগীর আনুকূল্যে ইহার অধিবেশন হইবে। ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত কোন বেগপ্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। পরে কি প্রণালী অবলম্বিত হইবে, অনুমান সাহায্যে এখন তাহার আংশিক অবধারণও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারুণ্যের কোমল কল্যাণ-কামনা ও দাক্ষিণ্যের দয়িত দানই এক্ষণে ইহার প্রধান পোষণ।

পৃষ্ঠপোষক।—অধ্যক্ষ সভা ও সদস্যগণের সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক-

---

(ক) প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথি।

(খ) প্রাচীন মুদ্রিত ও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক।

(গ) বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন, খোদিতলিপি, মুদ্রা প্রভৃতি।

(ঘ) জয়দেব, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাসাদি প্রাচীন কবিগণের স্মৃতিচিহ্নাদি।

(ঙ) আধুনিক সাহিত্যিক—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র প্রভৃতির প্রস্তর মূর্ত্তি, চিত্র এবং তাঁহাদের হস্তাক্ষর ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি।

(চ) বঙ্গের সাধারণ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের ঐরূপ স্মৃতিচিহ্ন।

(ছ) বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যার যন্ত্রাদির নমুনা। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন দুর্গ, অট্টালিকা, দেবমন্দিরাদির চিত্র। প্রাচীনকালের ব্যবহৃত বস্ত্র অলঙ্কার, তৈজস, অস্ত্রশস্ত্রাদির নমুনা।

(জ) অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, (ফলিত ও গণিত), বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, প্রাণিবৃত্তান্ত, শরীরতত্ত্ব, উদ্ভিদ্, যন্ত্রতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

(ঝ) পূর্ব্বোক্ত বিদ্যানিচয়ের রীতিমত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ।

(ঞ) গ্রন্থালয়ের পুস্তক সংগ্রহ।

রূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। যে প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগ, প্রবল উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায় সহকারে মহারাজ সম্মিলনের উন্নতিকল্পে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার তুলনা অতি বিরল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিম্নলিখিত মন্তব্য এস্থলে সম্পূর্ণ অন্বর্থ বলিয়া উদ্ধৃত হইতে পারে :—

"বঙ্গ-সাহিত্যের কল্যাণসাধন করা এবং স্বদেশের কল্যাণসাধন করা এক কথা। বরং বলিতে পারি ইহাই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণসাধন-চেষ্টার প্রথম চেষ্টা—মূল চেষ্টা; —ইহার তুলনায় অন্যান্য চেষ্টা সাধুবাদ লাভ করিতে পারে না। ইহাকে কেবল কল্যাণসাধন চেষ্টা বলিয়াই নিরস্ত হইতে পারি। ইহা পুণ্য—ইহাই শ্রেষ্ঠ পুণ্য। মহারাজ বাহাদুর এই পুণ্যের অনুষ্ঠানে যেরূপ অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন,—স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া অভ্যাগতগণের পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—তিনি শ্রেষ্ঠ পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন। কারণ কবি বলিয়াছেন :—

সন্ধ্যাভ্র-বিভ্রম-নিভা বিভবা ভবেঽস্মিন্
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দু-চলস্বভাবাঃ।
পুণ্যং নৃণামিহ পরত্র চ বন্ধুরেকো
নোচ্চৈঃ স্বদেশহিতসাধনতোঽস্তি পুণ্যম্॥"

অধ্যক্ষ-সভা।—সকল প্রকার সম্মিলনের অধ্যক্ষ-সভা বা কর্ম্মকর্ত্তৃগণই জীবন স্বরূপ। সমিতির গঠনার্থ উপাদান-সংগ্রহ হইতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পোষণ এবং ভবিষ্য পরিস্ফুরণ পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই অধ্যক্ষ-সভার সাহায্যসাপেক্ষ। যে রীতি সকল সভাসমিতিরই প্রযুজ্য, সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে তাহা যে অপরিহার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলনের সৌষ্ঠব-কল্পনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং পরবর্ষেও যাঁহাদের মুখরিত সমস্ত আয়োজন বিধাতার কঠোর ভবিতব্যতায় বিফল হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কাশীমবাজার-সাহিত্য সম্মিলনের গঠন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণের এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্মিলনসাধন সহজ ব্যাপার নহে। যে কয়েকটী সদস্য এই সম্মিলনের অধ্যক্ষ সভার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ হইয়াছে।

সভাপতি।—সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি মনোনয়ন লইয়া অধ্যক্ষদিগকে কিয়ৎপরিমাণে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১২ সালের সঙ্কল্পিত সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষের ধর্ষণায় অনেকের অমর্ষের উদয় হওয়াতে কাশীমবাজারের অধিবেশনে সভাপতিত্ব গ্রহণে একটা সার্ব্বজনীন অনাদর প্রকাশ পাইয়াছিল। তথাপি অধ্যক্ষগণ বয়স ও বিজ্ঞতার সমাদর করিতে ক্রুটী করেন নাই। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই সকল মহাত্মাদিগকে সভাপতির আসন গ্রহণের নিমিত্ত ঐকান্তিক অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অস্বাস্থ্য, সামর্থ্যাভাব বা অপ্রতিবিধেয় অনবসর জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহই সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি হইতে অগ্রসর হয়েন নাই। অবশেষে অধ্যক্ষগণের ঐকমত্যানুসারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই মনোনীত হইয়াছিলে। প্রথম প্রথম সভাপতিত্ব স্বীকারে তিনি কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই। তাঁহার কন্যার পীড়া নিবন্ধন তাঁহাকে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছিল। ভগবৎ কৃপায় দুহিতা আরোগ্যলাভ করিলে রবীন্দ্র বাবু কাশীমবাজারে আগমন করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমন্ত্রণ।—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ঐকান্তিক উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী মাত্রেরই আমন্ত্রণ হইয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা, সাময়িক ও সংবাদপত্রের সম্পাদক, সকল প্রকার সম্ভ্রান্ত সভাসমিতির অধ্যক্ষ ও প্রতিনিধি, ব্যবহারাজীব, শিক্ষাবিভাগের বহু প্রতিনিধি প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি স্বতঃ পরতঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ৩০০০ পত্র নানা প্রণালী দ্বারা দেশের নানাস্থানে পরিচালিত হইয়াছিল। বীণাপাণির এই আবাহনে যে সকল মাতৃভক্ত সন্তান কাশীমবাজারের সভাস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা কিন্তু আশানুরূপ নহে।

সভাস্থল।—শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিশাল প্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভাগৃহ গঠিত হইয়াছিল। সেই প্রকাণ্ড সভামণ্ডপের প্রায় প্রত্যেক অংশই ইতিহাসের আমগন্ধে মোদিত। কাশীমবাজার বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী :—

পরিশিষ্ট

ভাগীরথীর প্রচণ্ড তরঙ্গভঙ্গের রঙ্গাবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ মোগল-গৌরবের যবনিকা এইখানেই পতিত হইয়াছে :—এইখানেই একটী সামান্য পণ্যবাটিকায় সঙ্কীর্ণ পরিসরের অভ্যন্তরে ইংরাজের ঐশ্বর্য্য ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। বলিতে কি কাশীমবাজারের প্রত্যেক পরমাণু অশ্বত্থবীজের ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলেবরে বিরাট ঐতিহাসিক তত্ত্ব আহিত রাখিয়া উপেক্ষা ও অনাদরের অন্ধকারে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। নিরাশ স্মৃতির অন্ধতমিস্রাগুণ্ঠিত, ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাসে বিশোচিত এই কাশীমবাজার প্রাসাদ বীণাপাণির আমন্ত্রণে যেন বিষাদ ও জড়তার অন্ধকার দূরে ফেলিয়া সঙ্কল্পিত সাহিত্যযজ্ঞের জন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল। দুই দিন যে মহোৎসবে অতিবাহিত হইয়াছিল, প্রায় সংবৎসর উপনীত হইলেও আজিও তাহার মধুর প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে।

সমাগম।—সকল সম্প্রদায়ের অবাধ গতির সম্প্রসার নিমিত্ত শারদীয় পূজাবকাশই সাহিত্যযজ্ঞের উপযুক্ত অবসর বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত কার্য্যকালে তাহার বিপরীত ফলোদয় দেখা যায়। হেমন্তের অস্বাস্থ্যকর প্রভাবে অনেকের যজ্ঞদর্শন-সঙ্কল্প সফল হয় নাই। অনেকে আবার ভ্রমণ ও পরিক্রমণের রোগাক্রমণে অভিভূত হইয়া মাতৃপূজায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ সামান্য সামান্য—স্থলবিশেষে আবার অতি সামান্য কারণে সমাগমের প্রকর্ষ অনেক পরিমাণে লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা বঙ্গবাসী মাত্রেরই আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় হইলেও প্রাথমিক প্রত্যূহ বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। তথাপি যজ্ঞস্থল ভক্তগণের প্রগাঢ় নিবিড়তায় সূচীভেদ্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। পরন্তু কতিপয় মুসলমান সাহিত্যিকও এই মহতী মাতৃপূজায় হিন্দুর সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়া মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আদর আপ্যায়ন।—১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক উভয় দিনই সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু ১৬ই কার্ত্তিক শনিবার প্রাতঃকাল হইতেই মুর্শিদাবাদের বাহিরের সাহিত্যিক ও প্রতিনিধিবর্গ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহারাজের সুবিশাল প্রাসাদের বিভিন্ন অংশের আটটী বাড়ীতে তাঁহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল। অতিথি অভ্যাগতের জন্য মহারাজ পরিচর্য্যার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র সংখ্যার আয়োজন করা হইয়াছিল।

প্রত্যেক বাড়ীতে জলযোগের স্বতন্ত্র ভাণ্ডার ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতে স্নানশৌচাদির সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক অতিথি অভ্যাগতের বিন্দুমাত্র আদেশ-পালনের নিমিত্ত প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে অক্লান্ত পরিশ্রমী, বিনয়ী, মধুরালাপী স্বেচ্ছাসেবক বালক ও যুবকদল সর্ব্বদা উপস্থিত ছিল; আর ছিল ঘোড়ার গাড়ী,—যিনি যখনই যেখানে যাইতে চাহিয়াছিলেন—কি গঙ্গাস্নানে, কি নবাববাড়ী-দর্শনে, কি খাগড়া, বহরমপুর, সৈদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যিনি যখন যেখানে যাইতে চাহিয়াছিলেন, স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বিনা ভাড়ায় তিনি সেইখানেই যাইতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীবর্গের সুবিধার জন্য মহারাজ স্বীয় প্রাসাদের সিংহদ্বার পার্শ্বে খাগড়াই বাসনের এবং বালুচরের শাড়ী, বহরমপুরী গরদ এবং মট্‌কার বিবিধ ধুতি চাদর ও থানের দোকান বসাইয়া দিয়াছিলেন। কি সাহিত্যিক, কি সাহিত্যানুরাগী, কি অতিথি, অভ্যাগত প্রত্যেকের প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি ব্যাপারে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বহু ভৃত্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। সেবার জন্য প্রত্যুষে চা ও বিস্কুট এবং প্রাতে বহুবিধ ফল মূল, ডাব, সরবত, এবং বহুবিধ ছানার এবং ক্ষীরের মিষ্টান্নের বিপুল আয়োজন ছিল। মধ্যাহ্নে ৫০।৬০ প্রকার ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন, সন্ধ্যায় চা বিস্কুট ও জলযোগের আয়োজন এবং রাত্রিতে প্রথম দিন লুচি ও অপর দুই দিন পলান্নের ব্যবস্থা ছিল। ভূরি রাজভোগের প্রাচুর্য্যে অতিথি অভ্যাগত মাত্রই অতিমাত্র পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতে ৯টার মধ্যে দশ ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন আহার করাইবা মহারাজ সকলকে বিদায় দিয়াছিলেন।

আয়ব্যয়।—সাহিত্যসম্মিলন একটী স্থানীয় অনুষ্ঠান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তদনুসারে ইহার অধিবেশনের সর্ব্ববিষয়ক আয়োজন-কল্পে যে বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহার নির্ব্বাহার্থ মুর্শিদাবাদ জেলা হইতেই অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। তিন দিনে সর্ব্বসমেত ৯৬০৬৸৶১০ নয় হাজার ছয় শত ছয় টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা ব্যয় হইয়া যায়; তন্মধ্যে মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ৯০৫৫৶১০ সাহায্য করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট ৫৫১৸০ পাঁচ শত একান্ন টাকা বার আনা ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যানুরাগী ধনী ব্যক্তিগণের নিকট সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সকল দাতৃবর্গের—বিশেষতঃ মহারাজ বাহাদুরের এই বিপুল বদান্যতা জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ ঋণী হইয়াছেন। আয়ব্যয়ের তালিকা কার্য্য বিবরণীর যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
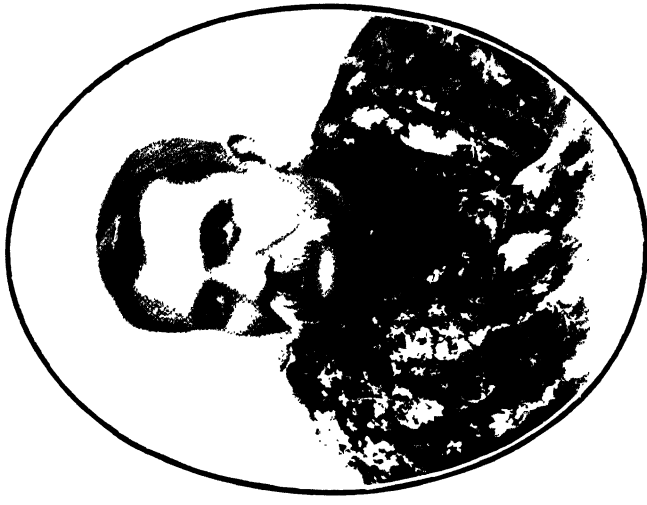
প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা
সমিতির সভাপতি

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

পরিশিষ্ট

প্রবন্ধ।—সাহিত্যসম্মিলনের জন্য দশটী প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সময়াভাবপ্রযুক্ত কেবল চারিটী প্রবন্ধ পঠিত হয়; অবশিষ্টগুলি পঠিত বলিয়া সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। "নদীয়ার ঐতিহাসিক তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়াতে ঐটী ভিন্ন অপর সমুদায়ই যথাস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে। অনবসরপ্রযুক্ত প্রবন্ধগুলির পরিদর্শনে ও নির্ব্বাচনে চিরাচরিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই; সেই জন্য সমপ্রকৃতি প্রবন্ধ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক সমতায় পরিণামে অবস্থার বৈষম্য অনিবার্য্য; সেই জন্য দোষদৃষ্টির সম্মুখে নানা ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যসম্মিলনের জন্ম-সময়ে অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন-বিড়ম্বনাদির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে উক্তপ্রকার ত্রুটী উপেক্ষণীয়।

"বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ বন্দর কাশিমবাজারে আজ আমরা উপস্থিত। আমরা যে স্থানে সকলে সমবেত হইয়াছি, সেই ঐতিহাসিক ভবনের সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে চারিদিকেই ঐতিহাসিক চিহ্ন বিদ্যমান। আমার পশ্চাতে যে প্রস্তর খচিত বিশাল গৃহ দৃষ্ট হইতেছে, উহা বারাণসীর চেৎসিংহের ভবন হইতে আনীত। সম্মুখে ইংরেজ রেসিডেন্সি ও সমাধিক্ষেত্র। তাহার সম্মুখে প্রাচীন গঙ্গার পরপারে বাঙ্গলার রাজস্ব-মন্ত্রী সন্ন্যাস-ব্রতধারী, রায় রায়ান চায়েন রায়ের আবাসস্থান সন্ন্যাসীডাঙ্গা। বামপার্শ্বে চেৎসিংহের নিকট হইতে আনীত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, ইংরেজ কুঠীর স্থান ও ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্র। দক্ষিণে প্রাচীন জৈন দেবালয় নেমিনাথের মন্দির।"

[এই সম্মিলনে পঠিত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত]

প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন

প্রথম অধিবেশন—রবিবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল

১৩১৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটী প্রধান স্মরণীয় দিবস। উক্ত দিনে কাশীমবাজার রাজবাটীর ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বীণাপাণির এই বিরাট যজ্ঞে মাতৃভাষার সেবা করিবার নিমিত্ত বঙ্গের নানাস্থান হইতে প্রায় চারিশত সাহিত্যসেবী সমাগত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার, সাময়িক ও সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকাশক বা অন্য কোন প্রতিনিধি, বক্তা, বিবিধ ধর্ম্ম ও সাহিত্য সভার সম্পাদক ও সভাপতি, শিক্ষাবিভাগের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি, ব্যবহারাজীব, মহারাজ হইতে রাজা ও সামান্য ভূম্যধিকারী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ ও শাস্ত্রানুশীলন-কার্য্যে ধৃতব্রত বুধগণ স্বদেশীয় সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের স্বতঃ ও পরতঃ এবং প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা সকলেই এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটীর নাম উল্লিখিত হইল।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি), শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলাধীপ), শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান), শ্রীযুক্ত যোগেশচরণ সেন (মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত হেমন্তচন্দ্র রায় (মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত নফরদাস রায় (মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার, শ্রীযুক্ত বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষাল, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (২৪ পরগণা), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলি,) শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রত্নতত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত শশধর রায় (রাজসাহী), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়া), শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত সতচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত হরিমোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফি, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-নাথ বাগ্‌চি, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষাল, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রলাল ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অবিনাশ-চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত আহম্মদ হোষেণ মিঞা, শ্রীযুক্ত ঠাকুর প্রজাপতি সরকার (কাশ্মীর), শ্রীযুক্ত অবিনাশ কুমার সেন, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যানিধি, মহা মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ঢাকা), শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ ঘোষ (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক (রাণাঘাট), শ্রীযুক্ত মহম্মদ রৌসন আলি চৌধুরী (ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ সিংহ (বর্দ্ধমান), শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় (বীরভূম), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাগলপুর), শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ (মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু (রংপুর) প্রভৃতি।

কাশীমবাজার রাজবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এই বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থল নানাবর্ণের পতাকায় ও বিচিত্র চিত্রব্যূহে সুসজ্জিত হইয়াছিল। প্রাঙ্গণের শিরোভাগে চারুচিত্র-শোভিত বিশাল নীলচন্দ্রাতপ ত্রিতলছাদের সমতলে বিস্তৃত হইয়া যেন মর্ত্তে নিরাকার আকাশকে সাকার করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাঙ্গণের চারিদিকে উচ্চ অলিন্দবক্ষে পাষাণস্তম্ভরাজি নানাবর্ণের চারুচীরখণ্ডনিচয়ে বিমণ্ডিত এবং বিবিধ চিত্রশিল্পে খচিত হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে যেন সৌন্দর্য্যের বীথিকা বিস্তার করিয়াছিল। সভাস্থলের শীর্ষস্থানে রমণীয় বিশাল মঞ্চ, তদুপরি মহারাজা, রাজা সভাপতি ও সাহিত্যরথিগণের আসন; সম্মুখে উভয়পার্শ্বে, চতুঃপার্শ্বস্থ অলিন্দের উপরিভাগে অসংখ্য কাষ্ঠাসন সমুৎসুক সাহিত্যিক দ্বারা প্রায় সর্ব্বথা অধিকৃত; এই মহাসভার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র কৃত্রিম প্রস্রবণ পঞ্চমুখে সুস্নিগ্ধ সুগন্ধি গোলাপবারির শীত শীকর বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নন্দনের আনন্দরাশির বিস্তার করিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে নিম্নলিখিত উদ্বোধনগীতি গীত হইয়াছিল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

উদ্বোধন—(মঙ্গলাচারণ-গীত)।

কবি-মনো-বিনোদিনি বাণি বরদে !
জ্যোৎস্না-জাল-বিকাশিনি শতদল-বাসিনি সারদে !
কজ্জল-উজ্জ্বল বিলোল-লোচনা,
উরোজ-সরোজে নীরজ রচনা,
নিবরা বরাননা শোভনা পীবর কবরী-নীরদে।
শুনাও শুনাও দেবি সে বীণা ঝঙ্কার,
যে ঝঙ্কার সেই প্রথম ওঙ্কার,
যে ঝঙ্কার অঙ্কে কাব্য অলঙ্কার,
যে ঝঙ্কারে অঙ্কুর অঙ্কের সংখ্যার,
যে ঝঙ্কারে জ্ঞান নাশে অহঙ্কার হৃদি ভাসে সুধাহ্রদে ॥
যে ঝঙ্কারে কাল-ধনুকে টঙ্কার,
যে ঝঙ্কারে তাল বিজয় ডঙ্কার,
গাজে যে ঝঙ্কারে শঙ্খ হুহুঙ্কার,
যে ঝঙ্কারে পুন শান্তি আশঙ্কার,
উঠে সঙ্গীত-তরঙ্গ হাস্য-লীলা-রঙ্গ বিমোদ প্রমোদে ;
কলা-শিল্প-তরু কল্প-তরু বীণা বাজাও বাজাও শুভ শুভদে ॥

তাহার পর শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা একতারা বাজাইয়া নিম্নলিখিত স্বরচিত গানটী গাহিলেন :—

দেশ মল্লার—একতালা

মা, জ্ঞানদে, বরদে, শুভদে সচ্চিদানন্দরূপিণী।
দেবী মহাবিদ্যে, পরম আরাধ্যে, আদ্যেশক্তি বাগ্বাদিনী ॥

প্রতিভাদায়িনী, মধুরভাষিণী, বেদমাতা বিদ্বজ্জন-প্রসবিনী, সঙ্গীত সাহিত্য, কবিত্ব নিরুক্ত, কাব্যকলা-প্রণোদিনী।

নীরব আকাশে, তোমার নিশ্বাসে, জাগিল গম্ভীর রবে দৈববাণী ; ছুটিল পবনে, ভুবনে ভুবনে, উঠিল গগনে তার প্রতিধ্বনি ; রচে তাহা কত বেদবিধিমন্ত্র, কণ্ঠে কণ্ঠে বাজে শত বীণা যন্ত্র, ধায় দ্রুতগতি, যথা স্রোতস্বতী (বিজলী যেমতি) রসনা লেখনী।

পরিশিষ্ট

অনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—

শুভাগত মহোদয়গণ,

আনন্দপরিপ্লুত চিত্তে ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আজি আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে মুর্শিদাবাদবাসিগণের পক্ষ হইতে এবং আমার দীন গৃহে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইল বলিয়া নিজ পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। মাতৃভাষার ও জাতীয় সাহিত্যের সেবা উপলক্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সুধীগণের এই শুভাগমনে মুর্শিদাবাদ ধন্য হইল, আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমি কৃতার্থ হইলাম। মুর্শিদাবাদবাসী আমাদিগের যে আজি কি গৌরব ও আনন্দের দিন, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সুকঠিন। মাতৃসেবায় কাহার না আনন্দ হয়? এই ভাবে—এই সেবার প্রথম অনুষ্ঠান মুর্শিদাবাদে হওয়ায় আমরা মুর্শিদাবাদবাসী যে, প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসে উল্লসিত, এ কথা বলা বাহুল্য। শুভাগত ও সমবেত মহাপ্রাণ সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ নিজের মন দিয়া আমাদিগের চিত্তভাবের পরিচয় গ্রহণ করেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

এই হেমন্তকালের দূর ভ্রমণের অনেক ক্লেশ নিশ্চয়ই আপনাদিগের অনেককে ভোগ করিতে হইয়াছে এবং এই স্থানে অবস্থান কালেও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। আন্তরিক যত্নের ত্রুটি না থাকিলেও কার্য্যের ত্রুটী অনেক সময় হয়। আমাদিগের কত যে ত্রুটি হইবে, তাহা এখন হইতে অনুমেয় নহে। আমাদিগের সকল ত্রুটি আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। আজি এখানে বঙ্গদেশের বিভিন্ন নগরের, বিভিন্ন গ্রামের বিবুধ-মণ্ডলের সম্মিলন। আজি সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এখানে সমবেত হইয়াছেন। আপনারা এখানে বৃথা উৎসব করিতে আসেন নাই, একটি মহাব্রত গ্রহণে আসিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি ও উন্নতি সাধন-জন্য একত্র সমবেত হইয়াছেন। মানুষের জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাতে দেশের হিত, জাতির হিত, সমাজের হিত, তাহার মত পুণ্য কর্ম্ম আর কি আছে? আজিকার সাহিত্য-সম্মিলনের যে

আয়োজন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ত মাতার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন। যদি আমরা মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যদি মাতার নিত্যসেবা ও বার্ষিক উৎসবের ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে শুধু আজি বলিয়া নহে, অনন্তকাল, অনন্তযুগ ধরিয়া অসংখ্য ভক্ত মাতৃপদে অঞ্জলি দিবার জন্য, যাহার যাহা আছে, সাধ্যানুসারে সে তাহাই লইয়া, এই মহাপবিত্র মন্দির-দ্বারে উপনীত হইবে। এই মন্দির বুঝি বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা মহনীয় ও পবিত্র! এত বড় পুণ্যানুষ্ঠানে অসুবিধা ও ক্লেশ অপরিহার্য্য। তীর্থদর্শনে অনেক অসুবিধা ও ক্লেশ আছে, কিন্তু কোন তীর্থযাত্রী, কোন্ ভক্ত সেই অসুবিধা ও ক্লেশকে মনে স্থান দেয়? আপনারা লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া, ভরসা করি, সকল অসুবিধা, সকল ক্লেশ উপেক্ষা করিবেন। আমাদিগের অনিচ্ছাকৃত সকল ত্রুটি উদার ও প্রফুল্লচিত্তে মার্জ্জনা করিবেন।

বাঙ্গলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন ও প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন জেলার পরিষদের বাৎসরিক মিলনোৎসব-অনুষ্ঠানের প্রস্তাব আমাদিগের ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই ইচ্ছার সার্থকতার জন্য দুইস্থানে অনুষ্ঠানের উদ্যোগও হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীভগবানের অবাঙ্মনোগোচরীয় কারণে সে চেষ্টা সাফল্য লাভ করে নাই। শাস্ত্রে বলে—'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। মাতৃভাষার জন্য আমাদিগের এই অনুষ্ঠান যাহাতে স্থায়ী ও সফল হয়, তজ্জন্য, আসুন, মঙ্গলময় ভগবানকে সাক্ষী করিয়া আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। সুখে, দুঃখে; সম্পদে, বিপদে; সুদিনে দুর্দ্দিনে সকল অবস্থাতেই আমরা আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও গৌরবের জন্য আত্মোৎসৃষ্ট হইয়া থাকিব। যদি অন্তর দিয়া সেবা করি, তাহা হইলে আমরা সাফল্য লাভ করিবই করিব।

বাঙ্গালীর সকল কার্য্যই হুজুগে পরিণত হইতে দেখা যায় এবং হুজুগ বলিয়াই এদেশে কোন একটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। কয়েক বৎসর হইল এদেশ বাসীর মনে একটা নূতন আবেগ আসিয়াছে। সেই আবেগটা হুজুগে পরিণত হয় নাই বলিয়া বাঙ্গালী যেন একটী নূতন জীবন লাভ করিয়াছে এবং তাহা হইতে বাঙ্গালী আপনাকে ভাল বাসিতে শিখিতেছে এবং সেই কারণে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির ইচ্ছা অল্প অল্প করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে আসিতেছে। এই জন্যই বাঙ্গালা

ভাষার ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে একটীর স্থানে আর একটী আসিয়া থাকে এবং একটীর বিনাশে অন্যটীর অভ্যুদয় নৈসর্গিক ধর্ম্ম। বহুকাল হইতে আমাদের বঙ্গভাষারও সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আকারের পার্থক্য বঙ্গভাষার উৎপত্তির কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখন কুম্ভকারের চাক ঘুরিতেছে—বঙ্গভাষা সেই চাকে। এই ঘূর্ণামান্ অবস্থায় সাময়িক অনুষ্ঠানাদি দ্বারা কুম্ভকাররূপী উদ্যমশীল ও ভক্ত সাহিত্যসেবীদিগের যত্ন ও নিষ্ঠা অধিকতররূপে সঞ্জীবিত করিতে পারিলে ভাষা সম্পূর্ণাকার ধারণ করিতে পারে।

নিজের কাজ নিজে না করিলে কখন সফলতা-লাভ হয় না। জাগতিক এই নীতির অনুসরণ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা নিজের কাজ নিজে করিতে শিক্ষা করি নাই বলিয়া সকল কার্য্যেই আমাদিগের নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, হইতেছে এবং চিরদিনই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের একটি দোষ দেখিতে পাইতেছি। আমরা সকল কার্য্যে উপদেশক হই, সকলকেই আমরা পরামর্শ দিই, কিন্তু কেহই ঐ কার্য্য নিজে অনুষ্ঠান করি না, কাহাকেও করিতে সাহায্য করি না, কিংবা করিতেও প্রস্তুত হই না। কোন একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে অনুষ্ঠাতাকে কোনরূপে উৎসাহ দান করি না, ক্রটী হইলে আমরা তাঁহার নিন্দা প্রচার করি। কোন দৈব প্রতিবন্ধকে ঐ সদনুষ্ঠানে বাধা ঘটিলে আস্ফালন করিয়া থাকি। আমাদের দেশে এই অবস্থা দূর না হইলে অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও আমরা সম্পূর্ণ অবয়ব-বিশিষ্ট করিতে পারিব না। এই জন্য আমার প্রার্থনা, *আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি পরিহার করিয়া নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে জাগ্রৎ করিয়া সমবেত চেষ্টায় মাতৃভাষাকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিব।*

আমাদিগের অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের নাম আমরা *"সাহিত্য-সম্মিলন" দিয়াছি।* সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য বলিলে যাহা বুঝায়, আজ বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য বলিলে তদপেক্ষা অধিক বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য বলিতে কাব্যাদি বা অলঙ্কার-শাস্ত্র বুঝায়। যাহা কিছুরই সহিত ব্যবহার হয়, সংস্কৃত ভাষায় তাহাই সাহিত্য। আমরা কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজী "লিটারেচার" (Literature) শব্দের হিসাবে সাহিত্য শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি।

বিদেশীয়েরা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য অল্পকালের মধ্যে বিশেষ উন্নত হইয়াছে, কিন্তু যেরূপ পুষ্টি,

যেরূপ উন্নতি হইলে আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই স্পর্দ্ধার কথা হয়, তাহা হইতে আমরা এখনও বহুদূরে রহিয়াছি। সাহিত্যের অনেক পথে, অনেক বিভাগে, আমাদিগকে আরও বহু দূরে অগ্রসর হইতে হইবে, তবে "আমাদের সাহিত্য" বলিয়া আমাদের স্পর্দ্ধা করিবার অধিকার হইলেও হইতে পারে। আমাদের ভাষা সাহিত্যের অনেক দীনতা আছে; তাহা আমাদিগকে পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। আমাদের সাহিত্য পূর্ণ করিবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিঘ্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থাঘটিত; আর কতকগুলি আমাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতিজনিত। যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য আপাততঃ আমাদের নাই। যে সকল আভ্যন্তরিক বাধা আছে, তাহা ত আমরা অন্তরের সহিত ইচ্ছা করিলেই অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের আলস্য, ঔদাসিন্য, জড়তা ও বৃথা স্পর্দ্ধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, উৎসাহ, উদ্যম, আন্তরিকতা ও যতটুকু মনুষ্যত্ব আমাদের আছে, তাহা লইয়া মাতৃসেবার জন্য মাতার মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলে সম্ভবতঃ আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আমাদের সাহিত্যিকগণ এখন যাহা করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় উদাসীন ভাবে। তাঁহাদিগকে ব্রতধারী করিতে হইবে। এই মহৎ ভার সাহিত্য পরিষদের গ্রহণ করা উচিত এবং ভরসা করা যাউক যে তাঁহারাই তাহা গ্রহণ করিবেন।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে অনেক অভাব আছে। অনেক কথা বলিবার সময় আমরা নিজের ভাষায় কথা খুঁজিয়া পাই না; অনেক ভাব ব্যক্ত করিবার উপযোগী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় নাই। এরূপ স্থলে পরাশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের গত্যন্তর নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিলে মর্য্যাদার হানি হয়, তাঁহাদের ত ইহাও মনে করা উচিত যে, আমরা ত অনেক ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবী নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, বিজ্ঞান অনুদিন উন্নত হইতেছে ও হইবে; যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতি করিতেছেন, তাঁহাদের ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবেই। ভাষার পুষ্টির জন্য ইহা আবশ্যক। ইহাতে আমাদের লজ্জার কারণ কিছু নাই। যাহা নিজের জোরে লইতে পারি, তাহা ভিক্ষা নহে। অন্য ভাষা হইতে যাহা কিছু লইব, তাহা নিজের অধিকার বলিয়া লইব—ভিক্ষাস্বরূপ নহে। সকল ভাষাই ত ইহা করিয়াছে। এরূপ ঋণ-গ্রহণে কোন লজ্জা নাই; এরূপ না করিলে কোন ভাষাই

পুষ্টি হয় না। সকল ভাষাই এইরূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে। আজ যে ইংরাজী ভাষা হইতে আমরা এখন শব্দ গ্রহণ করিতেছি, সেই ইংরাজী ভাষাও আমাদের শব্দ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে।

আর এক কথা। বিদেশীয় সাহিত্যে এমন সকল উপাদেয় গ্রন্থ আছে, যাহার অনুবাদ আমাদের ভাষায় হওয়া উচিত। আপনাকে বড় করিতে হইলে গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। আমরা কবে কি ছিলাম, সে অহঙ্কার করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। পরের কাছে গ্রহণ করিতে পারিলে যে লাভ আছে, তাহার প্রমাণ আধুনিক জাপানী। জ্ঞান যেখানে পাইবে, সেইখান হইতেই গ্রহণ করিবে; আমাদের শাস্ত্রেরও সেই নির্দ্দেশ আছে। অতএব বিদেশীয় সাহিত্যের উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ সকলের আমাদের ভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজনীয়। বিদেশীয় উচ্চ সাহিত্যের অনুবাদ হইবার কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। ভরসা করা যাউক যে, সাহিত্য পরিষৎ এই ভার গ্রহণ করিবেন।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য আমাদের সকলকেই সর্ব্বান্তঃকরণে সাধনা করিতে হইবে। সিদ্ধি সাধকের, সৌখিনের নহে। কথাটা বলিতে একটু কুণ্ঠিত হইতে হইতেছে, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যসেবী সৌখিন। সাধকের সংখ্যা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু সৌভাগ্য আনয়ন করাও ত আমাদের নিজের হস্তেই রহিয়াছে। ইংরেজী ভাষায় একটা প্রবচন প্রচলিত আছে যে, নিজের কার্য্য যে নিজে করিতে চেষ্টা করে, ভগবান্ তাহার সহায় হইয়া থাকেন। ইহা সত্য কথা। আমরা যখন নিজের কার্য্য নিজের হাতে লইবার চেষ্টা করিতেছি, তখন ভগবান্ যে আমাদের সহায় হইবেন, ইহা নিশ্চয়। বৎসরে একবার আমরা সম্মিলিত হইয়া যে আমাদের উচ্চ লক্ষ্য আয়ত্ত করিতে পারিব, এরূপ মনে করা যায় না। এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার প্রধানতঃ সাহিত্য পরিষৎকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং সাধারণভাবে আমাদের সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, তাহা আমাদিগের এই সম্মিলনে আলোচিত হইয়া স্থির করা হউক। আমাদের এই উদ্যম যাহাতে সফলতা লাভ করে, তৎপক্ষে আপনারা সকলেই যত্নশীল হউন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ইহাই আমার বিনীত নিবেদন। এক্ষণে সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আপনারা কার্য্য আরম্ভ করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের জমা-খরচ

জমা—		খরচ—	
মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—	৯০৫৫৶১০	সজ্জীকরণাদি বাবৎ—	৫৮৫।৶০
		আহারাদি বাবৎ—	৭৭৮১।/১৫
অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট—	৫৫১৸ ০	মুদ্রাঙ্কণ, কাগজাদি বাবৎ—	২৫৩৸ ০
		আলোক বাবৎ—	১২৬।/১০
		বাজে খরচ—	
মোট জমা—	৯৬০৬৸৶১০	ডাকমাশুল, গাড়িভাড়াদি—	৮৬০/ ৫
মোট খরচ—	৯৬০৬৸৶১০		
৹		মোট—	৯৬০৬৸৶১০

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে যে সকল মহাত্মাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের পত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,
৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩১৪।

কল্যাণবরেষু—

আপনার গত কল্যকার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া আমি বিশেষ সম্মানিত ও বাধিত বোধ করিতেছি। কিন্তু এক দিকে যেমন সুখী হইলাম অন্য দিকে তেমনই অসুখী হইতেছি, কেননা আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও সাধু ব্যক্তির ঈদৃশ আগ্রহবিশিষ্ট অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারা অত্যন্ত অসুখের বিষয়।

যদি আমার যাইবার পক্ষে নিতান্ত অসুবিধা না হইত তাহা হইলে আপনার পূর্ব্ব পত্রের উত্তরেই যাইতে স্বীকার পাইতাম, দুইবার অনুরোধ করিবার জন্য আপনাকে কষ্ট দিতাম না। স্থানান্তরে যাতায়াত করা অভ্যাস নাই, তন্নিমিত্ত তীর্থযাত্রাও আমার অদৃষ্টে প্রায় ঘটে না। স্বাস্থ্য জন্য স্থান পরিবর্ত্তনার্থে মধুপুরে

একটি ক্ষুদ্র বাটী প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু এত নিকটেও বৎসরে এক বার যাইতে পারি না, এ বৎসরও যাওয়া হয় নাই। শরীরের অবস্থা এক্ষণে যেরূপ, তাহাতে যথানিয়মে চলিতে হয়, একটু অনিয়ম হইলে অসুস্থতা হয় এবং স্থানান্তরে যাইতে হইলে কিঞ্চিৎ অনিয়ম অনিবার্য্য। এই সমস্তই যাইতে অনিচ্ছার প্রধান কারণ। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান স্থলে আমার অনুপস্থিতিতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনার অকুণ্ঠিত ও অকৃত্রিম যত্নে ও অপরিসীম বদান্যতায় এবং অসংখ্য সুযোগ্য ব্যক্তির সহকারিতায়, সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আপনি লিখিয়াছেন, আমি যাইতে অস্বীকার হইলে আপনি স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। আমি যদিও আপনার আহ্বানে যাইতে অক্ষম, কিন্তু সে আহ্বান যে কতদূর আন্তরিক ও আগ্রহপূর্ণ তাহা বুঝিতে অক্ষম নহি। এরূপ আন্তরিক যত্নের উপর কায়িক উপস্থিতি আর কিছুই যোগ করিতে পারে না। আপনার এত যত্ন সত্ত্বেও যে যাইতে স্বীকার করিতে পারিলাম না ইহা ইহা নিতান্ত অক্ষমতা-প্রযুক্ত, এ কথা নিশ্চিত জানিবেন এবং তজ্জন্য আপনা অপেক্ষা আমি শতগুণে অধিকতর অসুখী হইতেছি। আশা করি আপনি নিজগুণে আমার এই অক্ষমতা নিবন্ধন ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩রা কার্ত্তিক
শান্তিনিকেতন
বোলপুর।

সবিনয় নিবেদন—

আপনাদের সাদর আহ্বানে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আমার শরীর মনের অবস্থা তেমন নয় যে আপনাদের আহূত মহাত্মাদিগের সহবাসে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিয়া প্রীতিলাভ করিব। আপনাদের সৎসংকল্প সুসিদ্ধ হউক্ এই প্রার্থনা ব্যতীত আর কোন কিছুতে আপনাদের কার্য্যে যোগ দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।

ভবদীয়—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

19, Store Rd.
Balliganj
22nd October.

সবিনয় নিবেদন—

আপনার নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম ; কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা অতদূর যাইবার কষ্ট স্বীকার করিতে সাহস করিতেছি না, আমাকে ক্ষমা করিবেন। প্রার্থনা করি আপনাদের সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য সুসম্পন্ন হউক।

বিনীত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঢাকা ৮ই কার্ত্তিক ১৩১৪।

বহুসম্মান বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনং—

মহারাজ বাহাদুর, আপনকার অনুগ্রহপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া আনন্দে উদ্বেল ও কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই আজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমার আর এখন সে দিন নাই যে, আমি রেলের পথে দূরস্থানে যাইতে পারি, আত্মীয় স্বজনেরা অনুমোদন করেন কি না, ইহা বুঝিবার জন্য পত্রের উত্তর দিতে এই তিনটি দিন বিলম্ব করিয়াছি। কিন্তু কেহই অনুমোদন করিলেন না দেখিয়া এবং নিজেও শরীরের অবস্থানুসারে কোন ক্রমেই সাহস পাইলাম না বলিয়া আজি অতি কাতর প্রাণে এই পত্রখানা লিখিতেছি। আপনি উদারহৃদয়, মহাশয় পুরুষ, স্বদেশবৎসল সমৃদ্ধদিগের মধ্যে অন্যতম মুকুটমণি। আপনি কৃপাদৃষ্টিতে আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

একান্ত অনুগত—শ্রীকালী।*

৫নং রঘুনাথ চাটুয্যে ষ্ট্রীট।

কলিকাতা, ২রা কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল।

সবিনয় নিবেদন—

মহারাজ সর্ব্বাগ্রে আমার শ্রীশ্রী৺বিজয়ার নমস্কার গ্রহণ করুন। মহাশয়ের পত্র পাইলাম। চন্দ্রশেখর ভায়ার নিমন্ত্রণ পত্রও পাইয়াছি। বড়ই দুঃখিত

---

* পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এই পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

হইলাম, আমি সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে সম্পূর্ণ অক্ষম। বিগত ১০ই জুলাই তারিখে আমি রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হই। প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইত। একমাস কাল শয্যাগত ছিলাম। এখন রক্ত আর নির্গত হয় না। কিন্তু ডাক্তার বৈদ্য সকলেই অধিক চলা ফেরা নিষেধ করিয়াছেন। আমি প্রতিদিন প্রাতে প্রায় দুই ক্রোশ করিয়া বেড়াইতাম। তাঁহারা এক ক্রোশের বেশী বেড়াইতে বারণ করেন। এই জন্য এবার রাজা প্যারীমোহনের পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই। আমি বড়ই দুঃখিত, মহাশয়ের অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনে যাইতে পারিলাম না। এই মনঃকষ্টই আমার যথেষ্ট দণ্ড। আমার অপরাধ লইয়া আর অধিক দণ্ড করিবেন না।

বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, অধিবেশন যেন সগৌরবে সম্পন্ন হয় এবং উহার উদ্দেশ্য যেন সুসিদ্ধ হয়। ইতি—

বিনীত—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

কলিকাতা।

বহুমানভাজনেষু—

আপনার পত্র পাইয়া সম্মানিত হইলাম। সম্প্রতি আমার কন্যার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছে। কিন্তু বহরমপুরে যখন সভা বসিবে সে সময়ে তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইবে কি না এখন হইতে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যদি তৎপূর্ব্বেই তাহাকে লইয়া কোথাও বায়ুপরিবর্ত্তনে যাত্রা করিতে হয় তাহা হইলে আমি সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিব না। এই জন্য এবারে আমাকে ক্ষমা করিবেন। অন্য সভাপতি স্থির করিবেন—আমি যদি বাধা না পাই তবে শ্রোতারূপে সভায় যোগ দিতে পারিব। আশা করি আপনি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছেন। ইতি ১২ই আশ্বিন সন ১৩১৪ সাল।

ভবদীয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

কদমতলা, চুঁচুড়া।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নমস্কার নিবেদনমিদং—

আমার পিতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে আপনি কাশিমবাজারে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন এবং এখনও যেরূপ দুর্ব্বল আছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সভায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না,—এইজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। সুস্থ হইলে, অন্য সময়ে আপনার সহিত সাক্ষাত করিয়া, আপনার আহ্বানের গৌরব রক্ষা করিবেন। ইতি—৯ই কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল।

নিবেদক—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার।

কলিকাতা।

বহুমানভাজনেষু—

আমার কন্যার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল থাকায় আপনাদের সাহিত্য-সম্মিলনের আমন্ত্রণ আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম। ১৭।১৮ই কার্ত্তিকের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইব। আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করিতেছেন, সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। ইতি—২৪শে আশ্বিন, ১৩১৪ সাল।

ভবদীয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই সম্মিলনীতে ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য" শীর্ষক পঠিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। কারণ বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতেই বাঙ্গলায় প্রাচীন সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর পর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীনিবাসাচার্য্য বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদেও হরিনামের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের অনেক স্থান তখন হরিনাম-স্রোতে ভাসমান হইত। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্যদ্বয় রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের তেলিয়া বুধুরিতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। রামচন্দ্র কবিত্বের জন্য উপাধি পাইয়াছিলেন। পদকল্পলতিকায় তাঁহার কোন কোন পদের উল্লেখ দেখা যায়। স্মরণদর্পণ নামে তাঁহার এক গ্রন্থ ছিল এবং বঙ্গজয় নামক গ্রন্থে তিনি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকটিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ পদ-রচনার জন্য অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের আদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা বর্ণনা করিয়া কবিরাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুললিত পদাবলী বৈষ্ণব গায়কগণকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র গীত হইত। বাঙ্গলা পদাবলী ব্যতীত তিনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব নামক নাটক ও কর্ণামৃত নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ ব্যতীত মুর্শিদাবাদের বংশীদাস, চৈতন্য দাস, গোকুল দাস ও হরিরামাচার্য্যও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদাবাদের মালিহাটিবাসী যদুনন্দনদাস পয়ার রচনায় সকলের নিকট খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার রচিত কর্ণানন্দ, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের পয়ারই প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন তাঁহার সুললিত পদাবলী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে একজন বৈষ্ণব পণ্ডিত প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বনাথ অনেক সময় সৈদাবাদে

অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ সৈদাবাদে লিখিত হয়। বিশ্বনাথ শেষজীবন বৃন্দাবনে ধর্ম্মালোচনায় ও গ্রন্থলিখনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচিত, তবে তাঁহার রচিত অনেক বাঙ্গলা পদাবলীও আছে।

নববৈষ্ণবধর্ম্ম যখন বঙ্গভূমিতে প্রচারিত হয়, তখন ইহা মুসল্মানগণকেও আকর্ষণ করিয়াছিল। মুর্শিদাবাদের একজন ফকীর এই ধর্ম্মের রসাস্বাদ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সৈয়দ মর্ত্তুজা। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে সমাগত হন। মর্ত্তুজা জঙ্গীপুরের বালিঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসল্মান ফকীর হইয়া হিন্দু বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক সুন্দর সুন্দর পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, একটি পদের ভণিতা এই—

"সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে, কানুর চরণে, নিবেদন শুন হরি। সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া পায়ে, জীবন মরণ ভরি।"

ইহা কোন মুসল্মানের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। ছাপঘাটিতে মর্ত্তুজার সমাধি আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে দুইজন বৈষ্ণব মহাপুরুষ অপার কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম নরহরি দাস, দ্বিতীয় রাধামোহন ঠাকুর। নরহরি জঙ্গীপুর উপবিভাগের পাণিশালা নশীপুর নামক স্থানে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। নরহরি বিশ্বনাথের পবিত্র চরিত অনুসরণ করিয়া আপনাকে ধন্য করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের পর এমন সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার নরোত্তমবিলাসও উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন গৌরচরিত-চিন্তামণিতে তিনি মহাপ্রভুর চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। গীতচন্দ্রোদয়ের সুললিত গীতাবলী তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে। রাধামোহন শ্রীনিবাসাচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মালিহাটিতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে দুর্ল্লভ। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পদামৃতসমুদ্র তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে অন্যান্য কবির পদাবলীর সহিত তাঁহারও অনেকগুলি পদাবলী

গ্রথিত হইয়াছে। রাধামোহন পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃত টীকা করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহনের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি নন্দকুমারকে শ্রীনিবাসের পূজিত মহাপ্রভুর তৈলচিত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাহা কুঞ্জঘাটার রাজধানীতে বিদ্যমান আছে।

ইহার পর মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় না। ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হইলে ক্রমে যে নব বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়, মুর্শিদাবাদেও তাহা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, তাহার নাম "The Murshidabad News." তাহার পর রাজা কৃষ্ণনাথের যত্নে মুর্শিদাবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে উহা উঠিয়া যায়, পরে আবার পুনঃ প্রকাশিত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার পর ভারতরঞ্জন ও মাধুকরী নামক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধিও অনেক দিন চলিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রতিকার ও মুর্শিদাবাদ হিতৈষী প্রকাশিত হইতেছে। সংবাদপত্রের পর মাসিক পত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে। আচার্য্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক সমালোচক কয়েক বৎসর বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হয় সেই সময়ে খেয়াল নামে একখানি পাক্ষিক পত্রও বাহির হইত। এক্ষণে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ঐকান্তিক যত্নে উপাসনা প্রকাশিত হইতেছে। আচার্য্য চন্দ্রশেখরই উহার সম্পাদক। কণিকা নামে আর একখানি মাসিক পত্রও চলিতেছে।

মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা ও অনুশীলন

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুর্শিদাবাদে নব সাহিত্যচর্চ্চারও অভাব ছিল না। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বহরমপুরে এই সাহিত্যচর্চ্চার অত্যন্ত ধূম পড়িয়া যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"তখন বহরমপুরে বাঙ্গলা সাহিত্যচর্চ্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে, তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল,

আর ভারতবর্ষের সংস্পৃষ্ট ইংরেজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসলেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গলার ইতিহাসলেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতী করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর আমি আসার কিছুকাল পরেই—পিণ্ডান্ত-পিণ্ডশেষ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গলাচর্চ্চার মাহেন্দ্র যোগ বলিতে হইবে। আমি মাহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ অবহেলা করি নাই।

"আমি বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পূর্ব্বেই জজ কাছারির সেরেস্তাদার মহাশয়ের ঘরে একটি নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। * * * এই সভায় বিক্রমাদিত্য ছিলেন—জজ সাহেবের সেরেস্তাদার বৈকুণ্ঠনাথ নাগ। সে ঘরটি তাঁহারই ঘর। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্যামাচরণ ভট্ট বেতাল ভট্ট, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন (জাতিতে বৈদ্য) সুতরাং ধন্বন্তরি, বহরমপুরের সরকারী উকীল দীননাথ গাঙ্গুলী ক্ষপণক, বোধকরি তিনি একটু রাগী ছিলেন মনে করিয়া তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইবে। স্বনামপ্রসিদ্ধ গুরুদাস বাবু তখন বহরমপুরের আইনাধ্যাপক ছিলেন, অবশ্য ওকালতীও করিতেন, তিনি ছিলেন বররুচি, আর পিতৃদেব—কালিদাস। ভোরপুর আসরে যখন নবরত্ন সভা জমকাইয়া বসিয়া আছেন, তখন আমি ওকালতি করিতে গেলাম। কোন বেকান্সি ছিল না যে আমি প্রবেশ করিতে পারি, অথচ নবরত্ন সভা আমার সহিত সম্পর্ক রাখিতে উৎসুক হইলেন। আমাকে উৎকট বিকট সম্মানের পদ প্রদত্ত হইল, আমি হইলাম—রাক্ষস, আমি সমস্যা দিতাম, নবরত্ন পূরণ করিতেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিলে রামদাস ও অক্ষয়চন্দ্রের চেষ্টায় বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়।

বঙ্গদর্শনে ও অন্যান্য পত্রিকায় লিখিত প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সংকলিত হইয়া রামদাসের ঐতিহাসিক রহস্য, রত্নরহস্য নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রত্নতত্ত্বে তিনি যে ভারতে ও ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় এ স্থলে দেওয়া

নিষ্প্রয়োজন। তৎপূর্ব্বে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতালহরী, চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার পরই আর একজন মুর্শিদাবাদ হইতে বীণাঝঙ্কারে বঙ্গসাহিত্যলক্ষ্মীকে পুলকিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার নাম আচার্য্য চন্দ্রশেখর। এইখান হইতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস ও আরো কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের চেষ্টায় বৈষ্ণব-সাহিত্যও প্রচারিত হইতেছে।

—o—

এই সাহিত্যসম্মিলনে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত

যাঁহার উদ্যোগে ও আহ্বানে আমরা আজ এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাশীমবাজার নগরে উপস্থিত হইয়াছি, বলা বাহুল্য, এই কার্য্যের সফলতার জন্য মুখ্যতঃ আমাদিগকে তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে। তাঁহার নেতৃত্ব বিনা কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই প্রস্তাবে আমি তাঁহার অনুমোদন ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের আতিথ্যলাভে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন আজ অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন; কিন্তু সেই আনন্দের অভ্যন্তরে দারুণ ব্যথার চিহ্ন প্রচ্ছন্নভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। গত বৎসর আমরা আতিথ্যলাভের আনন্দভোগের জন্য আয়োজন করিতেছিলাম; নিষ্ঠুর বিধাতা অকস্মাৎ বজ্র হানিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দভোগে বঞ্চিত করিয়া-ছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দারুণ শোক বঙ্গের সাহিত্যসেবকেরা বিনাবাক্যে অঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সম্যক হেতুও বর্ত্তমান ছিল।

মহিমচন্দ্রের বিনয়মণ্ডিত মুখশ্রীর সহিত আমার যেরূপ পরিচয় ঘটিয়াছিল, আপনাদের সকলের সেরূপ ঘটে নাই, কিন্তু বঙ্গের এই দুর্দ্দিনে তাহার একটি

উজ্জ্বলতম আশার প্রদীপ অকস্মাৎ নিবিয়া গেলে বঙ্গ-সমাজ যে তমোমলিন হইয়া যাইবে ইহা স্বাভাবিক। সাহিত্যিক সমাজ তখন যে ব্যথা পাইয়াছিলেন, সেই ব্যথার চিহ্ন কথঞ্চিৎ আচ্ছাদিত রাখিয়া আজ অতিথিরূপে এই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য যিনি অরুন্তুদ মর্ম্মপীড়া মর্ম্মস্থলে সঙ্গোপন করিয়া বঙ্গের সারস্বত সমাজের অতিথিসৎকারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের বোধ করি প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই উপলক্ষে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন না করিলে আমাদের ধর্ম্মহানি হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এই আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন যদি এই সময়ে মাতৃমন্দির নির্ম্মাণবিষয়ে মহারাজের সহকারিতা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আশা করি আমাদের এই সময়ের অনুপোযোগী ধৃষ্টতা মার্জ্জিত হইবে। হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে আগুন জ্বলিয়া থাকে, তাহার নির্ব্বাপণ মানুষের সাধ্য কি না তাহা জানি না, তবে পুণ্য-কর্ম্মের জাহ্নবীবারি তাহাকে কতকটা শান্ত রাখিতে পারে। এই সারস্বত সম্মিলনের আহ্বানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মহারাজ যে পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শোকবহ্নির উপর শান্তিবারি নিক্ষেপ করিতে পারে। মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে আমি পুণ্যতম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। মহারাজের যদি ইহা অনুমোদিত হয় এবং তিনি যদি অগ্রণী হইয়া বঙ্গের জনগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, তাহা হইলে মহারাজের নিত্যানুষ্ঠিত সহস্র পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে এই পুণ্যতম কর্ম্ম তাঁহার অন্তরের বিয়োগব্যথার অপনোদনে সমর্থ হইবে, ইহাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি আপনাদিগকে সাহিত্য সম্মিলনের কর্ত্তব্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

ভারতের সাধনা (পৌষ, ১৩৩৬)—

স্মৃতি-তর্পণ

ভারতীয় সাধনার প্রতীকমূর্ত্তি, বঙ্গীয় সভ্যতার চরম ফল, বঙ্গজননীর সুসন্তান, হিন্দু সমাজের নেতা মহারাজ কাশিমবাজার মর্ত্তভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহা ধারণা করাও কঠিন। কারণ তাঁহার সহিত গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভারতের সাধনা পুনঃ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় শুভ অনুষ্ঠানসমূহ এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ও জড়িত যে তাঁহার অভাবে সেই সকলেরও অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই তাঁহার তিরোভাব সহসা মন ধরিতে চায় না। তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইলেও তাঁহার শুদ্ধ অবিনশ্বর আত্মা যাহা অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য এবং অশোচ্য তাহা চিরদিনই জগতের মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে ; তাঁহার বিলোপ সম্ভবে না।

আর তিনি মর্ত্তধামে তাঁহার মহান্ ও উদার প্রাণের যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন সেই ছাপ যতদিন ভারতের সাধনার ও বঙ্গের সভ্যতার অস্তিত্ব লোপ না হয় ততদিন মুছিয়া যাইবে না। সেই জন্যই তাঁহার দেহত্যাগ মন ধরিতে চাহে না। ভারতের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা তাঁহার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন তাঁহাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। কারণ এ বিষয়ে তাঁহার অকাতর মুক্তহস্তে অপরিসীম দান ও প্রাণপাত পরিশ্রমও কেবলমাত্র তাঁহার অন্তরের সামান্য অংশমাত্র বিকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই বৃদ্ধ বয়সেও এ বিষয়ে তাঁহার যৌবনসুলভ উৎসাহ ও উদ্যম, তদালোচনায় গভীর চিন্তা, তদ্বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ এবং উহার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অবিচলিত বিশ্বাস যাঁহারা লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই তাঁহারা তৎপ্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার বিষয় সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারিবেন না।

বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত করিবার চেষ্টায় জাতীয় জীবনের প্রথম স্পন্দন দেখা গিয়াছিল। তাহার ফলে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে তিনি একজন প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। নানা কারণে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত তাঁহার মতের মিল না হওয়ায় তিনি স্বয়ং অপরিমিত অর্থব্যয়ে বঙ্গীয় ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের আর্থিক উন্নতি-সাধনকল্পে মহারাজ কাশিমবাজার

পলিটেকনিক্ প্রভৃতি অনেক শিক্ষায়তন স্থাপন ও সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। অপরদিকে জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধনার্থে রঁাচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন করত তের বৎসরকাল অপরিসীম অর্থব্যয়ে উহা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ইহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। উহাকে সুসংস্কৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে এবং সাধনামূলক শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বমুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত তিনি কিরূপ কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা সে বিষয়ে তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

জাতীয় সাধনামূলক শিক্ষা প্রচলনকল্পে প্রারম্ভিক সাধারণ সভা হইতে তাহার মহাদায়িত্বপূর্ণ সভাপতির পদে বৃত হইয়া তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তজ্জন্য কিরূপ প্রয়াস করিতেছিলেন তাহা আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছি। যেদিন তিনি ঐ পদে বৃত হন সেইদিন সেই সভায় তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল "কেবল যে তিনি ধনবল ও উচ্চপদবীগুণেই এই সভার অধিনায়কত্ব করিবার উপযুক্ত তাহা নহে, পরন্তু দেশের সকল প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠানের অগ্রণী, মহাপ্রাণ এবং বর্ত্তমান সময়ে এদেশে ব্রহ্মচর্য্যমূলক জাতীয় শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়াই তিনি এই পদ অধিকার করিবার সম্যক্‌ভাবে যোগ্য।" ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং ইহা যে কত বড় সত্য তাহা এক্ষণে তাঁহার অভাবেই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি।

আজ পনর বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা মনে পড়ে। তখন তিনি মধুপুরে থাকেন। তথা হইতে প্রাতের ট্রেণে রওনা হইয়া জেসিডি ষ্টেসন হইতে ১১ মাইল কাঁচা রাস্তার পথে একটি সামান্য ভাড়াটিয়া অশ্বযানে একস্থানে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টায় উৎসাহ দিবার জন্য কত দুঃসহ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিয়াছিলেন তাহা আমাদের মনে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

তাঁহার দানশৌণ্ডতার কথা সর্ব্বজনবিদিত। তাহার উল্লেখ বা আলোচনার প্রয়োজন অল্প। কিন্তু তাঁহার দাতাকর্ণের মতন দানের আন্তরিকতার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। অনেকের দানের মধ্যেই আত্মগরিমার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব লুক্কায়িত থাকে। এমন করিয়া আত্মপর-প্রভেদবিহীন দান জগতে বিরল। তিনি যে তাঁহার কিছু অপরের জন্য দিতেছেন, এভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি মনে করিতেন যে, তাঁহার যাহা কিছু আছে তাহা সকলেরই। তিনি সকলের

মধ্যে বিতরণ করিবার জন্যই বসিয়া আছেন। সেইজন্য তাঁহার দান দেশ কাল পাত্র-ভেদে প্রযুক্ত হইতে পারিত না এবং প্রবঞ্চকগণের হস্ত হইতে সকল সময় রক্ষা পাইত না।

এই কথার উল্লেখ করিতে যাইয়া তাঁহার সরল বিশ্বাসের কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। তাঁহার বালসুলভ সরল বিশ্বাস এত প্রবল ও এত গভীর ছিল যে, তাহার ফলে বার বার বঞ্চিত হইয়াও তাহাতে তিনি কখনও ক্ষুণ্ণ হন নাই।

তাঁহার সকল গুণাবলী উল্লেখ করিতে যাইলে একটী বৃহৎ পুস্তক হইয়া যাইবে। তাহা করার উদ্দেশ্য এখন আমাদের নাই। বিশেষতঃ তাঁহার অভাবে এখন আমরা এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহা করাও আমাদের পক্ষে এক্ষণে সম্ভব নহে। ভবিষ্যতে ধারাবাহিকরূপে তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

এক্ষণে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ থাকার ফলে যে কয়টী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারা গিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

তাঁহার অমায়িকতা সর্ব্বজনবিশ্রুত। আমাদের মনে আছে যে, যখন কাশিম-বাজার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (সে প্রায় পঁচিশবৎসর পূর্ব্বের কথা) তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তম সুহৃদ্ স্বর্গীয় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে নাচের সভায় নকীব ফুকরণাদিগণের সহিত রাজশোভাযাত্রায় উপস্থিত হন। তখন আমাদের আশঙ্কা হইয়াছিল যে,এইবার হয়ত তাঁহার এতদিনের অমায়িকতা লুপ্ত হইতে চলিল, কিন্তু আমাদের সে আশঙ্কা যে অমূলক তাহা বার বার লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়াছি। ইহা কৃত্রিম নহে, তাঁহার স্বভাবজাত এবং আন্তরিক উদারতার ফল।

কি ধনী কি নির্ধ্দন, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সকলের পক্ষে তাঁহার দ্বার সমানভাবে সকল সময় উন্মুক্ত থাকিত এবং সকলকেই তিনি সমাদরে আপ্যায়িত করিতেন।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

এই শ্লোকে যে সমত্বভাবের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা তিনি জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়া এবং ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তাহা সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

আর একদিনকার কথা মনে হয়। একদিন একজন সন্ন্যাসীকে তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিতেছিলাম। তিনি তদুত্তরে বলিলেন যে, সংসারে থাকিয়া জিতেন্দ্রিয়তার বিষয় যদি দেখিতে চাও তাহা হইলে মহারাজ কাশিমবাজারের জীবন লক্ষ্য করিও। ধনী সম্প্রদায়ের যে দোষ তাহা তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় চিরজীবন একপত্নীক এবং বিবাহিত জীবন শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার দ্বারা সংযত করিয়া, বিবাহ যে সংযমের জন্য ভোগের জন্য নহে ইহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ধন্য তিনি এবং ধন্য তাঁহার দেশের সাধনা, যাহার ফলে এরূপ আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালীর সভ্যতায় বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধনার অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবনেও ইহার অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। বৈষ্ণব ধর্ম্মসাহিত্য প্রভৃতির জন্য তাঁহার কীর্ত্তির উল্লেখ করিতে যাইলে লেখনী বিশ্রাম পাইবে না এবং এমন কিছুও লিখিতে পারিব না যাহা সকলের জানা নাই। সেইজন্য তাহার উল্লেখেও বিরত থাকিতে হইল।

কেবলমাত্র ধর্ম্মজীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া আজ আমাদের শ্রদ্ধা তর্পণাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। সকলের বিদিত নাই যে, তিনি প্রতিপদ হইতে মহালয়ার দিন পর্য্যন্ত কি শ্রদ্ধাপূত চিত্তে তাঁহার সায়দাবাদ রাজপ্রাসাদবাহিনী জাহ্নবীবক্ষে তর্পণ কার্য্য সমাপন করিতেন। এবার তাঁহার শরীর ভাল ছিল না, তথাপি তাহা হইতে তিনি বিরত হন নাই। কে জানে, হয়ত কাল এই অবসরে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল। যদি তাহা সত্য হয় তবে ইহা বুঝা যাইবে যে, তিনি ভারতীয় সাধনা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই তর্পণ কার্য্য শেষ করিয়া কাশিমবাজার রাজবাটীতে প্রত্যাগত হইয়া নবরাত্রি উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য নয় দিন সঙ্কল্প করিয়া দেবীমাহাত্ম্য শ্রীশ্রী৺চণ্ডী পাঠ করিয়া ভগবতীর আরাধনা কিরূপ ভক্তিভাবে করিতেন তাহা তাঁহার নিকট আত্মীয়গণ ব্যতীত অপরের কাছে সুবিদিত নহে। ধন্য মহারাজ কাশিমবাজার, ধন্য বৈষ্ণবসেবক, ধন্য মায়ের সন্তান!

তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিতে যাইলে তাঁহার শেষ সাধারণ কার্য্যের কথাটী স্বতঃই মনে হয়। তিনি ভারতের সাধনার ঘোর অনিষ্টকর আত্মসম্মানের বিষয় হানিকর সর্দ্দাবিলের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া সেদিন কলিকাতা টাউন হলে বিশেষভাবে

লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। সেইভাবে স্কোবেলের সহবাস-সম্মতি বিষয়ক বিলের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া আর একজন মহাপুরুষ ৺স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। পার্থক্য এই যে তিনি বিদেশীয় ইংরাজ কাউন্সলরদের নিকট, আর ইনি অর্ব্বাচীন দেশবাসীর নিকট এরূপ হইয়াছিলেন। উভয়েই এই অপমান ও লাঞ্ছনা অম্লানবদনে ও স্ফীতবক্ষে সহ্য করিয়া ভারতীয় সাধনার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু ধিক্ দেশবাসী! তোমরা তাঁহার মর্য্যাদা রাখিতে না পারিয়া নিজেদেরই অপকৃষ্টতার পরিচয় দিলে! যদি তাহা দূর করিতে চাও, তাহা হইলে পশ্চিমদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া একবার পূর্ব্বমুখী হইয়া এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর এবং দেশের উদ্ধার ও জগতের মঙ্গল সাধনে রত হও।

প্রবাসী (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)—

মহানুভব মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

জগতে জন্ম হয় অনেক মানুষের, মৃত্যুও হয় অনেকের। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত মানুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্য ঘটে না।

তাঁহার কথা ভাবিলে প্রথমেই মনে পড়ে, তাঁহার বিরাট দানযজ্ঞের কথা। এত বড় দাতা আধুনিক ভারতে দেখা যায় না। তিনি জীবিতকালেই এক কোটির অধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, দানশীল পার্সীদিগের মধ্যেও ইঁহার মত দাতা দেখা যায় না।

তাঁহার দানশীলতার অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার দান কখনও অপাত্রে পড়ে নাই বা কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া টাকা লয় নাই, এরূপ বলা যায় না বটে। কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব এইখানে, যে, উপকৃত কোন ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হইলেও, তাঁহার দান অনুপযুক্ত ব্যক্তি পাইয়াছে জানিতে পারিলেও, কেহ প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়াছে জানিতে পারিয়াও তিনি মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বা মানববিদ্বেষী হইয়া যান নাই। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি কোমলহৃদয়, দয়ালু, বিশ্বাসপ্রবণ এবং সৎকর্ম্মে উৎসাহী ছিলেন।

তাঁহার দানশীলতায় প্রাচীন ও নবীন ভাবের সম্মেলন হইয়াছিল। আগেকার লোকে যে-প্রকার সৎকাজের জন্য দান করা পুণ্যকর্ম্ম মনে করিতেন, তাঁহার সেরূপ দান বিস্তর ছিল; আবার আধুনিক দানশীল লোকেরা বিদ্যাপীঠস্থাপন, দরিদ্র ছাত্রদের ভরণপোষণ, তাহাদের পুস্তকক্রয়ে সাহায্যদান, পরীক্ষার ফীদান, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের জন্য প্রভূত দান, সর্ব্বসাধারণের লাইব্রেরী বা পণ্ডিত-বিশেষের গবেষণা-লাইব্রেরীর জন্য বহু অর্থদান, দরিদ্র গ্রন্থকারের বহি ছাপাইবার ব্যয়নির্ব্বাহ, বিদ্বৎ পরিষদে ভূমিদান ও অর্থদান, বিদ্বজ্জনসম্মেলনের জন্য অর্থদান, প্রভৃতির জন্য ব্যয়ও তাঁহার খুব বেশী ছিল।

তিনি জানিতেন ও বুঝিতেন, যে, আমাদের দেশে যে-সব পণ্যশিল্প ছিল, তাহার অনেকগুলি লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে, এবং তাহাদের অনেকগুলির জায়গায় বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী পণ্যদ্রব্যোৎপাদনের কারখানা স্থাপিত না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। এই কারণে তিনি আধুনিক পণ্যশিল্পক্ষেত্রেও উদ্যোগিতা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং প্রভূত অর্থ এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের জন্য কলিকাতার টাউন হলে প্রথম যে সভা হয়, তিনি তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কৃষি ও পণ্যশিল্পে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিতেন। ব্যাঙ্কস্থাপন, জীবনবীমা কোম্পানী স্থাপন, প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহার উদ্যোগিতা ছিল।

তিনি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যত সৎকার্য্য করিয়াছেন ও যত দান করিয়া গিয়াছেন, কেহ যন্ত্রের মত তাহা করিয়া গেলেও, তাহারও প্রশংসা হইত। **কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার কাজের চেয়ে বড় ছিলেন।** তাঁহার মত সকল ধর্ম্মের সাধুলোকদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও প্রীতিসম্পন্ন, নিরহঙ্কার, নম্র, অমায়িক ও অতি ভদ্রলোক কচিৎ দেখা যায়। তাঁহার যে এত ব্যয় হইত, তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল, তাহা নিজের বিলাস ও ভোগসুখের জন্য নহে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের গুণাবলী তাঁহাতে লক্ষিত হইত। তিনি তৃণাদপি সুনীচ নিজেকে মনে করিতেন, তরুর মত সহিষ্ণু ছিলেন, নিজে সম্মানপ্রয়াসী না হইয়া অন্যকে মান দিতেন;—তিনি হরিগুণগানের যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। ধন্য তিনি। ধন্য তাঁহার বংশ ও জন্মভূমি।

———

বাংলার বাণী (ঢাকা, ১৪ই নভেম্বর, ১৯২৯)—

পরলোকে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাংলার গৌরব দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ পরলোক গমন করিয়াছেন। বাংলার সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম অভ্যুদয়ে যে সকল ধনী ধনভাণ্ডার মুক্ত করিয়াছেন—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাংলার এমন কোন অভ্যুত্থানের দিক নাই যাহাতে মণীন্দ্রচন্দ্র দান করেন নাই—বাংলার জাতীয় প্রচেষ্টার সকল স্তরে তাঁহার দানশক্তির পর্য্যাপ্ত পরিচয় রহিয়াছে। 'দানে নিঃস্ব মণীন্দ্র' কবির একথা অতি সত্য। বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সাহিত্য ধর্ম্ম-শিক্ষা রাজনীতি সকল দিকেই তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, সকল দিকের জন্যই তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কাহারো মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করি না, মৃত্যু নাই—মৃত্যু মিথ্যা। মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সাধনোচিতলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি তাঁহার দেশবাসীর অন্তরস্মৃতিপটে চিরজীবী হইয়াই থাকিবেন।

নবশক্তি (১৫ই নভেম্বর, ১৯২৯)—

মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী

মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর আকস্মিক তিরোধান সমগ্র বাঙালীর অন্তরে গভীর বেদনার সঞ্চার করেছে। সারা বাঙলার মাঝে তিনি একমাত্র রাজা ছিলেন, যিনি জনহিতের জন্য দুহাতে অর্থ দান করে করে নিজে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। দেশের শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, পণ্ডিত, অক্ষম সকলের চাই অর্থ। কে দেবে?—মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী। একটা জীবনে এক কোটিরও বেশী টাকা দান করেও তিনি সর্ব্বদা মনে করতেন, কিছুই দান করা হয়নি, কোন অভাবই পূর্ণ করা হয়নি। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর তাঁর ছিল না, আকর্ষণও নয়, দেশের লোকদের

খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে নিজে ফকিরী নিতেও যেন প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ছিলেন কলির দাতাকর্ণ, মানবতার জীবন্ত বিগ্রহ—আজ তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি আর মনে মনে ভাবছি এতখানি উদারতা এতখানি মানবতা নিয়ে আর কি কোন রাজা মহারাজা বাঙালীর দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচাবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করবেন?

———

সঞ্জীবনী (১১ই নভেম্বর)—

পরলোকে কাশিমবাজারের মহারাজা

গত সোমবার রাত্রি ১টা ২২ মিনিটের সময় কাশিমবাজারের স্বনামধন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন নিরহঙ্কার, বদান্য, স্বদেশপ্রেমিক, শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তিকে হারাইল।

* * * * মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, মহারাজকে গত ১৯১৫ খৃঃ অব্দ হইতে জানি, তাঁহার দানের খ্যাতি শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া জানিলাম তাঁহার বিবিধ দান এক কোটির উপর। কোন পার্শী এত দান করিয়াছেন বলিয়া তো আমার জানা নাই।

গত ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। দুই বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। কিন্তু তাঁহার মনের বলে তিনি বাল্যকালেই শিক্ষা ও সৎচিন্তার প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন।

কাশিমবাজারের মহারাজা, মহারাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয়, মহারাণী স্বর্ণময়ী মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতুলানী। ইঁহার পিত্রালয় শ্যামবাজারে ছিল, বাল্য ও যৌবনের প্রারম্ভ সেই বাটীতেই কাটাইয়া ছিলেন। তিনি বিরাট জমিদারীর উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু বাল্যকালে সুখ সম্পদের মুখ দেখিতে পান নাই। তিনি যখন হেয়ার স্কুলে পড়িতেন তখন আমরা দেখিয়াছি, তিনি সামান্য বেশেই

বিদ্যালয়ে আসিতেন, দরিদ্র ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময়ে তিনি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অতি সামান্য অর্থই পাইতেন, সুতরাং দরিদ্রের যে কিছু ক্লেশ তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার যেরূপ শাদাসিদে পোষাক ও চালচলন ছিল উত্তর কালেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দরিদ্রতার মহৎ শিক্ষা তাহার জীবনকে গঠন করিয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর তিনি কাশিমবাজারের জমিদারী লাভ করেন।

গত ৩২ বৎসরে এই জমিদারী হইতে তিনি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এক কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। অর্থ-করী শিক্ষা, ব্যবসায় স্থাপন, সৎসাহিত্যের প্রচার ও বিদ্যানুশালনের জন্য তিনি অকাতরে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

অনেক উচ্চশ্রেণীর গবেষক ও গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইতেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী ১৩১৪ সালে মহারাজের কাশিমবাজারস্থিত রাজ-বাটীতেই প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা এখন প্রতি বৎসর বঙ্গদেশের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গৃহের স্থান তাঁহারই দান।

প্রসিদ্ধ "বেঙ্গলী" সংবাদপত্র যখন মুমূর্ষু তখন তিনি তাহার একজন প্রধান স্বত্বাধিকারী হইয়া উহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গলীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি এবং রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কসের সংস্থাপনকর্ত্তা। বাঙ্গালাদেশে চীনামাটির বাসন তৈয়ারীর সর্ব্বপ্রকার উপাদানই আছে কিন্তু উৎসাহ ও অর্থের অভাবে বাঙ্গালাদেশের কেহই চীনামাটির দ্রব্য তৈয়ার করিতে অগ্রসর হয় নাই। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস তাঁহার এক মহৎ কীর্ত্তি। বাঙ্গালা দেশের অনেক ছাত্রই গরীব। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষা প্রদান করিলে অনেক বালক ছাত্রাবস্থাতেই উপার্জ্জনশীল হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি বাগবাজারে পলিটেক্‌নিক স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বহু দেশীয় কোম্পানীর সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

তিনি গত ১৫ বৎসর বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। নূতন শাসনতন্ত্র আরম্ভ হইলে তিনি কাউন্সিল অব ষ্টেটে বঙ্গীয় জমিদারের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

মহারাজের ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি বিখ্যাত। ধর্ম্মকার্য্যের জন্য তাহার দান সামান্য নহে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি বহরমপুরের বাঞ্জেটিয়া নামক স্থানে শিল্প প্রদর্শনীর বৃহৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বহু বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এমন বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে তাঁহার জমিদারীর বাহিরে যে কেহ তাঁহাকে বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় নিমন্ত্রণ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তথায় গমন করিতেন এবং অর্থ দান করিয়া আসিতেন।

তিনি যে কত সহস্র দরিদ্রের মা বাপ ছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, দরিদ্রেরা আজ যথার্থই পিতৃমাতৃহীন হইল। তিনি যথার্থই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দান করিতে করিতে তাঁহার কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়াছিল। তিনি কেবল কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ করেন নাই, বহু লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই ঋণ শোধের জন্য গিলাণ্ডার আরবুথনট কোম্পানীর হস্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহাতে তাহার মনে এই সান্ত্বনা ছিল যে জন্মভূমিকে নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাইবার এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্যই পরের হস্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়াছেন।

কলিকাতার দরিদ্র রোগিগণ বিনা চিকিৎসায় অনেক সময় মারা যায়। মহারাজা "গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাভবন" স্থাপন করিয়া বিশুদ্ধ কবিরাজী ঔষধ দানের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বহরমপুর কলেজ আগে গবর্ণমেণ্ট কলেজ ছিল। গবর্ণমেণ্ট যখন উহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন তখন মহারাণী স্বর্ণময়ী উহার ভার গ্রহণ করেন, এবং অবশেষে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী উহার জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। মহারাজা যে

কেবল প্রাচীন বহরমপুর কলেজ রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, ঐ কলেজে ব্যবসা বাণিজ্য ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা শিক্ষার এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন, যাহা অন্য কোন কলেজে নাই। বাঙ্গালীদিগকে বিদ্যাদান ও অর্থশালী করাই মহারাজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

সম্প্রতি ম্যালেরিয়া কমিশন বহরমপুর গিয়াছিল, তখন তাঁহার জ্বর ছিল। এই জ্বর লইয়াই তিনি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়েন।

চিকিৎসার্থ তাঁহাকে গত ৯ই নবেম্বর (শনিবার) কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ মহারাজের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারা যায় নাই।

মহারাজ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। জীবনের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরলোকে সদ্‌গতি লাভই করিয়াছেন।

মহারাজের যোগ্যপুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী তাঁহার পিতার জীবনের বিশুদ্ধতা অবলম্বন করিয়া স্বর্গগত আত্মার আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

আনন্দবাজার (২৭শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৩২)

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও সৌজন্য বশতঃ অনেক সময় অত্যুক্তি বা অতি প্রশংসা করা হইয়া থাকে। কিন্তু পরলোকগত কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সম্বন্ধে সংবাদপত্রাদিতে যাহা লেখা হইতেছে তাহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নয়। অন্য কোন দেশের কোন দানবীরের সঙ্গে আমরা তাঁহার তুলনা করিব না। আমরা শুধু বলিব, তিনি ছিলেন দাতাকর্ণ। নিজের দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য এমন অজস্র দান এ যুগে খুব কম লোকের জীবনেই দেখা গিয়াছে। এদেশে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন জনহিতকর বা দেশহিতকর অনুষ্ঠান হয় নাই যাহাতে তিনি দান করেন নাই। এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা

সামাজিক প্রতিষ্ঠান নাই বলিলেই হয়, যাহা তাঁহার সাহায্য পায় নাই। কেহ যদি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিত যে, এই কাজে দেশের উন্নতি হইবে তাহা হইলেই তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। এজন্য সময় সময় তাঁহাকে প্রতারিত পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বহুমুখী দানের বিশালতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের তৈলচিত্র উন্মোচন উপলক্ষে ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ আর্কোহার্ট বলিয়াছিলেন, শিক্ষা বিষয়ে এদেশে মহারাজ যে দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। একদিকে দীন-দুঃখীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া, অন্য দিকে গভীর স্বদেশপ্রেম—এই দুই ভাব হইতেই তাঁহার এই বিরাট দান সম্ভবপর হইয়াছিল।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি মহারাজের অকৃত্রিম অনুরাগ—এমন কি তীব্র ভালবাসা ছিল বলিলেই হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি কত দিক দিয়া কত ভাবে যে দান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছিলেন একজন প্রধান কর্ণধার, বন্ধু এবং হিতৈষী। তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির উপর পরিষদমন্দির ও রমেশভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। বহু মূল্যবান্ বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রকাশে তিনি সাহায্য করিয়াছেন। বহু দরিদ্র সাহিত্যিক তাঁহার সাহায্যে সরস্বতীর সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আজ কাল যে বার্ষিক বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হয়, তাহার প্রথম অধিবেশন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের উদ্যোগেই বহরমপুরে হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্ম যাহাতে দেশ-মধ্যে সুপ্রচারিত হয়, এজন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার এবং দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশ করিবার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে হরিভক্ত বৈষ্ণবের লক্ষণ বলা হইয়াছে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

মহারাজের মধ্যে এই আদর্শ বৈষ্ণবের সব গুণই বিদ্যমান ছিল। বাস্তবিক পক্ষে এমন বিনয়ী, অমায়িক, সহৃদয়, সৌজন্যের অবতার আমরা আর দেখি নাই। 'অমানিনা মান-দেন'—এতো তাঁহার প্রকৃতির একটা বিশেষ লক্ষণই ছিল। অতি

সামান্য দরিদ্র ব্যক্তিকেও তিনি তুচ্ছ করিতেন না, তাহারও সহিত সমপদস্থ বন্ধু ও আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলের যে মহাসভায় বাঙ্গলা দেশ প্রথম বিলাতী পণ্য বয়কট ঘোষণা করে, তিনি ছিলেন সেই চিরস্মরণীয় সভার সভাপতি। বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসে কেবল এই একটী ঘটনার জন্যই তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে।

প্রাচীন বাঙ্গলার একটা আদর্শ ছিল, তাঁহার একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। আজ বিদেশী সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে, জীবন সংগ্রামের কঠোরতায় বাঙ্গালী চরিত্রের সেই সব বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যে দুই একজনের মধ্যে শেষ তাহার বিকাশ দেখা গিয়াছে, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। বাস্তবিকই তিনি শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-ব্যবহারে, সৌজন্য-শালীনতায়, ধর্ম্মে ও সংস্কারে সব দিক দিয়াই খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। এই বাঙ্গালী প্রধানের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। বাঙ্গলা দেশ যেমনটী হারাইল, তেমনটী আর বুঝি ভবিষ্যতে হইবে না।

স্বায়ত্তশাসন, (কলিকাতা, ১৭ই নবেম্বর)—

পরলোকে রাজর্ষি স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

কে, সি, আই, ই

সোমবার ইং ১১ই নবেম্বর ১৯২৯, রাত্রি ১-২৩ মিনিটের সময় বঙ্গের দাতাকর্ণ মহাপ্রাণ বৈষ্ণবপ্রবর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের প্রকোপ যে খুব বেশী হইয়াছিল তা বলা যায় না, কেন না তিনি সম্প্রতি ম্যালেরিয়া কমিশনের সভ্যবৃন্দকে বহরমপুরে সাদর অভ্যার্থনা করিয়াছিলেন। ৩রা নবেম্বর হইতে রোগ প্রবল আকার ধারণ করায় তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত

শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় মহাশয় সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা আনয়ন করেন। তিনি ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল, এমন কি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয় রাধাকৃষ্ণের প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া গঙ্গাজল পানান্তে হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে করিতে জীবলীলা সাঙ্গ করেন।

স্বর্গীয় মহারাজ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই বৎসরের সময় মাতৃহারা হন এবং ত্রয়োদশ বর্ষে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ী মহারাজার মাতুলানী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার এষ্টেটের উত্তরাধিকারী হন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর উদারতা ও বদান্যতার বিষয় বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ সকলেই জানেন। সেই গুণগুলি মণীন্দ্রচন্দ্রে সমস্তই বর্ত্তিয়াছিল। কাশিমবাজার এষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব লাভ করা অবধি স্বর্গীয় মহারাজ শিক্ষা বিস্তারকল্পে বাঙলায় ও তাহার বাহিরে প্রায় দুই কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিস্তারকল্পে তাঁহার দানশীলতা অতুলনীয়। তিনি মহারাজা কৃষ্ণনাথের নামে বহরমপুরে একটি উচ্চ শ্রেণীর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুল স্থাপন ও তৎসংশ্লিষ্ট অনেকগুলি বোর্ডিং হাউসের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বহু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিচালনা কল্পে বার্ষিক অর্থ সাহায্য করিতেন। দৌলতপুর ও রংপুর কলেজ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। কলিকাতা পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিটিউট, ইথোরার খনিজ বিদ্যাশিক্ষালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীকে বৃত্তিকরী শিক্ষা প্রদানকল্পে তিনি ইংলণ্ড, জাপান, জার্ম্মাণী ও আমেরিকাতে অনেক ছাত্র পাঠাইয়াছিলেন। বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট, মূক বধির বিদ্যালয়, অন্ধ বালক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এক সময় সংস্কৃত কলেজের দুই শত ছাত্রের বেতন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফিসের অভাবে পড়িত তিনি তাহাদের জন্য প্রতি বৎসর দুই হাজার টাকা করিয়া ব্যয় করিতেন। তাঁহার দানে প্রতি বৎসর দুই তিন শতের অধিক ছাত্রের খাদ্য, শিক্ষার বেতন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল।

মহারাজ একজন প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার অর্থে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ভৃগুসংহিতার বঙ্গানুবাদ সম্ভব হইয়াছে

মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীরই অর্থে। কলিকাতার সারকুলার রোডের উপর যে জমির উপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ভবন প্রতিষ্ঠিত, সে জমি মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীরই দান। বোলপুরে বাঙ্গলা অভিধান প্রণয়নের জন্য তাঁহার মাসিক বৃত্তি ছিল।

মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথা দিত। তিনি কলিকাতার এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতাল স্থাপনের সময় প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। তিনি কাশিমবাজারস্থিত কার্জ্জন দাতব্য হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উক্ত দাতব্য হাঁসপাতালের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি একাকী বহন করিতেন। অন্যান্য বহু স্থানে তিনি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দেশের শিক্ষা ও সাধনার ইতিহাসে পরলোকগত মহারাজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কলিকাতা কংগ্রেসে যেবার প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, দেশবাসী তাঁহাকে উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধনে নেতৃত্ব করিতে নির্ব্বাচন করিয়াছিল। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্, রাজগাঁও ষ্টোন ওয়ার্কস্, চাঁইবাসার চায়না ক্লে প্রভৃতি তাঁহারই উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও দান করিয়াছিলেন ; এ জন্য তাঁহার উদার হৃদয় সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিত, তিনি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি এমনি ভাবে একাগ্রচিত্তে তাঁহার সমগ্র অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গল সাধনের গুরু দায়িত্বভার সদা সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে তিনি বহন করিতেন। তিনি ১৫ বৎসরের অধিক কাল বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। পরলোকগত মহারাজ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার্স অব কমার্সের সহকারী সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন ; তদুপরি তিনি মুর্শিদাবাদ এসোশিয়েসনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন।

কাশিমবাজারের পরলোকগত মহারাজ বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। 'রাউলাট বিলের' আলোচনা কালে

তিনি উক্ত বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন, মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড আইন প্রবর্ত্তনের পর পরলোকগত মহারাজ বাঙ্গালা দেশ হইতে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৯ সালে তিনি "মহারাজা" উপাধি এবং ১৯১৫ সালে তিনি কে, সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন।

পরলোকগত মহারাজ জীবনে অনেক শোক তাপ পাইয়াছেন কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ চিত্ত এই সব মর্ম্মান্তিক দুঃখ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিত। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এত উদার মতাবলম্বী ছিলেন যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোন প্রকার গোঁড়ামী তাঁহার মনে স্থান পাইত না। কলিকাতার বহুবাজারে যে বৌদ্ধ বিহার আছে, তাহার ভূমিখণ্ড তিনিই দান করিয়াছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইতে না হইতেই কলিকাতা সহরস্থ স্কুল কলেজ ও বহু কর্ম্মস্থল মহারাজের সম্মানার্থ বন্ধ হইয়াছিল। মফঃস্বলের সকল স্থানে স্কুল, কলেজ, বার-লাইব্রেরী, পুস্তকাগার, ক্লাব এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহার সম্মানার্থ বন্ধ ছিল। দেশ-জননীর একনিষ্ঠ সেবককে কলিকাতাবাসী জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে রাজনৈতিক মতামত পরিত্যাগ করিয়া একত্র সমবেত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য ১৫ই নবেম্বর শুক্রবার টাউনহলে এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

মহারাজের দানের বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন—

মহারাজের কর্ম্মতৎপরতা বহুমুখীন ছিল। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, মহারাজের দানের পরিমাণ কোটী টাকার উপর; এস্থলে মহাত্মাজী একটা ভুল করিয়াছেন; তিনি শুধু মহারাজ বাহাদুর শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে দান করেন, তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বিভিন্ন কাজের জন্য তিনি যে দান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ চার পাঁচ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

ঋত্বিক্ (২৯শে কার্ত্তিক)—

পরলোকে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

গত ১১ই নভেম্বর তারিখে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দেহত্যাগ করিয়াছেন। যদিও প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন তথাপি তাঁহার অভাব দেশবাসী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছে। দেশের বহু লোক-হিতকর সদনুষ্ঠানের তিনি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কলিকাতার সাহিত্য পরিষদের বাড়ী তাঁহারই প্রদত্ত জমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। দেশ যাহাতে শিল্পশিক্ষায় উন্নতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতা কংগ্রেসে প্রথম শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। তাঁহার সাহায্য লইয়া অনেক ছাত্রকে উচ্চতর শিল্পশিক্ষার জন্য ইংলণ্ড জাপান ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাঠান হইয়াছে। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস তাঁহারই সাহায্যে গড়িয়া বাঁচিয়া আছে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ঔষধালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশে এমন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান খুব অল্পই আছে যে প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি অর্থব্যয় করেন নাই।

সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যে তাঁহার গভীর ও ব্যাপক সহানুভূতি তাঁহাকে দেশবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি ভক্ত ও সাধক ছিলেন। জীবনে যদি সত্যকার কোন সাধনা না থাকে দেশের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির জন্য কাহারো প্রাণ এমন ভাবে কাঁদিয়া উঠিতে পারে না। দেশের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে যে কত প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার অতীত দানের কীর্ত্তিস্তম্ভ গুলির দিকে তাকাইলে সহজেই উপলব্ধি হয়। বাংলাদেশ যেন একজন অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিকে হারাইল। আমরা আজ সশ্রদ্ধ অন্তরে ব্যথিত হৃদয়ে পরমপিতার শ্রীশ্রীচরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করি।

হিতবাদী (১৫ই নভেম্বর, ১৯২৯)—

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

বঙ্গের গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব কাশিমবাজারের দানশৌণ্ড মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র আর ইহজগতে নাই! গত ১১ই নবেম্বর সোমবার রাত্রি ১টা ২৩ মিনিটের সময় মহারাজের শেষ নিঃশ্বাস অনন্ত বায়ুমণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়াছে। জরামরণশোকতাপপূর্ণ নরলোক ত্যাগ করিয়া তাঁহার আত্মা লোকান্তরে গমন করিয়াছে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ইদানীং বঙ্গদেশের একজন দিক্‌পাল স্বরূপ ছিলেন। অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিরন্নের অন্নদাতা, বিপন্নের সহায় এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তাঁহার মত এখন এই বঙ্গদেশে কয়জন আছেন? বহুবিধ রাজ-সম্মানে সম্মানিত এবং উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগভাজন হইয়াও মহারাজ এক দিনের জন্যও দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি বীতরাগ বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু তিনি দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ও শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান্ থাকিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কেহ তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। তিনি অসহায় দুঃস্থ ছাত্রের পিতৃস্বরূপ ছিলেন; সহস্র সহস্র ছাত্র তাঁহার অন্নে পুষ্ট,তাঁহার ব্যয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে ও করিতেছে। তিনি এতই সরলচিত্ত ও পরদুঃখকাতর ছিলেন যে, কেহ তাঁহার নিকট গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করিতেন। এই সরল বিশ্বাস ও পরদুঃখকাতরতার জন্য অনেক সময় তিনি শঠ প্রবঞ্চকদিগের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, কিন্তু সেজন্য ভবিষ্যতে কোনরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিতেন না।

মহারাজ পাশ্চাত্ত্যপ্রথানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত "উচ্চশিক্ষিত" ছিলেন না, কিন্তু যে শিক্ষায় মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, যে শিক্ষায় দরিদ্রের দুঃখ মোচনে, অভাবযুক্ত ব্যক্তির অভাব মোচনে প্রবৃত্তি জন্মে, যে শিক্ষায় দেশের স্থায়ী মঙ্গল সাধনের জন্য আন্তরিক আগ্রহের বিকাশ হয়, সেই শিক্ষায়

পরিশিষ্ট

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সমকক্ষ বঙ্গদেশে আর কয়জন আছেন? এহেন মহানুভবের মৃত্যুকে বঙ্গের একটা "ইন্দ্রপাত" বলিলে অত্যুক্তি হয় কি?

কোন্‌দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না? সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল ও কলেজ, আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির জন্য "গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" শিল্পশিক্ষার জন্য "পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিটিউট" কত নাম করিব? সাহিত্য, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য সকল বিভাগেই তাঁহার আন্তরিক অনুরাগের নিদর্শন স্বরূপ প্রভূত দান তাঁহার সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। এই অপরিমিত দানের জন্য তাঁহাকে শেষাবস্থায় অর্থাভাব বোধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরের অভাব মোচনের জন্য যিনি সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত, নিজের অভাব তিনি গণনীয় বলিয়া মনে করেন না। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও সেই জন্যই কখনও আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে শিক্ষা করেন নাই। আমরা আর একটি একটি করিয়া তাঁহার মহানুভবতার কত উল্লেখ করিব? একদিকে তিনি যেমন কোমল হৃদয় ছিলেন, অন্য দিকে তিনি সেইরূপ সহিষ্ণু ও দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র কুমার মহিমচন্দ্র যৌবনে পিতামাতা, বালিকা বধূ ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত করিয়া বৃন্দাবন ধামে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের চরণে চির আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, মহারাজের উপযুক্ত জামাতা ধর্ম্মদাসও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অমরধামে গমন করিয়াছেন। এইরূপ ছোট-বড় কত শোকে মহারাজ বাহাদুর জর্জ্জর হইয়াছেন; কিন্তু সেজন্য শোকে অভিভূত হইয়া আত্মহারা হয়েন নাই। প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় সুখ দুঃখ সকলই ভগবানের দান বলিয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছেন।

মহারাজ বাহাদুর কিছুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হইয়া কাশিমবাজারেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু সেখানে রোগ শান্তির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আনয়ন করিয়া ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। কিন্তু স্বয়ং মহাকাল যাহাকে আহ্বান করিয়াছে, তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখিবে? সোমবার মধ্যরাত্রির পর মহারাজ সেই মহাকালের আহ্বানে সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন।

*   *   *   *

শোকাচ্ছন্ন বাঙ্গলা

কলিকাতা টাউন হলে বিরাট শোক-সভা *

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই মহোদয়ের আকস্মিক মৃত্যু উপলক্ষ্যে, গত ১৫ই নবেম্বর অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকায় কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট শোক সভা আহুত হয়। সভার সময়ের বহু পূর্ব্বেই সভাগৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। মহারাজের পলিটেকনিক্ ইনষ্টিটিউসন হইতে কয়েকশত ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ বাগবাজার হইতে মিছিল করিয়া সভায় যোগদান করেন। শিক্ষার্থী মাত্রই তাঁহার কত প্রিয় ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সভায় পুষ্পমাল্য বিভূষিত মহারাজের একখানি তৈলচিত্র রাখা হইয়াছিল।

সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, বি, মরেনো, মিসেস্ ভিঃ সি, বেষ্টন, ডাঃ

---

* Mr. Krishna Kumar Mitter proposed Mr. Jatindranath Basu to the chair. The proposal was seconded by Rai Bahadur Jogendra Ch. Ghosh.

PRESIDENT'S SPEECH.

"Maharaja Sir Manindrachandra Nandy of Cossimbazar filled a large place in the life of our country for over a quarter of a century. He was the immediate successor to his aunt Maharani Swarnamoyee in the possession of the Cossimbazar estates. After the lapse of over three decades, the name of Maharani Swarnomoyee is a name revered in every home in Bengal. It will be a long time before Bengal forgets her large-hearted benefactions. The late Maharaja not only continued the traditions of his house in acts of charity, but he dedicated himself and all his energies and belongings to the service of his countrymen. He was a self-less patriot in the truest sense of the word. He mixed freely with the people in every walk of life, and he took part in their every day concerns and in their joys and their sorrows, with his wide sympathy. The late Maharaja initiated and carried out measures calculated to meet the needs of the people and to strengthen them where they were halting. He saw the need for the spread of education, and felt how handicapped

অন্তিম শয়ানে মণীন্দ্রচন্দ্র

সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, মিঃ টীপেণ্ডেল, মিঃ আই, বি, বরোস, দীঘাপতিয়ার কুমার এস্, সি, রায়, মিঃ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, রেভাঃ ডাঃ ডব্লিউ এস্, আর্কোহার্ট, সামসুল-উলেমা কামালুদ্দিন আহম্মদ, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত ললিত-মোহন দাস, লেফটেন্যাণ্ট বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, কুমার শৈলেশ্বর সিংহ রায়, প্রফেসর এন্, সি, নাগ, মিঃ, এস্, এম্, বোস্, শ্রীযুত অমূল্যধন আঢ্য, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুত মহীতোষ রায় চৌধুরী ও মিঃ জে, সি, গুপ্ত ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রস্তাবে ও রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সভাপতি করা হয়। সভাপতি মহাশয় মহারাজের অশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বলেন "মহারাজ বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সকলেই তাঁহার আপনার ছিল—বিশেষতঃ দরিদ্রের তিনি বন্ধু ছিলেন। তিনি লোকশিক্ষার জন্য অকাতরে দান করিয়াছেন—বিদ্যার্থীকে পালন করিয়াছেন—যাহাতে বাংলা তথা ভারতে শিল্প-শিক্ষার প্রচলন হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই মহারাজ কাশিমবাজার পলিটেক্নিক, খনিজ বিদ্যা শিক্ষালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যুবকদের বেকার সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম সর্ব্বজনবিদিত।"

---

we are by reason of the people not being educated in the light of present day requirements. He helped a very large number of schools and scholars, and he himself established several schools, some of which like the Maharaja Cossimbazar Polytechnic School and the Mining School have distinctive features intended to deal with the problem of unemployment, which has begun to loom into prominence. The Maharaja contributed largely towards pioneer efforts at organising our industrial and economic life. Owing to the failure that often takes place in such pioneer efforts, he lost heavily. But such failures never left behind any bitterness in him, and he entertained his robust optimism till the end.

The Maharaja was an outstanding example of a man endowed with great wealth refusing steadfastly to live a life of luxury and ease. He was a *Rishi* in the truest sense, thinking, feeling, and working silently but steadfastly for the good of the present and future generations of his countrymen. Sj. Hirendranath Dutt then moved the following resolution;

"এই বিষয় চেষ্টা করিতে, তাঁহাকে প্রভূতপরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল—কিন্তু তাহাতেও তিনি কখন হতাশ হন নাই, লোকের উপর বিশ্বাস হারান নাই। অন্তিমকাল পর্য্যন্ত এসব বিষয়ে তাহার অদম্য উৎসাহ ছিল।"

"প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বিলাসবৈভবে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, এ কারণেই তাঁহাকে সত্যকার ঋষি বলিয়া আমরা মনে করি। তিনি আজীবন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের কল্যাণের জন্য চিন্তা করিয়া গিয়াছেন এবং চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিতে কোনদিনই পরাঙ্মুখ হন নাই।"

ইহার পর মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, মৌলভী মুজীবররহমান, শ্রীযুত জে, এম্, সেন গুপ্তপ্রভৃতি সভায় নিজেদের অনুপস্থিতির জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, সভাপতিকর্তৃক সেগুলি পঠিত হয়।

তৎপর শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কাশিমবাজারের মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের অসীম দান, আদর্শ চরিত্র, প্রকৃত দেশপ্রেম তাঁহাকে প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

"The citizens of Calcutta assembled in this public meeting place on record their deep sense of loss at the death of Maharaja Sir Manindrachandra Nandy of Cossimbazar, whose unbounded charities, exemplary character and constructive patriotism have made his name a household word in Bengal and they offer their respectful homage to his memory. They also express their heartfelt condolence to his son, MaharajKumar Srischandra Nandy and other members of the bereaved family."

In moving the resolution Sj. Dutt said that the late Maharaja had a great regard for Bengali literature and helped the Bangiya Sahitya Parishad on many occasions with his princely gifts. He was a simple man, unostentatious and humble in his habits. In the words of Shakespeare the speaker described the Maharaja; "He was a man, take him all in all. I shall not look upon his life again."

Mr. Chippendale seconded the resolution.

Dr. Moreno in supporting the resolution said: "If there was a *Karmayogin* in Bengal it was the Maharaja of Cossimbazar." Speaking to the young men of Bengal, Dr. Moreno said: I hope the sons of Bengal will say "'Give us more Cossimbazars and we want them for our motherland.'"

তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহার জন্য অদ্যকার সভায় সমবেত কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ তাহাদের গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। এই সভা মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় হীরেন্দ্র বাবু বলেন "বঙ্গসাহিত্যে মহারাজের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ মহারাজের দানে বঞ্চিত ছিল না, বরং বহু বার মহারাজের নিকট প্রভূত আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে। মহারাজ সরল আড়ম্বরহীন এবং স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ী মহাপুরুষ ছিলেন। সেক্সপীয়রের কথায় বলিতে হয় **"He was a man, take him all in all, I shall not look upon his life again."**

মিঃ চিপেণ্ডেল উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন "একমাত্র দানই মহারাজের জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়াছে, শিক্ষাকল্পে তাঁহার সাহায্য প্রভূত। তাঁহার দানের কথা বলিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, মহারাজের দান প্রায় এক কোটি টাকা। আমার মতে সর্ব্বসাকল্যে তাঁহার দান চার পাঁচ কোটির ঊর্দ্ধ হইবে। মহারাজ বেনারস ইউনিভার্সিটীকে দুইলক্ষ টাকা, পলিটেক্নিক ইন্‌ষ্টিটিউটকে দুই লক্ষ টাকা দান

DR. URQUHART.

Seconding the resolution Rev. Dr. Urquhart, Vice-Chancellor of the Calcutta University, said that he had to leave a meeting of the Syndicate of the University and to come to this memorial meeting for they all knew how great the services of the Maharaja were in the cause of education, how well situated in comfortable circumstances he did not think that the material life was sufficient either for him or for his countrymen without emphasis upon the spiritual and the cultural life and they all knew how entering upon that heritage of generosity and liberality he devoted so much of his wealth to the support of the University and College institutions. He thought of the demand of his countrymen but the thought of it was not only in terms of the past. His benefactions were therefore of a various character. He was not merely connected with the education of the University but also indentified himself with the education of secondary and primary character, as well as, of vocational character.

করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী তাঁহার দানের জন্য চিরকৃতজ্ঞ। তিনি বহরমপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, বহু উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী স্কুল, রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয় ও কলিকাতা পলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিটিউসন তাঁহারই সাহায্যে প্রতিপালিত হয়। তিনি বহরমপুরে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য একলক্ষ টাকা দান করেন। তিনি বঙ্গীয় পরিষদকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। আজিকার এ পরিষদ তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টার ফল। তিনি বাংলার বেকারসমস্যা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া শুধু পলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে তিনি সাহায্য করিতেন এবং বিশেষ বিশেষ শিল্প-শিক্ষার জন্য বহু ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে বিদেশে পাঠাইয়াছেন।"

তিনি আরও বলেন' "বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে এই টাউন হলে যে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সে সভার সভাপতি ছিলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র। এই অপরাধের জন্য গভর্ণমেণ্টের 'ব্ল্যাকবুকে' দশবৎসর ধরিয়া তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ

LT. B. P. SINGH RAI

Lieutenant Bejoy Prosad Singh Rai in supporting the resolution said that **the late Maharaja lived and died for the poor. Though a rich man he never thought that there was a real barrier between his class and the masses and he did his duty to the utmost to the poor and it was now time that they should discharge their duties to perpetuate his memory, not in the interest of the departed great but in the interest of the living, in the interests of those who had yet to come.**

Dr. Sundari Mohan Das, Mr. Panchanan Neogy and Maulvi Kamaluddin Ahmed also supported the resolution.

At this stage a member of the audience stood up and proposed that in view of Maharaja's large-heartedness and philanthrophy he should be called "Rajarshi".

PROCESSION OF STUDENTS

About four hundred students of Maharaja Cossimbazar Polytechnic Institute with teachers and staff arrived at the Town Hall in a procession from Baghbazar and joined the meeting.

SREEJUT SUBHAS CHANDRA BOSE

Sj. Subhas Chandra Bose next moved the following resolution :—

"That with a view to perpetuate the memory of Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy of Cossimbazar steps be taken for a fitting

ছিল। প্রসিদ্ধ রাউলাট আইনের প্রতিবাদকল্পে, জমিদার সভা হইতে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তিনি তাহার অগ্রণী ছিলেন।"

তৎপরে ডক্টর মোরেণো ও শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবীর বক্তৃতার পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—

"মহারাজের আদর্শে জীবন যাপন কর।"

তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটী স্মৃতিসমিতি সংগঠন করিয়া মহারাজের যোগ্য স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। সুভাষচন্দ্র বলেন— "বর্ত্তমান রাজনীতির সহিত মহারাজের তেমন ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ ছিল না বটে, কিন্তু **স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সর্ব্বপ্রথম বিদেশী বর্জ্জন সভার সভাপতিরূপে তাঁহার নাম বাঙ্গালী চিরদিন মনে রাখিবে। মহারাজ দেশের সেবায় তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছেন।"** "আমি শুনিয়াছি, বড়লাটের ঘোষণার মধ্যে, আশা করিবার বা উহা লইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইবার কিছুই নাই পরলোকগত মহারাজ এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই উক্তি হইতে মহারাজের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। **মহারাজের পবিত্র আদর্শে জীবন**

---

memorial and that to give effect to this resolution a Committee be appointed consisting of the following members with power to co-opt : Maharajadhiraja Bahadur of Burdwan, Maharaja of Natore, Maharaja Sir P. C. Tagore, Raja Bejoy Singh Dudhoria, the Hon. Raja Bahadur of Santosh, Raja Manilal Singh. Rai, Kumar S. C. Rai of Dighapatiya, Mr. Krishnakumar Mitter, Mr. J. M. Sen Gupta, Sj. Subhas Chandra Bose, Sir Devaprasad Sarbadhikari, Mr. Hirendra Nath Datta, Dr. S. N. Das Gupta, Mr. Muralidhar Rai, Sir. Nilratan Sircar, Dr. Nalinakshya Sanyal, Raja Janakinath Rai, Kumar P. N. Ray, Mr. Taritbhushan Rai, Mr. Amulyadhone Addy, Mr. H. P. Ghosh and Mr. Jatindra Nath Basu."

Sj. Bose said that although the Maharaja had retired from the present day politics, Bengal would remember him with gratitude as being the President of the first boycott meeting during the Swadeshi days.

গঠন করিতে পারিলে তাঁহার সত্যকার স্মৃতি রক্ষা করা হইবে।" সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার রেভাঃ আরকুহার্ট শিক্ষাকল্পে মহারাজের প্রভূত দানের কথা উল্লেখ করিয়া, তাঁহার প্রতি হৃদয়ের আবেগ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

তৎপর লেপ্টেন্যাণ্ট বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, মৌলভী কামালউদ্দিন আহাম্মদ বক্তৃতা করেন। এই সময়ে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে জনৈক ভদ্রলোক মহারাজকে "রাজর্ষি" উপাধিতে ভূষিত করিবার প্রস্তাব করেন। অতঃপর সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, শ্রীযুত ললিতমোহন দাশ সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্

১৫ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ মন্দিরে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ একটি সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, কুমার শরৎকুমার রায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মন্মথমোহন বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রফুল্লকুমার সরকার, প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ সোম, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

He did his best to serve the country and gave his all to advance her interests. Sj. Bose then referred to the late Maharaja's opinion on the Viceregal pronouncement shortly before his death and said that the Maharaja had found nothing in that much-advertised pronouncement to be enthusiastic over. **The best way of prepetuating the memory of the Maharaja was to live up to the noble example set by him.**

The resolution of Sj. Subhas Chandra Bose was carried unanimously.

With a vote of thanks to the Chair proposed by Sj Lalit Mohan Das of the Bengal Provincial Congress Commitee the meeting was brought to a close.

পরিশিষ্ট

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র অদ্বিতীয় দানবীর, দেশের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যের তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অকৃত্রিম বান্ধব ছিলেন। শিশু-পরিষদকে তিনিই আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রদত্ত জমির উপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির ও রমেশভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজের ন্যায় সরল, অমায়িক, বিনম্র ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক এ যুগে বিরল।

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকর্ত্তৃক গৃহীত একটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলেন, সাহিত্য পরিষদের শৈশবে তাহার সঙ্কটকালে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। মহারাজ যে কত ভাবে কত দিক দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতদিন সাহিত্যপরিষদ্ থাকিবে, ততদিন তাহাই মহারাজের অক্ষয় স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হইয়া রহিবে। মহারাজ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি এখন বৈকুণ্ঠে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবু বলেন, তাঁহার বিশ্বাস সেখান হইতেও মহারাজ সাহিত্যপরিষদ্‌কে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন যে, মহারাজ বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতেন, সর্ব্বদা তাহার কল্যাণ চিন্তা করিতেন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই অকাতরে দান করিতেন। ইহাতে সময় সময় তাঁহাকে প্রতারিত হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু সেজন্য তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন লোক এ যুগে বড় দেখা যায় না।

কুমার শরৎকুমার রায় মহারাজের ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যের বর্ণনা করেন।

অন্যান্য কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা করিবার পর শোকসূচক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। সভায় শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম, প্যারী-মোহন সেন গুপ্ত, ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মহারাজের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কবিতা পাঠ করেন।

বহরমপুর, (মুর্শিদাবাদ)

বহরমপুরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গ্র্যাণ্টহলে মহারাজের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য বহরমপুর অধিবাসী কর্ত্তৃক একটি শোকসভা আহূত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মৌঃ আব্বাস সমাদ অনারেবল এস, কে, সিংহ আই, সি, এস, (জেলা জজ) মোহমোহন সেন, অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি মহারাজের অশেষ গুণবর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দিবার পর, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোকপ্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

বহরমপুর বার এসোসিয়েশনের সভায় শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মহারাজের মৃত্যুসংবাদ শুনিবামাত্র কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ মিলিত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মহারাজকুমারের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বহরমপুর কলেজ ও স্কুল সাত দিনের জন্য বন্ধ দেওয়া হয়। স্থানীয় বাজার দোকান ও অন্যান্য ব্যবসায়, কাজকর্ম্ম সব বন্ধ থাকে।

কলিকাতা পলিটেক্‌নিক্—

ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দের সভায় ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে শোক প্রকাশ করা হয়। মহারাজ শুধু যে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাহা নহে। এককালীন প্রভূত দান এবং মাসিক সাহায্য ও সময়ে সময়ে বিশেষ অর্থসাহায্যদ্বারা এই স্কুলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাজ-কুমারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। স্কুল ও তাহার শাখাসমূহ ১২ই—১৪ই পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে।

বঙ্গীয় জমিদার-সমিতির শোকপ্রকাশ—

উক্ত সমিতি মহারাজ-কুমারেরর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এই পত্র প্রেরণ করেন।—

পরিশিষ্ট

To Maharaj Kumar Sris Chandra Nundy Bahadur, M.A.—

Dear Sir—On behalf of the Bengal Landholders' Association, as well as myself, I beg to convey to you and your family our deep sympathy for the irreparable loss that you have suffered in the demise of your illustrious father, who played such prominent part in the welfare of the country and enjoyed the respect and affection of all irrespective of caste and creed. His death is a misfortune of the first magnitude and deprives the Bengal Landholders' Association of a valued and influential member who was one of the founders of the Association.

May the sublime spirit of his selfless labours for the uplift of his country inspire you in all your activities so that the country my feel that the illustrious departee has bequeathed a noble legacy in worthy hands.

কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক—

ম্যানেজিং এজেন্টস্, ম্যানেজার ও কর্ম্মচারিবৃন্দ একটী বিশেষ সভায় এই ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষক ও প্রাণস্বরূপ মহারাজবাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

মহারাজের সম্মানার্থে মৃত্যুর পরদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ দেওয়া হয়।

তিলিজাতিসম্মিলনী—

১৬ই নভেম্বর ৪৫নং বিডন ষ্ট্রীটে, সম্মিলনীগৃহে, রাজা জানকীনাথ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী শোকসভার অধিবেশন হয়।

নিম্নলিখিত স্কুল, কলেজ ও সাধারণ প্রতিষ্ঠান শোক প্রকাশ করেন ও মহারাজের সম্মানার্থ নিজ নিজ দৈনিক কার্য্য বন্ধ রাখেন :—

পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, বেণীমাধব হাইস্কুল, মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনষ্টিটিউসন, রাজসাহী লোকনাথ হাই ইং স্কুল, হোসেনাবাদ ফ্রেঞ্চ হাই ইং স্কুল, ডোনাভন্ বালিকাবিদ্যালয়, মাদারীপুর, সলপ হাইস্কুল, মহাকালীবিদ্যাপীঠ, বেলডাঙ্গা

গোবিন্দসুন্দরী হাইস্কুল, সিলেট রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল, প্রজাপতি অফিস, কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব, বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ, কুষ্টিয়া হাইস্কুল, দিনাজপুর জেলাবোর্ড, খুলনা জজ আদালত ও স্কুল, হাওড়া জেলাবোর্ড, সুজাপুর হাইস্কুল, শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউসন, বহরমপুর টেক্নিক্যাল ইনষ্টিটিউট;—এই স্কুলের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মহারাজ মণীন্দ্র টেক্নিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইল—চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট, বঙ্গবাসী কলেজ, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, উপাসনা প্রেস, চন্দ্র এণ্ড কোং, উপাসনাকার্য্যালয়, স্বায়ত্তশাসন-কার্য্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স, গিলেণ্ডার্স আরবুথনট কোং, ওয়ার্ডস্ এষ্টেট অফিস, কর্পোরেশন, কলিকাতার সমস্ত স্কুল ও কলেজ, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং ও তাহার ব্রাঞ্চ অফিস, ভদ্রকালী কোটরং কংগ্রেস কমিটী (২৪ নভেঃ), নবদ্বীপ অ্যাংলো সংস্কৃত লাইব্রেরী (১৩ নভেঃ), ৯নং করপোরেশন ওয়ার্ড (২০ নভেঃ) সভাপতি ডাঃ হরিধন দত্ত, বিশ্বভারতীসম্মিলনী ইত্যাদি ইত্যাদি।

বার এসোসিয়েসন্—

বালুরঘাট, ফরিদপুর, নেত্রকোণা; আসানসোল, কাঁথি, গাইবান্ধা, মাগুরা, বগুড়া, ব্রাহ্মণবেড়িয়া প্রভৃতি প্রত্যেক এসোসিয়েসন তাঁহাদের বিশেষ সভায় শোক-প্রকাশ করেন ও মহারাজকুমারকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করেন।

শোকসভার অধিবেশন—

শ্রীপাট ক্ষেতুর দেবালয়ের ট্রাষ্টীগণ ১৩ই নভেম্বর সভায় শোক প্রকাশ করেন।

নসীপুর, জিয়াগঞ্জ, বালুচর, রাজসাহী ইত্যাদি। সুমেরু ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, কাশী, তাহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজবাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়, রাঁচি—

এই বিদ্যালয়ের জন্য মহারাজ দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মহারাজের সম্মানার্থে সাতদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে।

১৭ই তারিখে রাঁচির জনসাধারণ একটী শোকসভায় মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

শিবপুর—(সভাপতি—অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) ২৩শে নভেম্বর মহামণ্ডপে জনসাধারণের একটী বিরাট শোকসভার অধিবেশন হয়।

কর্ণওয়ালিসস্কোয়ার—

কর্ণওয়ালিস্‌স্কোয়ারে—সভাপতি শ্রীমৎ কালিকা ব্রহ্মচারী (১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬), কিশোরগঞ্জ তিলিজাতিসম্মিলনী, লক্ষ্মীপুর, পুরী-নিবাসী বাঙ্গালীগণ, ময়মনসিংহের জমিদারগণ, চিলমারীর রায়তবৃন্দ। উত্তরপল্লী আর্ত্তসেবাসমিতি কর্তৃক দেশবন্ধুপার্কে, (১৬ই নভেম্বর), সালকিয়া জনসভা, মুর্শিদাবাদসম্মিলনী, ধুবড়ী, খুলনা, খুলনা জজকোর্ট, বোলপুর জনসাধারণ, চুচুঁড়া সাহিত্যসমিতি, সুহৃদ-পরিষদ, পাটনা, নারায়ণগঞ্জ ছাত্রসমিতি, কালীঘাট মহিলাপ্রতিষ্ঠান' নবদ্বীপ কংগ্রেসকমিটী, ঢাকা জিলাহিন্দুসভা, বহরমপুর জিলা কংগ্রেস কমিটী, হাওড়া জিলা হিন্দুসভা।

উড়িষ্যা ঐতিহাসিক সমিতি—

উক্ত সমিতির পৃষ্ঠপোষক মহারাজের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসুর সভাপতিত্বে পুরীতে ১৬ই নভেম্বর চার ঘটিকার সময় একটী বিশিষ্ট সভার অধিবেশন হয়, ঐ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।—

Resolved that this meeting of the Orissa Historical Association accords its deep sense of sorrow at the irreparable loss the country has suffered at the sad demise of one of our kindest patrons, Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy, K.C.I.E., of Kasimbazar, a philanthropist with a charming and amiable personality—a man of sterling character--one of the eminent patrons of learning and Indian Culture and a devotee of the religion of love of the Lord Gouranga."

"That this Meeting conveys its condolence and sympathy to Maharaj Kumar Sris Chandra Nandy and other members of the bereaved family."

নিখিল বঙ্গীয় ছাত্রসমিতি—

শোক-সভা—(৩০শে নভেম্বর) সভাপতি—শ্রীযুক্ত বাবু নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র এম্-এ, বি-এল, এম্, এল্, এ। এই সভায় এই সংখ্যায় প্রকাশিত "মহাতাপস" কবিতাটি পঠিত হয়।

গোবিন্দসুন্দরী দাতব্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভাগবতকুমার শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে ছাত্র, অধ্যাপক ও কলিকাতা সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি লইয়া একটী সভার অধিবেশন হয়। মহারাজের গুণাবলীর বিষয় বক্তৃতা করিবার পর, নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

That this meeting of the staff, students, guardians, and well wishers of the Govinda Sundari Ayurved College express their profound sorrow at the death of Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy Bahadur of Cossimbazar, who was the founder and patron of this Institution and whose sterling qualities of head and heart as a great patriot, a famous patron of learning, a genuine philanthropist, a man of devotion and piety, a generou ssupporter of all sorts of benevolent works.

কলিকাতা সাহিত্যসমিতি—

পরমহংস পরিব্রাজক নিখিলানন্দ সরস্বতী এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী শোকসভার অধিবেশন হয় এবং সমবেদনাসূচক পত্র মহারাজ-কুমারের নিকট প্রেরিত হয়।

মুর্শিদাবাদসম্মিলনী—

গত ২০শে নভেম্বর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে, একটি শোকসভা আহূত হয়। অধ্যাপক কে, পি, চট্টরাজ, মিঃ আলতাফ্ আলি, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, হেমাম্বপদ

বরাট প্রভৃতি মহারাজের গুণকীর্ত্তন করিবার পর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত সম্মিলনীর পক্ষ হইতে স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব করিলে, সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

চীলমারীতে শোকসভা—

মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের মহাপ্রয়াণসংবাদ চীলমারীতে গত ২৬শে কার্ত্তিক সন্ধ্যার পরে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে অত্র বন্দরে সমস্ত ব্যবসায়ী ও জোতদারগণ নিজ নিজ কারবার ও আফিস বন্ধ করিয়া সকলে সমবেত হইয়া তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত বন্দর পরিভ্রমণ করেন। পরদিন সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নামকীর্ত্তন সহ এক বিরাট শোকযাত্রার অনুষ্ঠান হয়। ঐদিন বেলা ৩ ঘটিকায় বন্দর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের জনগণ এক বিরাট শোক সভার অনুষ্ঠান করেন। উক্ত সভায় বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, ইউরোপীয় ও বেহারী প্রভৃতি বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হাওড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী—

গত ১৭ই নভেম্বর রবিবার হাওড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে "মিলন-মন্দিরে" মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের মহাপ্রস্থানে শোক প্রকাশ জন্য একটি সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল (উকীল হাইকোর্ট) মহাশয় সভাপতির আসন হইতে শোকসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া দানবীর রাজর্ষির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তৎপরে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে অনেকে মহারাজের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

"শক্তি" বর্দ্ধমান, (২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)—

বাঙালী হিন্দুর মহিমা ও গরিমার শেষ রশ্মিরেখাগুলি ধীরে ধীরে মিশাইয়া যাইতেছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গত পূর্ব্ব সোমবার পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙ্গালী হইলে বিশেষতঃ খাঁটি হিন্দু বাঙ্গালী হইলে কিরূপ দানব্রত—কি প্রকার হৃদয়বান্—কি প্রকার পুণ্যপরায়ণ—কিরূপ সর্ব্বভোলা ত্যাগশীল হয়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র! দানবীর পুণ্যশ্লোক হরিশ্চন্দ্র যে মর্ত্ত্য জীবনে সত্য ও

প্রত্যক্ষ, তাহা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে দেখিয়া অনুধাবন করা যাইত। ঐশ্বর্য্যকে অমন তুচ্ছ করা, অকাতরে অমন দান করা, বিত্তবিভবের মাঝে অমন সৌজন্য ও অমায়িকতা বর্ত্তমান বাঙলার একটি বিশেষ সম্পদ ছিল। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের পরলোকগমনে আধুনিক বাঙলার একটি জ্যোতিষ্ক খসিয়া গেল।

বেণু, (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)—

পরলোকে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মানুষের অন্তর যেখানে সাড়া পায়, সেইস্থানে আঘাত আসিয়া যখন বেদনার সৃষ্টি করে, তখনই সে চঞ্চল হইয়া উঠে। মণীন্দ্রচন্দ্রও বাঙালীর অন্তরের কোণে এমন প্রীতি ও ভালবাসার স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন যে, আঘাত যখন নিদারুণ হইয়া সেইখানে মূর্ত্ত হইল—তখন প্রত্যেকের চিত্ত ক্ষুব্ধতায় ক্লান্ত হইয়া উঠিল।

দেশের বুকে বহু লোক জন্মগ্রহণ করিয়া আবার মরণের শীতল স্পর্শ লভিয়া থাকে, কিন্তু কাহারো সে বার্ত্তার খোঁজ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। যে মানুষ শুধু আপনার স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের জন্য বাঁচিয়া থাকে না, বহুর কল্যাণ ও তৃপ্তির সন্ধান লইতে যাইয়া যাহার তথাকথিত ক্ষতির বোঝা বহিতে হয়—সে মানুষের অভাবও শুধু মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অনুভব করার বস্তু নয়—বহুর দ্বারাই তাহা অনুভূত হয়। কোটি মুদ্রা দান করিয়াও যিনি কোনদিন ভাণ্ডার রুদ্ধ করেন নাই, ঋণজালে জড়িত হইয়াও থলি উজাড় করিবারই অন্তর যাঁহার ছিল—আজ তাঁহার অভাব আমাদিগকে ত চঞ্চল করিবেই। দানের পরিমাণ দিয়া মহারাজকে যদি বিচার করিতে যাই তাহা হইলে সাধারণতঃ উহা আকাঙ্ক্ষিত সম্মানের বস্তু হইলেও সত্যকে ঠিক স্বীকার করিয়া চলা হইল না—কিন্তু এই দানের মধ্যে ইহার নির্লিপ্ততা ও স্বাভাবিকতার সন্ধান করিলে বুঝি যে মানুষের মাপকাঠি উহার পরিমাপ করিতে কতদূর ব্যর্থ। মণীন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রের এবংবিধ ব্যাখ্যায় সম্মান তাঁহার কতটুকু বৃদ্ধি পাইবে জানি না—কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে এই মহৎ-প্রাণকে জানিবার দাবী যদি কেহ করিতে চায়, তবে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহাই তাঁহার সত্য পরিচয়।

দৈনিক বসুমতী, (১৩ই নভেম্বর ১৩৩৬)—

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

বাঙ্গালার স্বর্ণচূড়া খসিয়া পড়িল। বাঙ্গালীর গর্ব্ব, বাঙ্গালীর মান, বাঙ্গালীর আপনার হইতেও আপনার বলিয়া অহঙ্কার করিবার যাহা কিছু কালের অমোঘ দণ্ডাঘাতে তাহা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। সৌজন্য ও বিনয়ের অবতার, নিরভিমান, নিরহঙ্কার, সাহিত্য ও সমাজের অকৃত্রিম সুহৃদ, দরিদ্র আতুরের বন্ধু, বিদ্যার্থীর সহায়, স্বজনপ্রতিপালক, স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দানবীর মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সপ্ততিতম বর্ষ বয়সে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীজাতিকে বিয়োগ ব্যথায় অভিভূত করিয়া গত সোমবার তাঁহার সারকুলার রোডস্থ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীজাতি আজ যে অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হইল, তাহা কোন অজানা ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে? * * *

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র প্রথম বয়সে সাধারণ গৃহস্থের জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখনও যে মাসহারা পাইতেন, তাহা হইতেও তাঁহার দ্বারা অভাব গ্রস্তের অভাব মোচন হইয়াছে। রাজতক্তে সমাসীন হইবার পর প্রথম জীবনের সেই মহৎ প্রবৃত্তি বিন্দুমাত্র লুপ্ত হয় নাই, বরং তখন তাহা শতগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে দান তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার জীবনে আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম বয়সে তিনি যেমন সহজ আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিয়াছিলেন, রাজতক্তে আসীন হইয়া যখন তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, তখনও সেইরূপ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সৌম্য প্রসন্ন মূর্ত্তির বিকৃতি কেহ কখন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। *

তাঁহার সৌজন্য, বিনয় ও সামাজিকতা এখনকার কালে দৃষ্টান্তের স্থল। তিনি স্বয়ং বাণীর একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ এজন্য বৃথা গর্ব্ব অভিমান উৎফুল্ল হইয়া ভদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে দেখে নাই। দেশের শিল্প-বাণিজ্য সাহিত্য আদির উৎকর্ষসাধনে তাঁহার আন্তরিক উৎসাহ আগ্রহ ও দান প্রবৃত্তি উপমার স্থল ছিল, অথচ সে জন্য কখনও তাঁহাকে কেহ বৃথা গর্ব্বে স্ফীত হইতে দেখে নাই, উহাতে তিনি যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, তাহা সঙ্গোপনে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলে লুক্কায়িত থাকিত, ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খনির্ব্বিচারে আমন্ত্রিত

অভ্যাগত তাঁহার রাজপ্রাসাদে সমান সমাদর প্রাপ্ত হইত, মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকলকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া পানভোজন করাইয়া আপ্যায়িত করিতেন।

হিন্দুধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠা বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মে অচলা ভক্তি মহারাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যে কেন্দ্রে তিনি বিচরণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার ভিন্নরূপ হওয়াই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরম অনুরক্ত দীনাতিদীন ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি তাঁহার আদর্শের অমূল্য বাণী 'তৃণাদপি সুনীচেন' কথাটীকে নিজজীবনে সার্থকতা দান করিয়া গিয়াছেন। শান্তিপুর ও নবদ্বীপে যাঁহারা তাঁহাকে অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর সহিত নগ্নপদে কীর্ত্তনানন্দে মাতিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, এই মানুষটির মন কি ধাতুতে গঠিত ছিল। তাঁহার প্রেমানন্দে মত্ততার মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। হিন্দুর সকল সদনুষ্ঠানে তাঁহার মুক্তহস্তে দানের কথা সকলেরই সুবিদিত।

ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে অনুষ্ঠানে ভোগবিলাসবেষ্টিত রাজ্যেশ্বর হইয়াও তিনি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন এবং সাধারণকে আনন্দ বিতরণ করিতেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কোমল ব্যবহারের ফলে যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মানুষের পক্ষে ইহার অধিক সুখ্যাতির কথা আর কি হইতে পারে জানি না। রাজ্যেশ্বরের পক্ষে অনাড়ম্বর ও নিরহঙ্কার হওয়া যে কত বড় গুণের পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

মানুষের জীবনে যে গুণ থাকিলে মানুষ প্রকৃত 'মানুষের মত মানুষের' পদবী প্রাপ্ত হয়, যে গুণলাভ জন্মজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রে তাহারও অভাব ছিল না। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অবস্থায় মানুষ পরের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হয়, ভাগ্যপরিবর্ত্তনের ফলে সে যখন রাজ্যেশ্বর, তখন সে উপকারের কথা প্রায়ই বিস্মৃত হয়। মহারাজকে কেহ কখনও এই অপরাধে অপরাধী করিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রথম জীবনের পরিচিত কত লোক যে তাঁহার সৌভাগ্যোদয়কালে তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যেখানে উপকারের প্রত্যুপকার করার প্রয়োজন হয় না, সেখানেও তাঁহার ব্যবহারের কথা শুনিলে আনন্দরসে মন আপ্লুত হয়। একটা দৃষ্টান্ত এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পরলোকগত মুনসেফ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রথম

বয়সে গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি যে সময়ে বহরমপুরের প্রথম মুনসেফের পদে সমাসীন, তখন মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজারের রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। একদিন মুনসেফ বাবুর কোনও নিকটাত্মীয় যুবক তাঁহার বাসার বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, মুনসেফ বাবু কাছারী গিয়াছেন, এমন সময়ে একজন বিগতযৌবন ভদ্রলোক সদরে পদার্পণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 'মা, মা, আমার মা কোথায় গেলেন?' বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া একবারে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবক বিস্মিত! এই অপরিচিত লোক অনুমতি না লইয়াই অন্দরে অগ্রসর হয় কোন্ সাহসে! সে দৌড়াইয়া বাধা দিতে গেল। লোকটি হাসিয়া বলিল, "বাঃ! মার কাছে যাচ্চি খেতে, তুমি বাধা দেবার কে হে ছোকরা? মা মা!" এমন সময়ে সদ্যোনিদ্রোত্থিতা গৃহিণী ভিতর হইতে বলিলেন, 'কে ডাকছে আমায়?' বলিয়া আগন্তুককে দেখিয়াই শশব্যস্তে বলিলেন, 'এস বাবা, এস'—তাড়াতাড়ি আসন দিবার ধূম পড়িয়া গেল। লোকটি কিন্তু সটানে সানের মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া আবদারের সুরে বলিল, 'ওসব থাক, কি খেতে দেবে বল দিকি? অনেক দিন তোমার হাতের রান্না খাই নি মা' যুবকটি তাহার পর যখন পরিচয় পাইল যে, তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, তখন সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

এই যে গুরুপত্নীর প্রতি জননীর মত ব্যবহার, তাঁহার নিকট আড়ম্বরশূন্য অহমিকাশূন্য আহারের আবদার, ইহার মিষ্ট ব্যবহারের ও সম্বন্ধের তুলনা অধুনা কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? কবে বাল্যকালে কাহার নিকট কিছুদিনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সেদিনের কথা মহারাজ সৌভাগ্য-সম্পদের দিনে ত একবারও বিস্মৃত হন নাই! ইহাই মহত্ত্ব, ইহার তুল্য মানুষের মধুর চরিত্র চিত্র আর কি অঙ্কিত হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। তিনি ত বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর হৃদয় জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিবেনই। কিন্তু বাঙ্গালী যদি তাঁহার মত সামাজিক, জনহিতব্রত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও দানবীর হইতে শিক্ষা করে, তবেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

মফঃস্বল ও কলিকাতার বহু সাময়িক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণ নিজ নিজ পত্রিকায় স্বর্গীয় মহারাজের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশপূর্ব্বক আপনাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—বাঙ্গলা দেশের বহু স্থানে বহু শোকসভাও আহুত হইয়াছিল। সে সকল বিবরণ মুদ্রিত করা সম্ভব হইল না বলিয়া তাঁহাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। —লেখক।

The Statesman, Nov., 12, 1929.—

DEATH OF MAHARAJA OF COSSIMBAZAR

PATRIOTIC SERVICES

PATRON OF ARTS AND SCIENCES

We regret to announce the death of Maharaja Sir Manindra Chandra Nandi, K.C.I.E., of Cossimbazar which occurred early this morning at his Calcutta residence in Upper Circular Road. He had been suffering from fever for about a month and was brought down to Calcutta on Saturday.

One of the prominent members of modern Bengali society, the Maharaja was born in 1860 and succeeded to Cossimbazar Raj estate on the death of his maternal aunt, Maharani Swarna-mayee whose charities had made her name a household word in Bengal. Since his succession about 32 years ago the Maharaja had added new lustre to the fame of his family as a generous patron of education and a great benefactor to his country. As a matter of fact, no public movement organized for the welfare of his countrymen was denied help by him.

He spent over a crore of rupees in the cause of education in Bengal, the Berhampur Krishnath College alone being maintained at an average annual expenditure of Rs. 30,000. He established a polytechnic institute in Calcutta, a school of mines at Ethora (Asansol), several high and middle schools at Beldanga, Mathrun, Jabagram and other villages. The Bose Institute in Calcutta received a sum of Rs. 2 lakhs from him, while the Hindu University of Benares, the National Council of Education, Bengal, the Bengal Technical Institute. the Association for the Scientific and Industrial Education for Indians, the Deaf and Dumb School, the Blind School, the Daulatpur Hindu Academy, the Ranchi Brahmacharya Vidyalaya and the Rungpur College were among the many institutions which counted him as one of their patrons.

PATRON OF LETTERS

A generous patron of letters, the Maharaja made a gift of the land on which the premises of the Bangiya Sahitya Parishad stands in Upper Circular Road. He encouraged *Pandits* for editing Sanskrit books on *Vaishnavism* and liberally helped men engaged in literary work. The Sahitya Sammilan or the literary conference, which has now become an annual affair in Bengal, was first held in 1910 under his auspices at the Cossimbazar Rajbati.

The contributions of the Maharaja towards the industrial regeneration of his country were no less noteworthy. He opened the first industrial exhibition in Calcutta organized by the Indian National Congress, and helped to send many students to England, Japan, America and other countries for technical education. He even undertook to pioneer industries. The Bengal Potteries, Ltd., owes its existence to him, while the Rajgaon Stone Company and the China clay mines testify to his industrial activities. The Maharaja was also one of the largest colliery proprietors in Bengal.

The cause of suffering humanity always appealed to him. He contributed Rs. 15,000 for the building of the Albert Victor Hospital at Belgachia, Calcutta, and established the Curzon Charitable Hospital at Cossimbazar and a well equipped dispensary at Mathrun. The water-works of Berhampur inaugurated by the late Maharani Swarnamayee were completed by him.

WAR SERVICES

When the Great War broke out the Maharaja did his share of the work in connexion with the raising of War Loans and organising the resources of the country. In order to afford relief to disabled soldiers in the field he and the members of his family paid for several units, and from August 1915 to November 1918 the Maharaja and the Maharani regularly contributed to the Carmichael Bengal Women's War Fund. He was also associated with the movement in connexion with the organization of the Bengal Volunteer Ambulance Corps and encouraged his tenants

to enlist as soldiers, offering to remit a quarter of the annual rent payable in respect of lands occupied and cultivated by them.

A Liberal in politics, the Maharaja was connected with the Indian National Congress as long as it had not drifted from its old moorings. When the right of nominating a representative to the Bengal Legislative Council was conferred on the Zamindars of the province, the Maharaja had the honour of being nominated as such. He was also elected on two successive occasions as the Bengal Landholders' representative to the old Imperial Legislative Council. After the inauguration of the Montague-Chelmsford Reforms the Maharaja was elected to the Council of State as one of the representatives of Western Bengal. He was twice President of the British Indian Association, Calcutta.

The Maharaja was four years Chairman of the Berhampur Municipality and to the day of his death he was the Chairman of the Murshidabad District Board.

He leaves a son, Maharaja Kumar Sris Chandra Nandi, who was for two terms a member of the Bengal Legislative Council.

The Statesman, (Editorial), 13th Nov., 1929.—

* * The MAHARAJA, head of one of the families that rose to prominence in CLIVE'S time, was by character and position a leader among the zemindars of the province, and accepted the obligations, political and other, that thus attached to him. He sat in the Legislatures both of Bengal and of India, took his turn at directing the affairs of the British Indian Association, and played his part in Congress activities in days when extremism was less insisted on as the price of welcome. By temperament he was little attracted to the rough and tumble of controversial politics. He was built for a quieter and gentler life; he loved to help all engaged in spreading knowledge and culture and in other interests that promoted the general welfare without rousing passions. Universities, schools and colleges found him

a warm-hearted friend; he showed his belief in the value of technical education ; he was a patron of scholars and writers ; he identified himself cheerfully if not always expectantly with many attempts to quicken the small industries of the province. He maintained a large school and college of his own at Berhampur ; many other schools owed their existence to his generosity; institutions as different as a school of mines and a Bengal Literature Society showed his wide range of interest. Nor were his benefactions confined to his own province. Benares University remembers him with gratitude, while one of his latest services to Indian learning was the establishment of a Sanskrit school after the ancient model in Ranchi. In these things he found pleasure and used his wealth, more lavishly indeed than a strictly business prudence could approve, and there are many who mourn him to-day. * * *

The Amrita Bazar Patrika, (Editorial),

Nov. 13th 1929.—

MAHARAJA OF COSSIMBAZAR

By the death of Maharaja Sir Manindra Chandra Nandi India has lost one of her greatest sons. The two noble traits in his character which distinguished him from his fellow men and made his name a household word in Bengal were his extraordinary devotion to God and love of humanity. He was born poor but Providence brought him a fortune, which not many men have ever had the opportunity or occasion to enjoy. But like *Rajarsi* Janaka of old, he never set any store by wealth or worldly honour. Indeed it is no exaggeration to say that in the midst of pomp and grandeur which sometimes the station in life to which he belonged made it obligatory on him to maintain, he

lived a life of absolute detachment verging even on asceticism. He was a true Vaishnava who heard the enchanting flute of Sri Krishna and regulated his whole life in accordance with the rhythm of that soul-enthralling music. This is why those who came in intimate contact with him could not fail to be impressed with an unusually pious disposition and ineffable sweetness in his manners.

He inherited extensive landed property of his maternal uncle on the death of Maharanee Swarnamoyee of revered memory. But from the moment he came into possession of this vast amount of wealth, he made a sacred determination to spend it not for his personal luxury but for the service of his fellow men. It is an inadequate description of his charities to call him simply an ideal zeminder. He was undoubtedly that—an object lesson to his brother landlords in every part of the country. But he was also much more than that. To tell the truth he always regarded his riches as a sacred trust for humanity at large to be utilised for the purpose of ministering to the various needs of his fellow beings.

For more than thirty-two years he spent money ungrudgingly for his countrymen. There is scarcely any noble cause anywhere in the land which has failed to enlist his active sympathy and support.

* * * *

The Maharaja was a friend of the poor. His heart melted at the sight of misery. Those who have seen him at the Cossimbazar Rajbati have found him surrounded at all hours of the day by the needy. He was always approachable and never had anyone who came to seek his help to go back disappointed. Indeed, except Iswar Chandra Vidyasagore, there has lived no other man in the nineteenth or the twentieth century in India whose heart has overflowed so much with the milk of human kindness. Indigent student especially had a soft corner in his heart.

* * * *

It is impossible to dwell on the manifold aspects of the life of the Maharaja. He was a true patriot who did not think of

his country in the abstract. He loved the people and culture and religion of his country as few men have loved them. He was one of the few persons born in any land who regard life as a sacred trust and are deeply conscious of a mission which they are called upon to fulfil in their mortal existence. India has been the poorer to-day by his death and humanity has lost one of the noblest benefactors. May his soul rest in peace.

* * * *

Liberty, Editorial, 12th Nov., 1929.—

IN MEMORIAM.

A great and good man—a noble soul and an ornament of humanity—has passed away by the death of Maharaja Sir Manindra Chandra Nundy of Cossimbazar. Bengal is distinctly poorer to-day. Coming to inherit the princely fortunes of Maharanee Swarnamayee of pious memory, Maharaja Manindra Chandra Nundy also richly inherited her philanthropy and her deep compassion for the poor and the needy. To maintain intact the noble traditions for large-hearted charities left by Maharanee Swarnamayee was the one absorbing passion of his life. And no man was more richly endowed by Nature for the noble task for which he lived and died. The vast wealth he became a heir to was regarded by him as a sacred trust for the proper utilisation of which he was responsible to God and humanity. No wonder, his purse-string was ever open to the calls of suffering humanity. He realized that there could hardly be a greater service to his people than giving them facilities for education, and in pursuance of the ideal of spreading education in the land he spent over a crore of rupees. Finding that mere literary education did not help young men in solving the bread problem, he delighted in nothing more than in opening institutions for vocational training.

The Polytechnic Institute at Bagbazar, the Shorthand Institution at Harrison Road, the Mining School at Ethora, the Ayurveda College at Ramkanta Bose's Street, the Brahmacharjya Vidyalaya at Ranchi—all associated with his illustrious name and receiving his kind patronage—testify to his anxiety for imparting the blessing of vocational training to youngmen to give them a start in life. The spread of education did not, however, absorb his herculean energy and his great wealth. He realized that without industrial development no nation could hope to thrive in these days of machinery and mass production, and the Bengal Potteries Ltd., the China Clay Factory, the Rajgaon Stone Works stand as monuments to his deep concern for the industrial development of the country. Nor did his capacious mind fail to perceive that the development of indigenous banking was essential for the growth of indigenous industries, and this consciousness led to the foundation of the Hindusthan Bank with which he was intimately connected.

If patriotism connotes, as Lord Lytton defined it, one's anxiety for promoting the interests of one's own nationals, there hardly breathed a greater patriot than Maharaja Sir Manindra Chandra Nundy. When Swadeshi was adopted as the national cult of Bengal during the anti-Partition days, Maharaja Manindra Chandra was present at the Calcutta Town Hall with Maharaja Surjya Kanta Acharjya and others to lend his whole-hearted support to the movement. Simple and unostentatious by nature, Maharaja Manindra Chandra always delighted in most simple costumes and dishes. He was a democrat in the best sense of the term, and nothing gave him greater pleasure than to pick out and lend a helping hand to his old friends of the days when he had not come to inherit the vast riches of the Cossimbazar Raj. Men with the least pretension to talents in any field, be it literary, musical, painting had always a warm friend and patron in the magnanimous Maharaja of Cossimbazar, and the number of authors who received substantial help from him in bringing out their literary works is very considerable. Social and amiable, he was the very pink of old world courtsey with kind words for every

man who went to him. To know him was to love him, to admire him for his large-heartedness and for his unalloyed patriotism. The death of Maharaja Manindra Chandra Nundy has left a void in our society which it will be hard to fill up. If sorrow shared gives any consolation to the bereaved family, the Maharanee and Maharaj-kumar Sris Chandra Nundy can count upon our sincere condolence in their bereavement.

Corporation of Calcutta.—

"THE CARNEGIE OF BENGAL"

The Corporation paid glowing tributes to the memories of Maharaja Nundy.........at its meeting on Wednesday (Nov. 13). The Mayor Mr. J. M. Sen Gupta was in the chair. Sj. Sachindra Nath Mukherji moved :—

That the Corporation desires to place on re[illegible]s deep sense of sorrow at the death of Maharajah Sir Ma[illegible]ndra Nundy K.C.I.E., of Cossimbazar who nobly s[illegible]st traditions of his House sanctified by the pious a[illegible] Maharanee Swarnomoyee, C.I.E., and made mu[illegible] magnanimous contribution to the advancement of t[illegible]ucation, industries, literature and religion, which [illegible]ied a large place in his heart and whose philanthropic and beneficent activities and the notable part he played in public life with high souled enthusiasm for the progress and welfare of his countrymen have earned for him the respect and regard of all communities and enshrined his name in their grateful recollection.

That the Corporation expresses its sincerest condolence to his son Maharaj Kumar Sris Chandra Nundy, M.A., and other members of his family in their sad bereavement and that to show respect to the memories of the Maharaja......the business of the Corporation be adjourned.

In moving the resolution Sj. Mukherji dwelt on the various public activities with which the Maharajah was connected—his strenuous opposition to the Rowlatt Act, as a member of the Imperial Council, his courage and ardent patriotism in taking the chair at that historic meeting to protest against the Partition of Bengal.

Though a rigid Hindu, Sj. Mukherji added, he was still catholic in his views. He gave away several cottahs of land to the Buddhists of Calcutta. Meek, humble, unostentatious in his manner, he had the best traditions of culture, the best things of the East and the West. He was so to say, the Andrew Carnegie of Bengal, and she is decidedly poorer today by his death.

Rev. B. A. Nag supporting the resolution said :—He was never afraid of risking his wealth in embracing even comparative poverty for the sake of the poor. Of him it might well be said that "he made himself poor for the poor."

Messrs. S. K. Roy Chaudhuri, Unsuddowla and Phelps also paid tributes to the deceased.

"A MAGNIFICENT MAN"

The Ma[illegible] [illegible]tting the resolution for acceptance, associated himse[illegible] [illegible]magnificent tributes to a magnificent man" and ac[illegible]

He was [illegible] [illegible]school but we all know while he kept to the ol[illegible] [illegible]d lived the life of the old culture he never fo[illegible] [illegible]e was living in the everchanging present and that his interest lay in every department of progressive life of India. Whether to industry or literature or politics or civics he gave his support monetary or otherwise. It is well said of him that no one who went to him for help for any cause private or public, provided it was good, came away disappointed.

The resolution was passed all standing.

পরিশিষ্ট

COPY OF LETTER FROM
HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR OF BENGAL.

GOVERNMENT HOUSE
Calcutta 14th November, 1929.

To

MAHARAJKUMAR SRIS CHANDRA NANDY,
302, Upper Circular Road, Calcutta.

DEAR MAHARAJKUMAR,

I was very sorry to hear of the death of your father. I valued his friendship greatly and had a high regard for him. Through his death Bengal loses an eminent son whose main object in life was to serve her and her people. His innumerable benefactions in the general interests of education can never be forgotten and his kind-hearted generosity in all directions will be remembered with gratitude in countless directions by many who benefitted from it. I offer you my sincere sympathy and with all best wishes. *

Believe me,
Yours sincerely,
(Sd.) F. STANLEY JACKSON.

---

* বাংলা গভর্ণরের সমবেদনাসূচক পত্র

(মূল পত্রের অনুবাদ)

গভর্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা
১৪ই নভেম্বর, ১৯২৯।

প্রিয় মহারাজকুমার,

আপনার পিতৃবিয়োগ সংবাদে আমি যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। মহারাজের বন্ধুত্বকে আমি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিতাম এবং তাঁহার প্রতি আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। স্বদেশের সেবাই মহারাজের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাইল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহার অসংখ্য দানের কথা কখনই বিস্মৃত হইবার নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সহৃদয় বদান্যতার কথা অসংখ্য দিকে বহু উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আমার ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনীয়।

একান্তই আপনার
(স্বাঃ) এফ, ষ্ট্যান্‌লী জ্যাকসন্

The Basumati, 13th Nov., 1929.—

The Report of the death of Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy has come as a rude shock to us ; and we have no doubt that the whole of Bengal will mourn for many a long day the loss of this true-hearted noble man. Bengal owes an immense debt of gratitude to him. There was no good cause which did not receive encouragement and support from him. Personally he was a man of frugal habits ; but he made enormous expenditure for public purposes. He was a man of limitless charity and benevolence ; and it may be said with confidence that he had no equal in this respect in Bengal. The cause of education was the nearest to his heart ; and he never grudged any sacrifice for it.

For education alone he spent over a crore of rupees ; and there was no public and humanitarian activity to which he did not render substantial help. He was a generous patron of literature and literary men ; and as for students, how many thousands of them owed their education to him cannot indeed be counted. The Maharaja was a true Hindu and devout Vaishnava, and led a pure and simple life all through. It may be said of him that even his weaknesses leant on virtue's side. The Maharaja might not have been an active politician ; but his sympathies were always on the right side, and he never sacrificed the interest of the country either for fear or for personal gain. It was he who presided over that memorable Town Hall meeting in which the boycott of British goods was for the first time declared as a protest against the partition of Bengal. He opposed the Rowlatt Bill tooth and nail in the Viceroy's Council and there in the Council of State he never cast a vote against the popular side. The interest of the country and the nation were always safe in his hands. How we wish there had been many more nobles like him amongst us !

Landholders' Journal, Sept., 1932.

The Late Maharaja
Sir Manindra Chandra Nandi, K.C.I.E.,
of Kasimbazar

(An Appreciation)

BY ANATH GOPAL SEN, B.L.

For over a quarter of a century Maharaja Sir Manindra Chandra Nandy of hallowed memory figured as the fountain head of charity and munificence on a scale hardly surpassed, as a leading patron of the country's industries, art and literature and as a model of humility, simplicity and religiosity, rare and hard to emulate. Having spent a crore of rupees in the cause of education alone he is rightly regarded as the greatest giver of modern Bengal.

When after a brief spell of illness the Maharaja died on the 12th November, 1929, the country as a whole mourned the loss of a great and good soul. In him India and particularly Bengal lost a glorious son, nay a glorious institution. The Maharaja represented a type, which, always rare, had grown exceedingly scare at the beginning of this century. His exit amounted to its virtual extinction.

Born in 1860, Manindra Chandra belonged to an older generation—a generation with an outlook on life and things quite different from that of ours. But although of the old school and adhering to old traditions, he was in no sense irresponsive to modern influences. He never lost sight of the fact that he was living in the ever-changing present and that living implied taking active interest in every sphere of progressive life. This type of men—men of an older generation capable of sympathetic, intelligent appreciation of new ideals and new thoughts—is always rare. Manindra Chandra was a rare specimen of this rare type.

Living faith in God, intense love of religion, altruism—these are ideals which have little appeal for the modern generation. Manindra Chandra had a superabundance of all of them. But along with them he cherished the ideals of love of country, of swadeshi and progress as dearly as any moderner. The very diversity and munificence of his charities were symbolic of that unique union between old ideals and new. He gave freely to Brahmins and pandits, to temples and sadhus and more freely to hospitals and colleges, to scientists and industrialists.

Undoubtedly he was a unique personality—a great and good man. But to what did he owe his goodness and greatness ? He lost his mother when he was a baby in arms and his father died when he was in his early teens. He was thus, more or less, an orphan. The path of life was not all strewn with roses for him. Although the heir presumptive to one of the biggest estates in Bengal, he was not, luckily for himself and for Bengal, reared in an atmosphere of ease and luxury. His childhood and early youth were spent in modest surroundings and this, in a way, was the secret of his phenomenal success in later life. When he succeeded to the Kasimbazar *gadi* in 1897 and came into possession of vast wealth, he did not lose balance. He had the advantage of a fairly strict upbringing and naturally wealth never made him giddy. He did not, and never could, abandon himself to an idle and wasteful life of ease and luxury. The training of his earlier days had made him averse to such a mode of existence. On the contrary, he modelled his life on the motto *noblesse oblige,* the greater your possessions the more your responsibility to mankind.

His life was a success—a glorious success—solely because he had lived up to that motto. He never considered his wealth as his private possession. He firmly believed it was in the nature of a trust property entrusted to him by God, for him to administer it in the interests of the needy. He acted according to this belief. Never a penny was wasted on his own self but there was always abundance to spare for the distressed and the deserving. What an irony that a favourite of Fortune should harbour such

ideals at a time when Marxism holds the world in a grip because of the meanness and the selfishness of the idle rich !

In days to come, the historian who will take upon himself the task of recording the chronicles of Bengal during the first quarter of the 20th century will be amazed to find that no matter from what angle he views the period he is confronted with the all-pervading personality of Maharaja Manindra Chandra. As a patron of learning and culture there is that towering figure distributing his patronage like Kamadhenu. We mention here only some of the institutions which received his princely munificence :—(1) Benares Hindu University (Rs. 2 lakhs) ; (2) Sir J. C. Bose's Science Institute (Rs. 2 lakhs) ; (3) Berhampore K. N. College (Rs. 60,000 annually, in all nearly Rs. 25 lakhs) ; (4) Berhampore K. N. Collegiate School (for building only, Rs. 1½ lakh besides grants for maintenance) ; (5) National Council of Education ; (6) Calcutta University ; (7) Bangiya Sahitya Parishad ; (8) Rungpur Carmichael College ; (9) Belgachia Medical College ; (10) Ethora Mining School ; (11) Berhampore Commercial and Technical Institutes ; (12) Calcutta Polytechnic School ; (13) Ranchi Brahmacharyya Vidyalaya ; (14) Govinda Sundari Ayurvedic Vidyalaya ; (15) Calcutta Deaf and Dumb School ; (16) Calcutta Commercial Institute.

He also maintained entirely at his cost, without taking any aid from the Government, nearly fourteen H. E. schools and innumerable M. E. and Primary schools in different localities of his zemindari. He spent several lakhs of rupees for the publication of some standard literary works of a classical and monumental character. We may mention here (1) Indian Medicinal Plants by Major B. D. Bose, I.M.S. ; (2) Sreemad Bhagbad Geeta in 5,400 pages with the annotations of Sreedhar Swamy, Sanatan Goswamy and others ; (3) Sree Sree Gopalchampu (life of Sree Krishna) in 4,000 pages : (4) Rig-Veda in English and Devanagri ; and many books on Vaisnab literature.

His contributions towards the industrial regeneration of the province are too numerous to recount. What he as a private individual did to help the infant industries of Bengal would

have been, we think, difficult for a single first class industrial bank of any country to outdo.

His treasury was open to all those who with some technical or specialised knowledge acquired in this country or abroad wanted to launch out on some industrial venture—let it be pottery, tannery, glass, sand, china clay, stone, insurance, banking, journalism, tin printing, weaving, enamelling, engraving—in short, any line of activities which might open out fresh fields of employment for his countrymen. Those who had the good fortune of enjoying his unbounded patronage did not always do justice to themselves or to his bounties, and as is only natural for these pioneering ventures, many of them did not prove successful. But it is certain that they paved the way for their successors. He fully realized that it was impossible for swadeshi industries to develop unless there were Indian industrial banks to back and support them. And what did he not do for the Co-operative Hindusthan Bank Ltd.? He, with his colleagues, borrowed about Rs. 7 lakhs and advanced the amount to the Bank to keep it going!

In the field of politics the Maharaja was a towering personality, with indomitable courage and the spirit of independence. Regardless of consequences, he stood heroically by the side of other leaders who led the anti-partition agitation and swadeshi movement. It was he who presided at that memorable Town Hall meeting which entered the now historic protest of united Bengal against her partition. It was he who opened the first Industrial Exhibition in Calcutta organized by the Congress. The result of these activities made him unpopular with the Government of Lord Curzon. The "black mark" against his name in the official papers was, however, removed during the Viceroyalty of Lord Curzon's successor, Lord Hardinge, who as soon as he met Manindra Chandra, instinctively realized the greatness and nobility of the man and came to treat him as a personal friend. It was Lord Hardinge who in 1915 conferred on him the distinction of K. C. I. E. in recognition of his sterling merits.

The cause of suffering humanity always appealed to him. The Albert Victor Hospital of Belgachia, the Curzon Hospital at Kasimbazar, the charitable dispensaries at Mathrun, Ulipur, Chilmari, Kurigram and other places all testify to his unbounded charities. Even before his death, when he had bled himself white and the management of the estate had gone out of his hands, he promised a lakh of rupees for a medical school at Berhampore and paid Rs. 40,000 of the promised sum by borrowing! When his friends dared occasionally to point out the serious consequences to which he was leading himself by his unrestrained generosities, he would smilingly reply that he was born a commoner and was not afraid to go out again into the wide world to live there as such. Rajarshi Manindra Chandra could rightly say so. In the midst of wealth and enormous fortune, he lived an austere, hard life. Simple in his habits and inured to severe physical and mental labour and strain, it was difficult to find a man who could beat him in bearing hardship and privations. Not to speak of his freedom from luxurious habits that cost money, he was free even from the poor man's habit of taking *pan* and smoking. When we look to this side of his character, as pure as a white lily, and when we remember that he was born in the ordinary environments of a commonplace Bengali life, we wonder how his life could be so uncommonly pure and undefiled. And we believe that his advent was pre-ordained by God to serve His hidden purpose, may be, to serve as a beacon light to his countrymen—the rich and the poor alike.

There are men who consider such goodness to be inseparable from the want of a worldly sense or intelligence. Many have a vague idea that the Maharaja was great, good and noble but was not worldly wise. But one simple fact should give the lie to any such notions. The net income of the Kasimbazar Estate during Maharani Swarnamoyee's time was only Rs. 6 lakhs. It increased to Rs. 18 lakhs a year when he died. This could not certainly be the work of a man who lacked worldly sense or administrative capacity. It was an achievement of which any man could

justly be proud. This he achieved not as a rack-renting landlord—that was out of the question with his nature. On the contrary, whenever and wherever there was distress amongst his tenantry, he arranged for relief and remissions of rents. In the biggest part of his zemindari—the Baharbund pargana—he once remitted a lakh of rupees in the case of one *jotedar* alone. The cause of his success lay elsewhere. He had a keen insight and broad outlook and did not remain satisfied with the stereotyped income from zemindaries but explored new avenues. Coal properties there were practically none at the time of Maharani Swarnamoyee but he saw the immense possibilities of this line investment and began buying coal lands, the income from which in normal years came to be not less than Rs. 10 lakhs annually ! The Ekra colliery which he puchased at a convenient price is now probably the finest and best equipped colliery in India.

He also conceived a bold scheme to remove the ever-growing poverty of the agriculturists. He saw that on account of buyers' combinations and middlemen's ingenuity, the tillers of the soil could not get proper price for their products, and though others thrived and prospered, their lot was unchanged. It was, therefore, in his contemplation to buy the entire jute production of his Baharbund pargana at a reasonable and fair price from his tenants by setting off the price against their rents as much as possible, and then to sell in a suitable market. This was also the scheme of Deshabandhu Das. Similar was also the object of the Co-operative Jute Sale and Supply Societies started by Rai Bahadur Jamini Mitra but which for mismanagement and want of sympathy came to grief. Sooner or later, something of this nature has to be done if exploitation of the peasants is to be stopped and the Bengal landholders are to exist. Manindra Chandra had the foresight to see this.

As regards zemindari management, he was thoroughly conversant with all its details, so much so that he could himself fill all kinds of forms from rent receipts to ledgers, a task which even many zemindari managers will hesitate to undertake. He used to keep a private account written up by himself, containing

every item of daily income and expenditure which, in view of the amounts involved and their diversity in character, was in itself a herculean task. He had a natural aptitude for going into details and though he had four or five secretaries, he would himself dictate the majority of orders and correspondence and would himself generally sign all of them.

Several estates of Bengal, some representing old and well-known houses, would have become extinct to-day but for his timely intervention and unexampled sacrifice. When the proprietors saw that they were so heavily encumbered that there was no way out of their mahajans' snare, they approached the Data-karna of Bengal and he readily took them under his protecting arms, being appointed their sole trustee. He thus took upon himself all their liabilities and saved them from the immediate clutches of the mahajans. It is really an irony of fate that he who considered himself a trustee for others and always tried to act as such had to hand over the management of his Estate to others ! It is really a tragic chapter in his life which this is not the proper place to narrate. It was like the case of a man who heroically saved all drowning men but was himself at last drowned.

He had one great defect we admit. He could not be hard even to the wicked, he could not say "no" to the undeserving. He was all forgiveness. He would say about them, 'let them have a change.' Of him only truly could we say :

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानिना मानदेन कीर्त्तनीयः सदा हरिः

---

৩৫ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারাগ্রাফের পরিশিষ্ট (১)

মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী

এই সাপ্তাহিক পত্রখানিকে সকলেই ভুলক্রমে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' * বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণে'র কথা বাদ দিলে 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'ই মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮৪০ সনের ১০ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ সনের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণাল'-এ পাইতেছি,—

"*Moorshedabad Sunbad Puttree.*—A weekly newspaper in the Bengally language and character, under the above title, made its appearance on the 10th of May, in Moorshedabad. Its opinions are liberal, and clothed in pure Bengally."
(P. 325.)

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' কাশিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। ১৮৪০,১৪ই মে তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়র' লিখিয়াছেন,—

"*A New Bengally Newspaper* —The first number of a new Bengally paper, called the *Moorshedabad Sungbad Putri*, has just made its appearance. It is, we believe, published under the auspices of Kowar Kissennauth Roy of Moorshedabad."

কাগজখানি সম্পাদন করিতেন গুরুদয়াল চৌধুরী। এক বৎসর পরে ইহার প্রচার রহিত করিতে হয়। ১৮৪১ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' দেখিতেছি,—

"কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই, রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় রাজধানীতে 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'

* [The Calcutta Review Vol. LVII (1873) তে পাওয়া যায়—রাজা কৃষ্ণনাথ Murshidabad News নামে ইং ১৮৩৮ সালে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুর লিখিত 'সংবাদ পত্রের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে দেখি রাজা কৃষ্ণনাথ ১৮৪০ সালে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন—; এতৎসম্পর্কে তাঁহার প্রবন্ধ হইতে উপরের উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য।]

নামে এক সংবাদপত্রী করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাদুর বর্ত্তমানেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তৎপরে রঙ্গপুর নিবাসী বিদ্যাভিলাষি মহাশয়দিগের আনুকূল্যে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামে এক পত্র প্রকাশ হয়।"

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'কে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা'রূপে উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' বহু বৎসর পরে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্য নহে। 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' ১২৭৯ সালের ১৫ই বৈশাখ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়,—পুনর্জ্জীবিত হয় নাই। ১২৭৯ সালের ২রা আষাঢ় তারিখের 'মধ্যস্থ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে পাইতেছি,—

"ভারতরঞ্জন ও মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।—প্রথমোক্ত পত্রখানি মুর্শিদাবাদের পুরাতন এবং শেষোক্ত পত্রিকাখানি নূতন। নবোদিতা প্রিয়ভগ্নী মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।"

৩৬ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারাগ্রাফের পরিশিষ্ট (২)

কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ ও তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করায়, ১৮৪৩ সনের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে কৃষ্ণনাথ কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে 'রসরাজ'-সম্পাদকের নামে মানহানির মোকদ্দমা রুজু করেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' একই সম্পাদকীয় দায়িত্বে প্রকাশিত হইত। এই কারণে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই দোষী সাব্যস্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৪৩, ১৯এ জানুয়ারি) লিখিয়াছেন,—

"The Editor of the *Rasoraj*, a native paper, was on Saturday [14 Jany.] found guilty of a libel on Rajah Kishennath Roy. A more infamous libel, has never stained the pages of a Native Journal. It is calculated to throw no little discredit on the Native Press, that this paper, which has been pre-eminently for its filthy attacks on character, should be published under the same editorial responsibility as the *Bhaskur*, which is remarkable for its talent. It is no credit to Native society that four hundred copies of this *Rusoraj* should find purchasers in it."

১৮৪৩ সনের ১৭ই জানুয়ারি বিচারপতি স্যর জন্ পিটার গ্রাণ্ট এই মানহানির মোকদ্দমায় রায় দেন। পরদিন 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে এই রায়ের নকল বাহির হয়; তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"The sentence of this court is, that you be imprisoned in the Common Jail for a period of six calendar months, that you pay a fine of Rs, 500 to your Sovereign Lady the Queen, etc. and further, that you be in imprisonment till the fine is paid; and that you enter into recognizance, yourself in the sum of Rs. 1,000, and two sureties in the sum of Rs. 500 each, that you will not, for the space of one year after the date of your imprisonment, write or publish any libel against the prosecutor."

আন্দুল-নিবাসী জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ও তাঁহার কর্ম্মচারী ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল জামিন হইয়া গৌরীশঙ্করকে যথাসময়ে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। ১৮৪৪ সনের ১৬ই জুলাই (২ শ্রাবণ ১২৫১) তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাইয়াছি,—

"গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।

আমার পরম বন্ধু আন্দুলনিবাসি জমিদার উক্ত মল্লিক মহাশয় এবং তাঁহার কর্ম্মকারক শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল অদ্য সুপ্রীম কোর্টের নিয়ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, গত শ্রা * * * * * * য় [২রা শ্রাবণ] দিনে জগন্নাথ বাবু আপন কর্ম্মকারক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সহিত সুপ্রীমকোর্টে প্রতিভূ অর্থাৎ জামীন হইয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত বাবু * * * ভূ পত্রে লিখিয়াছিলেন যদি আমি * * * * * সমাচার পত্রে মুর্শিদাবাদের মহারাজা * * * কৃষ্ণনাথের কোন অখ্যাতি প্রকাশ করি তবে দুই বাবু দুই সহস্র টাকা দণ্ড দিবেন এবং সুপ্রীম কোর্টের উত্তরদিগের আসনধারি বিচারকারি মহাশয় আমার স্থানেও লিখিয়া লইলেন এক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণনাথের নাম করিলে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিবেন, সে এক বৎসর গতকল্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, আমার বন্ধুরা অদ্য মুক্ত হইলেন, এবং আমিও পঞ্চ সহস্রি প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলাম, * * * ঐ বন্ধন মোচনকারী পূর্ব্বোক্ত দুই মহাশয়ের উপকারবন্ধনে যাবজ্জীবন থাকিতে হইল, তাঁহারা আমার যে উপকার করিয়াছেন আমি তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না।...

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।"

---

(১) ও (২) [দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯, ১ম সংখ্যা]

মহারাজের সাহিত্য-সেবা
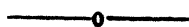
সাহিত্যে ভাববিপর্য্যয়

* * * রাজার এই রাজ্যের মঙ্গলার্থ রাজভক্ত ভারত তাহার দেহের শেষ শোণিতবিন্দু পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে স্বর্গে ভগবানের আসন নড়িয়া উঠে বলিয়া যে দেশের বিশ্বাস; দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারে সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত অভিসম্পাতে যে দেশে কাব্যের সৃষ্টি; সে দেশের লোক অত্যাচার প্রপীড়িত ভূমণ্ডলের উদ্ধার-সাধনের জন্য যে প্রাণপণে যত্ন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় ভারত যে তাহার ধর্ম্মপ্রাণতার চিরপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিকই গত চারি বৎসরের কথা স্মরণপথে উদিত হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সুরম্য সৌধমালা-পরিশোভিত আনন্দমুখর জনপদের তলদেশে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আগ্নেয়গিরির যে ভীষণ আলোড়ন আস্ফালন চলিতেছিল, তাহা কে জানিত? শত শত বৎসর ধরিয়া যে সম্পদ, যে সৌন্দর্য্য, যে অমূল্য জ্ঞানরত্ন সঞ্চিত হইতেছিল, কে জানিত, তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া ভাসাইয়া দিবার জন্য উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গের সহিত অনলাম্বুধি অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইবে? য়ুরোপের এত সভ্যতা, এত বিদ্যা, এত শিক্ষা—যাহার আদর্শে আমরা আমাদের জীবন গঠন করিবার জন্য ব্যগ্র—তাহার ভিতরে এত বিষ, এত দাহ, এত উন্মত্ততা! ইহা স্বহস্তে যাহা গঠন করে, অব্যবস্থিতচিত্ত বালকের ন্যায় এক দিনের খেয়ালে তাহাই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এ সভ্যতা—এ শিক্ষার সার্থকতা কি? এই প্রশ্নই এখন আমাদের মনে স্বতঃ উদিত হইয়া থাকে।

এই প্রশ্নের সহিত আমাদের সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সাহিত্যের আদর্শ লইয়া এখন আমাদের মধ্যে মহা আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। সংক্ষেপে

বলিতে গেলে, ভারতীয় অর্থাৎ আর্য্য-সাহিত্যের আদর্শ—ত্যাগ, সংযম—ভোগবিলাস নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Pessimistic বা দুঃখবাদের সাহিত্য বলিয়া আমাদের সাহিত্যের অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের দেশেরও এক সম্প্রদায় লেখক এখন এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু য়ুরোপ যাহাকে Pessimism বলে, আমাদের সাহিত্যের আদর্শ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের সাহিত্য সুখের বা ভোগের বিরোধী নহে; তবে শাস্ত্র ভোগেও সংযত হইবার উপদেশ দিয়াছেন, নতুবা ভোগের পরিণাম বিষময় হইয়া উঠে।

আমাদের কবি ও শাস্ত্রকারগণ স্থায়ী সুখলাভের জন্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভোগ কর—কিন্তু সংযত ও নিষ্কাম হইয়া। তাহার ফলে অনন্ত সুখ ও শান্তির অধিকারী হইবে। আসমুদ্র ধরণীর অধীশ্বর, প্রয়োজন হইলে, অম্লান-বদনে বনে বনে গোচারণ করিতে পারিতেন; মর্ম্মর-প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া ঋষির উটজ কুশশয়নে নিশাযাপন করিতে পারিতেন। আর্য্য শাস্ত্রকার মরীচিকার সৃষ্টি করিয়া দিগভ্রান্ত প'থককে ধ্বংসের পথে লইয়া যান না। তিনি তাহাকে প্রকৃত সুখের অনন্ত ক্ষীরোদ-সমুদ্রের সন্ধান বলিয়া দেন। সেই ক্ষীরোদ-সমুদ্রে উপস্থিত হইতে হইলে বহু প্রলোভন, বাধা বিঘ্ন এড়াইতে হইবে। কিন্তু ঘোরতর ঐহিকতাপ্রিয় (materialistic) ইহকাল-সর্ব্বস্ব য়ুরোপের আদর্শ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার জীবন-সুধার সমস্ত পান করিবেন, ভোগের কণামাত্রও বাদ দিবেন না। তাঁহাদের কথা—"আমি যা চাই, তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চট্‌কাব, দুই পায়ে ক'রে দল্‌ব। সমস্ত গায়ে তা মাখ্‌ব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব।"

এই উৎকট ভোগলালসার ফল য়ুরোপ হাতে হাতে পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপে যে কোনও আন্দোলনের সূচনা হয়, আমাদের দেশে তাহারই সমর্থন করিয়া একদল লোক আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন, এবং স্বতঃ পরতঃ তাহারই প্রচার-কল্পে বদ্ধপরিকর হন। য়ুরোপীয় সমাজে ঐ আন্দোলনের ফলাফলের প্রতীক্ষা করিবার ধৈর্য্য তাঁহাদের থাকে না। দেশের সমস্ত উন্নতি তাঁহারা তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই দেখিয়া যাইতে উৎসুক। কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কত চিন্তা কত ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহাদের কতকগুলি কোরক অবস্থায় শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া

পড়িয়া গিয়াছে ; কতকগুলি ফুটিতে ফুটিতে প্রতিকূল অবস্থায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; কতকগুলি আবার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। যে গুলিকে এক সময়ে পৃথিবীর লোক চিন্তা বা ভাবের চরমোৎকর্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিল, কালে তাহাদেরই উচ্ছেদের জন্ত কত শত চেষ্টা হইয়াছে। অতএব, পুরাতন হইলেই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, এমন নহে, সেইরূপ নূতন হইলেই যে তাহা সর্ব্বদা গ্রহণীয়, এমনও হইতে পারে না। বরং পুরাতনের দোষ গুণ অনেক দিনের পরীক্ষিত বলিয়া উহার স্বপক্ষে বিপক্ষে দুই একটি কথা বলিতে পারা যায় ; কিন্তু একেবারে অপরীক্ষিত নূতনকে সম্পূর্ণ অপরিচিত অতিথির ন্তায় কতকটা সন্দেহের চক্ষে দেখা আমাদের স্বভাব। তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি না, কি জানি যদি তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ছুরিকা লুক্কায়িত থাকে। এই সন্দেহ, সঙ্কোচের জন্ত যাঁহারা আমাদিগকে উপহাস করেন, করুন ; কিন্তু ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

য়ুরোপের এক একটা নূতন মতবাদ গ্রহণ করিতে আমাদের সন্দেহ সঙ্কোচের যথেষ্ট কারণ আছে কিনা, তাহা সেই সকল মতের একটু আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবে। আজকাল য়ুরোপীয় সাহিত্যে নীজকে ও ইবসেনের মতের খুব আলোচনা হইতেছে। যে অতিমানুষবাদ (Superman) এখন ওত-প্রোতভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, নীজকে সেই মতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে "feminist movement" ও খুব প্রবল হইয়াছে। ইব্‌সেন সেই আন্দোলনের একজন প্রধান সহায়। নীজকে ও তৎসম্প্রদায়ের মত আধুনিক জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং গত সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধের জন্ত ইঁহারা বহুল পরিমাণে দায়ী। আমরা আমাদের উক্তির সমর্থনার্থ এই মতের একটু আলোচনা করিব।

নীজকের মতের সারাংশ এই—আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যজাতি যে জীবন যাপন করিতেছে, তাহা একেবারে উদ্দেশুহীন। অতএব মনুষ্যজাতির সম্মুখে একটু উদ্দেশ্ত স্থাপন করিতে হইবে। সেই উদ্দেশু হইতেছে—Superman বা 'অতিমানুষ' জাতির সৃষ্টি ; অর্থাৎ এই মনুষ্যজাতি ক্রমোন্নতি সহকারে যাহাতে এক শ্রেষ্ঠতম জীবে পরিণত হয়, সেই উদ্দেশ্তেই ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। যে ধর্ম্ম, যে রাজনীতি বা সমাজনীতি এই উদ্দেশ্তসাধনের প্রতিকূল, তাহাকে সমূলে

উৎপাটিত করিতে হইবে। জগতে কেবল শক্তিশালী লোকেরই প্রয়োজন; কারণ এই সকল শক্তিশালী লোক হইতেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতশক্তি জাতির সৃষ্টি হইয়া সুদূর ভবিষ্যতে "অতিমানব" জাতির সৃষ্টি সম্ভবপর হইবে।

নীজকের নীতিশাস্ত্রে দয়াধর্ম্মের স্থান নাই। কারণ ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা হইতেই দয়ার সৃষ্টি। দয়া মানুষকে শক্তিহীন করে। নীজকের নিজের কথা এই—

"Pity is opposed to the tonic passions which enhance the energy of the feeling of life, its action is depressing. A man loses power when he pities. On the whole, pity thwarts the law of development which is the law of selection. It preserves that which is ripe for death, it fights in favour of the disinherited and the condemned of life. By multiplying misery quite as much as by preserving all that is miserable, it is the principal agent in promoting decadence.'

অর্থাৎ দুর্ব্বলের উপরেই লোকে দয়া করিয়া থাকে। যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা জগতের আবর্জ্জনা; তাহারা জগতে 'disinherited', অর্থাৎ সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত এবং condemned অর্থাৎ বধ্য। তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে কেবল দুঃখদৈন্যের ভার বর্দ্ধিত করা হয়, তাহাতে মানবজাতির অবনতিই ঘটিবে, জগৎ superman এর দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব দুর্ব্বলের প্রতি দয়া প্রকাশ অতি অন্যায় কার্য্য।

আবার—

"The weak and the botched shall perish; first principle of our humanity. And they ought even to be helped to perish."

অর্থাৎ দুর্ব্বল লোকদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যজাতির নীতিশাস্ত্রের প্রথম মূলমন্ত্র। ইহারা যাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহার সুবিধা পর্য্যন্ত করিয়া দিতে হইবে। এই সকল কথা ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্তনবাদের (Survival of the fittest) প্রতিধ্বনিমাত্র। তিনিও বর্ত্তমান সভ্যসমাজে অযোগ্য, পীড়িত, রুগ্ন মানবের রক্ষার্থ বিজ্ঞানের চেষ্টা মানবজাতির উন্নতির পরিপন্থী—এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

নির্ভীকতা, রণপ্রিয়তা—ইহাই নিজকের মতে উন্নত মনুষ্যজাতির বিশেষগুণ।

পরিশিষ্ট

"War and courage have done more great things than charity. What is the good? Ye ask. To be brave is good. Live your life of obedience and of war."

যাঁহারা জর্ম্মান্ সেনানী Bernhardi প্রণীত "German and the next war" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে নীৎসের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। Bernhardi লিখিয়াছেন—

"War is a biological necessity, an indispensable regulator in the life of mankind, failing which would result a course of evolution deletorious to the species, and, too, utterly antagonistic to all culture. War, said Heraclitus, is the father of all things. Without war, inferior or demoralised races would only too easily swamp the healthy and vital ones, and a general decadence would be the consequence. War is one of the essential factors of morality. If circumstances require, it is not only the right but the moral and political duty of a statesman to bring about a war!"

সেই একই কথা। অর্থাৎ যুদ্ধে মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, অশক্ত, আবর্জ্জনাস্বরূপ, যুদ্ধ ঘটিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় জাতির সারাংশটুকুই অবশিষ্ট থাকে। অতএব যুদ্ধ সংঘটিত করা রাজনীতিকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

এই শিক্ষার ফলেই জার্ম্মাণী দুর্ব্বল বেলজিয়মকে পদদলিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

ধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য—এ সমস্তই নিৎসের মতে পুরোহিতদের একটা ভয়ঙ্কর মিথ্যা চাতুরী—

"All lies through and through, without a shred of psychological reality—a vampirism of pale subterraneain leeches! Sin was invented in order to make science, culture, and every elevation and noble trait in man quite impossible; by means of the invention of Sin the priest is able to rule."

ঈশ্বর সম্বন্ধে নীৎসের মত পূর্ব্ববর্ত্তী মত সকলেরই অনুরূপ। তিনি বলেন—

"An omniscient and omnipotent God who does not even take care that his intentions shall be understood by his creatures could he be a god of goodness? A God, who for thousands of years

has permitted innumerable doubts and scruples to continue unchecked as if they were of no importance in the salvation of mankind, and who, nevertheless, announces the most dreadful consequences for any one who mistakes his truth,—would he not be a cruel God, if being himself in possession of the truth, he could calmly contemplate mankind, in a state of miserable torment, worrying its mind as to what was truth ?"

বিবাহ সম্বন্ধে নীজকের মত—ভবিষ্যতে বিবাহের উদ্দেশ্য হইবে—এক নূতন জাতির সৃষ্টি করা। এ জন্য "concubinage" প্রথার প্রচলনের প্রয়োজন হইতে পারে। "Wife" ও "concubine" এর দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কারণ—

"If, on the ground of his health, the wife is also to serve for the sole satisfaction of the man's sexual needs, a wrong perspective opposed to the aim indicated, will have most influence in the choice of a wife."

নীজকে এমন কি, "Trial marriage" বা "Leasehold marriage" এরও পক্ষপাতী ছিলেন। কিছুকাল একত্র বাস করিয়া যদি অসুবিধা মনে হয়, উভয় পক্ষ সে বিবাহ বাতিল করিতে পারেন।

আবার সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধেও সমাজকে কঠোর বিধিনিষেধের প্রবর্তন করিতে হইবে। এমন কি স্থল-বিশেষে বন্ধ্যাত্ব-সম্পাদনও সমাজের কর্তব্য হইবে। –

"Society, as the trustee of life, is responsible for every botched life before it comes into existence, and as society has to suffer for such lives it ought, consequently, to be made impossible for them ever to see the light of day. Society should in many cases actually prevent the act of procreation and may, without any regard for rank, descent, or intellect, hold in readiness the most rigorous forms of compulsion and restriction, and, under certain circumstances, have recourse to sterilisation."

মহাভারতের ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের পাঠক—ক্ষাত্রশক্তির অতিবৃদ্ধির দিনে এই সকল ভয়াবহ অনার্য্যজুষ্ট মতবাদের সুস্পষ্ট আভাস অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সেই সকল মতবাদেরই পরিণতি। এই অনর্থকর মতবাদের সহিত

আমাদের ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থার তুলনা করুন। সে উপদেশ কি পবিত্র ও মহান্! এই তুলনা হইতে, সভ্যতার মহত্ত্ব সহজেই উপলব্ধি হইবে ; আর উপলব্ধি হইবে যে, আমরা অন্ধের ন্যায় কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাচের সমাদর করিতেছি।

এই সমস্ত ভাব সমাজের কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা আধুনিক "Bolshevism"এর দ্বারা স্পষ্টীভূত হইতেছে। Bolshevikরা বিবাহ-পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়া "nationalisation of women", অর্থাৎ স্ত্রীমাত্রকেই সাধারণের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

ইব্‌সেনের নাটকগুলির সারমর্ম্ম এই যে, সমাজ স্ত্রীলোকদিগকে এমনই চাপিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা পুরুষের হস্তে ক্রীড়নকের ন্যায় হইয়া আছে, ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনে একেবারেই সমর্থ নহে।

আমাদের আধুনিক এক শ্রেণীর সাহিত্যে পূর্ব্বাপর এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায় ;—

"সমস্ত সমাজ চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে যেন ছোট ক'রে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেল্‌ছে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে।"

ইব্‌সেনের Doll's Houseএর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে Millএর Subject of Women প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই "নারীজাতির উদ্ধার বিষয়ে আন্দোলন দিন দিন শক্তিসঞ্চার করিতে থাকে। ইহার ফলস্বরূপ বিলাতে Suffragisteদের বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার কথা সকলেই অবগত আছেন।

আমাদের সমাজ, আমাদের শাস্ত্র, নারীজাতির শত্রু। আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি সমুদায় নারীজাতিকে পাষাণ-পিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গল্পে, গানে, কবিতায় এই কথারই প্রচার করা ও সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজের, হিন্দুশাস্ত্রের ও সেই শাস্ত্রপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা, উপহাস প্রভৃতি করা এক সম্প্রদায় লেখকের 'কর্ত্তব্য' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইঁহাদের কথা মানিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, যে স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য লজ্জা শিষ্টাচার প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া প্রকাশ্য রাজপথে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, লোকের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব অত্যাচার করে, তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ হইয়াছে, বা তাহারা সেই পথে অনেকটা

অগ্রসর হইয়াছে; আর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, রাণী ভবানী, অহল্যা বাঈ প্রভৃতি নারীগণের হৃদয় সংকীর্ণ ও শাস্ত্রবিহিত আচার পালনে সংপিষ্ট হইয়া থাকিয়া চূরিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এ কথা স্বীকার করেন, করুন; কিন্তু আমরা সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি নারীগণকে চিরকাল দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি, এবং এখনও পূজা করিব। কারণ, আমরা ত্যাগীর পূজা করি, ভোগবিলাসীর নহে।

পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কি নারীর ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রধান সহায়? আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের সমাজে নারী—জননী, পত্নী, এমন কি, সর্ব্বস্বহীনা বিধবা রূপেও ত্যাগের যে মহান্ আদর্শ প্রত্যহ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রহিয়াছেন, তাহার নিকট অন্য সমস্ত আদর্শই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

য়ুরোপীয়েরা নিজেদের আচার ব্যবহার প্রভৃতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা আমাদিগকে বুঝিতে পারেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করেন না। এরূপ অবস্থায় বদ্ধমূল সংস্কার লইয়া একদেশদর্শী য়ুরোপ যদি আমাদিগকে নারীপীড়ক বলেন, তাহা হইলে আমরা তাহাই বেদবাক্য মনে করিয়া সমাজ-সংস্কারে ব্যগ্র হইব কি? আমাদের শাস্ত্র কখনও নারীপীড়ক নহে। যে শাস্ত্র বলেন—

> "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
> যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
> শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
> ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥"

সে শাস্ত্র কখনও নারীপীড়ক নহে।

একেবারে দোষস্পর্শ-শূন্য সমাজ কখনও ছিল না, কোথাও নাই, এবং কোনও স্বপ্নরাজ্যে সম্ভব হইলেও বাস্তবজগতে পরিলক্ষিত হইবে না। এক অনর্থের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে, অন্য অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সন্তানজনক প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কার করিতে যাইয়া তথাকথিত য়ুরোপীয় সমাজ-সংস্কারকেরা কত বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অতএব সংস্কারকের দায়িত্ব কত গুরুতর, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

তবে কি সংস্কারের কোনও প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই আছে। সংস্কার হইয়াছে, হইতেছে, হইবে। কিন্তু সেই সংস্কার আমাদের জাতীয়তা, আমাদের মেদমজ্জাগত আদর্শের অনুরূপ হওয়া চাই। নচেৎ, তাহা কখনও সুফলপ্রদ হইবে না।

এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাব হইতে সমাজে একটা প্রবল অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; ইহার ফল অনেক সময় অতি ভীষণ হইয়া থাকে। ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে Sir John Woodroffe, Sir George Birdwoodএর মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা এই—

"It has destroyed in Indians the love of their own literature the quickening soul of a people, and their delight in their own arts, and worst of all their repose in their own traditional and national religion, has disgusted them with their own homes, their parents, and their sisters, their very wives, and brought discontent into every family so far as its baneful influences have reached."

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যিকেরা উচ্ছৃঙ্খল য়ুরোপীয় ভাবের প্রবর্ত্তন দ্বারা এই অনিষ্টের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। কয়েকজন বর্ণনাকুশল লেখক তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কুলভ্রষ্ট নারীগণের চরিত্র এমনই চিত্তাকর্ষকভাবে চিত্রিত করিতেছেন যে, অনেক অপরিণতবয়স্ক পাঠক-পাঠিকা তাহা পাঠ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এ সাহিত্য চিরস্থায়ী হইবে, সে আশা অনেকের নাই। কিন্তু উহার অস্থায়ী জীবিতকালের মধ্যে উহা দ্বারা যে কত দূর অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ সাহিত্য সাহিত্য-কাননের আবর্জ্জনামাত্র। ইহার উচ্ছেদসাধনে সমাজ ও সাহিত্যের মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে য়ুরোপীয় ভাবে দুষ্ট হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার প্রকৃতির আলোচনা করিলাম। আমি বলিয়াছি, আমরা দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী নহি। আমরাও সংস্কারের পক্ষপাতী। তবে আমাদের মঙ্গলেচ্ছার বা সংস্কারের মূলে অতীতের প্রতি অবজ্ঞা, শাস্ত্রের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা বা বিদ্বেষ নাই। আমরা যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার গর্ব্ব করি, তাহার মূল ধর্ম্মশাস্ত্র। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই আমাদের জাতীয়তার অপূর্ব্ব মর্ম্মরসৌধ যুগযুগান্তর

ব্যাপিয়া, অরাতির আক্রমণপরম্পরা ব্যর্থ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; যাহা দেখিয়া য়ুরোপীয়গণও বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন যে, "They have survived in a way, and to a degree, which is not seen in the case of any other country in the world." অর্থাৎ, হিন্দুরা এই সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আপনাদের অস্তিত্ব যেমন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এমন আর পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। সেই সৌধের সংস্কারে আমরা ইহকাল সর্ব্বস্ব, অস্থিরচিত্ত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মুখাপেক্ষী হইব কেন? যে দেশে এ বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে, সে দেশে ইহার সংস্কারের উপাদান নাই, ইহা কি সম্ভব? একান্ত প্রয়োজন হইলে বিদেশ হইতে সাহায্য লইব, কিন্তু তাহাদের আদর্শ লইব না। তাহা করিলে আমাদের জাতীয়তা বিলুপ্ত হইবে।

সুখের বিষয়, গত যুদ্ধে য়ুরোপের চক্ষু কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে। ইহাতে আশা করা যায়, আমাদের দেশেও অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইবে। আমাদের উচ্চ উদার আদর্শের অনুসরণ করিয়া, অধ্যবসায় ও সাধনার বলে, আমরা আবার উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া জগতে পরিচয় দিতে পারিব—"অমৃতস্য পুত্রা বয়ম্" আমাদের সাহিত্য সেই আদর্শের অনাবিল উৎসস্বরূপ হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত দৈন্য-দারিদ্র্য, ক্লেদ-কর্দ্দম বিধৌত করিয়া দিবে। ভগবৎ-সমীপে ইহাই আমার প্রার্থনা। কারণ—

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" *

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

---

* সন ১৩২৫ সাল, ১৯শে মাঘ বহরমপুর সাহিত্যসভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

শ্রীবিবেকানন্দ উৎসবে

পূজ্যপাদ সাধু এবং মাননীয় মহোদয়গণ,—

ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি বহুবার বহু সভায় নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আজ মহাপুরুষের নামসংসৃষ্ট এই মহতী সভায় আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে গৌরবের আসনে বরণ করিয়া আপনারা যে সম্মান দান করিয়াছেন, মুখের একটা কথায় ধন্যবাদ দিয়া তাহার প্রতিদান হয় না, এই জন্য আপনাদিগকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাহি না; কেবল বলিতে চাহি যে, আপনাদের এই উদার অনুগ্রহে আমিই ধন্য হইয়াছি। সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগলাভ আমাদিগের মত কাম-কাঞ্চনলিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সাগরসঙ্গমে গঙ্গাবগাহনের ন্যায় পাপহর এবং পবিত্রকর। এই জন্য পূর্ব্ব হইতে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। আমি এখানে কিছু বলিতে আসি নাই, আসিয়াছি—শুনিতে এবং পারি যদি, কিছু শিখিতে। অতএব যাঁহারা আমার নিকট কোনরূপ বিস্তীর্ণ আলোচনা প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহারা নিরতিশয় নিরাশ হইবেন। ইহা আমার দীনতা নহে, প্রকৃত অন্তরের কথা।

আজ যে পুণ্য প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা ব্যাপৃত, তাহার উচ্চতা—গগনভেদী, প্রসার—অনন্ত, গভীরতা—অতলস্পর্শী।

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু-পাত্রং
সুরতরু-বরশাখা লেখনী পত্রমূর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

সুগভীর সাগরের আধারে হিমাচলের ন্যায় পুঞ্জীকৃত কজ্জল ভরিয়া পৃথ্বীর ন্যায় বিশালায়ত পত্রে কল্পতরু শাখার লেখনী দ্বারা স্বয়ং সারদা যাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, কোথায় সেই গুণসিন্ধু শঙ্করপ্রতিম ত্যাগীশ্বর, বাগ্মী, যতিপ্রবর শ্রীবিবেকানন্দ, আর কোথায় আমার মত বিষয়-বিষ-কীট, অধম অজ্ঞজন! আজ যে নামের গৌরব-সৌরভ সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছে, যাহা উচ্চারণ করিলে জিহ্বা পবিত্র হয়, যাহার উচ্চারণে শত শত হৃদয় মাতিয়া উঠে, সেই নামধেয়

মহাপ্রাণ, প্রেমিক সন্ন্যাসীর কথা আমি কি বলিব? যিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মুক্তি চাহি না, ভক্তি চাহি না, আমি লাখ নরকে যাব,—বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ—এই আমার ধর্ম্ম," তাঁহাকে সম্যক উপলব্ধি করা ত দূরের কথা, তাঁহার এই পবিত্র বাণী কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিলে মানব ধন্য হয়। সন্ন্যাসীর মুখে ভক্তি-মুক্তির উপেক্ষা শুনিলে আপাততঃ বিসদৃশ মনে হয় বটে, কিন্তু বুঝিলে বুঝা যায় যে, শ্রীবিবেকানন্দের উক্ত লোকহিত-অনুষ্ঠান এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ-জ্ঞানে নরসেবাধর্ম্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত সাধনার বিভিন্ন পথ মাত্র।

কালের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের পূত চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, অহৈতুক প্রেম এবং অলৌকিক লোকহিতৈষণা তাঁহাদের বিশাল বিশ্বব্যাপী হৃদয়ে অম্লান পারিজাতের ন্যায় চির পরিস্ফুট। প্রেম এবং লোকহিতৈষণা ইঁহাদের সকল কার্য্যের প্রেরণা। পরের জন্য জীবন ধারণ, ইঁহাদের প্রতি শ্বাসবায়ু পরার্থে উৎসর্গীকৃত। প্রেমের শক্তি ত্রিলোকে অপরাজেয়। এই ক্ষুদ্র জীব নর—ক্ষণভঙ্গুর কলেবর—নিশ্বাস-পবনের উপর যার জীবন নির্ভর সে দেবত্বের উপর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়—প্রেমে। কেননা, স্বর্গবাসী দেবতা স্বর্গসুখাভিলাষী, আর ঐশী-বিভূতিমণ্ডিত প্রেমিক কেবল আত্মদান-প্রয়াসী। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান আয়ুধ বজ্র—যার বলে তিনি ত্রিলোকবিজয়ী সেই অশনি, নরমুনি দধীচির লোকহিতায় অস্থিদানে নির্ম্মিত। আত্মবলিদান প্রেমের নামান্তর মাত্র। মাতা, পিতা, সতী, স্বদেশ প্রেমিক, ভক্ত—যাঁহাদের জন্য ধূলিধূসরা বসুন্ধরা রত্নময়ী আখ্যায় ভূষিতা হইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই প্রেম স্বার্থত্যাগ বা আত্ম বলিদানের জীবন্ত বিগ্রহ। প্রেমের বন্ধনে সংসার স্থাপিত, নশ্বর মানব-জীবনে প্রেম পরম ঐশ্বর্য্য— কেননা এই প্রেমই সাম্য, সৌখ্য সুভ্রাতৃত্বের মূল এবং অদ্বৈত জ্ঞান-পদ্ম বিকাশের তপন স্বরূপ। ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্য বিভূষিত বিবেকানন্দের এই প্রেমই ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রেমিক নরবর নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে বিচরণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিপুল মানব-সমাজ স্বার্থপর নরপশুর মৃগয়া ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ, কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া উষ্ণ শোণিত পান করিতেছে! কে বলে ইহা তাঁহার প্রাণারাম প্রেমময়ের প্রেমের সংসার? না—না—কখন না! ইহা নরমেধ যজ্ঞস্থল! প্রেমিকহৃদয় সন্ন্যাসীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী যে প্রেম

তাঁহার প্রেমাস্পদের পূজার জন্ত প্রাণের নিভৃত ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দান করিলেন—নরসেবায়। প্রেম তাঁহার ধর্ম্ম, লোকহিত—সাধনা, মোক্ষ—নরসেবা।

কিন্তু এই সেবাধর্ম্ম কি প্রকৃত পক্ষে মোক্ষধর্ম্মের বিরোধী? যে ভারত শাস্ত্রে মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে; মুমুক্ষু মানব যেখানে শরীর পরিগ্রহ করিবার জন্ত লালায়িত; যাহার জল, স্থল, আকাশ বাতাস, মোক্ষমূলক অদ্বৈতমন্ত্রে অনুপ্রাণিত, অদ্বৈত সাধনা যাহার সনাতন ধর্ম্ম, সেখানে এ নূতন পন্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—কালের। এ দেশে যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন নূতন নহে। যুগে যুগে অবতারপ্রমুখ যুগাচার্য্যগণকর্ত্তৃক তাহাই সাধিত হইয়াছে এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে তপ, জপ, যোগ, সাধনা, বিবেক বিচার দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অতীত দুঃসাধ্য। সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া নরসেবা বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রকৃষ্ট পন্থা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে করিতে হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের স্ফুরণ হয়। এই বিশ্বপ্রেম অদ্বৈতপ্রেমের রূপান্তর। মানব মাত্রেই সচ্চিদানন্দের প্রকট বিগ্রহ। যদি মৃত্তিকা, প্রস্তর বা দারুব্রহ্মের পূজা শাস্ত্রবলে অদ্বৈতজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান হয়, তবে চেতনবিগ্রহ মানব সেবায় তাহা হইবে না কেন?

ইউরোপে বহুস্থানে নরসেবা ধর্ম্ম আচরিত হয় কিন্তু তাহা নারায়ণ জ্ঞানে নহে, দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দয়াভাবে সেবাধর্ম্মের আচরণে সেব্য-সেবকের মধ্যে গুরু লঘু ভাবের উদয় করে বলিয়া অদ্বৈত জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয়। যাহা ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধন করে,—"সা চাতুরী চাতুরী।"

বাস্তবিক পারলৌকিক কল্যাণ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধমাত্র ঐহিক মঙ্গলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা নরসমাজের পক্ষে পরম হিতকর। ইউরোপীয় মনস্বিগণের মত,—সংসারের দুঃখ, দৈন্ত দূর করিয়া, ভূতলে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সাম্য স্বাধীনতা এবং সুভ্রাতৃত্বের স্থাপনা একান্ত আবশ্তক। এইরূপ ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী দেশে সুসভ্য মানব যে দানবের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল এবং তাহার ফলে যে অবিরল জলধারার ন্তায় নররক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সে সকরুণ কাহিনী ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত।

যতদিন না প্রেমের প্রতিষ্ঠায় মানবপ্রকৃতি হইতে হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা প্রভৃতি হিংস্র বৃত্তিনিচয় নিঃশেষে নির্ম্মূল হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইবে ততদিন ভূতলে ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠার আশা আকাশ কুসুমের মত সুদূরপরাহত। স্বার্থবিসর্জ্জনে একতাবন্ধনে পৃথিবীর দুঃখ তাপ দৈন্য মোচন করা যদি কখন কল্পনা করিতে পারা যায়, তাহা কেবল মাত্র বিশ্বপ্রেম বা অদ্বৈত জ্ঞানে সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞানই একতার মূল মন্ত্র। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম মোক্ষ-সাধনের এই তিন সনাতন মার্গ। ভক্তি দুর্ল্লভ, জ্ঞান দুঃসাধ্য। প্রায় ষষ্টিবর্ষ এই ঘোর রহস্যময় সংসারে বিচরণ করিয়া প্রতিপদে প্রতিহত হইয়া বুঝিয়াছি যে, ঈশ্বর আত্মা মায়া প্রভৃতিত অনেক দূরের কথা—এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতে কিছুই জানিবার বুঝিবার উপায় নাই। আমি কিছুই জানিনা কিছুই বুঝি না। এমন কি অন্যাপেক্ষা যাহাকে আমার জানা বুঝা অধিকতর সম্ভব, সেই আমাকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা কম জানি, কম বুঝি। যে আবাল্য দীর্ঘ সাধনায় শাস্ত্র উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহা অতীব দুঃসাধ্য। এই কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে নিষ্কাম কর্ম্মমার্গ বিশেষতঃ শ্রীবিবেকানন্দপ্রতিষ্ঠিত শিবজ্ঞানে জীব-সেবা যে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

নরেন্দ্রনাথ যে কেবল কর্ম্মমার্গানুগত নর-নারায়ণ সেবার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রম উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি যেমন জ্ঞানী, তেমনি নিঃস্বার্থ কর্ম্মী এবং জ্ঞান কর্ম্ম আবরণে মহাভক্ত ছিলেন। তাঁহার উপদিষ্ট সেবাধর্ম্মের আচরণ সম্বন্ধে আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল দুর্ব্বলকে বল, নিরন্নকে অন্ন, পীড়িতকে ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা দাও, খঞ্জকে চলিতে শিখাও, অন্ধকে দৃষ্টিদান কর; আত্মা যার মোহতিমিরাবৃত, তার অন্ধকার ঘরে দীপ জ্বালাইয়া দাও, আর ভয়ার্ত্তকে বল —অভীঃ! আমি সেবার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি, এই জন্য যে আমার মনে হয় এই নিষ্কাম কর্ম্মই আমাদের বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। এই চির দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ ইহার জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্ব্বল নরনারী, আর সর্ব্বোপরি, জ্ঞান ঐশ্বর্য্যময়ী এই ভূমির বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক দৈন্য দেখিলে কার না মনে হয় যে, এই যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ত্রিকালজ্ঞ ঋষির জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছেন? তারপর হিংসা দ্বেষ

পরিশিষ্ট

জর্জ্জরিত স্বার্থৈকলক্ষ্য বিড়ম্বিত ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন!—যেখানে করাল অত্যাচার আপনার তাণ্ডব-নর্ত্তন শ্রান্তিতে আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে শোকের আতিশয্যে হাহাকার স্তব্ধ, বিয়োগবিধুরার উষ্ণশ্বাস বহনে সমীর শ্রান্ত, মহাকাশ ভারাক্রান্ত! যেখানে অস্থিমালিনী মেদিনীর রক্ত কলেবর অশ্রুধারায় ধৌত হইতেছে! সেই শ্মশানভূমে আর্ত্ত শোকার্ত্ত এখনও যারা জীবিত আছে—সেই হতভাগ্যগণ প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রেমবাণীর জন্ম উৎকর্ণ হইয়া আছে, তাহা আমাদিগকে শুনাইতে হইবে। বলিতে হইবে যে, হিংসায় হিংসা জয় করা যায় না, ঘৃণায় ঘৃণা জয় করা যায় না। বিদ্বেষে বিদ্বেষ জয় করা যায় না, ঘৃণা হিংসা বিদ্বেষ জয় হয় কেবল প্রেমে। জলধির গর্জ্জন লঙ্ঘিয়া গম্ভীর মেঘমন্দ্রে অমর সন্ন্যাসীর এই অবিনশ্বর বাণী হৃদয়ে ধ্বনিত হউক। সকল স্বার্থ বলি দিয়া সেবা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রেমের বিজয়নিশানকরে নির্ভীক অন্তরে শ্রীবিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জীবন-সংগ্রামে যে ভীত তাহাকে বলিতে হইবে—অভীঃ! ভয়? কিসের ভয়? পূজ্যপাদ স্বামিজী বলিয়াছেন—"ভয়ই মৃত্যু!" বীরের মৃত্যু একবার, কাপুরুষ শতবার মরে।

আজ কোথায় তুমি মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী! তোমার সেই গৈরিকবসনাবৃত গৌরবপু পরিগ্রহ করিয়া যে নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয় জগত জয় করিয়াছিলে সেই নিঃশঙ্ক দৃষ্টি লইয়া, তোমার আজানুলম্বিত বরবাহু তুলিয়া দিঙ্‌মুখ মুখরিত করিয়া বজ্র নির্ঘোষে আর একবার বল—অভীঃ!

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে
এ সবার পায়।
বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর!!"

এস সর্ব্বত্যাগী প্রেমিক নরবর! ভারতের এই ঘোর আধ্যাত্মিক নিশায় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় আর একবার উদিত হও, আমরা তোমাকে অভিবাদন করিয়া জীবন ধন্য করি।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

যৌবনের আদর্শ

বহরমপুর কলেজের যুবক সম্মিলনীর অধিবেশনে আমাকে সভাপতি মনোনীত করার জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। গত বৎসর হইতে আমাদের ছাত্রবর্গ এই সম্মিলনীর আহ্বান করিতেছেন। এখন দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশের ভিভিন্ন জেলার যুবকবৃন্দও এইরূপ ছাত্র সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করিতেছেন। এইরূপ সম্মিলনের উদ্দেশ্য যে মহান্ তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য ছাত্রবর্গের প্রাণে জাগিয়া থাকিলে বর্ষে বর্ষে ইহার উন্নতি সাধিত হইবে। প্রথম বর্ষে চেষ্টার সফলতা কিছু লাভ করা যায়; বর্ষে বর্ষে এইরূপ আন্দোলনে উহা দৃঢ়ীভূত হয় এবং এইরূপ আন্দোলনের উপর্য্যুপরি তরঙ্গ বৃহৎ একটা ভাব-সাগরের সৃষ্টি করে। যদি প্রত্যেক জেলার যুবকদের বার্ষিক সম্মিলনীতে তাঁহাদের চিন্তাশক্তি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং উৎসাহ এইরূপে বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে কালে সমস্ত বঙ্গ এবং ভারতভূমির যুবকবৃন্দ এক নূতন উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নূতন প্রেরণার দ্বারা চালিত হইয়া, নূতন কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, নূতন শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গলকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে এবং তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের মঙ্গল ও উন্নতি সাধিত হইতে থাকিবে। এইরূপ সম্মেলনে পরস্পরের ভাববিনিময়ে ছাত্রবর্গের হৃদয় উৎকর্ষ লাভ করিবে এবং তাঁহাদের জীবন নূতন ভাব ও নূতন আদর্শে গড়িয়া উঠিবে। এইরূপ আন্দোলনে যখন বঙ্গের কিংবা ভারতের সকল ছাত্র এক ভাবাপন্ন হইয়া ভারতের চারিদিক হইতে দেশের কল্যাণকর ও হিতকর কার্য্য করিতে থাকিবে তখনই ভারতের প্রকৃত জাতীয় জীবন লাভ হইবে। এইরূপ নূতন উদ্দীপনায় ধর্ম্ম ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বাল্যজীবন হইতে উন্নতির চেষ্টা যে জাতি না করে সে জাতি কখনও উন্নত হইতে পারে না। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পাঠ, মহৎ লোকের জীবনী পাঠ, ইহা প্রত্যেক যুবকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে কিরূপভাবে আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারি তাহা জানা যাইবে।

পরিশিষ্ট

যুবকেরা যদি এই সকল চিন্তা মনে রাখিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর না হ'ন তাহা হইলে তাঁহারা মানুষ হইতে পারিবেন না এবং তাঁহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধিতও হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই আমরা দেখিতে পাই যুবকেরাই জাতিকে নূতন ভাবে উন্নতির পথে গড়িয়া তুলিতেছেন। ভারতের যুবকগণ কি উন্নতির পথে না যাইয়া উদাসীন ভাবে গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকিবেন? ভারতের অনেক শিক্ষিত সন্তান জগতের নানাস্থানে গিয়াছেন, অনেক অসাধ্য কর্ম্ম তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হইতেছে। তাঁহারা বিভিন্ন দেশে গিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন। তবে ভারতের শিক্ষিত ছাত্রবর্গ শিক্ষার দ্বারা সকল বিষয় কেন সফলকাম হইবেন না? তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করিবার সুযোগ পাইলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশসমূহের যুবকশ্রেণীর সর্ব্ববিধ কার্য্যে তাঁহারা পারদর্শী কেন না হইতে পারিবেন। এই জন্য বাংলার, ভারতের যুবকবৃন্দের জাতীয় কার্য্যকরী শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের নানাবিধ বিভাগের কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া উন্নতির পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। নিষ্ক্রিয়তা এবং অবসাদকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। দেশের জলবায়ু এবং অর্থকৃচ্ছ্রতায় যোগ দিয়া আমাদের উদ্যোগ ও উদ্যমকে নিষ্ক্রিয় হইতে দিলে চলিবে না। অব্যবস্থচিত্ততা ও হুজুগপ্রিয়তা আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাই চিন্তাশক্তি ও বিবেককে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে অনেক শিক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি —কিন্তু সেই সকল বিষয় আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। থিয়েটারী অভিনয়, পুতুল নাচ ও ভোজ-বাজির খেলার ন্যায় আমরা সকল কার্য্য করিতেছি। রাজনীতিক্ষেত্রে, সাহিত্য-সভাতে অনেকরূপ বক্তৃতা শুনিতে পাই, কিন্তু সেই সকল বক্তৃতা তৎকালের জন্যই করিয়া থাকি, সেগুলি হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে আমরা চাহি না।

যুবকেরা এইরূপ বাহ্য বক্তৃতায় কালাতিপাত করেন—বৃদ্ধেরা নিজের গৃহে গিয়া অবসন্নদেহে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদের দেশে এই যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা শঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া আমরা কি নিৰ্জ্জীব হইয়া—

নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব ? আমাদের দেশ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে উদ্যমবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল যুবকদিগের মধ্যে উন্নতির ইচ্ছা আছে, শিক্ষা ও অর্থের অভাবে তাঁহারা সে উন্নতির পথে যাইতে পারিতেছে না। স্কুল কলেজের শিক্ষার সহিত সাধারণতঃ আমাদের শিক্ষার শেষ হইল—আমরা এই জ্ঞান লইয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করি এবং নিজ মতামত প্রকাশ করি, ইহাতে উন্নতির আশা কোথায় ? আমাদের দেশে সাধারণের জন্য যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহাতে 'সেন্টিমেণ্ট' এর শ্রাদ্ধ করা হয়, কেবল বক্তার ভাবপ্রবণতা ও ভাবের উদ্দীপনাই তাহাতে প্রকাশ পায় কিন্তু তাহাতে শ্রোতাদের মস্তিষ্কে নূতন ভাব প্রবেশ করিতে পায় না। গভীর চিন্তা তাহারা করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক কিংবা চিন্তাশীল বক্তৃতা শ্রোতৃগণ কেহ বুঝিতে চাহেন না। ইহাতে দেখা যায় যে, এ দেশে আজকাল চিন্তাশীলতার অভাব হইয়া পড়িতেছে, এরূপ অবস্থায় আমাদের ছাত্রবর্গ কেবল রঙ্গমঞ্চে নর্ত্তন-কুর্দ্দন শিক্ষা ভিন্ন অন্য শিক্ষা লাভ করেন না। তাঁহারা চিন্তাশীল হইতে শিক্ষা করিতেছেন না—কেবলমাত্র হুজুগপ্রিয় হইতেছেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যুবকেরা যাহাতে চিন্তাশীল, স্থিরপ্রকৃতি ও বিবেচক হন তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

মৌলিক চিন্তার অধিকারী হওয়া একান্ত দরকার। বর্ত্তমান সময়ে যুবকবর্গ যেরূপভাবে শিক্ষিত হইতেছেন তাহাতে জাতীয় জীবন গঠিত হয় না এবং জাতীয় স্বাধীনতা পাওয়াও সুকঠিন। সেজন্য আমাদের প্রয়োজন গঠনমূলক কার্য্য ; এই গঠনমূলক কার্য্য করিতে হইলে যেরূপভাবে অগ্রসর হইতে হয় আমাদের ছাত্রবর্গকেও তাহাই শিক্ষা করিতে হইবে। চিন্তা করিয়া কোন্ পথে আমাদের চলা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে হইবে। এই প্রশ্নের মীমাংসা এইরূপ বক্তৃতায় হইবে না। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহা স্থির করিতে হইবে এবং সেই পথেই চলিতে হইবে। যে সকল মহাত্মা এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা এই সকল পথ উদ্ভাবন করিয়া আমাদের গৃহ, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। উন্নতির পথে চলিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাঁহাদের ধারণা ও জ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন জ্ঞান হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়া নূতন জ্ঞানকে জাগাইয়া সমাজকে নূতন চোখে দেখিতে হইবে, ইতিহাসকে নূতন আলোকে পাঠ করিতে

হইবে এবং নূতন উদ্দীপনা লইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। আমার মনে হয় যে বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতিক আন্দোলনে অতিরিক্ত সময় ক্ষেপ না করিয়া সমাজতন্ত্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মৌলিক গবেষণায় মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং আপনাদিগকে বলশালী ও বুদ্ধিমান্ করিতে হইবে। বলবান্, ধনবান্ ও বুদ্ধিমান্ না হইলে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। সুতরাং আমাদের জাতীয় জীবনের সংগঠন কার্য্যও হইয়া উঠিবে না।

আমরা আপনাকে ভালবাসিতে জানি না—আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে জানি না, ভালবাসা যে কাহাকে বলে তাহাই জানি না—বিশ্বপ্রেম বিশ্বপ্রেম বলিয়া চীৎকার করি কিন্তু বিশ্বপ্রেম কি তাহা ধারণাও করিতে পারি না। যে জাতি আপনাকে ভালবাসিতে জানে না, সে কেমন করিয়া দেশবাসীকে ভালবাসিবে? যদি ভালবাসা আমার হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলে আমি অন্তকে ভালবাসিতে পারি। আমাদের বর্ত্তমান দেশের এরূপ অবস্থা কেন হইয়াছে? প্রথমত দেখিতে পাই সকল কার্য্য ফাঁকি দিয়া উদ্ধার করিবার চেষ্টা—দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ব্যাপারের বিচার না করিয়া কার্য্য করা। তৃতীয়তঃ নিজের স্বার্থ ত্যাগ না করা। এই সকল কারণেই দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং কোনরূপ উন্নতি হইবার উপায় নাই। যদি স্থির চিত্তে বিচার করিয়া এই সমস্ত কথার মীমাংসা করা যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ চেষ্টায় দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। এখন ধর্ম্ম ও রাজনীতি মিশ্রিত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবার উপায় নাই। উন্নতির অনেক পথ আছে। রাজনৈতিক, গঠনমূলক কর্ম্ম, জনসেবা ইত্যাদি কাজ হাতে লওয়া যাইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে তাহা অবধারণ করিতে হইবে। আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে বলবান্ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে কারখানায় শ্রমিক ও অন্যান্য কুলী মজুরদের আর্থিক অবস্থায় হয়ত কিছু উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে দৈন্য ঘুচিতেছে না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বিশেষ আবশ্যক। কৃষিজীবীদিগের মধ্যে আর্থিক অবস্থা মন্দ নয় কিন্তু কৃষি উন্নতি সম্বন্ধে তাহারা একেবারেই অজ্ঞ। তজ্জন্য কৃষির উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন।

গরীব চাকুরীজীবীদিগের অবস্থা কিসে ভাল হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত প্রয়োজন। হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিবারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা যিনি কর্ত্তা তিনিই কেবল উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পরিবারস্থ পুরুষ ও স্ত্রী কেহই আর অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন না। এ কারণ গরীব চাকুরীজীবিগণের মধ্যে আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে। ঐ শ্রেণীর মধ্যে অর্থোপার্জ্জনের উপায় যাহাতে বৃদ্ধি হয় সেই প্রথা অবলম্বনের চেষ্টা করা উচিত। আমার বিবেচনায় Vocational education যাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের একান্নপরিবারভুক্ত ধনীগণ, একত্রিত হইয়া থাকিলে এবং উক্ত পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি ধনাগমের চেষ্টা না করিলে পূর্ব্বপুরুষের উপার্জ্জিত ধন বৃদ্ধি হয় না, অধিকন্তু ঐ ধনী পরিবার ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়ে, এরূপস্থলে ধনী পরিবারগণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তার এবং ধনাগমের চেষ্টা বৃদ্ধি পায় তাহা করা উচিত। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখা যায় যে যৌথ কারবারের দ্বারা সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। এই যৌথ কারবার যাহাতে ভারতবাসীর মধ্যে স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যৌথ কারবারের প্রথা ও প্রবৃত্তি জাগাইতে পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। বর্ত্তমান সময় বেকারসমস্যা একটা বৃহৎ আন্দোলনের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয় যে আমাদের জাতিগত পেশা তুলিয়া দিয়া সকল জাতিতে সকল প্রকার পেশা অবলম্বন করা হইলে এই বেকারসমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত হইতে পারে! ঐ সঙ্গে সমবায় কর্ম্মপদ্ধতির দ্বারাও এই বেকার-সমস্যা কতকটা দূরীভূত হইতে পারে।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, পুস্তকালয় স্থাপন, কৃষির উন্নতির জন্য এক একটী কেন্দ্রে Laboratory স্থাপন বিশেষ আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠাগার স্থাপন, শ্রমজীবিগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগের জন্য Research Laboratory, Applied Chemistry Laboratary স্থাপনের প্রয়োজন।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে না পারিলে ভারতের যুবকগণের কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না।

অত্যাচার দাসত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার শোষণ-নীতির সহায়। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণ একটী পাঠাগারকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিলে, জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা করিলে, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের দ্বারা জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। পূর্ব্বে অনেক কথাই বলিলাম—শেষে একটী প্রধান কথা বলিতেছি যে, নিজের নিজের দেহকে যাহাতে সুস্থ রাখা যায় তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

এই জন্য গ্রামে গ্রামে একটী করিয়া ব্যায়ামাগার স্থাপন করা আবশ্যক। শরীর সুস্থ রাখিবার প্রধান উপায় চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখা। তোমরা সকলেই যুবক—এই তোমাদের প্রকৃত কর্ম্মের সময়—কাজ, কাজ, কাজ, যতই কাজ করিবে ততই তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সহজ সুন্দর এবং উজ্জ্বল হইবে। জীবনকে সফলতা-মণ্ডিত করিতে হইলে সর্ব্বদা কার্য্যরত হও—

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম ঘেরে আসি তারে।
সর্ব্বজন সর্ব্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণ গুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনমতে।
যে জাতি চেতনাহীন নিস্পন্দ অসার
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।।" *

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

---

* বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ "যুবক-সম্মিলনী"র সন ১৩৩৫ সালের সভাপতির অভিভাষণ।

গিরিশচন্দ্র

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,—

মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ও যে ক্ষণজন্মা পুরুষের স্মৃতিকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি, সৌভাগ্যক্রমে জীবনে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। অতএব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অভিমতরূপে যে কয়েকটী কথা আমি আপনাদিগকে নিবেদন করিব, তাহা সভাপতির অভিভাষণ নয়, কবির প্রতি আমার সুগভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি।

গিরিশচন্দ্র কবি, মহাকবি, নট ও নাট্যকার। কবি চেষ্টায় বা সাধনায় গঠিত হন না, জন্মগ্রহণ করেন। কল্পনাজীবী হইলেও কবি স্বভাবছবির চিত্রকর। প্রত্যক্ষ অনুভূত ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত তিনি আর কিছুই প্রত্যয় করেন না।— প্রকৃতি তাঁহার এই পালিত পুত্রটিকে যেন নাট্যকার রূপেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে বিপরীত সংঘর্ষ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকের জীবন, তাহার বীজ গিরিশচন্দ্রের নিজ জীবনেই নিহিত ছিল! সত্য বটে, নাটক রচনায় কবি আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না, কিন্তু আপনার ছায়াকে লঙ্ঘন করাও মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্যই গিরিশ বলিতেন, "আমাকে যে খুঁজবে সে আমাকে আমার নাটকের মধ্যেই পাবে।"

পিতার প্রভূত আদর এবং মাতার বাহ্য হতাদর—এই দুই বিপরীত সংঘর্ষে গিরিশচন্দ্রের বাল্য-জীবন গঠিত। পুরাণ-প্রসঙ্গে প্রগাঢ় আসক্তি তাঁহার জীবন প্রভাতের উপর অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ যাহা ভাবে তাহাই হয়। পৌরাণিক উচ্চ আদর্শের ধ্যান যে ভাবী কবির ভাবপ্রবণ হৃদয় ও প্রকৃতি কি ভাবে গঠন করিতেছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে উচ্চ আদর্শের আকর্ষণ ও অন্যদিকে প্রমোদপ্রবৃত্তির প্রলোভন—এই দুই বিপরীত তরঙ্গ যে ঘাত-প্রতিঘাত সূচিত করে, তাহাও ধারণা করা কঠিন নহে। গিরিশচন্দ্রের হৃদয়-ক্ষেত্রে এই দেব-দানব-দ্বন্দ্ব দীর্ঘব্যাপী। কিন্তু তাঁহার জীবনের চরম দ্বন্দ্ব—আস্তিকতা ও নাস্তিকতায়। উপর্য্যুপরি দুঃসহ শোক ও নানা অবস্থা

সঙ্কটে পরম আশ্রয় লাভের জন্য একদিকে যেমন তাঁহার হৃদয়ের আকুল প্রেরণা, অন্যদিকে তেমনি সংশয়ের প্রবল তাড়না। তাঁহার বহু নাটকে এই অবস্থার আভাস আছে। তেমনি তেমনি বহু বিসদৃশ ভাবসংঘর্ষে গিরিশচন্দ্রের জীবন গঠিত। অবশেষে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় লাভে তাঁহার সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

গিরিশচন্দ্রের জীবনের ন্যায় তাঁহার নাট্য-রস-রচনাও বৈচিত্র্যময়। মানুষ মাত্রেই এইরূপ বহু বিরোধী ভাবের আধার, কিন্তু গিরিশের হৃদয়ে তাহা পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়াছিল।

মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি রূপক-রচনায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও গিরিশচন্দ্রের নাটক বঙ্গ-রঙ্গ-জগতে এক অভিনব যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

যে সময় গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ, বাঙ্গালায় তখন আলো-আঁধারী যুগ। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কণ্ঠস্বর চির-নীরব হইয়াছে, কিন্তু বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটে বাটে, দোকানে, দালানে, অন্তঃপুরে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। সে সময় একদিকে যেমন কীর্ত্তন, কথকতা, কবি, হাফ্-আখড়াই প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও আদর্শের আবির্ভাব। প্রাচী ও প্রতীচীর এই ভাব-সম্মেলন যুগে গিরিশচন্দ্রের জন্ম। প্রতিভা ও সাময়িক ভাব ও প্রভাবের বশবর্ত্তী গিরিশচন্দ্রের রচনাও এই প্রাচ্যের আলোক ও প্রতীচ্যের ছায়া বিজড়িত; কিন্তু হিন্দুর আদর্শ তিনি কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ কবিদিগের যুগ এখন অতীত। বাংলা দেশ এবং সাহিত্য এখন যেরূপ দ্রুতপদবিক্ষেপে ধাবমান, তাহাতে পশ্চাদ্দৃষ্টিপাত করিবার ইচ্ছা ও অবসর তাহার নাই। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, বর্ত্তমান অতীতেরই সন্তান। সাহিত্যে অভিনব সম্পদ অর্জ্জন করিয়া সন্তান গৌরববান্ হউক, তাহা অবশ্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পিতৃদান উপেক্ষা করা আত্মবঞ্চনা মাত্র।

ইংরাজীতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে—**History repeats itself.** বাংলা-সাহিত্যে এখন ভারতচন্দ্রের যুগ প্রবর্ত্তিত। বিখ্যাত যাত্রা-গায়ক গোপাল উড়ে তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সরল এবং সতেজ ভাষায় এখন সেই

গোপাল উড়ের স্রোতই প্রবহমান। তাহার উপর ইউরোপীয় রূপজ মোহের নগ্ন চিত্র সকল আমাদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অত্যল্পকালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহা যেমন বিস্ময়জনক, তেমনি [illegible]-কর। গিরিশচন্দ্রের জন্ম ও যৌবনসময়ে এই সম্ভোগের সাহিত্য—কবি, হাফ্-আখ্‌ড়াই তরজা প্রভৃতি খেঁউড় নামে প্রচলিত ছিল; এখনকার সভ্য সাহি[illegible] বস্ত্র-পরিমাণের ন্যায় সেই খেঁউড়কে আবরণ দিয়াছে মাত্র। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, প্রেম ও নীতির আদর্শ ব্যতীত সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। বাল্য ও যৌবনে মনের উপর যে ছাপ পড়ে, তাহা সহজে মুছে না। কিন্তু দেবী সরস্বতীর কৃপায় এই সম্ভোগের সাহিত্য গিরিশের উপর কোন অসঙ্গত আধিপত্য স্থাপন করে নাই। তিনি চিরজীবন স্নেহ-ভালবাসার বশে চালিত হইতেন—স্বভাবের প্রভাবে প্রেম ও ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রেমবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যে সঙ্গীত রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সেই সঙ্গীতই সাধারণের নিকট তাঁহার প্রথম পরিচয় প্রদান করে। তখন তাঁহার বয়স চতুর্ব্বিংশতি বৎসর। ভাষাকে আয়ত্ত ও নিজ কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত পঞ্চদশবর্ষ বয়সে তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হন। অনন্তর তাঁহার প্রথমা পত্নীবিয়োগের পর একত্রিংশ বর্ষ বয়সে তিনি যে সকল শোকগাথা রচনা করেন, তাহাতে এবং এই সময় অনূদিত ম্যাক্‌-বেথের উইচদিগের ভাষায় তাঁহার সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু যে নাটকীয় ভাষা 'গৈরিশী ছন্দ' নামে এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে সুপরিচিত, তাহা যে কোন্ সময় হইতে তাঁহার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা এখন সুকঠিন। তবে দেখা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের ৩৭ বর্ষ বয়সে তাহার প্রথম বিকাশ এবং সে বিকাশ গিরি-কন্দর-বাসিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবল, অবাধ এবং অশ্রুতপূর্ব্ব বীণার ঝঙ্কারময়। মধুসূদন ও দীনবন্ধু গিরিশের পূর্ব্বে নাটকে পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নাটকীয় ভাষা নহে। গৈরিশী ছন্দ বাংলায় নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় দান। শুনা যায় স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এই ছন্দের প্রথম উদ্গাতা, কিন্তু গিরিশ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া যে তান তুলিয়াছিলেন, তাহার কাছে কালীপ্রসন্নের ছন্দোগীতি সিদ্ধ গায়কের ভৈরব সঙ্গীতের কাছে শিশুর বাক্যাঙ্কুরণ! এই অভিনব ছন্দ ও ভাষাকে স্বচ্ছন্দগতি-শীল ও প্রাণময় করিবার উপযোগী তাঁহার শব্দসম্পদ্ ছিল যেমন অফুরন্ত, তেমনি

দর্শকবৃন্দকে মোহাবিষ্ট করিবার প্রধান উপকরণ কল্পনা ও ভাবুকতা ছিল তাঁহার অসীম।

এক একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জাতির কোন বিশেষ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সংসার-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হ'ন। বাংলার রঙ্গালয়ের উন্নতি এবং অভিনেতা ও নাট্যকার-দিগকে পথপ্রদর্শনের জন্ত গিরিশের জন্ম। বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহীন ও অভিভাবকশূন্ত করিয়া বিধাতা তাঁহাকে সংসারের কুটিল ও কণ্টক-কঙ্করময় পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভের জন্ত। তাঁহার কলহাসপূর্ণ গৃহ শ্মশান করিয়াছিলেন সংসারের দারুণ শোক-তাপ অনুভূতির নিমিত্ত। সংসারে এরূপ অবস্থায় পতিত হওয়া বিরল নহে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি ছিল দেখিবার মত; হৃদয় ছিল অনুভূতির অনুকূল এবং ভাষা ছিল তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী।

এই স্বভাবসিদ্ধ নটের অভিনয় শক্তি ছিল অনন্তসাধারণ। কিন্তু এখন তাহা কয়েকজন মাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিয়াছেন :—

"দেহপট সঙ্গে নট সকলি হারায়।"

তাঁহার এই মর্ম্ম-বিগলিত অশ্রু-বিন্দু প্রকৃতই প্রাণস্পর্শী। জীবনের সুদীর্ঘ-কাল যিনি অভিনয়-কলা প্রদর্শনে আবালবৃদ্ধবনিতার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে, ভাবাভিব্যক্তির মাত্র কয়েকখানি ছায়াচিত্রে! হায়, কোথায় সে সুমিষ্ট পুরুষোচিত কণ্ঠস্বর, যাহা শ্রোতৃবৃন্দকে আকৃষ্ট করিয়া মোহাবিষ্ট করিত, আর কোথায় সে ভাবভঙ্গী যাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও তৃপ্তি হইত না।

গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভা ও রচনা-শক্তির মধ্যে কোনরূপ তারতম্য করা দুঃসাধ্য। তবে এই দুইশক্তি যে পরস্পরকে প্রবোধিত করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তাঁহার আবির্ভাবে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ একদিকে যেমন ভাব-ভক্তি, ধর্ম্ম-নীতি ও রসধারায় স্নাত হইয়া অপরূপ কান্তি ও উজ্জ্বল প্রভায় প্রভাবিত হইয়া উঠিল, অন্ত দিকে তেমনি অভিনব পরিকল্পনায় নূতন নূতন সাজ-সরঞ্জাম ও দৃশ্যপটে নিত্য নববেশ পরিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতে লাগিল।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

নাটকীয় সংস্থান (situation) সৃষ্টিতে, ভাব-রসের পুষ্টিতে, চরিত্রের অভিব্যক্তিতে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে, কলা-কৌশলে গিরিশচন্দ্রের লেখনী যেমন দক্ষ, উচ্চ কল্পনার বিকাশ ও মহান্ আদর্শের প্রতিষ্ঠাও তেমনই তাঁহার মহত্তর লক্ষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবার পর গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা এই মহা-পুরুষদ্বয়ের ভাবসঙ্গমে পুণ্য প্রয়াগের যুক্তবেণীর মহিমায় মহিমান্বিত। জ্ঞান-ভক্তি,কর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্মের এই ত্রিধারা তাঁহার রচনায় অনাবিল রসস্রোত ও পবিত্র প্রভাব সঞ্চার করিয়া বঙ্গরঙ্গ-মঞ্চকে ধর্ম্মের বেদীতে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার নাটকে বর্ণিত মাতৃত্ব, সতীত্ব, প্রেম-ভক্তির সকরুণ চিত্রনিচয়, সংশয় ও প্রত্যয়ে নিদারুণ সঙ্কটসঙ্কুল চিত্তের অবস্থা, বঙ্গ সাহিত্যের অতুল সম্পদ। তাঁহার পৌরাণিক চিত্রসকল রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও অভিনব পরিকল্পনায় অভিনব সম্পদে সমৃদ্ধিশালী। কবি পৌরাণিক চরিত্র-বিকাশে যে অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার এবং বাংলা সাহিত্যের গৌরব। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক চিত্রে যে স্বদেশ-প্রেম ও মহাপ্রাণতা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা সকল জাতির সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে। তাঁহার সামাজিক নাটক সকল বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি। অবতার এবং মহাপুরুষগণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া তিনি যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাহারা প্রাণময়। তাঁহার কল্পনাপ্রসূত রোমান্টিক্ নাটক ও গীতিনাট্য সকল উচ্চভাব, রস ও কাব্য সম্পদের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার।

নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র মহাকবি সেক্সপীয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও তাহা মৌলিকতাবর্জ্জিত নহে। সকল নাটকেই তাঁহার নিজস্ব ছাপ আছে।

গিরিশচন্দ্রের রচনা যেন ভাব, রস ও ভাষার একতান প্রবাহ। তিনি নিজ হস্তে পুস্তক লিখিতেন না! বলিয়া যাইতেন, একজন লিখিয়া লইত। কিন্তু তাঁহার রচনার প্রতিযোগিতায় অতি দ্রুত-চালিত লেখনীও সময় সময় হতাশে নিশ্চল হইত। এমনি ভাবে রূপক, গীতিনাট্য পঞ্চরং ও প্রহসন সমেত সর্ব্ব-সাকুল্যে তিনি বিরাশি খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার

উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও খণ্ড কবিতার সংখ্যাও কম নহে। সে সকলের দোষগুণ বিচার আমার শক্তির অতীত। স্রষ্টার এই সকল বিরাট সৃষ্টির উচ্চতা বিশালতা, গভীরতা, ও মহিমা দর্শনে যেমন আমরা স্তম্ভিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হই, ইহাদের অন্তর্নিহিত রত্নরাজিও তেমনি আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

সহানুভূতি ব্যতীত কবির মর্ম্মদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না। গিরিশচন্দ্রকে জানিতে—বুঝিতে হইলে যে হৃদয় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গাথায় আজিও অজস্র অশ্রু বর্ষণ করে, সেই প্রেম-ভক্তিবিগলিত, রস-পিপাসু হৃদয়ের প্রয়োজন। বাংলার প্রকৃতি যেমন শ্যামলা ও কোমলা, গিরিশচন্দ্রের ছন্দ, ভাব ভাষাও তেমনি অপরূপ শ্রীসম্পন্ন ও সুকোমল। পরন্তু তিনি নাটক-রচনায় প্রাচীর রুচি ও প্রতীচীর প্রথা সমন্বয় করিয়া অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

সাধারণের যত্ন, আগ্রহ, উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষায় জনপ্রিয় নট ও কবির মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু মহাপ্রাণ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি আত্মরক্ষার জন্য প্রাণহীন পাষাণের প্রতীক্ষা করে না। তিনি আপনার স্মৃতি আপনি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। গিরিশ তাঁহার রচনায় চিরজীবী। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মর্ম্মর মূর্ত্তি বা তৈলচিত্র নাই; কিন্তু আজিও তাঁহারা বাঙ্গালীর হৃদয়-সিংহাসনে রাজাধিরাজরূপে অধিষ্ঠিত। গিরিশচন্দ্রের নশ্বর দেহ ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত গিরিশচন্দ্র তাঁহার রচনায় অমর। কেবল তাহাই নহে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাসের ন্যায় এই মহাকবিকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গভাষা অমর হইয়া থাকিবে। *

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

---

* গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ। ২০শে পৌষ, সন ১৩৩৩ সাল

মণীন্দ্র-স্মৃতি

"There is a greater man than the great man—the man who is too great to be great."

আজ যাঁহার জন্ত বাংলার অনেক দীন-দরিদ্রের ঘরে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার উঠিয়াছে, সে প্রশান্ত হাস্তময় সৌম্যদর্শন মণীন্দ্রচন্দ্র আর ইহ-জগতে নাই। নিষ্ঠুর কাল যে অমূল্য রত্ন অপহরণ করিয়াছে, গগণভেদী বিলাপরোল তুলিলেও আর তাহা ফিরাইয়া দিবে না। জন্মিলে মরে, মরিলে আর ফিরে না, এ দৈনন্দিন নিত্য সত্যের পুনরুল্লেখ করিতেছি কেন, তাহার কারণ—এ দেশে তাঁহার স্থায় মুক্তহস্ত আদর্শ পুরুষ ও মহৎ চরিত্রের প্রয়োজন আছে বলিয়া। তবে ইহাও জানি—যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না।

মণীন্দ্রচন্দ্রের পিতা ছিলেন বর্দ্ধমান জেলার মাথরুণ গ্রামনিবাসী নবীনচন্দ্র, মাতা কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথের কন্তা গোবিন্দসুন্দরী। নবীনচন্দ্রের স্থায় নির্ব্বিরোধ, সরল, সহানুভূতি-সম্পন্ন, সাদাসিধে মানুষ আমি দেখি নাই। অন্ত দিকে মাতা ছিলেন তেমনি তেজস্বিনী।

নবীনচন্দ্রের তিন পুত্র, পাঁচ কন্তা। মণীন্দ্রচন্দ্র অষ্টম গর্ভের সন্তান। তাঁহার জন্ম শ্যামবাজার ২০নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে। ইহার জন্মের অল্পদিন পরে মাতা স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মধ্যমা কন্তা স্তন্তদানে মণীন্দ্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। মণীন্দ্রের জন্ম ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি মাতামহ রাজা হরিনাথের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্রের স্বভাব ছিল অত্যন্ত 'কুনো' এবং একান্ত অধ্যয়নানুরাগী। তেমন 'রাশভারী' লোক সচরাচর দেখা যায় না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্দরের পুকুর-পাড়ে বসিয়া মাছকে ময়দার গুলি খাওয়ান ছিল তাঁহার একমাত্র আমোদ ও নিত্য সঙ্গী ছিল রাশি রাশি পুস্তক আর এক দেশী কুকুর বাঘা। উপেন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে ছুটিয়া ছুটিয়া ছাদে আসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া সে কুকুরের কি চীৎকার ও কান্না! অধ্যয়নকীট হইলেও উপেন্দ্র প্রকৃষ্ট পরিমাণে হৃদয়বান্ ছিলেন।

পরিশিষ্ট

মধ্যম যোগেন্দ্রচন্দ্রের আকৃতি ও প্রকৃতি রাজপুত্রের মত ছিল। অকালে তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। এই দুর্ঘটনার পর ইঁহারা সপরিবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

শ্যামবাজার বঙ্গ-বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া মণীন্দ্র হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী পার না হইতেই তাঁহাকে নিদারুণ শিরঃপীড়া আক্রমণ করে। সে সময় একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় থাকিতেন। এখন হইতে তাঁহাকে বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া গৃহ-শিক্ষকের অধীনে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে হয়। স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া শিক্ষা-বিস্তারকল্পে তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল ঐকান্তিক। একণে যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া সমাজে গণ্যমান্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অন্ন, বস্ত্র এবং পরীক্ষার ফির জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। কেবল তাহাই নহে, টেক্‌নিক্যাল এডুকেশনের উন্নতি এবং কৃতিত্ব লাভ করিবার জন্য তিনি অনেক শিক্ষার্থীকে পাশ্চাত্য জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেবল এক সর্ত্তে—শিক্ষিত হইয়া দেশের কাজে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে। মণীন্দ্র বিদ্যালয়ে কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন এবং উপেন্দ্রের নির্ম্মম শাসনের ভয়ে সময় সময় তাঁহাকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এই নিমিত্ত তিনি বলিতেন, শিক্ষকের দোষে ছাত্র মিথ্যাচার শিক্ষা করে।

বাল্যকাল হইতেই মণীন্দ্রচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব দেখা গিয়াছিল। রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে মণীন্দ্রচন্দ্র ব্যাটবল খেলিতেছিলেন। খেলিতে খেলিতে মণীন্দ্রচন্দ্রের হাত হইতে ব্যাট ফস্‌কাইয়া আমার বুকে লাগে—মণীন্দ্রচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—"ব্যস্ত হয়ো না—তেমন লাগে নি"—মণীন্দ্রচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"ভাই ব্যাও, ব্যাটবল খেলা আজ হ'তে শেষ।" আর তিনি কখনও ব্যাটবল খেলা করেন নাই। আর একদিনের কথা বলিব। ছেলেবেলায় নিজের হাতে বাজি তৈয়ার করিয়া দেওয়ালীর রাত্রে সেই বাজি পোড়াইবার এক আনন্দ ছিল। আশুতোষ বসু তখন আমাদেরই বয়সী; মণীন্দ্রচন্দ্র বাজি পোড়াইতেন সে আগুনে আশুতোষের গা পুড়িয়া গেলে মণীন্দ্রচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "আর কখনও জীবনে বাজি পোড়াইব না।" তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চিরদিন তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

এই আত্মত্যাগী পুরুষের সকল কার্য্যই ছিল পরার্থে এবং স্বদেশের হিতকল্পে। মাতামহ রাজা হরিনাথ কন্যার সংসারখরচের নিমিত্ত প্রায় লক্ষ টাকা কলিকাতা হাইকোর্টে গচ্ছিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কালক্রমে কোম্পানীর কাগজের সুদ কমাতে তাহার আয়ে আর সম্পূর্ণভাবে ব্যয়-নির্ব্বাহ হয় না। এদিকে আত্মীয়-স্বজন-মুখাপেক্ষী মণীন্দ্রচন্দ্র সপরিবারে তাঁহার পৈতৃক বাস মাথরুণে স্থানান্তরিত হইলেন। কত লোক কত কথা বলিল, কিন্তু তিনি অটল। মাথরুণে দীন-দরিদ্রের সহিত বাস করিয়া, তাহাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া মণীন্দ্র একটি অমূল্য সম্পদ পাইয়াছিলেন—দৈন্যের সহিত সহানুভূতি। এই মাথরুণে অবস্থানকালে এক দিন স্নান করিতে যাইবার সময় মণীন্দ্রের পায় একটি বৃহৎ কণ্টক বিদ্ধ হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় মণীন্দ্র বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, কার জন্য, কিসের জন্য এত সহ্য করি? কিন্তু তখনই আত্মীয়-স্বজনের মুখ মনে পড়িল। কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। অতি দীন-দরিদ্র প্রজারাও তাঁহার কাছে অবারিত দ্বার। বড় লোকের দরবারে দাখিল হইতে হইলে কত বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত। তাঁহার দরবার হইতে বিদ্রোহী প্রজাও কখন বিমুখ হয় নাই। অন্য লোক ভয় পাইত, কি জানি কার মনে কি আছে কিন্তু তিনি নির্ভীক ছিলেন। কেবল তাহাই নহে। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, ইঁহার কাছে কোন ভয় নাই। দরিদ্রের অভাব-অভিযোগ শুনিবার জন্য তাঁহার কর্ণ সর্ব্বদাই উৎকর্ণ হইয়া থাকিত।

পরোপকার, পরসেবার জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিল। কৈশোরে দেখিয়াছি, এক বালক—রাতকাণা গাড়ীঘোড়ার ভয়ে চলিতে পারিতেছে না। এক পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। পথের লোক জিজ্ঞাসা করিতেছে ও সম্পূর্ণ উত্তর না শুনিয়াই উদাসীনভাবে চলিয়া যাইতেছে। মণীন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিতেছেন।

লক্ষ লক্ষ মুদ্রা যিনি লোকহিতার্থে ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার ত্যাগের কথা আর বলিতে হইবে না। অন্যদিকে তাঁর ক্ষমাও ছিল অসামান্য, ভৃত্য বা কর্ম্মচারী অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে; লোক কর্ম্মচ্যুত করিবার ইঙ্গিত করিতেছে। মণীন্দ্র ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, তাই উচিত বটে, কিন্তু তা হ'লে ও খেতে পাবে না। তাঁহার এই উদারতায় ইতর লোক আস্কারা পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত, তথাপি ক্ষমার অন্ত নাই।

এমন পূত সংযত চরিত্র আমি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি অনেকবার অনেক পরীক্ষায় পড়িয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার পদস্খলন হয় নাই।

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন"—মহাপ্রভুর এই মহানীতি তাঁহাতেই মূর্ত্ত দেখিয়াছি।

মণীন্দ্রচন্দ্রের চরিত্র বুঝাইতে আমরা কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, কেন না ছোট কাযেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। এইবার তাঁহার দুই একটি বড় কাযের কথা বলিব। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে টাউন হলে মহাসভা আহূত হয়। দেশের কোন ভূস্বামীই এ সভার সভাপতিত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। সে সঙ্কটের অবস্থায় কাশিমবাজারাধিপতি মূল সভাপতির পদ গ্রহণ না করিলে সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইত। তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমার বাসায় আসিয়া বলিলেন, "আর অমত কোরো না। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে।" তাঁহার নির্ভীক তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি আর কোন কথা বলিলাম না। বুঝিলাম, এই কার্য্যের জন্য যে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে, সে নিমিত্ত তিনিও প্রস্তুত হইয়াছেন।

তিলি-জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় মণীন্দ্রের দ্বিতীয় মহদনুষ্ঠান। এ দেশে সংকার্য্য-সাধন করিতে গেলে যে সকল প্রতিবন্ধক ঘটে, এ ক্ষেত্রেও তাহার অভাব ছিল না। ছোট লোক ছোট কথা বলিয়া মুখের উপর মণীন্দ্রকে কতই না অপমান করিয়াছে, মণীন্দ্র হাসিয়াছেন মাত্র।

উপাধিব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া কত লোক তাঁহার কত অপবাদ ঘোষণা করিয়াছে। তিনি কোন দিনই কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু আমি তাঁহার মনের সংবাদ জানি; বলিতেন, কি জান, খেতাবগুলো থাকলে রাজ-দরবারে কথার একটু গুরুত্ব হয়। দেশের কল্যাণ-সাধন ও রাজনীতিসম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল, **First deserve then desire**, প্রথম যোগ্যতা, তার পর কামনা।

মণীন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইয়াও নিরুৎসাহ হইতেন না। অসাফল্য বরং তাঁহাকে অধিকতর উত্তেজনা প্রদান করিত। কঠিন মাটী ভেদ করিয়া যেমন অঙ্কুরোদগম হয়, তাঁহার কর্ম্ম-প্রেরণাও তেমনি সর্ব্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিত।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

মণীন্দ্রচন্দ্রের বন্ধু-প্রীতি সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বাল্য-প্রেম, বাল্য-বন্ধু, বাল্য-সংস্কার।
যেই জন উচ্চাসনে বাল্য দিন রাখি মনে
বাল্য-বন্ধু সনে করে বালক-ব্যাভার।
সেইরূপ একান্তর, নাহি কভু ভাবান্তর,
নিরন্তর সরল নির্ম্মল প্রেমধার।
প্রেমপুষ্পে সুবাসিত হৃদয় আগার।"

যত দিন স্মৃতির উদয়, আমি তাঁহার এই নির্ম্মল স্বার্থশূন্য সৌহার্দ্দ্য উপভোগ করিয়াছি। আশৈশব সুদীর্ঘ সংস্রবে তাঁহার সহিত একত্র স্নান, ভ্রমণ, ক্রীড়া, বিহার করিয়াও তাঁহার বিশাল হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় পাই নাই, এই কয়েক ছত্রে তাঁহার কি চিত্র পরিস্ফুট করিব? তবে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পড়িয়াই তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। নহিলে আমার বর্ত্তমান অবস্থা তাহার অনুকূল নহে।

হায় অভিন্ন-হৃদয় সোদরাধিক সুহৃদ্‌বর! একবার রেলগাড়ীর তলদেশ হইতে দৈবরক্ষিত হইয়াছিলে; হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় পরের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া, তুমি আসন্ন-মৃত্যু হইতে দৈববলে রক্ষা পাইয়াছিলে, আর আজ সামান্য ঝড়ে বহু জনাশ্রয় মহাতরু নিপতিত হইল!

মণীন্দ্রচন্দ্র আর নাই! যে মহাপ্রাণ অনুক্ষণ দেশের ও দশের কল্যাণ ধ্যান করিত, তাহা মহাপ্রয়াণ করিয়াছে; যে হৃদয় নিরন্তর পরার্থে স্পন্দিত হইত, তাহা নিস্পন্দ হইয়াছে; শ্রান্ত কর্ম্মক্লান্ত জীবন মহানিদ্রা-মগ্ন! উৎসবে, শোকে, সম্পদে, বিপদে তোমাকে সকল অবস্থায় দেখিয়াছি, উপর্য্যুপরি শোকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে. লোককল্যাণ-চিন্তায় কখন বিরত— কখন ভাবান্তর দেখি নাই। আজ এ কি ভাবান্তর? অনাবিল স্নেহ, অপার্থিব ভালবাসা, অকৃত্রিম প্রীতি, অকপট সৌহার্দ্দ্য জীবনে যাহা কিছু দিয়াছিলে, মৃত্যুতে সকলই কাড়িয়া লইয়া, রাখিয়া গেলে, কেবল তোমার চরণের স্মৃতি আর আমার অফুরন্ত অশ্রু! *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

---

* বসুমতী, ১৩৩৬ সাল। কার্ত্তিক।

শোকাষ্টক

মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়—অনন্ত জীবন
লভিয়াছে মহাপ্রাণ বরিয়ে শমন ;
মাটির মমতা মায়া ত্যজি' ছায়াহীন কায়া—
লভিয়াছে নরবর—নূতন চেতন,
স্বপ্ন ভঙ্গে নবলোকে নবজাগরণ !

মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়, এ মহাপ্রয়াণ
মরণের জয়-যাত্রা, পুণ্য অভিযান ;
কি জানি কি কর্ম্মফলে এসেছিলে ধরাতলে,
গেলে চলে' দান-যজ্ঞ করি সমাধান,
চিতানলে দিয়ে শেষ পূর্ণাহুতি প্রাণ।

নিশিদিন শান্তিহীন জীবন-যাপন,
কণ্টকিত পথপরে চির বিচরণ
সহিয়ে যন্ত্রণা-জ্বালা জন্মভূমি জপমালা,
মহাদায় ক্লান্তকায় নিদ্রায় মগন,
বিশ্বব্যাপী চিতাধূম চুমিছে গগন !

সত্য বটে মৃত্যু নয়, কিন্তু তবু হায়,
চির বিরহিত হিয়া করে হায় হায়
যে গেছে সে আসিবে না, হেসে কাছে বসিবে না,
আসে যদি ফিরে সে কি চিনিবে আমায়,
পূর্ব্বপ্রীতি পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে কি সে পায় ?

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

জানি ভালো জ্বলে আলো নিবিলে আবার,
জোড়া যায় পুনরায় ছিন্ন পুষ্পহার;
অতি অকিঞ্চিত যাহা ফিরে পুন পাই তাহা,
ফিরে না কেবল জীব—শিব নাম যার—
হারায়ে হৃদয়-নিধি হাহাকার সার।

ঐ ত ফুটিছে ফুল ছুটিছে পবন,
ছুটিছে তটিনীকুল উঠিছে তপন;
ভরিয়ে বিরাট ভূমি সবি আছে শুধু তুমি
হলে চির অদর্শন, হে চিরশরণ!
চিরবঞ্চিতের চিরবাঞ্ছিত রতন।

নাহি আর দোলা-হেলা সংশয়-দোলায়,
ঘুচে গেছে জন্মশোধ জন্মভূমি দায়;
মায়া মৃগ পিছে ছোটা, পায় পায় কাঁটা ফোটা
অবিশ্রান্ত নামা-ওঠা, আশা—নিরাশায়,
পরের ভাবনা ভাবা বিনিদ্র নিশায়।

প্রীতি দিয়ে ভুলাইয়ে প্রীতি-পারাবার,
হেনে গেলে চির শোক-শর-তীক্ষ্ণ-ধার;
চলে গেলে, ফেলে একা, আর নাহি পাব দেখা,
পুণ্যশ্লোক, তব লোক অগম্য আমার,
সম্মুখে নিরখি শুধু স্তব্ধ অন্ধকার। *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

---

* বসুমতী, ১৩৩৩। অগ্রহায়ণ।